জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ্ গ্রন্থাবলী—৫

ন্যায়-পরিচয়

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ

প্রবোধচন্দ্র বসুমল্লিক বৃত্তি-প্রাপ্ত

অধ্যাপক

মহামহোপাধ্যায়

শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ

প্রণীত

১৩৪৭

মূল্য ২।০ আড়াই টাকা মাত্র

বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ
হইতে
শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ কর্তৃক প্রকাশিত
যাদবপুর ২৪ পরগণা।

প্রিণ্টার—শ্রীশচীন্দ্র প্রসাদ বসু
ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস.
৯।৩ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ্ গ্রন্থাবলী

হিন্দুসমাজ বিজ্ঞান (২য় সংস্করণ) ৫৲

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ এম্, এ

হিন্দুরাষ্ট্রের গড়ন ২॥০

শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম্, এ

ইতিহাস ও অভিব্যক্তি ৩৲

শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম্, এ

কমিউনিজম্ ও সোসিয়ালিজম্ ১৸০

শ্রীদয়ালচন্দ্র ঘোষ

হিন্দুসোসিয়ালিজম্ ২॥০

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ এম্, এ

যাদবপুর জাতীয় শিক্ষা-পরিষদে

এবং

কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

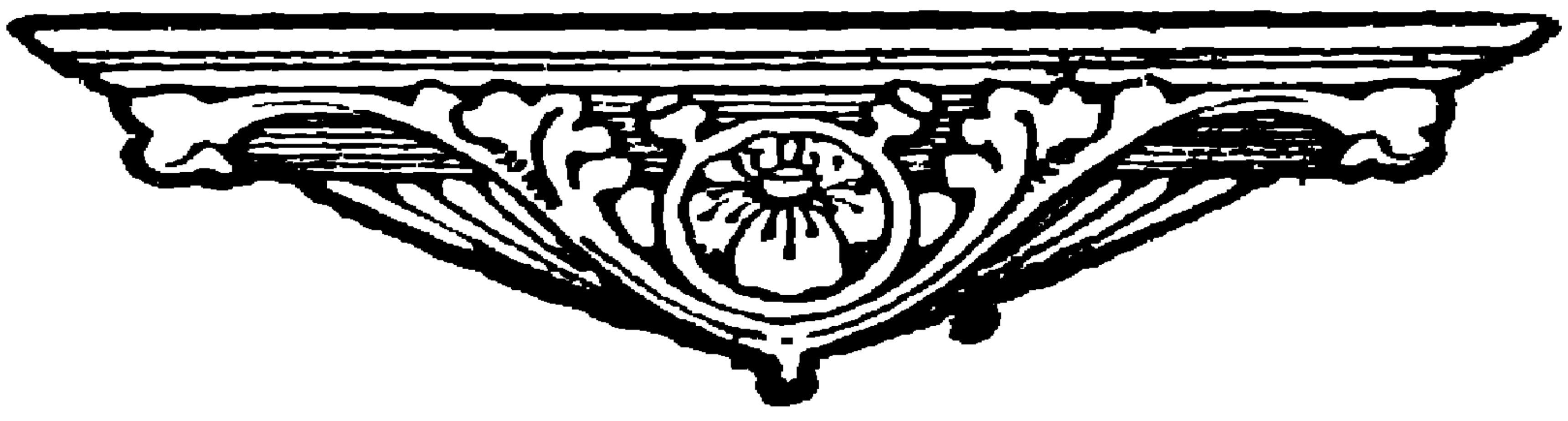

ভূমিকা

ন্যায়শাস্ত্রে বাঙ্গালীর জয়

"বঙ্গ আমার জননী আমার" বলিয়া ভক্তি গদ্‌গদকণ্ঠে স্বদেশের গৌরব-গান করিতে এই বিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত কবি দ্বিজেন্দ্রলালও যাঁহাকে মনে করিয়া গাহিয়াছিলেন—**ন্যায়ের বিধান দিল রঘুমণি,** সেই রঘুনাথ শিরোমণি তাঁহার "দীধিতি" টীকার প্রারম্ভে লিখিয়া গিয়াছেন—

ন্যায়মধীতে সর্ব্বস্তনুতে কুতুকান্নিবন্ধমপ্যত্র।
অস্য তু কিমপি রহস্যং কেচন বিজ্ঞাতুমীশতে সুধিয়ঃ॥

অর্থাৎ সকলেই ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং সে বিষয়ে গ্রন্থও রচনা করেন, কিন্তু এই ন্যায়শাস্ত্রের যে অনির্ব্বচনীয় রহস্য, তাহা বুঝিতে কোন কোন সুধীই সমর্থ হন্।

কথাটি তখন অনেকের অপ্রিয় হইতে পারে,—কিন্তু যিনি এমন কথা বলিয়াছেন, তিনিই মিথিলা-জয় করিয়া নিখিল ভারতে ন্যায়শাস্ত্রের অভিনব যুগান্তর উপস্থিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই অভিনব প্রতিভার গুরুগৌরবে 'বঙ্গ আমার, জননী আমার'—নব্যন্যায়ে নিখিল ভারতের গুরুস্থান হইয়াছেন। বাঙ্গালীর গৌরব-গান করিতে তাঁহার সম্বন্ধে, প্রখ্যাত যুবক কবি সত্যেন্দ্রনাথ সত্যই লিখিয়াছেন—

কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষ শাতন করি
বাঙ্গালীর ছেলে ফিরে এল ঘরে,-যশের মুকুট পরি।

এখানে বলা আবশ্যক যে, নবদ্বীপ হইতে প্রথমে বাসুদেব সার্ব্বভৌম মিথিলায় গিয়া মিথিলার নব্য ন্যায় গ্রন্থ "তত্ত্ব-চিন্তামণি" পাঠ করিয়া নবদ্বীপে আসিয়া নব্যন্যায়ের অধ্যাপনা করেন। রঘুনাথ প্রথমে তাঁহার নিকটে অধ্যয়ন করিয়া পরে তৎকালে ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নৈয়ায়িক সরস্বতীর বরপুত্র পক্ষধর মিশ্রের নিকটে অধ্যয়নের জন্য মিথিলায় গমন করেন এবং পরে বিচারদ্বারা পক্ষধরেরও পক্ষ-খণ্ডন অর্থাৎ মত-খণ্ডন পূর্ব্বক "তত্ত্বচিন্তামণি"র "দীধিতি" নামক অপূর্ব্ব টীকা রচনা করিয়া নবদ্বীপে নব্য-ন্যায়ের নব সম্প্রদায়ের সুপ্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র এইরূপ প্রাচীন প্রবাদ প্রসিদ্ধ আছে। খৃঃ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে "গোষ্ঠীকথা"র রচয়িতা প্রসিদ্ধ রাঢ়ীয় ঘটক পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়ও (ফুলো পঞ্চানন) বলিয়া গিয়াছেন—

কাণা ছোড়া বুদ্ধে দড় নাম রঘুনাথ।
মিথিলার পক্ষধরে যে করেছে মাথ॥

রঘুনাথ শিরোমণি কাণা ছিলেন,—ইহাও চির প্রসিদ্ধ আছে। তাই তিনি কাণভট্ট শিরোমণি নামেও কথিত হইয়াছেন। ফলকথা, পরে রঘুনাথ শিরোমণিই নবদ্বীপে নব্য-ন্যায়ের নব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া নিখিল ভারতে নব্য-ন্যায়ের গুরু হইয়াছেন—ইহা সত্য।

কিন্তু ইহাও বলা আবশ্যক যে, বঙ্গদেশে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের পূর্ব্বে আর কেহ ন্যায়-শাস্ত্র পড়েন নাই এবং তখন ন্যায়-শাস্ত্রের কোন গ্রন্থও এদেশে ছিল না—এই সমস্ত কথা সত্য নহে। পূর্ব্বকালেও বঙ্গ দেশে প্রাচীন ন্যায়-বৈশেষিক গ্রন্থের বিশেষ চর্চ্চা হইয়াছে। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে বঙ্গের দক্ষিণ রাঢ়ায় সুপ্রসিদ্ধ মীমাংসক শ্রীধরভট্ট ন্যায়-বৈশেষিক শাস্ত্রেও অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন—ইহা তাঁহার "ন্যায়-কন্দলী" গ্রন্থ পাঠেই বুঝা যায়। সর্ব্বদেশে প্রসিদ্ধ প্রশস্তপাদ-ভাষ্য-টীকা

ন্যায়কন্দলী তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। তিনি আরও অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

শ্রীধরভট্টের পরে রাঢ় দেশে তাঁহার শিষ্য-সম্প্রদায়ও অবশ্যই ছিলেন। পরে "খণ্ডনখণ্ডখাদ্য"কার মহানৈয়ায়িক শ্রীহর্ষও যে, বঙ্গদেশেই কোন স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন. ইহা বুঝিবারও অনেক কারণ আছে। রাজশেখর সূরিও তৎকৃত "প্রবন্ধকোষে"র উত্তরাংশে শ্রীহর্ষকে গৌড়দেশীয়ই বলিয়া গিয়াছেন। পরে মিথিলার বিদ্যাপতিও "পুরুষ-পরীক্ষা"গ্রন্থে তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। পরন্তু শ্রীহর্ষের "নৈষধচরিতে"র অনেক শ্লোকে কোন কোন স্থলে 'যমক' ও "অনুপ্রাসে", লক্ষ্য করিলেও বুঝা যায়—বঙ্গদেশীয় বর্ণোচ্চারণই তাঁহার অভ্যস্ত ছিল। ‡ এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গাগত ভরদ্বাজ গোত্র শ্রীহর্ষ "নৈষধ-চরিত"কার নহেন। "নৈষধ-চরিত"কার শ্রীহর্ষ, তাঁহার পরবর্ত্তী এবং তাঁহার পিতার নাম শ্রীহীর ও মাতার নাম মামল্ল দেবী। তিনি নৈষধ-চরিতের সর্গশেষে আত্ম-পরিচয়-বর্ণনে আরও অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। তাহার গৌড়দেশে জন্ম সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও "ন্যায়-কন্দলী"কার শ্রীধরভট্ট যে গৌড়দেশীয় প্রাচীন মহাদার্শনিক,* ইহা নির্ব্বিবাদ সত্য।

---

* শ্রীধরভট্ট "ন্যায়-কন্দলী" গ্রন্থে তাঁহার পূর্ব্ব-রচিত "অদ্বয়-সিদ্ধি," "তত্ত্ব-প্রবোধ", "তত্ত্ব-সংবাদিনী" ও "সংগ্রহ-টীকা" এই গ্রন্থ চতুষ্টয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা এখন তাঁহার ঐ সমস্ত গ্রন্থ দেখিতে পাই না।

‡ নৈষধচরিতে—"অমী ততস্তস্য বিভূষিতং সিতং" (১।৫৭)। "প্রসূনশূন্যেতর-গর্ভগহ্বরং" (১।৯৫)। মনস্তু যং নোজ্ঝতি জাতু যাতু" (৩।৫৯)। "জাগর্ত্তি যাগেশ্বরঃ"। (১২।৩৮)। "সখ্যমীক্ষতে"। (১।৩৮) "অবোধি তজ্জাগরদুঃখসাক্ষিণী" (১।৪৯) নখৈঃ কিলাখ্যায়ি বিলিখ্য পক্ষিণা" (৯।৬৬) আরও বহুস্থলে দ্রষ্টব্য। "সখা মীক্ষতে" "দুঃখ-সাক্ষিণী" ইত্যাদি বহুস্থলেই শ্রীহর্ষ যে "খকার" ও "ক্ষ"কারের বঙ্গদেশীয় একরূপ উচ্চারণই করিতেন, ইহা প্রণিধান করা আবশ্যক।

"ন্যায়কন্দলী"র শেষে শ্রীধরভট্টের নিজের উক্তির দ্বারা জানা যায় যে, গৌড়দেশে দক্ষিণ রাঢ়ায় বহুপুণ্যকর্ম্মা ব্রাহ্মণসমাজ এবং বহু শ্রেষ্ঠিজনের বাসস্থলী "ভূরিসৃষ্টি" নামে সুপ্রসিদ্ধ গ্রাম ছিল।* সেখানে তাঁহার পিতামহ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বৃহস্পতিকল্প পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র (শ্রীধরের পিতা) বলদেবও পরমবিদ্বান্ ও বিবিধ কীর্ত্তিমান্ ছিলেন। তাঁহার পত্নী (শ্রীধরের মাতা) অব্বোকা দেবী "বিশুদ্ধ-কুলসম্ভবা" ও বহুগুণবতী ছিলেন। শ্রীধরভট্ট তৎকালে ঐ দেশের অধিপতি, কায়স্থকুল-তিলক পাণ্ডুদাসের প্রার্থনায় "ত্র্যধিকদশোত্তর-নবশত-শাকাব্দে" অর্থাৎ ৯১৩ শকাব্দে (৯৯১ খৃঃ) "ন্যায়কন্দলী" রচনা করেন।‡

শ্রীধরভট্টের পরে একাদশ শতাব্দীতে রাঢ় দেশে রাজা হরিবর্ম্মদেবের মন্ত্রী সিদ্ধলগ্রামী মহামীমাংসক ভবদেব ভট্ট নানা গ্রন্থকার সর্ব্বদেশ-

---

* শ্রীধরভট্ট লিখিয়াছেন :—"আসীদ্দক্ষিণরাঢ়ায়াং দ্বিজানাং ভূরিকর্ম্মণাং। ভূরি-সৃষ্টিরিতি গ্রামো ভূরিশ্রেষ্ঠিজনাশ্রয়ঃ"। "প্রবোধচন্দ্রোদয়" নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে শ্রীকৃষ্ণমিশ্রও লিখিয়াছেন—"গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং, নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়া ততো ভূরিশ্রেষ্ঠিক-নাম ধাম পরমং তত্রোত্তমো নঃ পিতা ॥" গৌড়রাজ্যে রাঢ়া পুরীর অন্তর্গত শ্রীধরভট্টোক্ত "ভূরিসৃষ্টি" গ্রামকেই শ্রীকৃষ্ণমিশ্র উক্ত শ্লোকে "ভূরিশ্রেষ্ঠিক" নামে উল্লেখ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। টীকাকার লিখিয়াছেন—ভূরিশ্রেষ্ঠিগ্রামস্য অধুনা "ভূরসুট" ইতি প্রসিদ্ধিঃ।" বস্তুতঃ, বর্ত্তমান হুগলী জেলার মধ্যে 'ভূরসুট' অতি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রও ঐ স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন।

‡ অনেক ঐতিহাসিক খ্রীঃ দশম শতাব্দীর শেষ বা একাদশ শতাব্দীর প্রথমে রাঢ়াধিপতি কায়স্থরাজ পাণ্ডুদাসকে বৌদ্ধ বলিয়াছেন। কিন্তু "ন্যায়-কন্দলী" গ্রন্থে শ্রীধরভট্ট বৌদ্ধমতের যেরূপ প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং কোন স্থলে কোন প্রসঙ্গে "গুণরত্নাভরণঃ কায়স্থকুল-তিলকঃ পাণ্ডুদাসঃ"—এইরূপ বলিয়া পাণ্ডুদাসের যেরূপ প্রশংসা করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীধর ভট্টের অনুগত ঐ পাণ্ডুদাস যে, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিরোধীই ছিলেন, ইহাই বুঝা যায়। পরে রাঢ়াধিপতি অন্য কোন পাণ্ডুদাস বৌদ্ধ হইতে পারেন।

বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। ভুবনেশ্বরে অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরে খোদিত তাঁহার প্রশস্তিতে তাঁহার সর্ব্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য ও বহুকীর্ত্তি-কথা বর্ণিত আছে। ন্যায়-শাস্ত্রে বিশিষ্ট পাণ্ডিত্য ব্যতীত ভবদেবের ন্যায় মীমাংসক হওয়া যায় না। পরে দ্বাদশ শতাব্দীতে মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সময়েও বঙ্গে হলায়ুধ প্রভৃতি মীমাংসক ও অনেক নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। আমরা বৃদ্ধ মুখে প্রবাদ-রূপে শুনিয়াছি—লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় তাঁহার যশোবর্ণন করিতে কোন কবি উপস্থিত বঙ্গীয় নৈয়ায়িকদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়াছিলেন—*

"ভাবাদভাবাদ্ যদি নাতিরিক্তঃ সম্বন্ধিভিঃ স্বীক্রিয়তে পদার্থঃ।
জন্যাঽবিনাশি প্রতিযোগি-শূন্যং শ্রীলক্ষ্মণক্ষৌণি-পতের্যশঃ কিম্?

তাৎপর্য্য এই যে, নৈয়ায়িক-মতে পদার্থ দ্বিবিধ—ভাব ও অভাব। এতদ্‌ভিন্ন তৃতীয় প্রকার কোন পদার্থ নাই। তাই উক্ত শ্লোকের দ্বারা কোন কবি বলিয়াছিলেন যে—সম্বন্ধিগণ অর্থাৎ সমবায়াদি নানা সম্বন্ধ-বাদী নৈয়ায়িকগণ যদি ভাব ও অভাব হইতে ভিন্ন প্রকার কোন পদার্থ স্বীকার না করেন, তাহা হইলে ভূপতি শ্রীলক্ষ্মণ সেনের যশঃ কি পদার্থ? উহাকে ভাবপদার্থ বলা যায় না। কারণ, শ্রীলক্ষ্মণ সেনের যশঃ "জন্যা-বিনাশী' অর্থাৎ সেই যশঃ তাঁহার নানা গুণ-জন্য হইলেও অবিনশ্বর। কিন্তু জন্যভাব পদার্থমাত্রই বিনশ্বর। এইরূপ উহাকে অভাবপদার্থও বলা যায় না। কারণ, উহা "প্রতিযোগি-শূন্য" অর্থাৎ শ্রীলক্ষ্মণসেনের যশের প্রতিযোগী বা বিরোধী কিছুই নাই। কিন্তু অভাব পদার্থ-মাত্রেরই প্রতিযোগী আছে। প্রতিযোগি-শূন্য অভাব হইতে পারে না। সুতরাং শ্রীলক্ষ্মণ সেনের যশঃ অভাব পদার্থও নহে। তাহা হইলে সম্বন্ধীদিগের মতে 'শ্রীলক্ষ্মণ-ক্ষৌণি-পতের্যশঃ কিম্?"

---

* এখানে বুঝা আবশ্যক যে, নৈয়ায়িকগণ সমবায় প্রভৃতি নানাবিধ সম্বন্ধ স্বীকার করায় উক্ত শ্লোকে কবি তাঁহাদিগকে সম্বন্ধী বলিয়াছেন। কিন্তু উহার দ্বারা যে উপহাস

সেন রাজত্বের অবসানে মুসলমান রাজ্যারম্ভেও বঙ্গে বহু মীমাংসক ও ন্যায়শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ছিলেন। উত্তর বঙ্গে "নন্দনবাসি" গ্রামে লব্ধপ্রতিষ্ঠ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকুল প্রদীপ দিবাকরভট্টের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ কুল্লূক ভট্ট পরে ৺কাশীবাসী হইয়া "মনুসংহিতা"র যে টীকা করেন, তাহার প্রারম্ভে তিনি লিখিয়াছেন—"মীমাংসে! বহুসেবিতাসি সুহৃদস্তর্কাঃ সমস্তাঃ স্থ মে।" কুল্লূকভট্টের পরে উত্তরবঙ্গে রাজা গণেশের সভাপণ্ডিত রায়মুকুট বৃহস্পতি অসাধারণ শাব্দিক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি "অমরকোষে"র টীকা প্রভৃতি রচনা করেন। তাঁহার "স্মৃতিকণ্ঠহার" নামে স্মৃতিনিবন্ধও বিদ্যমান আছে। এইরূপ বঙ্গের প্রাচীন স্মার্ত্ত "দায়ভাগ"কার জীমূতবাহন এবং শূলপাণি প্রভৃতি স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণও ন্যায়শাস্ত্রবিৎ ছিলেন। নচেৎ ঐরূপ বিচারপূর্ব্বক "দায়ভাগ" প্রভৃতি নিবন্ধ-রচনা সম্ভব হইতে পারে না।

মূলকথা, পূর্ব্বকালেও বঙ্গে ন্যায়শাস্ত্রের বিশেষ চর্চ্চা হইয়াছে। আর বঙ্গদেশীয় কোন কোন পণ্ডিত দেশান্তর-বাসী হইয়া মিথিলার নব্যন্যায় গ্রন্থেরও অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাদি করিয়াছেন, ইহাও বুঝা যায়। কিন্তু তখন নবদ্বীপে নব্যন্যায়ের সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠা হয় নাই। পরে বাসুদেব সার্ব্বভৌম এবং প্রধানতঃ তাঁহার শিষ্য রঘুনাথ শিরোমণিই নবদ্বীপে নব্যন্যায়ের সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। কোন্ সময়ে তাঁহারা মিথিলায় গিয়াছিলেন, ইত্যাদি বিষয়ও বিচার করিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে তাঁহাদিগের কিছু পরিচয় বলা আবশ্যক।

ব্যঙ্গ হইয়াছে, তাহা বঙ্গীয় নৈয়ায়িকদিগের প্রতিই বুঝা যায়। কারণ, বঙ্গদেশেই শ্যালককে সম্বন্ধী বলে। মিথিলাদি দেশে বৈবাহিককেও সম্বন্ধী বলে। অন্য দেশের নৈয়ায়িকদিগকে কেহ সম্বন্ধী বলিলে তাঁহারা ঐরূপ উপহাস বা তিরস্কার বুঝেন না।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও রঘুনাথ শিরোমণি

যিনি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য নামে বিখ্যাত হইয়া পরে উৎকলের স্বাধীনরাজা গজপতি প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিতরূপে ৺পুরীধামে বাস করিয়াছিলেন এবং ১৫১০ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যদেব ৺পুরীধামে গেলে যিনি পরে তাঁহার পরম ভক্ত হইয়াছিলেন—তিনিই নবদ্বীপের বিশারদপুত্র মহানৈয়ায়িক বাসুদেব সার্ব্বভৌম।

"শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত" গ্রন্থের মধ্যলীলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে কবিরাজ গোস্বামীও বর্ণনা করিয়াছেন যে, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ৺পুরীধামে তাঁহার ভগ্নীপতি গোপীনাথ আচার্য্যের নিকটে শ্রীচৈতন্যদেবের পরিচয়-প্রশ্ন করিলে তিনি বলিয়াছিলেন যে, ইনি নবদ্বীপের জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র এবং নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র, ইহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম—বিশ্বম্ভর। পরে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বলেন যে, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী আমার পিতা বিশারদের সহাধ্যায়ী ছিলেন এবং জগন্নাথমিশ্রও আমার পিতার মান্য ছিলেন। অতএব—"পিতার সম্বন্ধে দোহা পূজ্য করি মানি।" পরে—"নদীয়া সম্বন্ধে সার্ব্বভৌম তুষ্ট হৈলা। প্রীত হঞা গোসাঞিরে কহিতে লাগিলা॥" কবিরাজ গোস্বামীর উক্ত বর্ণনার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনিও উক্ত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে নবদ্বীপের বিশারদ-পুত্র নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্ব্বভৌমই জানিতেন। তথাপি কেহ কেহ নিষ্প্রমাণ তাঁহাকে অন্য কোন বৈদান্তিক বাসুদেব সার্ব্বভৌম বলিয়াছেন এবং কেহ কেহ তাঁহার বাসুদেব নাম বিষয়েও সংশয় করেন।

বস্তুতঃ লক্ষ্মীধরকৃত "অদ্বৈতমকরন্দ" গ্রন্থের টীকায় উক্ত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিজের উক্তির দ্বারাই জানা যায় যে, তিনি গৌড়াচার্য্য বাসুদেব সার্ব্বভৌম। বঙ্গাক্ষরে লিখিত ঐ টীকার পুথি পুরীর শঙ্কর-

মঠে আছে। উহার লিপিকাল ১৫৫১ শকাব্দ। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ও ঐ পুথির বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। উক্ত টীকার মঙ্গলাচরণ-শ্লোকের পরেই টীকাকার লিখিয়াছেন—"শ্রীবাসুদেববিদুষা গৌড়াচার্য্যেণ যত্নতঃ। অদ্বৈত-মকরন্দস্য ক্রিয়তে পরিশোধনম্॥"

পরন্তু উক্ত টীকার শেষে লিখিত **শ্রীবন্দ্যান্বয়** ইত্যাদি শ্লোকের * দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি নরহরি বিশারদের পুত্র। সেই নরহরি বন্দ্যবংশরূপ কুমুদের চন্দ্র-স্বরূপ ও 'বেদান্ত-বিদ্যাময়' ছিলেন। তাঁহার

"শ্রীবন্দ্যান্বয়-কৈরবামৃতরুচো বেদান্তবিদ্যাময়াদ্
ভট্টাচার্য্য-বিশারদান্নরহরে র্যং প্রাপ ভাগীরথী।
গৌড়াচার্য্যবরেণ তেন রচিতা লক্ষ্মীধরোক্তেরিয়ং
শুদ্ধিঃ কাচন বাসুদেব-কৃতিনা বিদ্বজ্জন-প্রীতয়ে।"

"কর্ণাটেশ্বর কৃষ্ণরায় নৃপতেগর্ব্বাগ্নি-নির্ব্বাপকো
যত্র স্মস্তভরোঽভবদ্ গজপতিঃ শ্রীরুদ্রভূমীপতিঃ।
তস্য ব্রহ্ম-বিচার-চারুমনসঃ শ্রীকূর্ম্মবিদ্যাধর-
স্যানন্দো মকরন্দ-শুদ্ধি-বিধিনা সান্দ্রো ময়া মন্ত্রিতঃ॥

প্রথম শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে "নরহরে র্যং প্রাপ ভাগীরথী" এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিয়া 'ভাগীরথী (মাতা) নরহরেঃ (পিতুঃ) যং প্রাপ'—এইরূপ ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝা যায় উক্ত বাসুদেব সার্ব্বভৌমের পিতার নাম নরহরি এবং মাতার নাম ভাগীরথী। কিন্তু 'চৈতন্য ভাগবতে' বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন—"সার্ব্বভৌম-পিতা বিশারদ মহেশ্বর।" "নদীয়া কাহিনী" পুস্তকে কোন স্থলে এক পাদটীকায় লিখিত হইয়াছে—'সার্ব্বভৌমের পিতামহ নরহরি বিশারদ'। আমি উক্ত মতানুসারে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় ঐরূপই লিখিয়াছিলাম। কিন্তু পরে অনেক আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছি যে, নরহরি বিশারদ উক্ত সার্ব্বভৌমের পিতা। 'রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকা'তেও দেখা যায়—নরহরির পুত্র বাসুদেব। সম্ভবতঃ উক্ত নরহরি বিশারদকে অনেকে মহেশ্বর বিশারদ বলিতেন। মহেশ্বর তাঁহার নামান্তর হইতে পারে। তদনুসারেই বৃন্দাবনদাস ঐরূপ লিখিয়াছেন। অনেকেই উক্ত বিষয়ে এইরূপেই সামঞ্জস্য করিয়াছেন, ইহাও দেখিয়াছি।

পাণ্ডিত্যের উপাধি ছিল—বিশারদ। অই তিনি বিশারদ ভট্টাচার্য্য নামে খ্যাত ছিলেন। রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থের দ্বারাও জানা যায় যে—নরহরি বিশারদ বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ আখণ্ডল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্তান এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ-পুত্র বাসুদেব সার্ব্বভৌম।

উক্ত বাসুদেব সার্ব্বভৌমের রচিত উক্ত টীকার সর্ব্বশেষে তাঁহার লিখিত **কর্ণাটেশ্বর** ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা বুঝা যায় যে—কোন সময়ে কর্ণাটের অধিপতি কৃষ্ণদেব রায়ের সহিত উৎকলাধিপতি প্রতাপ রুদ্রের প্রবল বিরোধ উপস্থিত হইলে তখন কূর্ম্ম বিদ্যাধরের প্রতি রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া প্রতাপ রুদ্র নির্ভয়ে বিজয়যাত্রা করেন। সেই কূর্ম্ম বিদ্যাধর অদ্বৈতবেদান্তমতে বিশেষ অনুরক্ত ব্রহ্ম-বিচারক ছিলেন। উক্ত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁহারই ইচ্ছানুসারে "অদ্বৈত-মকরন্দ" গ্রন্থের প্রতিবাদ-খণ্ডন দ্বারা সমর্থন করিয়া তাঁহার অত্যন্ত আনন্দ বিধান করেন। শেষোক্ত শ্লোকের কথায় ঐতিহাসিকগণের অনেক বিচার্য্য আছে।

"অদ্বৈত-মকরন্দে"র টীকাকার উক্ত বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রতাপ-রুদ্রের সভাপণ্ডিতরূপে ৺পুরীধামে অবস্থানকালে পূর্ব্বোক্ত কারণে অদ্বৈত বেদান্তের বিশেষ চর্চ্চা করায় তখন হইতে সে দেশে তিনি অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক বলিয়াও প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কিন্তু তিনি সেই বাসুদেব সার্ব্বভৌম—যিনি মিথিলা হইতে নব্যন্যায় পড়িয়া নবদ্বীপে আসিয়া বিদ্যানগরের চতুষ্পাঠীতে প্রথমে নব্য-ন্যায়ের অধ্যাপনা করেন। তিনিও নিজমতানুসারে নব্যন্যায়ের গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার কোন কোন বিশিষ্টমত "সার্ব্বভৌমমত" নামে কথিত হইয়াছে। পরন্তু তাঁহার পুত্র **জলেশ্বর** উৎকল-বাসকালে উৎকলরাজের নিকটে **বাহিনীপতি মহাপাত্র** উপাধি লাভ করেন। তিনিও পিতার নিকটে ন্যায়-শাস্ত্র পাঠ করিয়া মহানৈয়ায়িক হইয়া নব্য-ন্যায়ের গ্রন্থ

রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই গ্রন্থে তিনি "অস্মাকং পৈতৃকঃ পন্থাঃ" এইরূপ বলিয়া তাঁহার পিতা বাসুদেব সার্ব্বভৌমের বিশিষ্ট মতেরও উল্লেখ করিয়াছেন্। তাঁহার রচিত পক্ষধরমিশ্র-কৃত "আলোকে"র টীকার এক পুথি কাশীর "সরস্বতীভবনে" আছে। উহার লিপিকাল ১৬৪২ সংবৎ (১৫৮৫ খৃঃ)। দ্রষ্টব্য—Saraswati Bhaban Studies, Vol. IV. P. 69-70.

পূর্ব্বোক্ত বাসুদেব সার্ব্বভৌমের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রত্নাকর বিদ্যাবাচস্পতি। তিনি 'বিদ্যাবাচস্পতি' নামেই খ্যাত ছিলেন। 'শ্রীমদ্‌ভাগবতে'র দশম স্কন্ধের টীকার শেষে সনাতন গোস্বামী তাঁহার গুরু-বর্গের নাম করিতে প্রথমেই লিখিয়াছেন—"ভট্টাচার্য্যং সার্ব্বভৌমং বিদ্যাবাচস্পতীন্ গুরূন্।" শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে সনাতন গোস্বামীর অধ্যয়ন-কালে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপেই অধ্যাপনা করিয়াছেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতিই সনাতনের প্রধান গুরু ছিলেন। তাই তিনি উক্ত শ্লোকে 'গুরূন্' এইরূপ বহুবচনান্ত প্রয়োগ করিয়াছেন। উক্ত বিদ্যাবাচস্পতির পুত্র কাশীনাথ বিদ্যানিবাস সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ মহানৈয়ায়িক হইয়া সর্ব্বদেশে 'বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য্য' নামেই প্রখ্যাত হন। তাঁহার পুত্র রুদ্রনাথ ও বিশ্বনাথ ন্যায়-শাস্ত্রে নানা গ্রন্থকার প্রখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। যে বিশ্বনাথের "ভাষাপরিচ্ছেদ" ও "সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী" এবং "ন্যায়-সূত্র-বৃত্তি" ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত, তিনি উক্ত বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ভ্রাতুষ্পুত্র বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য্যেরই পুত্র। বিদ্যানিবাস ও বিশ্বনাথের সম্বন্ধে অন্যান্য কথা পরে বলিব।

বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ পূজ্য আখণ্ডল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্তান বাসুদেব সার্ব্বভৌমের কুল-পরিচয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-কুলগ্রন্থে বর্ণিত আছে। কিন্তু তাঁহার শিষ্য রঘুনাথ শিরোমণির কুল-পরিচয় আমরা কোন কুলগ্রন্থে পাই নাই। "শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত" পুস্তকের লেখক খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত

অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় শ্রীহট্টের 'বৈদিকসংবাদিনী' নামক কোন গ্রন্থানুসারে লিখিয়াছেন যে, শ্রীহট্টের 'পঞ্চখণ্ড'বাসী কাত্যায়ন গোত্র বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর কনিষ্ঠ পুত্র রঘুনাথই রঘুনাথ শিরোমণি। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রঘুপতি ঐ দেশের রাজা সুবিদ নারায়ণের খঞ্জা কন্যা রত্নাবতীকে বিবাহ করায় ঐ রাজার কুল-দোষে সমাজে বড় কলঙ্ক হয়। ক্রমে সেই কলঙ্ক বিশেষ কষ্ট-দায়ক হওয়ায় বিধবা মাতা সীতা দেবী কনিষ্ঠ পুত্র রঘুনাথকে সঙ্গে লইয়া নবদ্বীপে আসেন এবং রঘুনাথকে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের হস্তে অর্পণ করেন ইত্যাদি। এই নূতন মতের বিশেষ বিবরণ ১৩১৯ বঙ্গাব্দে সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত অচ্যুত চরণ চৌধুরী মহাশয়ের প্রকাশিত প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

পরে "বিশ্বকোষ" প্রভৃতি কোন কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থেও নির্ব্বিচারে ঐ মতই গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীহট্টের সেই রঘুনাথই যে, নবদ্বীপের রঘুনাথ শিরোমণি, এবিষয়ে প্রমাণ না পাইয়া অনেকে উক্ত মতের বহু প্রতিবাদও করিয়াছেন। ১৩২০ সালে ঢাকা হইতে প্রকাশিত **প্রতিভা** পত্রিকায় (১১ শ সংখ্যায়) শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র গুহ মহোদয় বহু ঐতিহাসিক বিচার দ্বারা প্রতিপন্ন করেন যে, শ্রীহট্ট দেশীয় রাজা সুবিদ নারায়ণ নবদ্বীপের রঘুনাথ শিরোমণির সমকালীন নহেন। তাঁহার জামাতা রঘুপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা রঘুনাথ নবদ্বীপের রঘুনাথ শিরোমণি হইতেই পারেন না। শ্রীহট্টের খ্যাতনামা পণ্ডিত ৺ পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এম, এ মহোদয়ও পরে ঐমত সমর্থন করিতে না পারিয়া প্রতিবাদই করিয়াছিলেন। *

* 'শিলচর' হইতে প্রকাশিত "শিক্ষা সেবক" নামক ত্রৈমাসিক পত্রে (১৩৩৭ শ্রাবণ সংখ্যায়) পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় লিখিয়া গিয়াছেন—"কেহ কেহ বলিয়াছেন, রঘুনাথের বাড়ী 'পঞ্চখণ্ডে' ছিল। তিনি কাত্যায়ন গোত্রজন্মা ছিলেন। সুবিদ

কিন্তু শ্রীহট্টের গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর কনিষ্ঠ পুত্র সেই রঘুনাথ নবদ্বীপের রঘুনাথ শিরোমণি না হইলেও তিনি যে, শ্রীহট্টেই জন্মগ্রহণ করেন,—ইহা শ্রীহট্টবাসী বৃদ্ধ পণ্ডিতগণের দেশীয় প্রবাদমূলক স্থির বিশ্বাস ছিল—ইহা আমি জানি। এদেশেও কোন কোন বৃদ্ধ পণ্ডিত ঐরূপ প্রবাদের কথা বলিতেন—ইহাও আমি জানি। কিন্তু প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপ-নিবাসী ৺কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী মহোদয় নবদ্বীপের বৃদ্ধ পণ্ডিতগণের কথানুসারে ১২৯৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত **নবদ্বীপ মহিমা** পুস্তকে রঘুনাথ শিরোমণির নবদ্বীপেই জন্ম-কথা লিখিয়া-গিয়াছেন। তখন তিনি ঐবিষয়ে কোন মতান্তরও শুনিতে পান নাই। পরে রাণাঘাটের বাবু কুমুদ নাথ মল্লিক মহোদয় ১৩১৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত **নদীয়াকাহিনী** পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন—"রঘুনাথ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে নবদ্বীপে এক দুঃখী পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। মতান্তরে রঘুনাথ শ্রীহট্টে জন্ম করিয়াছিলেন"—ইত্যাদি (১১২ পৃঃ)।

কিন্তু পরে ১৩৩০ সালে বীরভূমের বহু-বিজ্ঞ বৃদ্ধ ঐতিহাসিক ৺ কালী প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার **মধ্যযুগের বাঙ্গালা** নামক পুস্তকে (৬১ পৃঃ) লিখিয়া গিয়াছেন—"রঘুনাথ শিরোমণি বর্দ্ধমান জেলার কোটা মানকরে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি শৈশবে পিতৃহীন হইলে তাঁহার জননী ভরণপোষণের অভাবে নদীয়ায় আসিয়া এক কুটুম্বের বাড়ীতে আশ্রয় লন। এই এক চক্ষু কাণা বালক নারায়ণের জামাতা রঘুপতির তিনি কনীয়ান্ ভ্রাতা ছিলেন,—ইত্যাদি। আমি ইহাদিগের কথার উপর নির্ভর করিয়া "বিজয়া" পত্রিকায় (১৯১৯ চৈত্র সংখ্যায়) "শ্রীহট্টের কাণাছেলে" শীর্ষক প্রবন্ধে ঐরূপই লিখিয়াছিলাম। কিন্তু এই মতের সারবত্তা তেমন কিছু দেখা যাইতেছে না।" "রঘুনাথ যদি শ্রীচৈতন্যদেবের সমকালীন হন্, তাহা হইলে তিনি সুবিদ নারায়ণের জামাতা রঘুপতির কনিষ্ঠ সহোদর হইতেই পারেন না।" "বিজয়া"য় "শ্রীহট্টের কাণাছেলে" প্রবন্ধে যে সকল কথার উল্লেখ আছে, তাহা কিম্বদন্তী মূলক কথা, প্রকৃত ইতিহাস নহে।"

রঘুনাথের বুদ্ধিশক্তি বিষয়ে ভবিষ্যতে অনেক গাল গল্প সৃষ্ট হইয়াছে।" কালীপ্রসন্ন বাবু পরে তাঁহার কথার সমর্থনের জন্য কোন কোন পণ্ডিতের কথাও লিখিয়াছেন।† কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে হইলে অন্যান্য পণ্ডিতগণের কথারও বিচার করা উচিত।

বস্তুতঃ রঘুনাথ শিরোমণির জন্মভূমি ও কুলপরিচয়-বিষয়ে প্রকৃত প্রমাণ না পাইলে কাহারও মুখের কথা বা নানারূপ প্রবাদের দ্বারা ঐ বিষয়ে সত্য-নির্ণয় ও বিবাদ-নিবৃত্তি হইতে পারে না। যাহা হউক আমাদিগের রঘুনাথ শিরোমণি যেখানেই যে বংশেই জন্ম গ্রহণ করুন তিনি যে, নবদ্বীপের রঘুনাথ শিরোমণি, তিনি বাঙ্গালার মাথার মণি এবিষয়ে কোন বিবাদ নাই। আর তিনি যে, নবদ্বীপ হইতে পরে মিথিলায় গিয়া পক্ষধর মিশ্রের নিকটে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন—এই চির প্রসিদ্ধ প্রবাদেও কোন বিবাদ নাই। কিন্তু তিনি কোন্ সময়ে মিথিলায় গিয়াছিলেন, ইহা বিচার করিয়া বুঝিতে হইবে।

আমরা পূর্ব্বে বুঝিয়াছি যে, বাসুদেব সার্ব্বভৌম পঞ্চদশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের (১৫৮৬ খৃঃ) কিছু পূর্ব্বে বা পরেই উৎকল-যাত্রা করেন। তিনি নবদ্বীপে অবস্থান-কালে শ্রীচৈতন্যদেবের কোন পরিচয় জানিতেন না। তিনি পরে ৺পুরীধামের

---

† তিনি পাদ টীকায় লিখিয়াছেন—"৪৫ বৎসর নবদ্বীপের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকা আমরা নদীয়ার অনেক কথা জানি। রঘুনাথ শিরোমণিকে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ [illegible] বলিয়াই জানেন। অল্পদিন পূর্ব্বে তাঁহার বংশের এক ব্যক্তি নবদ্বীপে ছিলেন। পাঁ বৎসর পূর্ব্বে মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন আমাকে লিখিয়াছিলেন—"নবদ্বী আম্পুলিয়া পাড়ায় তাঁহার বংশধর রামতনু ন্যায়ালঙ্কার ছিলেন, আমরা তাঁহাকে দেখিয়াছি। রঘুনাথ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।" ভট্ট পল্লী-নিবাসী মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয়ও আমায় বলিয়াছেন—"গুরুপরম্পরা [illegible]" ইত্যাদি।

শ্রীচৈতন্য দেবের দর্শন লাভ করেন এবং সেখানে তাঁহার ভগ্নীপতি গোপীনাথ আচার্য্যের নিকটে সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্বাশ্রমের পরিচয় প্রশ্ন করিয়া তাঁহার নিকটেই পরিচয় জানিতে পারেন। আর রঘুনাথ শিরোমণি যে, নবদ্বীপে অধ্যয়ন-কালে কখনও শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গ-লাভ করিয়াছিলেন—ইহারও কোন প্রমাণ নাই। "নবদ্বীপমহিমা" প্রভৃতি পুস্তকে লিখিত কল্পিত গল্প কোন প্রমাণ নহে। "অদ্বৈত-প্রকাশ" গ্রন্থেও রঘুনাথ শিরোমণির নাম নাই। এইরূপ নানা কারণে আমরা বুঝিতে পারি যে, বাসুদেব সার্ব্বভৌমের উৎকল-যাত্রার পরেই রঘুনাথ মিথিলায় গিয়া পক্ষধর মিশ্রের নিকটে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু পক্ষধরমিশ্র পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে ইহা সম্ভব হয় না। সুতরাং বিচারপূর্ব্বক পক্ষধরমিশ্র ও রঘুনাথ শিরোমণির কাল-নির্ণয়ও কর্ত্তব্য।

পক্ষধরমিশ্র ও রঘুনাথশিরোমণির কাল-বিচারে বক্তব্য

কোন মতে পক্ষধর মিশ্র পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী এবং তিনি মিথিলার যজ্ঞপতি উপাধ্যায়ের ছাত্র। মিথিলার শঙ্কর মিশ্র ও স্মৃতি-নিবন্ধকার বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার পরবর্ত্তী। কিন্তু নানা কারণে আমরা এখনও ঐ মত গ্রহণ করিতে পারি নাই। এখানে তাহার কয়েকটি কারণ বলিতেছি। পক্ষধরের স্বহস্ত-লিখিত বিষ্ণুপুরাণের এক পুথি দ্বারভাঙ্গা জেলার যোগিয়াড়া গ্রামে নৈয়ায়িক কেশব ঝাঁর বাড়ীতে আছে, ইহা আমরা অনেক দিন পূর্ব্বে শুনিয়াছি। পক্ষধর নামে অন্য কোন ব্যক্তি যে, ঐ পুথির লেখক, এবিষয়ে এপর্য্যন্ত কোন প্রমাণ পাই নাই। * ঐ পুথির শেষে লিখিত শ্লোকের দ্বারা বুঝা যায় যে, পক্ষধর

* পক্ষধর মিশ্র গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের "তত্ত্ব-চিন্তামণি" গ্রন্থের "আলোক" নামে স্বকৃত

৩৪৫ লক্ষ্মণসংবতে মার্গমাসে ষষ্ঠীতিথিতে অমরাবতী নগরে বাসকরতঃ ঐ পুথি লিখিয়াছিলেন। * মিথিলার প্রাচীন গাথানুসারে ১১০৮ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণ সংবতের আরম্ভ হয়। ১১১৯ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণ সংবতের আরম্ভ হয়;—এই নবীন মত গ্রহণ করিলে বুঝা যায়,—পক্ষধর ১৪৬৪ খৃষ্টাব্দে ঐ পুথী লেখেন। (কারণ, ১১১৯ সংখ্যার সহিত ৩৪৫ সংখ্যার যোগ করিলে ১৪৬৪ হয়)। তাঁহার বৃদ্ধাবস্থায় স্বয়ং ঐ পুথি লেখার জন্য পরিশ্রম স্বীকার অনাবশ্যক। সুতরাং তিনি যে, পাঠাবস্থাতেই স্থানান্তর হইতে ঐ পুথী লিখিয়া আনিয়াছিলেন, ইহাই আমরা সম্ভব বুঝি। পক্ষধরের যৌবনকালে মিথিলার শঙ্কর মিশ্র ও স্মৃতি-নিবন্ধকার-

---

টীকার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—"অধীত্য জয়দেবেন হরিমিশ্রাৎ পিতৃব্যতঃ।" সুতরাং বুঝা যায়, তাঁহার প্রকৃত নাম জয়দেব এবং তিনি তাঁহার পিতৃব্য হরি মিশ্রের নিকটে অধ্যয়ন করিয়া ঐ টীকা রচনা করেন। মিথিলার নানা গ্রন্থকার মহা নৈয়ায়িক রুচি দত্ত তাঁহার নিজকৃত টীকার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—"অধীত্য রুচিদত্তেন জয়দেবাজ্ জগদ্‌গুরোঃ।" সুতরাং তিনি উক্ত জয়দেবের ছাত্র, ইহা নিশ্চিত। উক্ত জয়দেবের পক্ষধর নামের অনেক কারণ কথিত হয়। কিন্তু আমরা বুঝি যে, তিনি পাঠাবস্থা হইতেই তাঁহার অলৌকিক প্রতিভাবলে বিচারে যে পক্ষই গ্রহণ করিতেন, তাহাই রক্ষা করিতে পারিতেন। কেহই তাঁহার পক্ষ-খণ্ডন করিতে পারিতেন না। তাই তখন হইতেই তিনি "পক্ষধর" নামেই প্রসিদ্ধ হন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বাসুদেব মিশ্রও নিজকৃত টীকার শেষে লিখিয়াছেন—"ইতি ন্যায়-সিদ্ধান্তসারাভিজ্ঞমিশ্রবর্য্য-পক্ষধর মিশ্র-ভ্রাতুষ্পুত্র বাসুদেব মিশ্র-বিরচিতায়াং চিন্তামণি টীকায়াং।" নবদ্বীপের জগদীশ গদাধর প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণও 'পক্ষধর' নামেরই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

* উক্ত পুথির শেষে লিখিত আছে, "বাণৈর্ব্বেদযুতৈঃ সশম্ভুনয়নৈঃ সংখ্যাং গতে হায়নে, শ্রীমদ্ গৌড় মহীভুজো গুরু দিনে মার্গে চ পক্ষে সিতে। ষষ্ঠ্যাং তামমরাবতী-মধিবসন্ যা ভূমি দেবালয়ঃ, শ্রীমৎ পক্ষধরঃ সুপুস্তক মিদং শুদ্ধং ব্যলেখীদ্ ক্রুতং"। শম্ভুনয়ন—৩, বেদ—৪, বাণ—৫। ৩৪৫ লক্ষ্মণ সংবৎ। এবিষয়ে ১৩৩০ সালের "ভারতবর্ষ" পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

বাচস্পতি মিশ্র প্রাচীন। মৈথিল পণ্ডিতগণও ইহাই বলেন এবং তাঁহারা প্রসিদ্ধ প্রাচীন শ্লোক পাঠ করেন—"শঙ্কর-বাচস্পতী শঙ্কর-বাচস্পতি-সদৃশৌ। পক্ষধরস্য প্রতিপক্ষো লক্ষ্যীভূতো ন কুত্রাপি।"

পরন্তু পক্ষধর মিশ্রের ছাত্র মিথিলার "সোদরপুর-নিবাসী" রুচি দত্তের মৈথিল অক্ষরে স্বহস্ত-লিখিত উদয়নাচার্য্য-কৃত "কিরণাবলী"র এক পুথী ৺কাশীর সরস্বতী ভবনে আছে। উহার শেষে লিখিত শ্লোকের দ্বারা বুঝা যায়,—রুচি দত্ত ৩৮৬ লক্ষ্মণ সংবতে (১৫০৫ খৃষ্টাব্দে)-ঐ পুথী লেখেন। * সুতরাং রঘুনাথ শিরোমণির গুরু "আলোক" টীকাকার পক্ষধর মিশ্র যে, পঞ্চদশ শতাব্দীতেই ভারত-বিখ্যাত মহানৈয়ায়িক হইয়াছিলেন—ইহাই আমরা বুঝি। তিনি যে, গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের পৌত্র যজ্ঞপতির শিষ্য বা প্রশিষ্য, ইহা আমরা বুঝি না। আর তিনি "আলোক" টীকাকার নহেন, "আলোক" টীকাকার পক্ষধর মিশ্র তাঁহা হইতে পূর্ব্ববর্ত্তী, এইরূপ কল্পনাও আমরা করিতে পারি না। ‡ কারণ,

* উক্ত পুথির শেষে লিখিত আছে—"রস-বসু-হরনেত্রে চৈত্রকে শুক্লপক্ষে, প্রতিপদি বুধবারে বৎসরে লাক্ষ্মণে চ। বিবুধবুধবিনোদং ভাবয়ন্তীং সুপুস্তী মলিখ দমলপাণিঃ শ্রীরুচিঃ শ্রীসমেতাম্"॥ হরনেত্র=৩, বসু=৮, রস=৬,—৩৮৬ লক্ষ্মণ সংবৎ (১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দ)। কেহ রুচিদত্ত কৃত কোন পুথীর লিপিকাল ১৩৭০ খৃষ্টাব্দ বলিয়া পক্ষধর মিশ্রকে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াছেন। কিন্তু হরিমিশ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র ও ছাত্র পক্ষধর মিশ্র যে পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহা আমরা বুঝিতে পারি না।

‡ মহামহোপাধ্যায় পূজ্যপাদ ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় "ন্যায়-কুসুমাঞ্জলির" ভূমিকায় ঐরূপ কল্পনা করিয়াছেন। কারণ, সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের সংগৃহীত পক্ষধরমিশ্রকৃত "প্রত্যক্ষালোকে"র এক পুথীর লিপিকাল ১৫৯ লক্ষ্মণ সংবৎ। কিন্তু শুনিয়াছি, মিত্র মহোদয়ের সংগৃহীত সেই পুথার শেষে লিখিত আছে—শুভমস্তু শ্রীরস্তু শকাব্দা। লসং ১৫০৯। উক্ত স্থলে পরে "লসং" লিখিত হওয়ায় ১৫০৯ লক্ষ্মণ সংবৎ অসম্ভব বলিয়া মিত্র মহোদয় উক্ত অঙ্কে শূন্য ত্যাগ করিয়া ১৫৯ লক্ষ্মণ সংবৎই উক্ত পুথার লিপিকাল নির্ণয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা হইলে

রঘুনাথ শিরোমণির গুরু পক্ষধর মিশ্রই যে, "তত্ত্বচিন্তামণি"র "আলোক" নামে টীকা করেন—ইহাই চির-প্রসিদ্ধ আছে। তাই পরে নবদ্বীপের মথুরানাথ তর্কবাগীশ প্রভৃতিও রঘুনাথ শিরোমণির গুরু পক্ষধর মিশ্র-কৃত "আলোক" টীকারও টীকা করিয়াছিলেন। "ব্যাপ্তি-সিদ্ধান্তলক্ষণ-দীধিতি"র "যো যদীয়কল্পে"র টীকায় জগদীশ তর্কালঙ্কারও ঐ পক্ষধর মিশ্রেরই নামোল্লেখপূর্ব্বক নিজের উক্তি-বিশেষের সমর্থনের জন্য সসম্মানে তাঁহারই "আলোক" টীকার সন্দর্ভবিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছেন। আর "আলোক" টীকাকার পক্ষধর মিশ্র যে, তাঁহার পিতৃব্য হরি মিশ্রের ছাত্র—ইহা তিনি সেই টীকার প্রারম্ভে নিজেই বলিয়াছেন। মিথিলার কবি বিদ্যাপতিও উক্ত হরিমিশ্রের নিকটে প্রথমে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, ইহাও মিথিলায় প্রবাদ আছে এবং উক্ত পক্ষধর মিশ্র যে, যৌবনকালে বৃদ্ধ বিদ্যাপতির গৃহে অতিথিরূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন—এইরূপ প্রবাদও আছে।

উক্ত লেখক পূর্ব্বে "শকাব্দ" লিখিয়াছেন কেন? সেখানে তাঁহার কোন অংশে ভ্রম স্বীকার্য্য হইলে তিনি পরে সংখ্যা অর্থেই "ল সং" লিখিয়াছেন, ইহাও বলা যায়। আমাদিগের মনে হয়, উক্ত লেখক শকাব্দ লিখিয়া পরে লক্ষ্মণ সংবৎও লিখিবার জন্যই "লসং" লিখিয়া পরে উহার সংখ্যাঙ্ক স্মরণ না হওয়ায় পূর্ব্ব-লিখিত শকাব্দের সংখ্যাঙ্কই লিখিয়াছিলেন—১৫০৯।

* প্রবাদ আছে,—একদিন ক্ষীণকায় যুবক পক্ষধর মিশ্র স্থানান্তরে যাইতে বিদ্যাপতির গ্রামে তাঁহার সুবিশাল অতিথি-শালার এক স্তম্ভ-কোণে বসিয়াছিলেন। পরে বিদ্যাপতি অতিথিগণের পর্য্যবেক্ষণের জন্য আসিয়া তাঁহাকে ঐ স্থানে দেখিয়াই বলেন,—"প্রাঘুণো ঘুণবৎ কোণে সূক্ষ্মত্বান্নোপলভ্যসে।" অর্থাৎ স্তম্ভকোণে ঘুণবৎ অবস্থিত "প্রাঘুণ" (অতিথি) তুমি সূক্ষ্মত্ববশতঃ দৃষ্টিগোচর হইতেছ না। বিদ্যাপতি ঐ কথা বলিলে পরক্ষণেই পক্ষধর মিশ্র বলেন—"নহি স্থূলধিয়ঃ পুংসঃ সূক্ষ্মে দৃষ্টিঃ প্রজায়তে"। অর্থাৎ স্থূলবুদ্ধি পুরুষের সূক্ষ্ম পদার্থে দৃষ্টি জন্মে না। পরক্ষণেই বিদ্যাপতি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া বহু সমাদর করিয়াছিলেন।

পরন্তু পক্ষধর মিশ্র যে সময়ে "তত্ত্ব-চিন্তামণি"র "আলোক" নামে টীকা রচনা করেন, তখন "তত্ত্ব-চিন্তামণি"র বিভিন্ন লেখকের লিখিত বিভিন্ন পুথিতে তিনিও পাঠ-ভেদ দেখিয়াছেন। তিনি প্রত্যক্ষ-খণ্ডেও কোন স্থলে পাঠ-ভেদের উল্লেখ করিয়া উহা কল্পিত অসাম্প্রদায়িক বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন। * কিন্তু গঙ্গেশের পৌত্র যজ্ঞপতির সময়ে গঙ্গেশের "তত্ত্ব-চিন্তামণি" গ্রন্থের কোন পুথিতে ঐরূপ পাঠ-বিকৃতি আমরা সম্ভব মনে করি না। পরন্তু আমরা বুঝি যে, পক্ষধর মিশ্র তাঁহার টীকা-রচনা-কালে যজ্ঞপতির গৃহের আদর্শ পুথি পাইলে তিনি অন্যান্য পুথি দেখিতেন না এবং যজ্ঞপতি তাঁহার গুরু হইলে তিনি সেই গুরুর কথাও অবশ্য লিখিতেন। কিন্তু তিনি তাঁহার টীকারম্ভে লিখিয়াছেন—"অধীত্য জয়দেবেন হরিমিশ্রাৎ পিতৃব্যতঃ"। সুতরাং তিনি যজ্ঞপতির পরে তাঁহার পিতৃব্য হরিমিশ্রের নিকটেই অধ্যয়ন করিয়া পঞ্চদশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদে অধ্যাপনা ও গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন—ইহাই আমাদিগের বিশ্বাস। গঙ্গেশ উপাধ্যায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে "তত্ত্ব-চিন্তামণি" রচনা করিলেও তখন হইতে ৫০ বৎসরের মধ্যে তাঁহার পৌত্র যজ্ঞপতির টীকা-রচনা আমরা সম্ভব মনে করি।

এখানে ইহাও বক্তব্য যে, অনেকেই বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে পক্ষধর মিশ্রের ছাত্র বলিয়া লিখিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বে অনেক বৃদ্ধ নৈয়ায়িক বলিতেন—বাসুদেব পক্ষধরের সহাধ্যায়ী ছিলেন। আমরাও ইহাই সম্ভব বুঝি। কারণ, বাসুদেব সার্ব্বভৌম নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের

* পক্ষধর মিশ্র তাঁহার "আলোক" টীকায় কোন স্থলে লিখিয়াছেন—"কচিত্তু (পুস্তকে) আবশ্যকত্বাদিত্যনন্তরং অন্যথাঽণুত্ব-পক্ষে......নতু ইতি পর্য্যন্তং গ্রন্থ-লিখনং অগ্রে নবুত্বাচ্চ ইত্যনন্তরং 'ন' শব্দ-লোপশ্চ দৃশ্যতে, তত্তু কল্পিত মসাম্প্রদায়িক মিত্যুপেক্ষিতম্।"—"তত্ত্ব-চিন্তামণি"র প্রত্যক্ষখণ্ডে "মনোঽণুত্ববাদে"র "আলোক" টীকা। (সোসাইটী সংস্করণ—৭৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

(১৪৮৬ খৃঃ) পূর্ব্বে নবদ্বীপে অধ্যাপনা করিয়াছেন। গৌড়াচার্য্য সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রখ্যাত পণ্ডিত হইয়াই পরে উৎকলে গজপতি প্রতাপরুদ্রের সভা-পণ্ডিতের পদ লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে পক্ষধর মিশ্রের ছাত্রাবস্থাতেই মিথিলায় অধ্যয়ন করেন, ইহাই আমরা বুঝি। তাঁহার নবদ্বীপে অধ্যাপনা-কালে স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের জন্ম হয় নাই। শ্রীচৈতন্যদেবকেও তিনি তখন দেখেন নাই, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং শ্রীচৈতন্য, রঘুনাথ ও রঘুনন্দন, বাসুদেব সার্ব্বভৌমের চতুষ্পাঠীতে সহাধ্যায়ী ছিলেন—এই নিষ্প্রমাণ মত কোনরূপেই গ্রহণ করা যায় না।

পূর্ব্বোক্ত বাসুদেব সার্ব্বভৌমও মিথিলার নব্য ন্যায়ের মূলগ্রন্থ "তত্ত্ব-চিন্তামণি"র টীকা করিয়াছিলেন। উক্ত টীকার কোন অংশের এক খণ্ডিত পুথি ৺কাশীর সরস্বতীভবনে আছে। ‡ রঘুনাথ

শ্রীচৈতন্যদেবের সহাধ্যায়ী মুরারি গুপ্তও তাঁহার 'করচা'য় শ্রীচৈতন্যদেবের অধ্যাপকগণের নাম বলিতে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নাম বলেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন—"ততঃ পপাঠ স পুনঃ শ্রীমান্ শ্রীবিষ্ণু পণ্ডিতাৎ। সুদর্শনাৎ পণ্ডিতাচ্চ শ্রীগঙ্গাদাস-পণ্ডিতাৎ॥" (১।৯।১)। শ্রীচৈতন্যদেব যে, পরে কাহারও নিকটে ন্যায়-শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন এবং তাহার টীকাও করিয়াছিলেন—ইত্যাদি বিষয়েও প্রকৃত প্রমাণ নাই। উক্ত বিষয়ে এবং রঘুনন্দন ও রঘুনাথের সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বে অন্য প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। "ভারতবর্ষ"—১৩৪৬ পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যায় সেই প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

‡ সরস্বতীভবনের ক্যাটালগে ঐ পুথির নাম "সারাবলী" লিখিত হইয়াছে ঐ পুথির বর্ত্তমান সংখ্যা ন্যায়বৈশেষিক ২৮০। ঐ পুথির পত্রে "সার্ব্ব টী" এবং অনেকস্থানে "চি-সা" এইরূপ লিখিত আছে। হুগলী কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ মহাশয় উহা দেখিয়া আমাকে বলিয়াছেন যে, "সার্ব্ব টী" বুঝিতে না পারিয়া কেহ উহার 'সারাবলী' নাম লিখিয়া দিয়াছিলেন। "সার্ব্ব টী"র অর্থ—সার্ব্বভৌম-কৃতটীকা। "চি-সা"র অর্থ—চিন্তামণির সার্ব্বভৌমকৃত টীকা। পরন্তু

শিরোমণি তাঁহার "দীধিতি" টীকায় উক্ত বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ব্যাখ্যা-বিশেষ এবং মতবিশেষেরও খণ্ডন করায় বুঝা যায় যে, তিনি নবদ্বীপে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকটে প্রথমে তাঁহার ঐ টীকা পড়িয়াছিলেন এবং পরে তিনি "দীধিতি" টীকা রচনা করিয়াছেন। সুতরাং তিনি বাসুদেব সার্ব্বভৌমের পূর্ব্ববর্ত্তী টীকাকার নহেন, ইহা নিশ্চিত।

পরন্তু রঘুনাথ শিরোমণি মিথিলার শঙ্কর মিশ্র প্রভৃতির মতেরও খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু বৈশেষিকদর্শনের "উপস্কারে" অত্যন্তাভাবের স্বরূপ-ব্যাখ্যায় এবং অন্যান্য অনেক সিদ্ধান্তের সমর্থনে শঙ্কর মিশ্র রঘুনাথ শিরোমণির নূতন কথার কোন সমালোচনা করেন নাই। ফলকথা, শঙ্কর মিশ্রের পরে রঘুনাথ শিরোমণি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, ইহা নিশ্চিত। মিথিলার 'স্মৃতিনিবন্ধ'কার দ্বিতীয় বাচস্পতি মিশ্রের সমকালীন উক্ত শঙ্কর মিশ্র পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই নানা গ্রন্থকার প্রখ্যাত পণ্ডিত হন, ইহাও নিশ্চিত। তাঁহার **ভেদরত্ন** গ্রন্থের যে পুথি জম্বুতে আছে, তাহার লিপিকাল ১৫১৯ সংবৎ (১৪৬২ খৃষ্টাব্দ)—ইহাও জানিয়াছি। পূর্ব্বোক্ত স্মার্ত্ত বাচস্পতি মিশ্র মিথিলাধিপতি ভৈরবেন্দ্র দেবের ধর্ম্মপত্নীর নিয়োগে **দ্বৈতনির্ণয়** নামক স্মৃতিনিবন্ধ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থের প্রারম্ভে "শ্রীভৈরবেন্দ্রধরণীপতি-ধর্ম্মপত্নী রাজাধিরাজপুরুষোত্তমদেব-মাতা" ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য। উক্ত ভৈরবেন্দ্র দেবের রাজ্যকাল ১৪৪০ হইতে ১৪৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। উক্ত

"অনুমান-চিন্তামণি"র "ব্যাপ্তিবাদে" সিংহব্যাঘ্রলক্ষণের "দীধিতি"টীকায় সার্ব্বভৌম-মতের খণ্ডন করিতে, রঘুনাথ শিরোমণি যে সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা উক্ত "সারাবলী"টীকায় দেখা যায়। "দীধিতি"র প্রাচীন টীকাকার রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কারও উক্ত স্থলে লিখিয়াছেন—"নমু সাধ্য-সামানাধিকরণ্যাভাবস্তদনধিকরণত্বমিত্যেবং সার্ব্ব-ভৌমোক্তং কিমিত্যুপেক্ষিত মিত্যত আহ এতেনেতি।" সরস্বতীভবনের ৪৫৫নং—পুথি দ্রষ্টব্য।

বিষয়ে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল এসিয়াটিক্ সোসাইটীর পত্রিকায় বহুবিজ্ঞ গবেষক রায় বাহাদুর মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ফলকথা, রঘুনাথ শিরোমণি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দশকে মিথিলায় পক্ষধর মিশ্র প্রভৃতির সহিত বহু বিচার করিয়া এবং মিথিলার তৎকালীন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সেখানে **তার্কিকশিরোমণি** উপাধি লাভ করেন এবং পরেই "তত্ত্ব-চিন্তামণি"র "দীধিতি" টীকা এবং ক্রমে অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করেন—ইহাই আমরা বুঝিয়াছি।

রঘুনাথ শিরোমণি স্মৃতিশাস্ত্রেও মলমাসবিষয়ে **মলিম্লুচবিবেক** নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থে তাঁহার উক্ত বিষয়ে নানা গ্রন্থ-দর্শন ও বিশিষ্ট পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ঐ গ্রন্থে পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক নিবন্ধকারের অনেক মতেরও খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার তিরোধানের পরে ষোড়শ শতাব্দীর পরার্দ্ধের প্রথম ভাগে নবদ্বীপে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন তাঁহার প্রথম গ্রন্থ **মলমাস-তত্ত্বে** আরও বিশেষ বিচার করিয়া মলমাস-লক্ষণ-ব্যাখ্যায় শিরোমণির কথারও প্রতিবাদ করিয়াছেন।

---

* "তত্ত্বচিন্তামণি"র প্রারম্ভে "মঙ্গলবাদে"র "দীধিতি" নাই। পরে "...বাদ" হইতে সংক্ষিপ্ত "দীধিতি" টীকা আছে। উহার প্রারম্ভে রঘুনাথ শিরোমণি লিখিয়াছেন—"সংক্ষেপতঃ শ্রীরঘুনাথনামা চিন্তামণে দীধিতি মাতনোতি॥" পরে "অনুমান চিন্তামণি"র "দীধিতি"র প্রারম্ভে তিনি লিখিয়াছেন—"দীধিতি মধিচিন্তামণি তনুতে তার্কিক শিরোমণিঃ শ্রীমান্।" 'শব্দ চিন্তামণি'র "দীধিতি" টীকা আমরা দেখি নাই। কিন্তু পরে কতিপয় "বাদ" মুদ্রিত হইয়াছে। কাশী চৌখাম্বা হইতে প্রকাশিত "বাদবারিধি" দ্রষ্টব্য।

† রঘুনাথ শিরোমণি-কৃত ঐ গ্রন্থ অন্যত্র পাওয়া যায় না। উহা পূর্ব্বস্থলীতে নানাগ্রন্থকার মঃ মঃ কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের বাটীতেই আছে। এতদিন পরে আমি নিজে ঐ গ্রন্থ দেখিতে পাইয়াছি। উহার প্রথমে রঘুনাথ শিরোমণির অন্যান্য গ্রন্থে লিখিত "ওঁ নমঃ সর্ব্বভূতানি" ইত্যাদি মঙ্গলাচরণ শ্লোকই আছে। শেষে

নবদ্বীপে নব্যন্যায়ের নবযুগ

রঘুনাথ শিরোমণি নবদ্বীপে তৎকৃত নব্যন্যায় গ্রন্থের প্রতিষ্ঠা করিলে ক্রমে সর্ব্বদেশে উহার এমন প্রতিষ্ঠা হয় যে, তখন রঘুনাথ শিরোমণির গ্রন্থ পাঠ না করিলে কেহ নৈয়ায়িকের প্রতিষ্ঠা-লাভ করিতে পারেন না। তাই তখন হইতে ক্রমশঃ ভারতের সর্ব্বত্র নব্যন্যায়ে রঘুনাথ শিরোমণির গ্রন্থের এবং তাঁহার টীকা গ্রন্থের পঠন-পাঠনা প্রচলিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ত্রৈলিঙ্গ দেশীয় সুবিখ্যাত জগন্নাথ পণ্ডিতও তাঁহার **রসগঙ্গাধর** নামক অলঙ্কার গ্রন্থে উপমালঙ্কার-বিচারে লিখিয়াছেন,—"ইত্থমেব চ আখ্যাতবাদশিরোমণি-ব্যাখ্যাতৃভিরপি তথৈব সিদ্ধান্তিত-মিতি চেৎ ?"। উক্ত স্থলে রঘুনাথ শিরোমণি-কৃত **আখ্যাতশক্তিবাদ** নামক গ্রন্থই "আখ্যাতবাদশিরোমণি" নামে কথিত হইয়াছে। সুতরাং বুঝা যায় যে, জগন্নাথ পণ্ডিতও শিরোমণির ঐ গ্রন্থ এবং উহার টীকা পাঠ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই দেশান্তরেও রঘুনাথ শিরোমণির নব্যন্যায় গ্রন্থ "শিরোমণি" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এখনও সর্ব্বদেশে তাঁহার গ্রন্থও "শিরোমণি" নামে কথিত হয়। রঘুনাথ শিরোমণির গ্রন্থ এবং নবদ্বীপে অনেক মহানৈয়ায়িকের রচিত তাহার টীকার মহাপ্রভাবে পরে মিথিলার বহু ছাত্রও নব্যন্যায় পড়িবার জন্য নবদ্বীপে আসিয়াছেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে মিথিলার মহানৈয়ায়িক গোকুলনাথ উপাধ্যায়ও রঘুনাথ শিরোমণির "দীধিতি"র "দীধিতি-

---

আছে—"ইতি ভট্টাচার্য্যশিরোমণি-বিরচিতো মলিম্লুচবিবেকঃ সমাপ্তঃ ॥" রঘুনন্দনের "মলমাসতত্ত্বে"র টীকায় ৺কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় শিরোমণির "মলিম্লুচ-বিবেকে"র সন্দর্ভও উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি সেখানে ইহাও ব্যক্ত করিয়াছেন যে, পূর্ব্ববর্ত্তী টীকাকার শান্তিপুরের রাধামোহন গোস্বামীও শিরোমণির ঐ গ্রন্থ দেখেন নাই। ঐ টীকার দ্বিতীয় খণ্ডে ১৮,১৯,২০ ও২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বিদ্যোত" নামে সংক্ষিপ্ত টীকা করেন। নবদ্বীপে নব্যন্যায়-প্রতিষ্ঠার পর হইতেই ভারতের সর্ব্বত্র নৈয়ায়িকগণ নবদ্বীপকেই নবন্যায়ের গুরুস্থান বিদ্যাপীঠ বলিয়া সম্মান করিতেছেন।

রঘুনাথের "দীধিতি"র প্রসিদ্ধ টীকাকারগণ

রঘুনাথ শিরোমণির ছাত্র রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী প্রথমে সংক্ষেপে "দীধিতি"র টীকা করেন। তিনি শিরোমণির "গুণ-দীধিতি"র টীকার প্রথমে শেষোক্ত শ্লোকের শেষে লিখিয়াছেন—"ব্রূতে শিরোমণিগুরো-রিহ রামকৃষ্ণঃ।" শিরোমণির "প্রত্যক্ষ-চিন্তামণি-দীধিতি"র টীকার প্রথমে তিনি লিখিয়াছেন,—"শ্রীরামকৃষ্ণো ব্যাচষ্টে প্রত্যক্ষমণি-দীধিতিং।" তাঁহার পরে রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কার, কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌম এবং শ্রীরাম তর্কালঙ্কারও সংক্ষেপে "দীধিতি"র টীকা করেন। কিন্তু পরে মথুরানাথ তর্কবাগীশ, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ এবং জগদীশ তর্কালঙ্কার ও গদাধর ভট্টাচার্য্যই "দীধিতি"র প্রসিদ্ধ টীকাকার। ইহাঁদিগের সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা লিখিয়াছেন। "নবদ্বীপমহিমা" প্রভৃতি পুস্তকে অনেক নিষ্প্রমাণ গল্পও লিখিত হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে "শব্দকল্পদ্রুমে"ও "ন্যায়" শব্দের বিবরণে শিরোমণির ছাত্র মথুরানাথ, তাঁহার ছাত্র ভবানন্দ ও তাঁহার ছাত্র জগদীশ, ইহা লিখিত হইয়াছে। কারণ, তখনও পণ্ডিতগণ প্রবাদ অনুসারে ঐরূপ কথাই বলিতেন। কিন্তু প্রবাদের সাধক ও বাধকের বিচার না করিয়া কেবল প্রবাদমাত্রকেই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

প্রশ্ন এই যে, "তত্ত্ব-চিন্তামণি"র 'রহস্য' টীকাকার মথুরানাথ তর্কবাগীশ যে, রঘুনাথ শিরোমণির ছাত্র, এবিষয়ে প্রমাণ কি? এতদুত্তরে পূর্ব্বে নৈয়ায়িকগণ এইমাত্র বলিতেন যে, মথুরানাথ "পক্ষতা-

রহস্য”·টীকায় “ভট্টাচার্য্যাস্তু” বলিয়া রঘুনাথ শিরোমণির ব্যাখ্যা-বিশেষের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত স্থলে তিনি যে, “ভট্টাচার্য্য” শব্দের অধ্যাপক গুরু অর্থেই প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা প্রতিপন্ন করা যায় না। কারণ, অন্যত্র তিনি গুরু-মতের উল্লেখ করিতে তৎপূর্ব্বে “গুরু-চরণাস্তু” এবং “উপাধ্যায়াস্তু” এইরূপ লিখিয়াছেন। কিন্তু তিনি রঘুনাথ শিরোমণির ব্যাখ্যা-বিশেষের উল্লেখ করিতে তৎপূর্ব্বে “দীধিতিকৃতস্তু” এবং “দীধিত্যনুযায়িনস্তু” এইরূপ লিখিয়াছেন। † পরন্তু তিনি রঘুনাথ শিরোমণির “দীধিতি”র টীকা করিতে কোন কোন স্থলে তাঁহার সন্দর্ভ-বিশেষের অর্থ-ব্যাখ্যায় অপরের মতও বলিয়াছেন এবং উহার পরেই “গুরু-চরণাস্তু” বলিয়া সে বিষয়ে তাঁহার গুরু-মতও বলিয়াছেন।* ইহার দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি রঘুনাথ শিরোমণির নিকটে ঐ গ্রন্থ পড়েন নাই। কারণ, তিনি রঘুনাথ শিরোমণির নিকটে তাঁহার গ্রন্থ-তাৎপর্য্য জানিলে তদ্বিষয়ে উক্তরূপে অপরের মত ও নিজ গুরুমত বলিতেন না।

পরন্তু ইহাও দেখা আবশ্যক যে, মথুরানাথও শিরোমণির গ্রন্থের টীকা করিতে অনেক স্থলে পাঠাপাঠের বিচারও করিয়াছেন। অনেক

---

† “মঙ্গলবাদ-রহস্য”টীকায় (সোসাইটী সংস্করণ ১৭ পৃষ্ঠায়) “উপাধ্যায়াস্তু”। পরে “প্রামাণ্যবাদ-রহস্য” টীকায় (ঐ ১১৫ পৃঃ) “দীধিতিকৃতস্তু জগৎ পদং তদানীং সংসৃষ্টবিশিষ্টত্ব-পরং” ইত্যাদি। পরে—“প্রামাণ্যবাদসিদ্ধান্ত-রহস্য” টীকায় “দীধিত্যনুযায়িনস্তু” ইত্যাদি। (ঐ ২১৭ পৃঃ)। পরে “ভট্টাচার্য্যাস্তু……তদসৎ” (ঐ ২৯৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

* ব্যাপ্তি সিদ্ধান্ত লক্ষণের “দীধিতি”র টীকায় মথুরানাথ কোন স্থলে লিখিয়াছেন—“কেচিত্তু উক্ত ফক্কিকৈব দীধিতিকৃতা সিদ্ধান্তীকৃতা, তথাচ তদ্‌গ্রন্থস্থায়মর্থ,” ইত্যাদি। উহার পরেই “গুরুচরণাস্তু” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা উক্ত স্থলে শিরোমণির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় তাঁহার গুরু-মতও বলিয়াছেন।

স্থলে অনেক পাঠকে অপপাঠ বলিয়াছেন।* কিন্তু তিনি শিরোমণির ছাত্র হইলে তাঁহার গ্রন্থের ঐরূপ পাঠ-বিকৃতি দেখিতেন না। পরে কোন লেখকের দোষে কোন পুথিতে ঐরূপ পাঠ-বিকৃতি হইলেও মথুরানাথ নিজের টীকায় তাহার উল্লেখ ও সমালোচনা করিতেন না—ইহাও প্রণিধান পূর্ব্বক চিন্তা করা আবশ্যক।

পরন্তু মথুরানাথের পিতা শ্রীরাম তর্কালঙ্কার উদয়নাচার্য্যের "আত্ম-তত্ত্ব-বিবেকে"র রঘুনাথ শিরোমণি-কৃত টীকার টীকা করিতে সেই টীকার প্রারম্ভেও লিখিয়াছেন—"হৃদি কৃত্বা চ নিখিলং সার্ব্বভৌমস্য সদ্বচঃ।" সুতরাং তিনি যে, কোন সার্ব্বভৌমের উপদেশ স্মরণ করিয়া ঐ টীকা করেন, ইহাই বুঝা যায়। পরন্তু তিনিও ঐ টীকায় "গুরু-চরণাস্তু" ইত্যাদি এবং "কেচিত্তু" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা রঘুনাথ শিরোমণির উক্তিবিশেষের ব্যাখ্যায় নিজ গুরু-মত এবং মতান্তরও বলিয়াছেন। (৺কাশী-চৌখাম্বা হইতে প্রকাশিত ঐ পুস্তকের ২৪ ও ৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ফলকথা, শ্রীরাম তর্কালঙ্কারও শিরোমণির ছাত্র নহেন,—কিন্তু তিনি শিরোমণির "দীধিতি"র অধ্যাপক কোন সার্ব্বভৌমের ছাত্র, ইহাই বুঝা যায়। তাঁহার পিতাও মহানৈয়ায়িক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার নাম ও উপাধি এখনও জানিতে পারি নাই। "কিরণাবলী"র "রহস্য" টীকার প্রথমভাগে মথুরানাথ তর্কবাগীশ কএকস্থলে তাঁহার পিতামহের ব্যাখ্যা বিশেষের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—**ইত্যস্মৎ-পিতামহ-চরণাঃ।**

---

* শিরোমণি-কৃত "আখ্যাতশক্তিবাদের" টীকায় মথুরানাথ তর্কবাগীশ লিখিয়াছেন—"অত এব জানাতীত্যস্য পূর্ব্বং গচ্ছতীতি পাঠঃ-প্রামাদিকঃ। কচিচ্চাত্র মাত্র-পদসম্বলিতো ন পাঠঃ, জানাতীত্যস্য পূর্ব্বং গচ্ছতীত্যপি পাঠঃ।" (সোসাইটী সং ৮৮০ পৃঃ)। পরে "ক্রিয়াবিশেষকারণস্যেতি পাঠঃ" ইত্যাদি—(ঐ ৮৯৬ পৃঃ)। পরে "দীধিতিকার-লিখনন্তু" ইত্যাদি (ঐ ৯০৯ পৃঃ)। পরে......"পাঠস্তু প্রামাদিকঃ"—(ঐ ৯২০ পৃঃ)। এইরূপ মথুরানাথের অন্য গ্রন্থেও দ্রষ্টব্য।

ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ যে, মথুরানাথ তর্কবাগীশের ছাত্র, এবিষয়েও কোন প্রমাণ পাই নাই। পরন্তু কেহ কেহ ইহাও বলেন যে, ভবানন্দ মথুরানাথের পূর্ব্বে "দীধিতি"র টীকা রচনা করেন। যাহা হউক, ভবানন্দের টীকা পরে বঙ্গদেশে প্রচলিত না হইলেও এক সময়ে উহা মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে প্রচলিত হয়, ইহা আমরা শুনিয়াছি। মহারাষ্ট্র দেশীয় নৈয়ায়িক মহাদেব পুন্তামকর ভবানন্দের ঐ টীকার "সর্ব্বোপকারিণী" ও "ভবানন্দীপ্রকাশ" নামে ছোট ও বড় দুইখানি টীকা করেন। তিনি ভবানন্দের ছাত্র না হইলেও তাঁহার প্রতি অসাধারণ ভক্তি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

মধুসূদন বাচস্পতি ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের পুত্র, ইহা "নবদ্বীপ মহিমা" পুস্তকে লিখিত হইলেও তাহার কোন প্রমাণ লিখিত হয় নাই। "মিথিলায়াঃ সমায়াতে মধুসূদন বাক্‌পতৌ"—ইত্যাদি উদ্ভট শ্লোকও কোন প্রমাণ নহে। শ্রীজীব গোস্বামীর অধ্যাপক এক মধুসূদন বাচস্পতি ৺কাশীধামে ছিলেন—ইহা "ভক্তিরত্নাকরে" নরহরি চক্রবর্ত্তী লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বলা আবশ্যক,—তিনি "অদ্বৈতসিদ্ধি"-কার মধুসূদন সরস্বতী নহেন। তিনি ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের পুত্রও নহেন। ভবানন্দের **কারকচক্র** গ্রন্থের প্রথম টীকাকার রুদ্ররাম তর্কবাগীশ তাঁহার পৌত্র। তাঁহার ঐ টীকার শেষে দেখা যায়........
"পিতামহ-কৃত কারকাদ্যর্থ-নির্ণয়-টিপ্পনী সমাপ্তা।"

মথুরানাথ তর্কবাগীশের ন্যায় ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশও খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে নবদ্বীপে অধ্যাপনা ও গ্রন্থ-রচনা করিয়াছেন, ইহাই বুঝা যায়। গুপ্তপল্লী—(গুপ্তিপাড়া)—নিবাসী শতাবধান রাঘবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য তাঁহার নিকটে ন্যায় শাস্ত্র পাঠ করেন। তাঁহার পুত্র চিরঞ্জীব শর্ম্মা—"বিদ্বন্মোদ-তরঙ্গিণী"গ্রন্থে পিতৃ-পরিচয়-বর্ণনে লিখিয়া গিয়াছেন—"অধীয়ান্ মুদ্দিশ্য চাধ্যাপকোঽয়ং ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ উচে।

অয়ং কোঽপি দেবঃ” ইত্যাদি। অর্থাৎ ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ রাঘবেন্দ্রের অদ্ভুত কবিত্ব-শক্তি ও অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাইয়া নিতান্ত বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন,—এই ছাত্রটী কোনও দেবতা,—মানুষ নহে। চিরঞ্জীব শর্ম্মা তাঁহার পিতার “শতাবধান” নামের অর্থ বলিয়াছেন যে, এক সময়ে একশত ব্যক্তি একশত শ্লোক পাঠ করিলে রাঘবেন্দ্র তাহা শ্রবণ করিয়া পরে প্রত্যেকের শ্লোক হইতেই এক একটি শব্দ গ্রহণ করিয়া অবিলম্বে একশত শ্লোক রচনা করিতে পারিতেন। তাই উক্তরূপ অর্থে তিনি ‘শতাবধান ভট্টাচার্য্য’ নামে প্রসিদ্ধ হইয়া ছিলেন। চিরঞ্জীব শর্ম্মা তাঁহার অন্য গ্রন্থেও তাঁহার পিতৃ-পরিচয়-বর্ণনে বলিয়াছেন—“ভট্টাচার্য্য শতাবধান ইতি যো গৌড়োদ্ভবোঽভূৎ কবিঃ।” উক্ত শতাবধান রাঘবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য নানাশাস্ত্রে প্রখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি “মন্ত্রার্থ-দীপ” রচনা করেন এবং কালতত্ত্ব-বিষয়ে “রাম-প্রকাশ” নামে স্মৃতিনিবন্ধও রচনা করেন। * তিনি ভবানন্দ সিদ্ধান্ত-বাগীশের ছাত্র, ইহা নিশ্চিত।

কিন্তু নবদ্বীপের বৃদ্ধ পণ্ডিতগণও জগদীশ তর্কালঙ্কারকে ভবানন্দ সিদ্ধান্ত-বাগীশের ছাত্র বলিতেন কেন, ইহা আমি কোনরূপেই বুঝিতে

---

* উক্ত রাঘবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য আগ্রার নিকটে রাজা কৃপারামের আশ্রয়ে থাকিয়া “রামপ্রকাশ” রচনা করেন। উক্ত কৃপারামের পুত্র রাজা গোবর্দ্ধন, তাঁহার পুত্র যশবন্ত সিংহ। চিরঞ্জীব শর্ম্মা উক্ত যশবন্ত সিংহকে সংস্কৃত ছন্দ শিক্ষা দিবার জন্য সংক্ষেপে সরলভাবে যে, “বৃত্তরত্নাবলী” নামে ছন্দোগ্রন্থ রচনা করেন,—তাহাতে তিনি যশবন্ত সিংহকে বলিয়াছেন—“শ্রীগোবর্দ্ধনভূপ-নন্দন বৈরিব্রাত-বিমর্দ্দ-নিষ্কৃপ-কৃপারামৈক বংশধ্বজ।” উক্ত যশবন্ত সিংহের সময়ানুসারে তাঁহার শিক্ষক চিরঞ্জীব শর্ম্মা যে, এদেশে পলাশীর যুদ্ধের অনেক পূর্ব্বেই পরলোক গমন করেন—ইহা নিশ্চিত। সুতরাং ১৮৪৬ খৃঃ ডিসেম্বরের “কলিকাতা রিভিউ” পত্রে লং সাহেব যে, চিরঞ্জীব শর্ম্মার “বিদ্বন্মোদ-তরঙ্গিণী”র রচনার কাল ১৭৭০ খৃষ্টাব্দ লিখিয়া গিয়াছেন, ইহা সত্য নহে।

পারি নাই। কারণ, জগদীশ নিজেই তাঁহার "মণিময়ূখ" টীকার প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন—"শ্রীসার্ব্বভৌমস্য গুরোঃ পদাব্জং।" "ন্যায়াদর্শ" গ্রন্থের প্রথমেও লিখিয়াছেন,—শ্রীসার্ব্বভৌমগুরুণা করুণাময়েন।"* জগদীশের গুরু উক্ত সার্ব্বভৌম "ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী"কার সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক জানকীনাথ চূড়ামণির পুত্র সুপ্রসিদ্ধ রামভদ্র সার্ব্বভৌম। কারণ, "শব্দশক্তিপ্রকাশিকা"য় (২৩শ কারিকার বিবরণে) জগদীশ লিখিয়াছেন—"ইতি পুন র্ন্যায়-রহস্যে হস্মদ্‌গুরু-চরণাঃ।" উক্ত "ন্যায়-রহস্য" গ্রন্থ পূর্ব্বোক্ত চূড়ামণির পুত্র রামভদ্র সার্ব্বভৌমের রচিত, এবিষয়ে সংশয় নাই। ৺কাশীর সরস্বতী ভবনে ঐ পুথির অনেক অংশ আছে।

উক্ত রামভদ্র সার্ব্বভৌম 'কুসুমাঞ্জলি"র টীকা এবং শিরোমণিকৃত "পদার্থতত্ত্ব-নিরূপণে"র টীকা প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। "পদার্থতত্ত্ব-নিরূপণে"র টীকার প্রথমে তিনি লিখিয়াছেন,—"তাতস্য তর্কসরসীরুহ-কাননেষু চূড়ামণে র্দ্দিনমণে শ্চরণৌ প্রণম্য।" পূর্ব্বে কোন সময়ে কেহ কেহ উক্ত শ্লোকে "চূড়ামণি" শব্দের দ্বারা রঘুনাথ শিরোমণি বুঝিয়া বলিতেন—উক্ত রামভদ্র, শিরোমণির পুত্র। উক্ত রামভদ্রী টীকা অনেকদিন পূর্ব্বে ৺কাশীধামে মুদ্রিত হইয়াছে। তাহাতেও কোন স্থলে মুদ্রিত হইয়াছে—"শব্দমণি-দীধিতৌ তাত চরণাঃ।" অবশ্য 'শব্দমণিদীধিতি' রঘুনাথ শিরোমণিরই গ্রন্থ। কিন্তু নবদ্বীপে উক্ত

---

* নবদ্বীপে জগদীশ তর্কালঙ্কারের গৃহে আমি "তত্ত্ব-চিন্তামণি"র প্রথম ভাগের জগদীশ-কৃত "ময়ূখ"টীকার এক পুথি দেখিয়াছি। উহার প্রথমে আছে—"শ্রীসার্ব্ব-ভৌমস্য গুরোঃ পদাব্জং বিদ্যার্থিনাং কল্পতরোঃ প্রণম্য। বিনির্ম্মিতঃ শ্রীজগদীশ বিজ্ঞে র্বিদ্যোততা মাদ্য মণে র্ময়ূখঃ।" জগদীশ কৃত "ন্যায়াদর্শ" নামক কোন গ্রন্থের প্রথমে দ্বিতীয় শ্লোক দেখিয়াছি—"যস্মাদৃশে সমুপদিষ্ট মজুষ্ট মন্যৈঃ শ্রীসার্ব্বভৌমগুরুণা করুণা-ময়েন। সিদ্ধান্তসার মিদমাদরতস্তদস্য বিদ্যার্থিনাং গুণ-কৃতে প্রকৃতে বদামঃ॥"

টীকার প্রাচীন পুথিতে উক্ত স্থলে পাঠ আছে—"শব্দমণি-মরীচৌ তাত-চরণাঃ।' বস্তুতঃ উহাই প্রকৃত পাঠ। "ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী"কার জানকীনাথ চূড়ামণিও তাঁহার রচিত "শব্দমণি-মরীচি" ও "ন্যায়নিবন্ধ দীপিকা"র উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র রামভদ্র সার্ব্বভৌমও উক্ত স্থলে পিতৃকৃত "শব্দমণি-মরীচি"র সন্দর্ভবিশেষই উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—"ইতি তু শব্দমণিমরীচৌ তাত-চরণাঃ।"

বস্তুতঃ নানাগ্রন্থকার উক্ত জানকীনাথ চূড়ামণির শিষ্য-সম্প্রদায় বহু নৈয়ায়িক ছিলেন। তাঁহার "ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী"র বহু টীকার দ্বারাও বুঝা যায়, তিনি নবদ্বীপে মহামান্য ন্যায়াচার্য্য ছিলেন। খানাকুল কৃষ্ণ নগরের মহানৈয়ায়িক কণাদ তর্কবাগীশ উক্ত চূড়ামণির ছাত্র ছিলেন, ইহা তাঁহার **ভাষারত্ন** গ্রন্থের প্রারম্ভে "চূড়ামণি-পদাম্ভোজ" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা বুঝা যায়। তিনিও "তত্ত্ব-চিন্তামণি"র টীকা করিয়াছিলেন। এক সময়ে নৈয়ায়িক-সমাজে তাঁহার 'অবয়ব-টীকা'র বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল। ঐ টীকার কিয়দংশ কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুস্তকালয়ে দেখিয়াছি। মূলকথা, সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার জগদীশ তর্কালঙ্কার উক্ত জানকীনাথ চূড়ামণির সম্প্রদায় ও তৎপুত্র রামভদ্র সার্ব্বভৌমের প্রধান ছাত্র। তাই তিনি "অনুমান-দীধিতি"র টীকায় হেত্বাভাস-বিভাগে "অসিদ্ধিদীধিতি"র টীকায় কোন স্থলে ভবানন্দ সিদ্ধান্ত বাগীশের সম্প্রদায়-সম্মত দীধিতি-পাঠ গ্রহণ না করিয়া লিখিয়াছেন—"উচ্যত-ইত্যনন্তরমস্মৎ-সম্প্রদায়-সিদ্ধঃ পাঠো লিখ্যতে"—জাগদীশী (কাশী চৌখাম্বা সিরীজ ১১৮৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

নবদ্বীপে জগদীশ তর্কালঙ্কারের গৃহে রক্ষিত বংশ-তালিকায় দেখিয়াছি—জগদীশ শ্রীচৈতন্যদেবের শ্বশুর সনাতন মিশ্রের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ। সনাতনের পিতা ছিলেন—বটেশ্বর মিশ্র। সনাতনের পুত্র মাধবাচার্য্য। তাঁহার পুত্র যাদবচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। তাঁহার পুত্র

জগদীশ তর্কালঙ্কার। নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র শ্রীবিশ্বম্ভর মিশ্র (শ্রীচৈতন্যদেব) সনাতন মিশ্রের কন্যা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ করিয়া কএকবৎসর পরেই ১৫১০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সুতরাং সনাতন মিশ্রের প্রপৌত্র জগদীশ ১৫৬০ খৃষ্টাব্দের কিছু পরে বা পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়া সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম হইতে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, ইহাই আমার ধারণা ছিল। পরে অবগত হইয়াছি—জগদীশের রচিত শিরোমণিকৃত-'অনুমান দীধিতি'র টীকার এক পুথির লিপিকাল—১৬১০ খৃষ্টাব্দ। * জগদীশের জীবন-কালেই তাঁহার পরম ভক্ত ছাত্র বিষ্ণু শর্ম্মা ঐ পুথি লিখিয়া ছিলেন। জগদীশ ষোড়শ শতাব্দীর শেষেও ঐ টীকা-রচনা করিতে পারেন। কিন্তু ইহাও বলা আবশ্যক যে, তাঁহার পূর্ব্বে বহু নৈয়ায়িক "দীধিতি"র টীকা রচনা করিলে পরে তিনি বহু বিচার করিয়া টীকা রচনা করেন। তাই তিনি টীকারম্ভে লিখিয়াছেন—"প্রাচ্যৈরনুচিতবিবিধক্ষোদৈঃ কলুষীকৃতোঽপ্যধুনা। দীধিতিযুত-মণিরেষ শ্রীজগদীশ-প্রকাশিতঃ স্ফুরতু॥" "তত্ত্ব-চিন্তামণি"র উপমান-খণ্ড ও শব্দ-খণ্ডের জগদীশ-কৃত টীকার প্রারম্ভেও "প্রাচ্যৈরনুচিত-বিবিধক্ষোদৈঃ কলুষীকৃতোঽপ্যধুনা"—ইত্যাদি শ্লোক দেখিয়াছি।

পরন্তু জগদীশ-পুত্র রঘুনাথকৃত 'তত্ত্ব-চিন্তামণি'র কোন অংশের টীকার এক পুথি আমি দেখিয়াছি। ‡ উহার লিপিকাল ১৫৮৮ শকাব্দ।

---

* মঃ মঃ ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের কলিকাতার বাড়ীতে ঐ পুথি আছে। উহার শেষে লিখিত শ্লোকের প্রথম চরণ—"শয়-ত্রিপুরবৈরি-দৃক্-শর-পরেন্দু সংখ্যে-শকে।" "শয়" শব্দের অর্থ হস্ত—২, ত্রিপুরবৈরীর (মহাদেবের) নয়ন—৩, শর—৫, ইন্দু—১ = ১৫৩২ শকাব্দ। হুগলী কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিজে ঐ পুথি দেখিয়া উহার শেষে লিখিত সম্পূর্ণ শ্লোক ও পুষ্পিকা আমাকে লিখিয়া দিয়াছেন।

‡ নবদ্বীপে জগদীশ তর্কালঙ্কারের গৃহে জগদীশের অধস্তন নবম পুরুষ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ মহাশয় আমাকে ঐ পুথি দেখাইয়াছেন। উহার প্রথমে আছে—

উক্ত পুথির লিপিকালে (১৬৬৬ খৃঃ) শ্রীরঘুনাথ শর্ম্মা জীবিত ছিলেন, তাঁহার পিতা জগদীশ তর্কালঙ্কার তখন জীবিত ছিলেন না—ইহাই বুঝা যায়। কিন্তু তখন গদাধর অতি প্রখ্যাত হইয়াছেন। ১০৬৮ বঙ্গাব্দে (১৬৬১ খৃঃ) কৃষ্ণনগরের অধিপতি রাজা রাঘব গদাধর ভট্টাচার্য্যকে মালিপোতা গ্রামে ৩৬০ বিঘা ভূমি দান করেন। এখনও নবদ্বীপে গদাধরের বংশধরগণ সেই সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন। নবদ্বীপে গদধরের বংশধর কোন পণ্ডিত আমাকে বলিয়াছেন যে, ১০০৬ বঙ্গাব্দে গদাধরের জন্ম এবং ১১১০ বঙ্গাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়, ইহা তাঁহাদিগের গৃহে এক কাগজে লিখিত ছিল। আমি ঐ কাগজ দেখিতে পাই নাই। কিন্তু গদাধরের গৃহে এক লিপি দেখিয়া বুঝিয়াছি—গদাধরের প্রপৌত্র কৃষ্ণকান্তের মৃত্যু হয়—১২২৬ বঙ্গাব্দে।

শুনিয়াছি—মঃ মঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার History of Indian Logic পুস্তকে গদাধর ভট্টাচার্য্যের রচিত **ব্যুৎপত্তিবাদ** গ্রন্থের এক পুথির লিপিকাল ১৬২৫ খৃষ্টাব্দ লিখিয়াছেন। কিন্তু জগদীশ তর্কালঙ্কারের "শব্দশক্তি-প্রকাশিকা" গ্রন্থের পরে গদাধর "ব্যুৎপত্তি-বাদ" রচনা করেন, ইহাই আমরা বুঝি। গদাধর যে, ১৬২৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে "দীধিতি"র টীকা ও শব্দখণ্ডে স্বতন্ত্রভাবে "ব্যুৎপত্তি-বাদ" গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, ইহা আমরা সম্ভব মনে করি না। পরন্তু গদাধর সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, ইহাও বুঝিতে পারি। গদাধরের বৃদ্ধ প্রপৌত্র শ্রীরাম শিরোমণি নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক হইয়া ১২৬০ বঙ্গাব্দে ৬ই ফাল্গুন তারিখে কলিকাতা কাশীপুরে নড়াইলের জমীদার রামরত্ন রায়ের বাড়ীতে ন্যায়-শাস্ত্রের যে বিচার

"শ্রীমতা রঘুনাথেন তর্কালঙ্কার-সূনুনা। পক্ষতা-পর মূলস্য নিগূঢ়ার্থঃ প্রকাশ্যতে।"
শেষে আছে—"ইতি শ্রীরঘুনাথশর্ম্মণা বিরচিতা পাঠ্য কেবলব্যতিরেকি মূল টীকা সমাপ্তা।
শ্রীরামশর্ম্মণঃ স্বাক্ষর মিদং পুস্তকঞ্চ ৩০শে জ্যৈষ্ঠ—১৫৮৮,শকাব্দাঃ।"

করেন; সেই বিচার-বার্ত্তা ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে **সংবাদ-ভাস্কর** পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তৎকালে শ্রীরাম শিরোমণির বয়স ৫৫-৬০ বৎসর হইতে পারে। সুতরাং তাঁহার বৃদ্ধ প্রপিতামহ গদাধর যে, সপ্তদশ শতাব্দীর পরেও কিছুদিন জীবিত ছিলেন, এইকথা আমরা সম্ভব মনে করি। রাজা রাঘব তাঁহাকে ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে ভূমিদান করিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

পরন্তু গদাধর ভট্টাচার্য্য এবং রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার নবদ্বীপের হরিরাম তর্কবাগীশের ছাত্র, ইহা পণ্ডিত-সমাজে প্রসিদ্ধ আছে। শিরোমণিকৃত "নঞ্‌ বাদ" গ্রন্থের টীকার প্রারম্ভে রঘুদেবও লিখিয়াছেন, "শিবং প্রণম্য তৎ পশ্চাৎ তর্কবাগীশ্বরং গুরুং।" হরিরাম তর্কবাগীশ এবং রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কারেরও বহু গ্রন্থ আছে। গদাধরের টীকা যেমন **গাদাধরী** নামে প্রসিদ্ধ, তদ্রূপ রঘুদেবের টীকা **রঘুদেবী** নামে প্রসিদ্ধ ছিল। "নবদ্বীপমহিমা" পুস্তকে উক্ত রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কারের পরিচয়-বর্ণনে লিখিত হইয়াছে—"রঘুদেব গদাধরের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্রের পুত্র ছিলেন॥" (১৮১ পৃঃ)। কিন্তু হরিরাম তর্কবাগীশের ছাত্র উক্ত রঘুদেব গদাধরের পৌত্র হইতে পারেন না। পরন্তু গদাধরের পূর্ব্ববর্ত্তী টীকাকার ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের ছাত্র গুপ্তপল্লীর শতাবধান রাঘবেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের পুত্র চিরঞ্জীব শর্ম্মা উক্ত রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কারের ছাত্র। তাই তিনি উক্ত রঘুদেব ভট্টাচার্যের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিতে তাঁহার **কাব্য-বিলাস** গ্রন্থে কোন শ্লোকে লিখিয়াছেন—"ইমৌ ভট্টাচার্য্য-প্রবররঘুদেবস্য চরণৌ।" চিরঞ্জীব শর্ম্মার অধ্যাপক উক্ত রঘুদেব সপ্তদশ শতাব্দীতে গদাধর ভট্টাচার্য্যের সমসাময়িক।

গদাধরের ছাত্র জয়রামেরও বহু গ্রন্থ আছে। কিন্তু পরে গদাধরের গ্রন্থই সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছে। "তত্ত্ব-চিন্তামণি"র মথুরানাথ-কৃত টীকার কোন কোন অংশ এবং "দীধিতি"র "জাগদীশী" টীকাও প্রচলিত

আছে। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে "গাদাধরী" টীকাই বিশেষরূপে প্রচলিত হয়। গদাধরের বহু গ্রন্থ এখনও সর্ব্বদেশে প্রচলিত আছে। দাক্ষিণাত্য পণ্ডিতও উহার টীকা করিয়াছেন। গদাধরই নব্যন্যায়ের চরম অবতার।

নব্যন্যায় ও আন্বীক্ষিকী বিদ্যা

পূর্ব্বে যে নব্যন্যায়ের কিঞ্চিৎ পরিচয় বলিয়াছি,—যাহা নবদ্বীপে নবমূর্ত্তি পরিগ্রহে উন্নতির চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়া ন্যায়শাস্ত্রে বাঙ্গালীর অক্ষয় জয়স্তম্ভরূপে বিদ্যমান আছে,—তাহা পরবর্ত্তী বৌদ্ধাদি সম্প্রদায়কে নিরস্ত করিবার জন্য গঙ্গেশ প্রভৃতি তার্কিকগণের নিজ বুদ্ধি-কল্পিত অভিনব কোন তর্কবিদ্যা নহে। কিন্তু উহাও সেই বেদমূলক "আন্বীক্ষিকী" বিদ্যা।

কোষকার অমরসিংহ "স্বর্গ-বর্গে" তর্কবিদ্যামাত্রকেই "আন্বীক্ষিকী" শব্দের অর্থ বলিয়াছেন। কারণ, যাহাতে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হয় নাই, সেই সমস্ত তর্কবিদ্যাতেও "আন্বীক্ষিকী" শব্দের গৌণ প্রয়োগ হইয়াছে। * কিন্তু বেদমূলক যে "আন্বীক্ষিকী" বিদ্যা, তাহাতে বেদের প্রামাণ্য এবং আত্মার নিত্যত্ব, জন্মান্তর ও মুক্তি প্রভৃতি বৈদিক সিদ্ধান্ত প্রতিপাদিত হওয়ায় উহা কেবল তর্কবিদ্যা নহে। উহা তর্কবিদ্যা হইলেও আত্ম-বিদ্যা। রাজার শিক্ষণীয় বিদ্যার উল্লেখ করিতে মনুও বলিয়াছেন—

---

* মহাভারতেও দেখা যায়, "আন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যামনুরক্তো নিরর্থিকাং।" (শান্তি-পর্ব্ব—১৮৭।৪৭)। উক্ত স্থলে আন্বীক্ষিকী" শব্দের পরে "তর্ক-বিদ্যা" ও "নিরর্থিকা" শব্দের প্রয়োগ করিয়া কেবল তর্কবিদ্যারূপ নাস্তিক তর্কবিদ্যাই যে, উক্ত "আন্বীক্ষিকী" শব্দের দ্বারা বিবক্ষিত, ইহাই সুব্যক্ত করা হইয়াছে। এবং ঐ স্থলে সেই নাস্তিক তর্ক-বিদ্যায় অনুরক্ত বেদ-নিন্দাকারী নাস্তিকদিগেরই নিন্দা করা হইয়াছে। কিন্তু মহাভারতে অন্যত্রও আত্ম-বিদ্যারূপ আন্বীক্ষিকীর নিন্দা হয় নাই। পরন্তু উহা মুমুক্ষুর পক্ষে হিতকরী বলিয়া উহার প্রশংসাই হইয়াছে। মৎসম্পাদিত ন্যায় দর্শনের প্রথম সং ভূমিকায় উক্ত বিষয়ে প্রমাণ ও বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

"আন্বীক্ষিকীঞ্চাত্ম-বিদ্যাং" (৭।৪৩)। মনুসংহিতার ভাষ্যকার মেধাতিথি সেখানে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, চার্ব্বাক ও বৌদ্ধাদি-প্রণীত তর্কবিদ্যা অনেকের আস্তিক্য নাশ করে,—এজন্য তাহা রাজার শিক্ষণীয় নহে; কিন্তু আত্মবিদ্যারূপ 'আন্বীক্ষিকী'ই রাজার জ্ঞাতব্য। তাই উক্ত শ্লোকে "আত্ম-বিদ্যাং" এইরূপ বিশেষণ পদের প্রয়োগ হইয়াছে। এই মতে আন্বীক্ষিকী বিদ্যা দ্বিবিধ।*

বস্তুতঃ "আন্বীক্ষিকী শব্দের অর্থ বিষয়ে মতভেদ হইলেও সুপ্রাচীনকালেও যে, বেদ-বিরুদ্ধ তর্ক-বিদ্যাও ছিল, ইহা স্বীকার্য্য। শ্রীরামচন্দ্রকে বন গমন হইতে নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে পরম আস্তিক জাবালি মুনিও প্রথমে তাঁহাকে নাস্তিক তর্কবিদ্যানুসারে অনেক কথা বলিয়া ছিলেন। কিন্তু বলা আবশ্যক যে, শ্রীরামচন্দ্র পরে জাবালিকে যে সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন—তন্মধ্যে আস্তিক তর্ক-বিদ্যার কোন নিন্দা নাই। শ্রীরামচন্দ্র নৈয়ায়িকদিগকে কোন অভিসম্পাতও করেন নাই। (রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড ১০৯—সর্গ দ্রষ্টব্য।)

পূর্ব্বোক্ত বেদমূলক "আন্বীক্ষিকী" বিদ্যার প্রসিদ্ধ নাম **ন্যায়**। পরার্থ অনুমান এবং তদুদ্দেশ্যে প্রযোজ্য প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বরূপ বাক্যকে

---

* রাজশেখর সূরিও তাঁহার "কাব্যমীমাংসা" পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আন্বীক্ষিকী বিদ্যাকে দ্বিবিধ বলিয়াছেন। তাঁহার মতে জৈন, বৌদ্ধ ও চার্ব্বাকদর্শন পূর্ব্বপক্ষ-রূপ আন্বীক্ষিকী এবং সাংখ্য, ন্যায় ও বৈশেষিক উত্তরপক্ষ-রূপ আন্বীক্ষিকী। অর্থশাস্ত্রে কৌটিল্যও সাংখ্য, যোগ ও লোকায়ত শাস্ত্রকে আন্বীক্ষিকী বলিয়া উহার যে ফল বলিয়াছেন এবং সর্ব্বশেষে "প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানাং" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা উহার যে বৈশিষ্ট্য ব্যক্ত করিয়াছেন তদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনিও সমস্ত তর্ক বিদ্যা এবং তন্মধ্যে মুখ্যরূপে গৌতমোক্ত ন্যায়শাস্ত্রকে গ্রহণ করিয়াই ঐ সমস্ত কথা বলিয়াছেন। সুতরাং উক্ত স্থলে কৌটিল্য যে, "যোগ" শব্দের দ্বারা ন্যায়বৈশেষিক শাস্ত্রেরই উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাই বুঝা যায়। প্রাচীনকালে ন্যায়বৈশেষিকশাস্ত্রও "যোগ" শব্দের দ্বারা কথিত হইত। এ বিষয়ে প্রমাণাদি মৎসম্পাদিত ন্যায়দর্শনের প্রথম খণ্ডের ভূমিকা ও ২২৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বাৎস্যায়ন প্রভৃতি "ন্যায়" বলিয়াছেন। সেই ন্যায়-প্রতিপাদক শাস্ত্রও "ন্যায়" নামে কথিত হইয়াছে। উক্ত অর্থে পরে অনেকে উহাকে "নীতি" নামেও উল্লেখ করিয়াছেন। * উক্ত ন্যায়শাস্ত্রও যে, সেই সর্ব্বশাস্ত্র-যোনি সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর হইতেই উদ্ভূত হয়, ইহা প্রকাশ করিতে সুবালোপনিষদের দ্বিতীয় খণ্ডে পরে কথিত হইয়াছে—"ন্যায়ো মীমাংসা ধর্ম্মশাস্ত্রাণি"। "যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা"র প্রারম্ভে "পুরাণ-ন্যায়-মীমাংসা" ইত্যাদি-শ্লোকে এবং "মীমাংসা ন্যায়তর্কশ্চ উপাঙ্গং পরিকীর্ত্তিতং"—এই পুরাণ-বচনে "ন্যায়" শব্দের দ্বারা উক্ত "ন্যায়" শাস্ত্রই গৃহীত হইয়াছে। উহা তর্ক শাস্ত্র বলিয়া "ন্যায়তর্ক" নামে এবং অনেক স্থলে কেবল "তর্ক" নামেও কথিত হইয়াছে। উক্ত তর্কশাস্ত্রের অপর প্রাচীন নাম "বাকো-বাক্য"। ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডে নারদ-সনৎকুমার-সংবাদে এবং পতঞ্জলির মহাভাষ্যের প্রথম আহ্নিকে "বাকো-বাক্য" নামেই উহার উল্লেখ হইয়াছে। সুপ্রাচীন কালেও উক্ত তর্ক শাস্ত্রের তত্ত্ব-সূচক বহু সূত্র ঋষিগণ জানিতেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে পরমেশ্বরের নিঃশ্বসিত বেদাদি বিদ্যার উল্লেখ করিতে যে "সূত্রাণি" এই পদের উল্লেখ হইয়াছে, তদ্দ্বারা অন্যান্য সূত্রের ন্যায় তর্কশাস্ত্রের তত্ত্বসূচক বহু সূত্রও বুঝা যায়।

বস্তুতঃ তৈত্তিরীয় আরণ্যকের প্রথম প্রপাঠকের তৃতীয় অনুবাকে "স্মৃতিঃ প্রত্যক্ষ মৈতিহ্যমনুমানং চতুষ্টয়ং"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে, অনুমান প্রমাণের উল্লেখ হইয়াছে, তাহার তত্ত্ব বুঝিতে অবশ্য জ্ঞাতব্য "ব্যাপ্তি" ও "হেত্বাভাস" প্রভৃতি পদার্থের তত্ত্ব যে, অক্ষপাদ গৌতম

---

* "মিলিন্দ পঞ্হ" নামক বৌদ্ধ পালিগ্রন্থেও দেখা যায়, "সাংখ্য যোগা নীতি বিসেসিকা"। (৩য় পৃঃ)। নব্য নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কারও "ঈশ্বরানুমান-চিন্তামণি"র দীধিতির টীকার শেষে লিখিয়াছেন—"কুর্ব্বন্তি নিত্যমনুমানমণৈরনেকে প্রায়ঃ প্রয়াস মধিদীধিতি নীতিভাজঃ।"

ঋষির পূর্ব্বে আর কোন ঋষি জানিতেন না—ইহা বলা যাইবে না। অক্ষপাদের পূর্ব্বেও সৃষ্টির প্রথম অবস্থা হইতেই যে, সংক্ষিপ্তরূপে ন্যায়শাস্ত্র ছিল,—ইহা "ন্যায়মঞ্জরী"র প্রারম্ভে মহানৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্টও বলিয়াছেন। ন্যায়ভাষ্যের শেষে বাৎস্যায়নও বলিয়াছেন—"যোঽক্ষপাদমৃষিং ন্যায়ঃ প্রত্যভাদ্ বদতাং বরং।" অর্থাৎ অক্ষপাদ ঋষির সম্বন্ধে ন্যায়শাস্ত্র প্রতিভাত হইয়াছিল, তিনি উহার স্রষ্টা নহেন, কিন্তু বক্তা।

ন্যায়দর্শনের প্রথম সূত্র-ভাষ্যে বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ ও আগমের অবিরুদ্ধ অনুমান অর্থাৎ শাস্ত্রদ্বারা তত্ত্ব-শ্রবণের পরে অনুমান প্রমাণরূপ যুক্তির দ্বারা মননই "অন্বীক্ষা।" "তয়া প্রবর্ত্ততে ইত্যান্বীক্ষিকী ন্যায়বিদ্যা ন্যায়শাস্ত্রম্।" অর্থাৎ উক্ত "অন্বীক্ষা"-সম্পাদনের জন্য যে শাস্ত্র প্রকাশিত হইয়াছে—এই অর্থে "অন্বীক্ষা" শব্দের উত্তর তদ্ধিতপ্রত্যয়-নিষ্পন্ন উক্ত "আন্বীক্ষিকী" শব্দের অর্থ ন্যায়শাস্ত্র। উহা অনেক অংশে তর্ক শাস্ত্র হইলেও মননশাস্ত্ররূপ অধ্যাত্মশাস্ত্র। প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থই এই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য।

পরে অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক শ্রীহর্ষও "নৈষধ-চরিত" কাব্যের দশম সর্গে "উদ্দেশ-পর্ব্বণ্যথ লক্ষণেঽপি দ্বিধোদিতৈঃ ষোড়শভিঃ পদার্থৈঃ ইত্যাদি (৮১ম) শ্লোকে উক্ত "আন্বীক্ষিকী" বিদ্যাকে মুক্তিকামীর সহায়রূপে বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহার পরে নব্যনৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায় "তত্ত্ব-চিন্তামণি" গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, পরম কারুণিক অক্ষপাদ মুনি জগতের মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে "আন্বীক্ষিকী" বিদ্যা প্রকাশ করিয়াছেন। গঙ্গেশের "তত্ত্ব-চিন্তামণি"ও গৌতমের ন্যায় সূত্রাবলম্বনে রচিত প্রকরণগ্রন্থ। তাই গঙ্গেশ গৌতমোক্ত "প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি"—এই তৃতীয় সূত্রের উল্লেখ করিয়া প্রধানতঃ গৌতমোক্ত প্রত্যক্ষাদি চতুর্ব্বিধ প্রমাণ পদার্থেরই বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং উক্ত "আন্বীক্ষিকী" বিদ্যার প্রতিপাদ্য অন্যান্য অনেক পদার্থেরও

বিচার পূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং "তত্ত্ব-চিন্তামণি" এবং উহার টীকা প্রভৃতি সমস্ত নব্যন্যায় গ্রন্থও গৌতম-প্রকাশিত মূল "আন্বীক্ষিকী" বিদ্যারই ব্যাখ্যান-গ্রন্থ। তাই বলিয়াছি—নব্যন্যায়ও মূলতঃ আন্বীক্ষিকী বিদ্যা। "তত্ত্বচিন্তামণি"র "রহস্য" টীকাকার মথুরানাথ তর্কবাগীশও (শব্দ খণ্ডের টীকারম্ভে) নব্যন্যায়ের অধ্যাপকমণ্ডলীকেও **আন্বীক্ষিকী-পণ্ডিতমণ্ডলী** বলিয়াছেন। বস্তুতঃ যেমন বেদান্তার্থ-প্রকাশক ব্রহ্মসূত্র এবং উহার ভাষ্যাদি সমস্ত গ্রন্থও বেদান্ত শাস্ত্র বলিয়া কথিত হয়—("বেদান্তো নাম উপনিষৎ, তদুপকারীণি শারীরকসূত্রাদীনি চ"—বেদান্তসার)—তদ্রূপ, ন্যায়সূত্র এবং উহার প্রতিপাদ্য বিষয়ের ব্যাখ্যানরূপ প্রাচীন ও নব্য সমস্ত ন্যায়গ্রন্থও ন্যায়শাস্ত্র বলিয়া কথিত হয়।

ন্যায়সূত্র-কারের পরিচয় ও ন্যায়সূত্র-রচনার কাল

বাৎস্যায়ন প্রভৃতি পূর্ব্বাচার্য্যগণ মহর্ষি অক্ষপাদকে ন্যায়সূত্র-কার বলিলেও এবং পরে অনেক গ্রন্থকার তাঁহাকে গোতম বা গৌতম বলিলেও তাঁহার বিশেষ পরিচয় কিছু বলেন নাই। আমি পূর্ব্বে ন্যায়দর্শনের ভূমিকায় বলিয়াছি যে, অহল্যাপতি মহর্ষি গৌতমই ন্যায়সূত্র-কার অক্ষপাদ। কারণ, স্কন্দপুরাণে তাঁহাকেই অক্ষপাদ বলা হইয়াছে। * এবং কালিদাসেরও পূর্ব্ববর্ত্তী ভাস কবি তাঁহার "প্রতিমা" নাটকের পঞ্চম অঙ্কে যে মেধাতিথির ন্যায়শাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন,—সেই মেধাতিথিও অহল্যাপতি গৌতম, ইহা মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে—"মেধাতিথি" র্মহাপ্রাজ্ঞো গৌতমস্তপসি স্থিতঃ" ইত্যাদি (২৬৫ অঃ ৪৫)

* "অক্ষপাদো মহাযোগী গৌতমাখ্যোঽভবন্মুনিঃ। গোদাবরী-সমানেতা অহল্যায়াঃ পতিঃ প্রভুঃ।" (স্কন্দপুরাণ-মাহেশ্বর খণ্ড-কুমারিকাখণ্ড—৫৫ অঃ—৫ শ্লোক)।

—শ্লোকের দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়। মেধাতিথি—এই নামে আর কেহ যে, ন্যায়শাস্ত্র-রচনা করিয়াছিলেন এবং ভাস কবির পূর্ব্বে 'তাহা প্রসিদ্ধ ছিল, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ বা প্রবাদও নাই'। কিন্তু গৌতম মুনি কোন সময়ে বেদব্যাসকে দর্শন করিবার জন্য যোগ-বলে নিজ চরণে চক্ষুরিন্দ্রিয়-সৃষ্ট করায় তখন হইতে তিনি **অক্ষপাদ** নামে খ্যাত হন—এইরূপ প্রবাদ চির-প্রসিদ্ধ আছে। * উক্ত বিষয়ে আমি পূর্ব্বে দেবী-পুরাণের অনেক বচনও উদ্ধৃত করিয়াছি। মুদ্রিত দেবীপুরাণে ঐ অংশ না থাকিলেও উহা যে, উক্তরূপ প্রাচীন প্রবাদের সমর্থক, ইহা স্বীকার্য্য।

পরন্তু স্কন্দপুরাণের "অক্ষপাদো মহাযোগী" ইত্যাদি বচনকে প্রক্ষিপ্ত বলিবার কোন হেতু নাই। সুতরাং গৌতম ও অক্ষপাদ যে, ভিন্ন ব্যক্তি এবং ন্যায়দর্শনের প্রাচীন অংশই গৌতম রচনা করেন, তাঁহার অনেক পরে অক্ষপাদ নূতন অংশ রচনা করেন,—এইরূপ মতও আমরা

---

* ইন্দ্রিয়মাত্রের বাচক "অক্ষ" শব্দের চক্ষুরিন্দ্রিয়রূপ বিশেষ অর্থেও প্রয়োগ হওয়ায় "অক্ষযুক্তঃ পাদো যস্য" এইরূপ বিগ্রহে "অক্ষপাদ" শব্দের দ্বারা উক্তরূপ অর্থ বুঝা যায়। কেহ লিখিয়াছেন যে, উক্ত "অক্ষ"শব্দের অর্থ জন্মান্ধ এবং "গুরুপাদ" ও "স্বামিপাদ" প্রভৃতি শব্দে "পাদ"শব্দের ন্যায় "অক্ষপাদ" শব্দে "পাদ" শব্দটি পূজ্যার্থ। উক্ত "অক্ষপাদ" শব্দের দ্বারা বুঝা যায়,—জন্মান্ধপাদ অর্থাৎ বেদোক্ত দীর্ঘতমা গোতম; তিনি গৌতম নহেন। কিন্তু পূর্ব্বাচার্য্যগণ ঐরূপ বুঝেন নাই। তাই বাৎস্যায়ন প্রভৃতি "অক্ষপাদ" শব্দের একবচনান্ত প্রয়োগই করিয়াছেন। পরন্তু মাধবাচার্য্য 'ন্যায়সূত্র'কার গৌতমকে "চরণাক্ষ" বলিয়াছেন। (পরে ১৪শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। "বেদান্তকল্পতরু-পরিমলে"র প্রথম অঃ প্রথম পাদের শেষে অপ্যয়দীক্ষিত "কর্ণভক্ষ-পদাক্ষক" ইত্যাদি শ্লোকে গৌতমকে "পদাক্ষক" বলিয়াছেন। "মানমেয়োদয়" গ্রন্থে নারায়ণ ভট্ট "অক্ষপাৎ" বলিয়াছেন। কিন্তু "পাদ" শব্দ চরণার্থ না হইলে ঐ সমস্ত প্রয়োগ হইতে পারে না। আর দীর্ঘতমা গোতমই যে ন্যায় সূত্রকার, এ বিষয়ে আমরা কোন প্রকৃত প্রমাণও পাই নাই। পরন্তু তাঁহাকে 'জন্মান্ধপাদ' বলিলে তাঁহার কি গৌরব-প্রকাশ হয়, ইহাও আমরা বুঝি না।

গ্রহণ করিতে পারি না। উক্ত অহল্যাপতি ঋষির প্রসিদ্ধ নাম যে, গৌতম-ইহা সর্ব্ব-সম্মত। আমরা বৃদ্ধ নৈয়ায়িকগণের মুখে ন্যায়সূত্রকারের গৌতম নামই শুনিয়াছি এবং অনেক গ্রন্থেও আমরা তাঁহার গৌতম নাম দেখিতে পাই। * কিন্তু তাঁহার আদি পুরুষ বেদোক্ত মহর্ষি গোতমের নামানুসারে অনেক গ্রন্থে তিনি গোতম নামেও কথিত হইয়াছেন। তাই আমরাও অনেক স্থলে গোতম নামে তাঁহার উল্লেখ করিয়াছি। বস্তুতঃ প্রাচীনকালে আদি পুরুষের নামেও অনেক প্রধান পুরুষের উল্লেখ হইয়াছে, এ বিষয়ে অনেক উদাহরণ আছে। তদনুসারেই "নৈষধচরিত" কাব্যে (১৭।৭৫) শ্রীহর্ষও কোন প্রয়োজনবশতঃ ন্যায়শাস্ত্র-বক্তা মুনির গোতম নামই গ্রহণ করিয়াছেন। কোন মতে অন্য অর্থে তিনি গোতম নামে কথিত হইলেও মহর্ষি গোতমের বংশজাত বলিয়া তিনি গৌতম নামেও কথিত হইতেন। দেবীপুরাণের কোন বচনেও পরে ঐ তাৎপর্য্যেই কথিত হইয়াছে—"গোতমান্বয়-জন্মেতি গৌতমোঽপি স চাক্ষপাৎ"।

মহাযোগী মহর্ষি গৌতম যোগ-বলে সুদীর্ঘজীবী হইয়া নানা সময়ে নানা স্থানে নানা কার্য্য করিয়াছেন। স্কন্দপুরাণাদিতে সেই সমস্ত বর্ণিত হইয়াছে। কূর্ম্মপুরাণে তিনি শিবাবতার বলিয়া কথিত হইয়াছেন। শিব পুরাণেও তাঁহার বহু মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। লিঙ্গপুরাণে (২৪ অঃ) অক্ষপাদ ও উলূক মুনি শিবাবতার সোমশর্ম্মার শিষ্য-শিষ্য রূপে কথিত হইয়াছেন। শর-শয্যায় শয়ান ভীষ্মদেবের দেহ-ত্যাগ কালে বেদব্যাস, নারদ, গৌতম এবং উলূক প্রভৃতি মুনিগণ সেখানে উপস্থিত

---

* বেদান্তদর্শনের চতুর্থ সূত্রের শাঙ্করভাষ্যের 'রত্নপ্রভা' টীকায় "তত্র অক্ষপাদ গৌতম মুনিসম্মতিমাহ।" "তার্কিকরক্ষা" গ্রন্থে হেত্বাভাসের ব্যাখ্যারম্ভে "গৌতমেঃ প্রপঞ্চিতাঃ"। "গৌতম গ্রহণেন"। "অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি" গ্রন্থে "গৌতমাদিমুনীনাং ইত্যাদি।

ছিলেন,—ইহা মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে (৪৭ অঃ) বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত উলূক মুনি অথবা (মতান্তরে) ঔলূক্য মুনি বৈশেষিকসূত্র-কার। তাই বৈশেষিক-দর্শন "ঔলূক্যদর্শন" নামেও কথিত হইয়াছে। উক্ত উলূক বা ঔলূক্য ঋষি সামান্য তণ্ডুলকণা বা তুষকণামাত্র ভক্ষণ করিয়াই জীবন ধারণ করায় তিনি "কণাদ" নামেই প্রসিদ্ধ হন। পরে অনেক গ্রন্থকার তাঁহার ঐ নামার্থ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে "কণভুক্" এবং "কণভক্ষ" নামেও উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি কশ্যপের অপত্য বলিয়া অনেক প্রাচীন আচার্য্য "কাশ্যপ" নামেও তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন।

পরন্তু মহাভারতের সভা-পর্ব্বের পঞ্চম অধ্যায়ে নারদমুনির নানা-শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য-বর্ণনায় পরে বিশেষ করিয়া কথিত হইয়াছে—"পঞ্চাবয়ব-যুক্তস্য বাক্যস্য গুণ-দোষ-বিৎ।" অর্থাৎ নারদ মুনি গৌতমের ন্যায়দর্শনোক্ত প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বযুক্ত বাক্যরূপ ন্যায়বাক্যের সম্বন্ধে অনুকূলতর্করূপ-গুণ এবং সর্ব্বপ্রকার হেতুদোষও জানিতেন। টীকাকার নীলকণ্ঠও সেখানে উক্তরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং মহাভারত-রচনার অনেক পূর্ব্বেই যে, কণাদ ও গৌতম যথাক্রমে বৈশেষিকসূত্র ও ন্যায়সূত্র রচনা করিয়াছিলেন, ইহা আমরা বুঝিতে পারি।

এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, ন্যায়-বৈশেষিক-সূত্রে কোন পূর্ব্বাচার্য্যের নাম নাই। ন্যায়ভাষ্যে (১।১।৩২) দশাবয়ববাদী নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। কিন্তু ন্যায়সূত্রে তাহা নাই। ন্যায়সূত্রে প্রাচীন সাংখ্যমতের খণ্ডন এবং প্রাচীন যোগশাস্ত্রেরই উল্লেখ হইয়াছে। আর বিচার দ্বারা খণ্ডনের জন্য পূর্ব্বপক্ষরূপে যে সমস্ত নাস্তিকমতের উল্লেখ হইয়াছে, তাহা উপনিষদেও প্রকাশিত আছে। সুপ্রাচীনকালে নানা নাস্তিক সম্প্রদায় নানা প্রকারে ঐ সমস্ত মতের ব্যাখ্যা করিয়া উহা সমর্থন করিবার জন্য আরও অনেক মতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। দার্শনিক ঋষিগণ কোন কোন সূত্রদ্বারা সেই সমস্ত মতেরও খণ্ডন করিয়া

গিয়াছেন। কিন্তু পরে বৌদ্ধ নাগার্জ্জুন যেরূপ শূন্যবাদের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহা কোন ন্যায়-সূত্রে নাই, বাৎস্যায়নের ভাষ্যেও নাই। নাগার্জ্জুনের ব্যাখ্যাত শূন্যবাদ সর্ব্বনাস্তিত্ববাদ নহে। পূর্ব্বে ন্যায়সূত্র ও বাৎস্যায়নের ভাষ্য-ব্যাখ্যায় যথাস্থানে আমি ঐ সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি।

ফলকথা, ন্যায়সূত্র যে, নাগার্জ্জুনের পরে রচিত হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় করিবার কোন্ কারণই নাই। * কোন বৌদ্ধগ্রন্থের কোন একটি শব্দ কোন ন্যায়-সূত্রে দেখিয়া সেই সূত্রটি যে, সেই বৌদ্ধ গ্রন্থের পরে রচিত হইয়াছে, এইরূপ অনুমানও কোনমতে সদনুমান হইতে পারে না। "লঙ্কাবতারসূত্র" বা "মাধ্যমিকসূত্র" প্রভৃতি কোন বৌদ্ধ গ্রন্থের কোন অসাধারণ পারিভাষিক শব্দও ন্যায়সূত্রে নাই। বাৎস্যায়নও "প্রতীত্যসমুৎপাদ" প্রভৃতি বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ করেন নাই। তিনি "ক্ষণিকবাদী", "অনাত্মবাদী" এবং সর্ব্বনাস্তিত্ববাদীকে "আনুপলম্ভিক" নামে উল্লেখ করিলেও "শূন্যবাদী" বলেন নাই। "শূন্য" শব্দের ব্যাখ্যাও করেন নাই। তবে কিরূপে বুঝিব যে, বাৎস্যায়নও শূন্যবাদী বৌদ্ধ নাগার্জ্জুনের পরবর্ত্তী ?

---

* ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের "সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা"র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত "বাঙ্গলার বৌদ্ধসমাজ" প্রবন্ধে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন—"ক্ষামা-দিগের ন্যায়সূত্রখানি নাগার্জ্জুনের সময়ে বা কিছু পরে লেখা"। ঐতিহাসিক-বৃদ্ধ শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত প্রবন্ধে এবং তৎপূর্ব্বে আরও অনেক প্রবন্ধে ন্যায়সূত্র এবং তাহার সিদ্ধান্ত-বিষয়েও আরও অনেক মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বে মূল ন্যায়দর্শনের ব্যাখ্যায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সে বিষয়েও আমি যথা বক্তব্য বলিয়াছি। সে সব কথা এখানে বলা সম্ভব নহে। পাঠকগণ সম্পূর্ণরূপে মূলগ্রন্থের পর্য্যালোচনা করিয়াই নানা মন্তব্যের বিচার করিবেন। ব্যক্তিবিশেষের কথানুসারে কোন সিদ্ধান্ত-নির্ণয় করা উচিত নহে।

পরন্তু পাণিনি যে, গৌতম বুদ্ধের পূর্ববর্ত্তী, ইহা অনেক পাশ্চাত্ত্য ঐতিহাসিকও সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু পাণিনির সূত্রে "ন্যায়" শব্দ ও "চরক" শব্দের উল্লেখ থাকিলেও তৎপূর্ব্বে যে, গৌতমের ন্যায় সূত্র ও চরক মুনির কোন গ্রন্থ ছিল না, এ বিষয়ে কি প্রমাণ আছে? পরন্তু প্রচলিত "চরকসংহিতা"র সূত্রস্থানের প্রথম অধ্যায়ে দ্রব্যাদি ষট্ পদার্থের এবং পরে বিমানস্থানের অষ্টম অধ্যায়ে ন্যায় দর্শনোক্ত "বাদ", "জল্প", "বিতণ্ডা" এবং "প্রতিজ্ঞা"দি পঞ্চাবয়ব প্রভৃতি অনেক পদার্থেরই উল্লেখ হইয়াছে। তন্মধ্যে কোন কোন পদার্থের স্বরূপ-ব্যাখ্যায় মতভেদ থাকিলেও ঐ সমস্ত পদার্থ যে, চরক মুনির পূর্ব্ব হইতেই সুপ্রসিদ্ধ ছিল, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

বস্তুতঃ ন্যায়সূত্রকার মহর্ষি গৌতমের যোগবলে-সুদীর্ঘ জীবন ও ন্যায়-সূত্রের অতি প্রাচীনত্ব বিশ্বাস না করিলেও ন্যায়সূত্র যে, বেদান্ত সূত্র-রচনার পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে, ইহা স্বীকার্য্য। বেদান্ত দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে কতিপয় সূত্রের দ্বারা শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ যে "পরমাণুকারণবাদে"র খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা কণাদ ও গৌতমের মত, ইহা সর্ব্বসম্মত। ফলকথা, বেদান্তসূত্র যে, ন্যায়বৈশেষিক-সূত্রের পরে রচিত হইয়াছে—ইহা বুঝিবার অনেক কারণ আছে। উক্ত বিষয়ে বিবাদের কোন কারণ আমরা জানি না। আর ভগবদ্গীতায় (১৩।৫) যে ব্রহ্ম-সূত্রের উল্লেখ হইয়াছে এবং পাণিনি যে, (৪।৩।১১০ সূত্রে) পারাশর্য্য ভিক্ষু সূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা পরাশর-পুত্র বেদব্যাস-রচিত বেদান্ত-সূত্র ভিন্ন আর কিছুই আমরা বুঝি না এবং ভগবদ্গীতা ও বেদান্তসূত্র যে, গৌতম বুদ্ধের বহু পূর্ব্বে রচিত, এবিষয়ে আমাদিগের কোন সংশয় নাই।

ন্যায়সূত্রের প্রাচীন ব্যাখ্যাকারগণ

প্রথমে বাৎস্যায়নই (পক্ষিলস্বামী) যথাক্রমে সম্পূর্ণ ন্যায়সূত্রের উদ্ধার করিয়া উহার ভাষ্য রচনা করেন। পরে মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিশেষ অভ্যুদয়-কালে বৌদ্ধাচার্য্য বসুবন্ধু ও দিঙ্‌নাগ প্রভৃতি ন্যায়সূত্র ও বাৎস্যায়ন ভাষ্যের অনেক প্রতিবাদ করিলে ভারদ্বাজ উদ্দ্যোতকর বাৎস্যায়ন-ভাষ্যের "বার্ত্তিক" রচনা করেন। তাহাতে তিনি নিজ মতানুসারে ন্যায়সূত্রও উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি উক্ত গ্রন্থে বহু সূক্ষ্মবিচার দ্বারা তৎকালীন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মত-খণ্ডন করিয়া এক প্রবল সম্প্রদায়-গঠন করিয়াছিলেন। **বাৎস্যায়ন** নামের ন্যায় তাঁহারও গোত্রনিমিত্তক নাম **ভারদ্বাজ**। ক্রমে উদ্দ্যোতকরের "ন্যায়বার্ত্তিকে"র অনেক টীকাও হইয়াছিল। কিন্তু কাল-প্রভাবে পরে উদ্দ্যোতকরের সম্প্রদায়ও বিলুপ্ত হয়। তাঁহার বহু পরে নবম শতাব্দীতে সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার গুরু ত্রিলোচনের উপদেশ লাভ করিয়া উদ্দ্যোতকরের "ন্যায়বার্ত্তিকে"র টীকা রচনার দ্বারা উহার উদ্ধার করেন। তাঁহার সেই টীকার নাম **ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্য টীকা**। বাচস্পতি মিশ্রের পরে নবম শতাব্দীর শেষে কাশ্মীরে কারারুদ্ধ জয়ন্ত ভট্ট গদ্য ও পদ্যে **ন্যায়মঞ্জরী** নামে অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন। তাহাতে তিনি সমস্ত ন্যায়সূত্রের ব্যাখ্যা করেন নাই। তিনি ঐ গ্রন্থে (১২ পৃঃ) বলিয়াছেন—"অপিতু লক্ষণসূত্রাণ্যেব ব্যাখ্যাস্যন্তে।" কিন্তু তিনি যথাক্রমে সমস্ত ন্যায়সূত্রের **ন্যায়কলিকা** নামে লঘুবৃত্তিও রচনা করিয়াছিলেন। (উহার প্রাপ্ত অংশ কাশীর সরস্বতীভবন হইতে প্রকাশিত হইয়াছে)।

জয়ন্ত ভট্টের পরে দশম শতাব্দীর শেষভাগে মিথিলার সুপ্রসিদ্ধ মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য বাচস্পতি মিশ্র কৃত "ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্য-টীকা"র "তাৎপর্য্য পরিশুদ্ধি" টীকা রচনা করেন। ঐ টীকা **ন্যায়নিবন্ধ**

নামে কথিত হইয়াছে। উদয়নাচার্য্য ন্যায়দর্শনের অতিগহন পঞ্চম অধ্যায়ের ব্যাখ্যার জন্য যে **ন্যায়-পরিশিষ্ট** গ্রন্থ রচনা করেন, উহা "প্রবোধসিদ্ধি" নামে এবং **পরিশিষ্ট** নামেও কথিত হইয়াছে। "তার্কিক-রক্ষা"কার বরদরাজ লিখিয়াছেন—"প্রবোধসিদ্ধিনাম্নি পরিশিষ্টে।" এখন পূর্ব্বোক্ত বাৎস্যায়ন প্রভৃতি প্রাচীন ব্যাখ্যাকারগণের সম্বন্ধে আমার যাহা বিশেষ বক্তব্য, তাহাও বলা আবশ্যক। বাহুল্যভয়ে সংক্ষেপেই তাহা বলিতে হইবে।

বাৎস্যায়ন ও ভারদ্বাজ

প্রাচীন বাৎস্যায়ন ঋষিই "ন্যায়-ভাষ্য"কার এবং ভারদ্বাজ মুনিই "বার্ত্তিক"কার—এই মতের কোন প্রমাণ নাই। উদ্দ্যোতকর "বার্ত্তিক"শেষে ভাষ্যকার বাৎস্যায়নকে 'অক্ষপাদপ্রতিভ' এবং তাঁহার ভাষ্যকে মহাভাষ্য বলিয়া তাঁহার প্রতি অসামান্য সম্মান প্রদর্শন করিলেও তাঁহাকে ঋষি বা মুনি বলেন নাই। পরন্তু তিনি অনেক স্থলে অসংকোচে বাৎস্যায়নের মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্রও বাৎস্যায়নের মতকে আর্যমত বলিয়া জানিতেন না। তিনি "তাৎপর্য্যটীকা"র প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—**ভগবতা পক্ষিলস্বামিনা**। সুতরাং বুঝা যায় যে, পক্ষিলস্বামীই ন্যায়ভাষ্যকার, ইহাই তৎকালে প্রসিদ্ধ ছিল। অনেক গ্রন্থকার **পক্ষিল** নামেই তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। ফলকথা, তিনি ঋষিকল্প হইলেও উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি ন্যায়াচার্য্যগণ তাঁহাকে ঋষি বলেন নাই।

জৈনপণ্ডিত হেমচন্দ্র সূরি "অভিধানচিন্তামণি" গ্রন্থে সুপ্রসিদ্ধ কৌটিল্য বা চাণক্য পণ্ডিতের অপর নাম বলিয়াছেন—পক্ষিলস্বামী। আরও কোন কারণে অনেক প্রাচীন পণ্ডিত বলিতেন যে, "অর্থশাস্ত্র"কার কৌটিল্যই ন্যায়ভাষ্য-কার। তাঁহার বাৎস্যগোত্রনিমিত্তক নাম

বাৎস্যায়ন। বাৎস্যায়নের "কামসূত্রে"র টীকায় যশোধরও লিখিয়াছেন— "বাৎস্যায়ন ইতি গোত্রনিমিত্তা সংজ্ঞা। মল্লনাগ ইতি সংস্কারিকী"। কিন্তু "অর্থশাস্ত্র"কার কৌটিল্যের মুখ্য নাম **বিষ্ণুগুপ্ত**। তিনি নিজেও বিষ্ণুগুপ্ত নামেরই উল্লেখ করিয়াছেন। অবশ্য "কামসূত্র"কার বাৎস্যায়নও নৈয়ায়িক ছিলেন। তাই তিনি (দ্বিতীয় অ: একাদশ সূত্রে) ন্যায় মতানুসারেই কামের লক্ষণ বলিয়াছেন। কিন্তু "অর্থশাস্ত্র", 'ন্যায়ভাষ্য'ও "কামসূত্রে"র ভাষাগত বৈশিষ্ট্য এবং কামসূত্রের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণও লক্ষ্য করা আবশ্যক।

পরন্তু "কামসূত্র"কার বাৎস্যায়ন "আন্বীক্ষিকী" বিদ্যার বিশেষ উল্লেখ করেন নাই। "অর্থশাস্ত্রে" কৌটিল্য সাংখ্যশাস্ত্রকেও আন্বীক্ষিকী বিদ্যা বলিয়াছেন। কিন্তু ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রথম সূত্র-ভাষ্যে "আন্বীক্ষিকী" শব্দের ব্যুৎপত্তির ব্যাখ্যা করিয়া মহর্ষি গৌতম-প্রকাশিত প্রমাণাদি ষোড়শপদার্থ-প্রতিপাদক ন্যায়-শাস্ত্রকেই "আন্বীক্ষিকী" বলিয়াছেন। "অর্থ-শাস্ত্র"কার ও ন্যায়-ভাষ্যকারের উক্তরূপ মতভেদ-বশতঃ খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে "অর্থশাস্ত্র"কার কৌটিল্য বা চাণক্য পণ্ডিতই যে, ন্যায়-ভাষ্য-কার বাৎস্যায়ন, ইহা আমি বুঝিতে পারি নাই। পাশ্চাত্ত্য ঐতিহাসিকগণের মতেও ন্যায়-ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন খৃঃ তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন। কিন্তু আমার ধারণা, বাৎস্যায়ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রথম অভ্যুদয় কালে ন্যায়-ভাষ্য রচনা করেন। তিনি শূন্যবাদী বৌদ্ধ নাগার্জ্জুনের পূর্ব্ববর্ত্তী।

প্রাচীনকালে অনেকে নিজবংশগৌরবখ্যাপনের জন্য নিজগোত্র-নিমিত্তক নামের উল্লেখ করিতেন। ন্যায়ভাষ্য-কার পক্ষিলস্বামীর ন্যায় "বার্ত্তিক"কার উদ্দ্যোতকরও তাঁহার গোত্র-নিমিত্তক নাম গ্রহণ করিয়া "বার্ত্তিক"-শেষে বলিয়াছেন—"ভারদ্বাজেন বার্ত্তিকম্॥" তিনি ভরদ্বাজ মুনির বংশ-সম্ভূত বলিয়া ঐ অর্থে 'ভারদ্বাজ' নামে প্রসিদ্ধ

হইয়াছিলেন, ইহাই বুঝা যায়। কিন্তু "তাৎপর্য্যটীকা"কার বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি বহু গ্রন্থকার উদ্দ্যোতকর নামে তাঁহার উল্লেখ করায় উদ্দ্যোতকরই তাঁহার প্রকৃত নাম, ইহা বুঝা যায়। ন্যায়বার্ত্তিকের শেষেও দেখা যায় "ভারদ্বাজ উদ্দ্যোতকর।'

'ন্যায়বার্ত্তিকে"র প্রারম্ভে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন,—"কুতার্কিকাজ্ঞান-নিবৃত্তি-হেতুঃ করিষ্যতে তত্র ময়া নিবন্ধঃ।" সুতরাং বুঝা যায়,—কুতার্কিকগণের অজ্ঞান-নিবৃত্তিই তাঁহার "বার্ত্তিক"-রচনার প্রয়োজন। বাচস্পতি মিশ্র উক্ত "কুতার্কিক" শব্দের দ্বারা বৌদ্ধ দিঙ্নাগ প্রভৃতিকে গ্রহণ করায় বুঝা যায় যে, তাঁহার মতে দিঙ্নাগ প্রভৃতির জীবনকালেই উদ্দ্যোতকর "বার্ত্তিক" রচনা করেন। নচেৎ তিনি দিঙ্নাগ প্রভৃতির অজ্ঞান-নিবৃত্তির আশা করিতে পারেন না। পরন্তু বাচস্পতি মিশ্র "তাৎপর্য্যটীকা"র প্রারম্ভে "উদ্দ্যোতকর-গবীনা মতিজরতীনাং সমুদ্ধরণাৎ"—এইরূপ উক্তির দ্বারা উদ্দ্যোতকরের 'বার্ত্তিক' নিবন্ধের অতিপ্রাচীনত্ব খ্যাপন করিয়া তাহার উদ্ধার-জন্য পুণ্যলাভের ইচ্ছা প্রকাশ করায় বুঝা যায় যে, উদ্দ্যোতকর বৌদ্ধাচার্য্য ধর্ম্মকীর্ত্তিরও বহু পূর্ব্ববর্ত্তী।*

পরন্তু হর্ষবর্দ্ধনের সভাপণ্ডিত বাণভট্ট—"হর্ষচরিতে"র প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—"কবীনা মগলদ্ দর্পো নূনং বাসবদত্তয়া।" বাণ ভট্টও যে

* বস্তুতঃ উদ্দ্যোতকর "ন্যায়বার্ত্তিকে" ধর্ম্মকীর্ত্তির কোন কথার উল্লেখ করেন নাই। তিনি 'প্রত্যক্ষসূত্র বার্ত্তিকে' দিঙ্নাগের "প্রত্যক্ষং কল্পনাপোঢ়ং"—এই কথার বিচার পূর্ব্বক খণ্ডন করিলেও ধর্ম্মকীর্ত্তির "প্রত্যক্ষং কল্পনাপোঢ় মভ্রান্তং" এই কথার কোন উল্লেখই করেন নাই। পরে বৌদ্ধ বিজ্ঞান-বাদ খণ্ডনেও ধর্ম্মকীর্ত্তির "সহোপলম্ভ-নিয়মাৎ" ইত্যাদি কারিকার উল্লেখ বা কোনরূপ আলোচনা করেন নাই। কিন্তু ধর্ম্মকীর্ত্তি তাঁহার "বাদন্যায়"গ্রন্থে পরে উদ্দ্যোতকরের মত খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন—"অত্র চ ভাষ্যকার-মতং দূষয়িত্বা বার্ত্তিককারো যং স্থিতপক্ষ মাহ তত্রৈবং ক্রমঃ।" উক্ত সন্দর্ভে কথিত "বার্ত্তিককার" উদ্দ্যোতকর

"বাসবদত্তা" কাব্যের ঐরূপ প্রশংসা করিয়াছেন, সেই বাসবদত্তা কাব্যের রচয়িতা কবি সুবন্ধু যে বাণভট্টের পূর্ব্বেই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু সেই সুবন্ধুও তাঁহার "বাসবদত্তা" কাব্যে কোন স্থলে বলিয়াছেন—"ন্যায়স্থিতিমিব উদ্দ্যোতকরস্বরূপাং।" ইহার দ্বারা বুঝা যায়, উদ্দ্যোতকর উক্ত সুবন্ধুরও পূর্ব্বে ন্যায়মত-স্থাপক আচার্য্য বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ফলকথা, উদ্দ্যোতকর যে, সপ্তম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন,—এইমত কোনরূপেই গ্রহণ করিতে পারি না। বৌদ্ধাচার্য্য বসুবন্ধুর সময় চতুর্থ শতাব্দী হইলেও উদ্দ্যোতকর পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে "বার্ত্তিক" রচনা করিতে পারেন।

বাচস্পতি মিশ্র ও উদয়নাচার্য্য

বাচস্পতি মিশ্রের "ন্যায়সূচীনিবন্ধে"র শেষে লিখিত শ্লোকে পাওয়া যায়, "শ্রীবাচস্পতি মিশ্রেণ বস্বঙ্ক-বসু-বৎসরে॥" (বসু—৮। অঙ্ক—৯। বসু—৮, = ৮৯৮ বৎসর। পূর্ব্বে অনেকে উক্ত "বৎসর" শব্দের দ্বারা শকাব্দ গ্রহণ করিয়া ৮৯৮ শকাব্দ (৯৭৬ খৃঃ) "ন্যায়-সূচী-নিবন্ধ" রচনার কাল বলিয়াছেন। কিন্তু উক্ত শ্লোকে "শক শব্দের প্রয়োগ না হওয়ায় উক্ত "বৎসব" শব্দের দ্বারা সংবৎই বুঝা যায়। পরন্তু উক্ত "বৎসর" শব্দের দ্বারা শকাব্দ গ্রহণ করিলে বাচস্পতি মিশ্র উদয়নাচার্য্যের সমসাময়িক, ইহা বলিতে হয়। কারণ উদয়নাচার্য্যের "লক্ষণাবলী" গ্রন্থের শেষে লিখিত শ্লোকে পাওয়া যায়,—"তর্কাম্বরাঙ্ক-প্রমিতে ষতীতেষু শকান্ততঃ।" (তর্ক—৬। অম্বর—০। অঙ্ক—৯।) উক্ত শ্লোকে "শক" শব্দের প্রয়োগ হওয়ায় উহার দ্বারা বুঝা যায় যে, ৯০৬ শকাব্দ অতীত হইলেই (৯৮৪ খৃঃ) উদয়নাচার্য্য "লক্ষণাবলী" রচনা করেন। বস্তুতঃ বাচস্পতি মিশ্রের "তাৎপর্য্যটীকার" টীকাকার উদয়নাচার্য্যের সময় দশম শতাব্দী, এ বিষয়ে বিবাদের কারণ নাই।

উদয়নাচার্য্যের "কুসুমাঞ্জলি"র প্রাচীন টীকাকার বরদরাজ তাঁহার টীকায় শ্রীহর্ষের প্রতিবাদের কোন সমালোচনা না করায় বুঝা যায়,—তিনি শ্রীহর্ষের পূর্ব্বে একাদশ শতাব্দীতে ঐ টীকা রচনা করিয়াছেন। আরও অনেক কারণে উদয়নাচার্য্যের সময় দশম শতাব্দী, ইহা বুঝা যায়।

কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র যে, উদয়নাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহা উদয়নাচার্য্যের নিজের কথার দ্বারাও বুঝা যায়। কারণ, উদয়নাচার্য্য বাচস্পতি মিশ্রের "তাৎপর্য্য-টীকা"র "তাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধি" টীকার প্রারম্ভে "মাতঃ সরস্বতি" ইত্যাদি শ্লোকে ৺সরস্বতী মাতার নিকটে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে বলিয়াছেন—"বাক্ চেতসো র্মম পুনর্ভব সাবধানা বাচস্পতে র্ব্বচসি ন স্খলতো যথৈতে ॥" অর্থাৎ বাচস্পতির বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যায় আমার বাক্য ও চিত্ত সেইরূপ সাবধানা হউন্, যাহাতে আমার বাক্য ও চিত্ত বাচস্পতির বাক্যে স্খলিত না হয়। উদয়নাচার্য্যের এই প্রার্থনার দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি বাচস্পতি মিশ্রের নিকটে তাঁহার তাৎপর্য্য বিষয়ে উপদেশ লাভ করিতে পারেন নাই। আর তিনি উক্ত শ্লোকে "বাচস্পতে র্ব্বচসি" এইরূপ উক্তির দ্বারা বাচস্পতি মিশ্রকে বৃহস্পতি বলিয়া ব্যক্ত করিলেও তাঁহাকে নিজের গুরু বলেন নাই। তাঁহার আরও অনেক কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি ত্রিলোচন ও তাঁহার শিষ্য বাচস্পতি মিশ্রের অন্তর্দ্ধানের পরে মিথিলায় ন্যায়াদি শাস্ত্রের সাধনা করিয়াছেন। সুতরাং বাচস্পতি মিশ্রের "ন্যায়সূচীনিবন্ধ" রচনার কাল **বস্বঙ্ক বসু-বৎসর** ৮৯৮ শকাব্দ (৯৭৬ খৃঃ) নহে, কিন্তু ৮৯৮ বৈক্রম সংবৎ (৮৪১ খৃঃ) ইহাই আমরা বুঝিয়াছি।

বাচস্পতি মিশ্র ও জয়ন্ত ভট্ট

জয়ন্ত ভট্টের পুত্র অভিনন্দ "কাদম্বরী-কথাসার" রচনা করিতে প্রথমে নিজবংশপরিচয়-বর্ণনে লিখিয়াছেন—"শক্তি র্নামাহভবদ্ গৌড়ো ভারদ্বাজ-কুলে দ্বিজঃ।" জয়ন্ত ভট্টের পূর্ব্বপুরুষ যে, গৌড়দেশীয় ব্রাহ্মণ, ইহাই ব্যক্ত করিতে উক্ত শ্লোকে অভিনন্দ, গৌড় শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন—ইহাই আমরা বুঝি। তাই জয়ন্ত ভট্টের পুত্র "কাদম্বরী কথাসার"-রচয়িতা কাশ্মীরবাসী অভিনন্দই গৌড় অভিনন্দ নামে কথিত হইয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে "গৌড়" শব্দ প্রয়োগের বিশেষ প্রয়োজন কি, ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক। আমরা অন্য কোন প্রয়োজন বুঝিতে পারি না।

জয়ন্ত ভট্টের প্রপিতামহ শক্তি স্বামী অষ্টম শতাব্দীতে মুক্তাপীড় ললিতাদিত্যের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার পুত্র কল্যাণ স্বামী মহাযাজ্ঞিক পণ্ডিত ছিলেন। জয়ন্ত ভট্ট "ন্যায়-মঞ্জরী" গ্রন্থে বেদের প্রামাণ্য সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, আমার পিতামহই বেদোক্ত "সাংগ্রহণী" নামক যাগ করিয়া "গৌরমূলক" নামক এক গ্রাম লাভ করিয়াছিলেন। বেদোক্ত "সাংগ্রহণী" যাগের ফল গ্রাম-লাভ। কল্যাণ স্বামীর পৌত্র ও চন্দ্র পণ্ডিতের পুত্র জয়ন্ত "ন্যায়-মঞ্জরীতে" (২৭১ পৃঃ) কাশ্মীরাধিপতি শঙ্কর বর্ম্মার নাম ও তাঁহার কার্য্যবিশেষের উল্লেখ করিয়াছেন এবং পরে কোন প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"রাজ্ঞা তু গহ্বরেঽস্মিন্ অশব্দকে বন্ধনে বিনিহিতোঽহং। গ্রন্থরচনা-বিনোদাদিহ হি ময়া বাসরা গমিতাঃ॥" "(ন্যায়-মঞ্জরী প্রথম সংস্করণ ৩৯৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। উক্ত শ্লোকের দ্বারা বুঝা যায় যে, জয়ন্ত ভট্ট কোন কারণে কাশ্মীর-রাজ কর্ত্তৃক কোন নিঃশব্দ গহ্বরে বদ্ধ হইয়া সেই অবস্থায় "ন্যায়-মঞ্জরী" গ্রন্থ রচনা করেন। ঐতিহাসিকগণের মতে কাশ্মীরাধিপতি শঙ্কর বর্ম্মার রাজ্যকাল ৮৮৩ হইতে ৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

ফলকথা, কাশ্মীর-বাসী জয়ন্তভট্ট শঙ্কর বর্ম্মার রাজ্যলাভের পূর্ব্বে কারারুদ্ধ হন নাই, ইহা নিশ্চিত। সুতরাং তিনি বাচস্পতি মিশ্রের "তাৎপর্য্যটীকা"-রচনার পরেই "ন্যায়-মঞ্জরী" রচনা করিয়াছেন।

কিন্তু এখানে বলা আবশ্যক যে, জয়ন্ত ভট্ট "ন্যায়মঞ্জরী"তে বাচস্পতি মিশ্রের কোন কথার উল্লেখ করেন নাই।* তিনি গৌতমের প্রত্যক্ষ-সূত্রের ব্যাখ্যায় নানা মতের উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করিলেও বাচস্পতি মিশ্র "তাৎপর্য্যটীকায়" ত্রিলোচন গুরুর মতানুসারে যেরূপ নূতন ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার কোন উল্লেখই করেন নাই। তিনি সেই ব্যাখ্যা জানিলে প্রাচীন ব্যাখ্যার সমর্থন করিতে ত্রিলোচনের সেই ব্যাখ্যার সমালোচনা অবশ্য করিতেন। পরে জৈন নৈয়ায়িক হেমচন্দ্র সেই নূতন ব্যাখ্যার সমালোচনা করিতে **প্রমাণমীমাংসা**

---

* প্রথম প্রকাশিত "ন্যায়মঞ্জরী" গ্রন্থের ভূমিকায় উদ্ধৃত "জাতঞ্চ" ইত্যাদি "তাৎপর্য্যটীকা"র কথা প্রথমে "ন্যায়বার্ত্তিকে" ২।১।৩৩ (২৩৬ পৃঃ) উদ্দ্যোতকরই বলিয়াছেন। পরে প্রকাশিত "ন্যায়মঞ্জরী" গ্রন্থে (৬২ পৃঃ) জয়ন্তভট্টোক্ত আচার্য্যমত যে, বাচস্পতি মিশ্রের মত, ইহা বুঝাইতে সম্পাদক নিম্নে "তাৎপর্য্যটীকা"র কোন সন্দর্ভও উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু বুঝা আবশ্যক যে, উক্ত রূপ আচার্য্যমত বাচস্পতি মিশ্রের মত হইতে পারে না। কারণ, তিনি জয়ন্ত ভট্টের ন্যায় সামগ্রার করণত্ববাদী নহেন; কিন্তু উক্ত স্থলে জয়ন্ত ভট্ট সেই আচার্য্য মতের প্রকাশ করিতে লিখিয়াছেন,—"ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষাদি-সামগ্রীস্বভাবস্য প্রত্যক্ষপ্রমাণস্য।।" পরন্তু আমরা বুঝিয়াছি, জয়ন্ত ভট্ট বাচস্পতি মিশ্রের "তত্ত্ব-কৌমুদী" এবং "সাংখ্যকারিকা"র মাঠর বৃত্তিও দেখিতে পান নাই। তাই তিনি পরে (১০৯ পৃঃ) "ঈশ্বর কৃষ্ণস্তু" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা ঈশ্বর কৃষ্ণের প্রত্যক্ষ-লক্ষণে অনুমানাদিতে অতি ব্যাপ্তি দোষ বলিয়াছেন। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র অথবা মাঠরের ব্যাখ্যা দেখিলে সহসা তিনি ঐ দোষ বলিতে পারিতেন না। তিনি সেখানে যে রাজার ব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন—তিনি অষ্টম শতাব্দীর রণরঙ্গমল্ল ভোজরাজ, ইহাই আমরা বুঝি। মৎসম্পাদিত ন্যায়দর্শনের (দ্বিতীয় সং ১০৭ ও ১১৯) পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

গ্রন্থে (৩৬ পৃঃ) বলিয়াছেন—"অত্র চ পূর্ব্বাচার্য্য-কৃতব্যাখ্যা-বৈমুখ্যেন সংখ্যাবদ্ভি 'ত্রিলোচনগুরু-বাচস্পতিপ্রমুখৈ রয়মর্থঃ সমর্থিতো যথা" ইত্যাদি। হেমচন্দ্র ঐ গ্রন্থে জয়ন্ত ভট্টের কথাও বলিয়াছেন। ত্রিলোচন ও জয়ন্ত ভট্ট একই ব্যক্তি কিনা, এইরূপ সংশয় একেবারেই অমূলক। বৌদ্ধাচার্য্য রত্নকীর্ত্তি "অপোহসিদ্ধি" গ্রন্থে ত্রিলোচনের মতেরও খণ্ডন করায় বুঝা যায়, ত্রিলোচনও অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়া ছিলেন। তিনি বাচস্পতি মিশ্রের উপযুক্ত গুরু।

কেহ কেহ এইরূপ একটি নূতন সিদ্ধান্তও সমর্থন করিতেছেন যে, জয়ন্ত ভট্ট মীমাংসাশাস্ত্রে বাচস্পতি মিশ্রের গুরু ছিলেন। কারণ, বাচস্পতি মিশ্র মণ্ডন মিশ্রকৃত "বিধিবিবেকে"র টীকা **ন্যায়কণিকার** প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ শ্লোকে গুরু নমস্কার করিতে বলিয়াছেন— "ন্যায়মঞ্জরীং....প্রসবিত্রে....বিদ্যাতরবে নমো গুরবে।" জয়ন্ত ভট্টই "ন্যায়মঞ্জরী"কার ; কিন্তু বাচস্পতি মিশ্রের উক্ত শ্লোকে "ন্যায়মঞ্জরী" শব্দের দ্বারা যে জয়ন্ত ভট্ট-কৃত "ন্যায়মঞ্জরী" গ্রন্থই বুঝিতে হইবে, এ বিষয়ে কি প্রমাণ আছে? মীমাংসাশাস্ত্রোক্ত 'ন্যায়'ও **ন্যায়** শব্দের একটি প্রসিদ্ধ অর্থ। সেই ন্যায়ের ব্যাখ্যার জন্য পরে যেমন **ন্যায়-মালা** প্রভৃতি নামে গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তদ্রূপ, বাচস্পতি মিশ্রের স্বদেশীয় সেই মীমাংসাগুরু যে, মীমাংসাশাস্ত্রে **ন্যায়মঞ্জরী** নামে গ্রন্থ রচনা করেন নাই, এ বিষয়েও কোন প্রমাণই নাই। সুতরাং যে হেতু কোন প্রমাণসিদ্ধ নহে, তদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সিদ্ধ হইতে পারে না। আর বাচস্পতি মিশ্রের উক্ত শ্লোকে "ন্যায়মঞ্জরী" শব্দের দ্বারা কি গ্রন্থ বিশেষই তাঁহার বিবক্ষিত? তিনি উক্ত শ্লোকে তাঁহার গুরুকে 'বিদ্যাতরু' কেন বলিয়াছেন এবং সেই তরু হইতে উদ্ভূত 'মঞ্জরী' কিরূপ, ইহাও বুঝিতে হইবে।

পরন্তু বাচস্পতি মিশ্র তৎকালে মগধ দেশে মীমাংসা শাস্ত্রের গুরু না পাইয়া, কাশ্মীরে গেলে তিনি বেদান্ত শাস্ত্র কোথায় গিয়া পড়িয়াছিলেন, ইহাও বলা আবশ্যক। তিনি যাঁহার নিকটে উত্তরমীমাংসা পড়িয়াছিলেন, তাঁহারই নিকটে যে, পূর্ব্বমীমাংসাও পড়েন নাই, এবিষয়ে কি প্রমাণ আছে? পরন্তু বাচস্পতি মিশ্র "তাৎপর্য্যটীকা"-রচনা কালে জয়ন্ত ভট্টের "ন্যায়মঞ্জরী" গ্রন্থ না পাইলেও তিনি তৎপূর্ব্বে জয়ন্ত ভট্টের নিকটে অধ্যয়ন করিলে তাঁহার মুখে তাঁহার অনেক বিশিষ্ট মত অবশ্যই শুনিতে পাইতেন এবং "তাৎপর্য্যটীকা"তেও সেই সমস্ত মতের উল্লেখ ও আলোচনা করিতেন। কিন্তু তিনি "তাৎপর্য্য-টীকা" বা অন্য গ্রন্থেও জয়ন্ত ভট্টের বিশিষ্ট মতের কোন আলোচনা করেন নাই। তিনি "তাৎপর্য্যটীকা"য় গৌতমের প্রত্যক্ষ সূত্র-ব্যাখ্যায় তাঁহার গুরু ত্রিলোচনের মতেরই ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছেন—"অস্মাভিস্তু—"ত্রিলোচনগুরূন্নীত মার্গানুগমনোন্মুখৈঃ" ইত্যাদি। বস্তুতঃ জয়ন্ত ভট্টের অধ্যাপনাকালের পূর্ব্বেই বাচস্পতি মিশ্র গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তিনি "তাৎপর্য্যটীকা"-রচনার সময়েই সমস্ত ন্যায়সূত্র উদ্ধৃত করিয়া "বস্বঙ্ক-বসুবৎসরে" অর্থাৎ ৮৯৮ সংবতে (৮৪১ খৃঃ) "ন্যায়সূচীনিবন্ধ" রচনা করিয়াছেন। আর জয়ন্ত ভট্ট ৮৮৩ খৃষ্টাব্দের পরে কাশ্মীরে কারারুদ্ধ হইয়া "ন্যায় মঞ্জরী" রচনা করিয়াছেন।

এখন এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও সংক্ষেপে বক্তব্য এই যে, কিছুদিন হইতে অনেকে জয়ন্ত ভট্টের বড় উদারতার ঘোষণা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার সেই উদারতা কি রূপ? তিনি কি, জাতিভেদ বা চণ্ডালাদি স্পর্শ-দোষ মানিতেন না? নবপ্রকাশিত "ন্যায়মঞ্জরী"র ভূমিকায় ব্যক্ত করিয়া লিখিত হইয়াছে—"বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার গুরু জয়ন্তের মত উদার মতাবলম্বী ছিলেন না। ইনি বৌদ্ধ-জৈন-নিন্দায়-মুখর" ইত্যাদি। কিন্তু জয়ন্ত ভট্ট বৌদ্ধাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্যবিষয়ে

পরে মতান্তরের উল্লেখ করিলেও তিনি নিজ মত স্পষ্ট বলিয়াছেন— "যে তু সৌগত-সংসার-মোচকাগমাঃ পাপকাচারোপদেশিনঃ কস্তেষু প্রামাণ্য মার্যোহনুমোদতে। বুদ্ধশাস্ত্রেহি বিস্পষ্টা দৃশ্যতে বেদ-বাহ্যতা" ইত্যাদি। পরে জয়ন্ত ভট্টও বৌদ্ধ প্রভৃতিকে 'দুরাত্মা' বলিয়া লিখিয়াছেন—"তথাচ ব্রতে বৌদ্ধাদয়োহপি দুরাত্মানো বেদপ্রামাণ্য-নিয়মিতা এব চণ্ডালাদি-স্পর্শং পরিহরন্তি" ইত্যাদি। ("ন্যায়মঞ্জরী" প্রথম সং ২৬৫-৬৬ পৃঃ)। আরও অনেক স্থলে জয়ন্ত ভট্টের অনেক কথা বুঝিলে তাঁহার উদার মত কিরূপ, তাহা বুঝা যাইবে।

নব্যনৈয়ায়িক ও ন্যায়সূত্রের নব্য ব্যাখ্যাকার

গঙ্গেশ উপাধ্যায় মিথিলার মঙ্গলবনী (মঙ্গলৌনী) গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়া "তত্ত্ব-চিন্তামণি" গ্রন্থ রচনার দ্বারা নব্যনৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করেন। পরে তাঁহার পুত্র বর্দ্ধমান উপাধ্যায় এবং তৎপুত্র যজ্ঞপতি ও তৎপুত্র নরহরি "তত্ত্ব-চিন্তামণি"র টীকাদি-রচনা ও অধ্যাপনার দ্বারা নব্য নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের সুপ্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাদিগের-সম্প্রদায়-ক্রমে পরে পঞ্চদশ শতাব্দীতে বহু বিখ্যাত অসাধারণ নব্যনৈয়ায়িকের অভ্যুদয় হয়। * গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের "উপমান চিন্তামণি" গ্রন্থে "জরন্নৈয়ায়িকা জয়ন্তভট্ট প্রভৃতয়ঃ" এরূপ পাঠানুসারে বুঝা যায় যে, তিনি জয়ন্ত ভট্টকেও "জরন্নৈয়ায়িক" অর্থাৎ প্রাচীন

* পক্ষধর মিশ্র যজ্ঞপতির গৃহের "তত্ত্ব-চিন্তামণি"র পুথি দেখিতে পান নাই ইহা বুঝিয়া পূর্ব্বে (১৮ শ পৃঃ) লিখিয়াছি যে, পক্ষধর মিশ্র পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে যজ্ঞপতির সমকালীন নহেন। যজ্ঞপতির সময় চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইলে তাঁহার পিতামহ ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে "তত্ত্ব-চিন্তামণি" রচনা করেন, ইহাই আমার ধারণা। এবিষয়ে আরও অনেক বক্তব্য ও বিচার্য্য আছে।

নৈয়ায়িক বলিয়াছেন। বস্তুতঃ গঙ্গেশের পূর্ব্ববর্ত্তী উদয়নাচার্য্য ও তৎ-পূর্ব্ববর্ত্তী জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতিই প্রাচীন নৈয়ায়িক বলিয়া কথিত হইয়াছেন। জয়ন্ত ভট্ট বহু প্রাচীনমতের ব্যাখ্যা ও তদনুসারে ন্যায়সূত্রেরও ব্যাখ্যা করায় ঐ তাৎপর্য্যেও গঙ্গেশ তাঁহাকে প্রাচীন নৈয়ায়িক বলিতে পারেন। কিন্তু জয়ন্ত ভট্ট ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের মতেরই অনুরাগী সমর্থক, এইরূপ মন্তব্য সত্য নহে। জয়ন্ত ভট্ট বহুস্থলে ভাষ্যকারের মত ও ব্যাখ্যা গ্রহণ না করিয়া অন্যরূপ ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। যাহা হউক, মূলকথা, গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের "তত্ত্ব-চিন্তামণি"র অধ্যাপক গণই **নব্যনৈয়ায়িক** বলিয়া কথিত হইয়াছেন। "কেবলান্বয়ি-দীধিতি"র টীকার শেষে "অত্র বদন্তি" কল্পের ব্যাখ্যারম্ভে জগদীশ তর্কালঙ্কারও লিখিয়াছেন—"শঙ্কেয়ং নব্যনৈয়ায়িকানাং।"

অভিজ্ঞ বাঙ্গালীর লিখিত **সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস** পুস্তকেও (২৯৫ পৃঃ) লিখিত হইয়াছে—"গঙ্গেশের পরবর্ত্তী নৈয়ায়িক আচার্য্য-গণ কেবল 'ব্যাপ্তিবাদ' ও অনুমান খণ্ড লইয়াই বিব্রত রহিলেন কিন্তু ঈশ্বর ও আত্মা ও উভয়ের সম্বন্ধ তাহাদের দৃষ্টি পথ অতিক্রম করিয়া নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইল। কুসুমাঞ্জলির সেশ্বর ন্যায়শাস্ত্র কেবলমাত্র শুষ্ক তর্ক শাস্ত্রে পরিণত হইল।" এই সমস্ত কথা কোন সাহেবের কথার অনুবাদ কিনা, ইহা জানিনা। কিন্তু পরবর্ত্তী নব্যনৈয়ায়িকগণও যে, অধ্যাত্মশাস্ত্র ও অন্যান্য নানা শাস্ত্রের কিরূপ চর্চ্চা করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহাদিগের নানা গ্রন্থ পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে। নানা দেশে মুদ্রিত বহু সংস্কৃত পুস্তকের তালিকা পাঠ করিলেও নব্য নৈয়ায়িকগণের নানা গ্রন্থের সংবাদ জানা যাইবে। গৌড়াচার্য্য নব্য নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্ব্বভৌমও বেদান্ত গ্রন্থ "অদ্বৈত মকরন্দে"র টীকা করিয়া ছিলেন এবং তাঁহার

পিতা নরহরি বিশারদ "বেদান্তবিদ্যাময়" ছিলেন। * উক্ত বাসুদেব সার্ব্বভৌমের পৌত্র স্বপ্নেশ্বর **শাণ্ডিল্যসূত্র-ভাষ্যকার**। তিনি "সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী"র **প্রভা** নামে টীকা এবং ন্যায়শাস্ত্রে **ন্যায়তত্ত্ব-নিকষ** নামে এবং বেদান্ত শাস্ত্রেও **বেদান্ততত্ত্ব-নিকষ** নামে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি শাণ্ডিল্যসূত্র-ভাষ্যে কোন স্থলে লিখিয়াছেন—"প্রমাণ-বিচারোঽস্মাভি "ন্যায়তত্ত্ব-নিকষে" "বেদান্ত তত্ত্ব-নিকষে"চ নিরূপিত ইতি নেহ প্রতন্যতে।" (মহেশ পাল সং ১০৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ফলকথা, নবদ্বীপে নব্যন্যায়ের প্রতিষ্ঠার পরে বাঙ্গালী নৈয়ায়িকগণ সাংখ্যবেদান্তাদি শাস্ত্র জানিতেন না, তাঁহারা কেবল নব্যন্যায়ের অনুমান খণ্ড লইয়াই বিব্রত থাকিতেন—এইরূপ মন্তব্যও নিতান্ত অসত্য। নবদ্বীপে স্মার্ত্ত রঘুনন্দনও সাংখ্য-বেদান্তাদি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, ইহা তাঁহার "মলমাসতত্ত্বা"দি অনেক গ্রন্থ পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে।

নব্য নৈয়ায়িকগণের মধ্যে প্রথমে গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের পুত্র বর্দ্ধমান উপাধ্যায় উদয়নাচার্য্য-কৃত "কুসুমাঞ্জলি" প্রভৃতি অনেক গ্রন্থেরও

---

* "নবদ্বীপমহিমা" পুস্তকে (দ্বিতীয় সং—১৫৭ পৃঃ) লিখিত হইয়াছে যে, দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশের পিতা গাঙ্গবংশীয় (গঙ্গোপাধ্যায়) দ্বিতীয় বাসুদেব সার্ব্বভৌম "অদ্বৈতমকরন্দের" টীকা করেন। কিন্তু উক্ত লেখক সেই টীকার শেষে টীকাকার বাসুদেব সার্ব্বভৌমের "শ্রীবন্দ্যান্বয়" ইত্যাদি শ্লোক জানিলে ঐরূপ অসত্য লিখিতেন না। পূর্ব্বে (৮ম পৃঃ) সেই শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত করিয়াছি। উক্ত বাসুদেব সার্ব্বভৌম সুপ্রসিদ্ধ আবিগুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ নরহরি বিশারদের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জনেশ্বর বা জলেশ্বর বাহিনীপতি মহাপাত্র। কনিষ্ঠপুত্র চন্দনেশ্বর। জনেশ্বর বা জলেশ্বরের পুত্র স্বপ্নেশ্বর 'শাণ্ডিল্যসূত্র-ভাষ্য শেষে আত্ম-পরিচয় বর্ণন করিতে লিখিয়া গিয়াছেন—"গৌড়ক্ষ্মাবলয়ে বিশারদ ইতি খ্যাতা দভূদ্ ভূমণেঃ" ইত্যাদি। এবিষয়ে অন্যান্য কথা I. H. Q. Vol XVI. P. 58 69 শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য

"প্রকাশ" নামে অত্যুৎকৃষ্ট টীকা করিয়াছেন এবং তাহাতে তিনি বিশেষ করিয়া প্রাচীন ন্যায়-বৈশেষিকমতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তন্মধ্যে উদয়নাচার্য্য-কৃত "তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি" টীকার "প্রকাশ" টীকা **ন্যায়নিবন্ধপ্রকাশ** নামে প্রসিদ্ধ হয়। পদ্মনাথ মিশ্র উহার "বর্দ্ধমানেন্দু" নামে টীকা করেন। উহার শঙ্কর মিশ্র-কৃত টীকা "ন্যায়তাৎপর্য্যমণ্ডন।" উদয়নাচার্য্য-কৃত "প্রবোধসিদ্ধি" বা "ন্যায়-পরিশিষ্ট" গ্রন্থের "প্রকাশ" টীকাই **পরিশিষ্ট-প্রকাশ** নামে প্রসিদ্ধ হয়। উক্ত টীকায় বর্দ্ধমান উপাধ্যায় ন্যায়দর্শনের পঞ্চম অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় অনেক বিচার করিয়াছেন। পূর্ব্বে ঐ টীকা নৈয়ায়িক-সমাজে বিশেষ মান্য ও আলোচ্য ছিল। পক্ষধর মিশ্রও উক্ত বর্দ্ধমানের প্রতি গুরুবৎ সম্মান প্রকাশ করিয়া তাঁহার "আলোক" টীকায় বলিয়াছেন—"যত্তু পরিশিষ্ট-প্রকাশে মহামহোপাধ্যায়-চরণাঃ।" (সোসাইটি সং ৬৭৪ পৃঃ)। পরে মিথিলার গোকুল নাথ উপাধ্যায়ও তাঁহার "অমৃতোদয়" নাটকের তৃতীয় অঙ্কে লিখিয়াছেন—"এষ পরিশিষ্ট-প্রকাশকৃদ্ বুধোবর্দ্ধমানঃ।" উক্ত "পরিশিষ্টপ্রকাশ"-সহিত "ন্যায়পরিশিষ্ট" গ্রন্থ পরে কলিকাতা সংস্কৃত গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত বর্দ্ধমান উপাধ্যায় স্বতন্ত্রভাবে ন্যায়সূত্রের **অন্বীক্ষানয়তত্ত্ববোধ** নামে টীকাও রচনা করেন। তাঁহার পরে পঞ্চদশ শতাব্দীতে মিথিলার দ্বিতীয় বাচস্পতি মিশ্র আরও বিশেষ বিচার করিয়া **ন্যায়তত্ত্বালোক** নামে নূতন টীকা করেন। তাঁহার **ন্যায়সূত্রোদ্ধার** নামক গ্রন্থও আছে। তাহাতে সমগ্র ন্যায়সূত্রের সংখ্যা—৫৩১। প্রাচীন বাচস্পতি মিশ্রের **ন্যায়সূচীনিবন্ধে** সূত্র-সংখ্যা—৫২৮। ৺কাশীধামে মহাদেব বেদান্তীর **মিতভাষিণী** নামে ন্যায়সূত্র-বৃত্তি আছে। বাঙ্গালী মহাদেব ভট্টাচার্য্যই মহাদেব বেদান্তী, ইহা আমরা শুনিয়াছি। ষোড়শ শতাব্দীতে নবদ্বীপে রামভদ্র সার্ব্বভৌম **ন্যায়রহস্য** রচনা করেন।

তিনি জানকীনাথ "চূড়ামণি"র পুত্র *এবং জগদীশ তর্কালঙ্কারের গুরু, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

রামভদ্র সার্ব্বভৌমের পরে বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন **ন্যায়সূত্র-বৃত্তি** রচনা করেন। তিনি নানাগ্রন্থকার বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য্যের পুত্র ও নানাগ্রন্থকার রুদ্রনাথ ন্যায়বাচস্পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বিশ্বনাথের "ন্যায়সূত্রবৃত্তি"র শেষে লিখিত "রস-বাণ-তিথৌ শকেন্দ্রকালে" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি ১৫৫৬ শকাব্দে (১৬৩৪ খৃঃ) বৃন্দাবনে 'ন্যায়সূত্র-বৃত্তি" রচনা করেন। কোন কোন পুঁথিতে উক্ত শ্লোকে "রস-বার-তিথৌ" এইরূপ পাঠ আছে। (তিথি—১৫। বার—৭। রস—৬)। উক্ত পাঠানুসারে বুঝা যায় যে, বিশ্বনাথ ১৫৭৬ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে "ন্যায়সূত্র-বৃত্তি" রচনা করেন। কিন্তু আমার ধারণা এই যে, বিশ্বনাথ ঐ সময় পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন না, অথবা তখন তিনি অতিবৃদ্ধ। কারণ, সনাতন গোস্বামীর অধ্যাপক বিদ্যাবাচস্পতি শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের (১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের) পূর্ব্ব হইতে নবদ্বীপে অধ্যাপনা করিয়াছেন। তাঁহার পৌত্র বিশ্বনাথের জন্ম ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে

---

* রামভদ্র সার্ব্বভৌমকৃত 'কুসুমাঞ্জলি' টীকার পুঁথিতে প্রথমে "ভবানী-ভবনাথাভ্যাং পিতৃভ্যাং প্রণমাম্যহং" ইত্যাদি শ্লোক দেখা যায়। কিন্তু উক্ত রামভদ্র ভবনাথের পুত্র নহেন। মিথিলার শঙ্কর মিশ্রের পিতার নাম ভবনাথ ও তাঁহার মাতার নাম ভবানী, ইহা তিনি নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন। এবং তাঁহার রচিত "কুসুমাঞ্জলি"র "আমোদ" টীকার প্রারম্ভে "ভবানী-ভবনাথাভ্যাং" ইত্যাদি শ্লোক আছে। এবিষয়ে অনেকে অনেক রূপ কল্পনা করেন। কিন্তু আমি ৺কাশীধামে বাঙ্গালী পণ্ডিত ৺হরিহর শাস্ত্রীর গৃহে উক্ত রামভদ্রী টীকার প্রাচীন পুঁথিতে প্রথম হইতে কয়েক পত্রের পরে গ্রন্থ-মধ্যেই লিখিত দেখিয়াছি—"এতৎ পর্য্যন্তং শঙ্কর মিশ্র-কৃতং, ততঃ সার্ব্বভৌমীয়ং।" সুতরাং বুঝা যায় যে, প্রথমে কোন লেখক শঙ্কর মিশ্রকৃত উক্ত টীকার প্রাপ্ত অংশ লিখিয়া পরে রামভদ্রী টীকা লিখিয়াছিলেন। তিনি ও রামভদ্রী টীকার প্রথম অংশ পান নাই।

হইলেও ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বয়স ৯৪ বৎসর হয়। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে "রস-বাণ-তিথৌ" এইরূপ পাঠই আমি প্রকৃত মনে করি।

পরন্তু বিশ্বনাথের পিতা সুদীর্ঘজীবী বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য্য পরে ৺কাশীবাসী হইয়াছিলেন এবং বিশ্বনাথও তখন তাঁহার নিকটে ছিলেন, ইহা আমরা বুঝিতে পারি। সেই সময়ে মহারাষ্ট্র দেশীয় কোন ব্রাহ্মণ-সমাজের সম্বন্ধে কোন এক ব্যবস্থা পত্রে বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য্যেরও নাম-স্বাক্ষর আছে। ষোড়শ শতাব্দীর চতুর্থ পাদে বাদসাহ আকবরের সময়ে দিল্লীতে আহূত ভারতীয় পণ্ডিতগণের মহাসভায় উপস্থিত হইয়া বিদ্যা নিবাস ভট্টাচার্য্য সুপ্রসিদ্ধ দাক্ষিণাত্য মীমাংসক নারায়ণ ভট্টের সহিত বিচার করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রীয় কোন কোন বিষয়ে বঙ্গদেশের মতের সমর্থন করেন। পরে মাংসশ্রাদ্ধ ও মৎস্য-মাংস ভক্ষণ-বিষয়ে দাক্ষিণাত্য পণ্ডিত গণের সহিত তাঁহার গুরুতর বিবাদ উপস্থিত হইলে তাঁহার উপদেশানুসারে তৎপুত্র বিশ্বনাথ বঙ্গদেশীয় আচারের শাস্ত্রীয়ত্ব প্রতিপন্ন করিতে **মাংসতত্ত্ব-বিবেক** নামে গ্রন্থ রচনা করেন। ৺কাশীর সরস্বতী ভবন হইতে ঐ গ্রন্থও প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থের শেষে দাক্ষিণাত্য পণ্ডিত দিগের প্রতি বিশ্বনাথের কটূক্তি বুঝিলে তখন তাঁহাদিগের সহিত বিবাদ যে, কিরূপ গুরুতর হইয়াছিল, ইহা বুঝা যাইবে। *

বিশ্বনাথের পিতা বিদ্যানিবাস ভটাচার্য্যই প্রথমে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের টীকা করিয়া নবদ্বীপাদি দেশে ঐ ব্যাকরণ প্রচলিত করেন। অসাধারণ পণ্ডিত বিদ্যা নিবাসের ব্যাকরণ শাস্ত্রে এক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত

---

* "মাংসতত্ত্ব-বিবেকে"র সর্ব্বশেষে বিশ্বনাথ লিখিয়াছেন—"ব্রহ্মাবর্ত্ত-ব্রহ্মর্ষি-দেশ-মধ্যদেশা-র্য্যাবর্ত্তেষু মাংসভক্ষণাচার আজানিকোঽবিগীতঃ প্রতীয়ত এব। যেতু কলি-বর্জ্জ্যতয়া মাংসশ্রাদ্ধে বিবদন্তে, 'স্তেয়াস্তমহাপাতক-নিষ্কৃতি'রিতি কলিবর্জ্জ্যতয়োক্তমপি ব্রহ্মহত্যা-তৎসংসর্গ-প্রায়শ্চিত্তং ধনলোভাদুপদিশন্তি, মাতৃসপিণ্ডানয়নে চ ন বিবদন্তে, রাগদ্বেষদূষিতচেতসোদেবানাং প্রিয়া স্তে কেন শিক্ষণীয়া ইত্যলং মাংসং বিদ্বিষদ্ভিঃ সৌগত মতানুসারিভিঃ সহ শ্রমেণেতি।"

হয়। পরে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের টীকাকার শ্রীরাম তর্কবাগীশও টীকারম্ভে লিখিয়াছেন—"কেচি দ্বিদ্যানিবাসাদ্যাঃ।" বিদ্যানিবাসের মুগ্ধবোধ-টীকা এখনও আমরা পাই নাই। কিন্তু "তত্ত্ব-চিন্তামণি"র টীকার এক পুথি আমি দেখিয়াছি। উহার প্রথমে দেখিয়াছি—"বিশারদ-তনূজস্য বিদ্যা বাচস্পতেঃ সুতঃ। বিদ্যানিবাসস্তনুতে চিন্তামণি-বিবেচনং॥" * উক্ত টীকা পাঠে বুঝা যায় যে, বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য্য নব্য ন্যায়ের "তত্ত্বচিন্তা-মণি" গ্রন্থেও অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন এবং তিনি নরহরি বিশারদের পৌত্র ও রত্নাকর বিদ্যাবাচস্পতির পুত্র। বিদ্যানিবাসের পুত্র বিশ্বনাথ "ন্যায়সূত্রবৃত্তি"তে ন্যায়ভাষ্যাদি প্রাচীন গ্রন্থের অনেক কথাও বলিয়াছেন। তাঁহার "ন্যায়সূত্রবৃত্তি" নিজ গৌরবে সর্ব্বদেশেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে শান্তিপুরের অদ্বৈত প্রভুর অতি বৃদ্ধপ্রপৌত্র † রাধামোহন গোস্বামী বিদ্যাবাচস্পতি

---

* আমি ৺কাশীধামে বাঙ্গালী পণ্ডিত ৺হরিহর শাস্ত্রীর গৃহে ঐ টীকার পুথি দেখিয়াছি। অন্যত্র উহার কোন সংবাদ পাই নাই। ঐ পুথির শেষে লিখিত আছে—"কৃষ্ণদাস ঘোষেণ লিখিতং, শকাব্দাঃ ১৫০৫॥ ঐ স্থানে "শব্দমণিপরীক্ষা" নামে অন্য এক পুথিও আমি দেখিয়াছি। (উহা বাসুদেব সার্ব্বভৌম-কৃত "মণিপরীক্ষা" টীকার কিয়দংশ, ইহাও বুঝা যায়)। উক্ত পুথির শেষে লিখিত আছে—"বিদ্যানিবাসানাং পুস্তক মিদং, ভবানন্দ নন্দিনা-কাশ্যাং লিখিতং—শকাব্দাঃ ১৫০৩। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, বিদ্যা নিবাস ঐ সময়ে (১৫৮১ খৃঃ) ৺কাশীধামেই ছিলেন। তাঁহার প্রধান লেখক কায়স্থ কবিচন্দ্র, লক্ষ্মীধরকৃত "কৃত্যকল্পতরু"র দানকাণ্ড লিখিয়া দিয়াছিলেন। ঐ পুথি এখন ইণ্ডিয়া আফিসে আছে। উহার শেষে লিখিত দ্বিতীয় শ্লোকে "ব্যোমেন্দু-শর-শীতাংশুমিতে শাকে" এই কথার দ্বারা বুঝা যায়—১৫১০ শকাব্দে (১৫৮৮ খৃঃ) ঐ পুথি লিখিত হয়। ৺কাশীবাসী বিদ্যানিবাস ঐ সময়ের পরেও জীবিত ছিলেন।

† অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে নাটোরের শক্তি-সাধক রাজা রাম কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বনাথ উক্ত রাধা মোহন গোস্বামীর নিকটেই দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব হইয়াছিলেন, ইহা জানা আবশ্যক।

বিশ্বনাথের "ন্যায়সূত্রবৃত্তি" অবলম্বন করিয়াই নবীন ভাবে **ন্যায়-সূত্র-বিবরণ** রচনা করেন। পরে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশও **গৌতমসূত্র-সন্দীপনী** নামে অভিনব টীকা রচনা করিয়াছিলেন। স্থানাভাবে নানা গ্রন্থকার উক্ত গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি নব্য মহা-নৈয়ায়িক গণের পরিচয় ও কীর্ত্তি-কথা লেখা সম্ভব হইল না।

'ন্যায়-পরিচয়'-রচনার কারণ

দশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয় 'জাতীয় শিক্ষাপরিষদ্' হইতে **প্রবোধচন্দ্র বসুমল্লিকবৃত্তি** প্রাপ্ত হইয়া উক্ত পরিষদের নিয়োগানুসারে 'ন্যায়দর্শন' সম্বন্ধে আমার কতিপয় বক্তৃতা করিতে হয়। পরে "ন্যায়-পরিচয়" নামে গ্রন্থ রচনা করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে দিলে উক্ত 'জাতীয় শিক্ষাপরিষদ্' হইতে ১৩৪০ বঙ্গাব্দে সেই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কিন্তু সেই সময়ে আমি ৺কাশীধামে থাকায় আমার সম্পূর্ণরূপে প্রুফ্ সংশোধন করা সম্ভব হয় না। এবার এই দ্বিতীয় সংস্করণে কলিকাতা যোগেন্দ্র চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক আমার ছাত্র সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ এই গ্রন্থের প্রুফ্ সংশোধন কার্য্যে আমার বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। এবার সর্ব্বত্র পূর্ব্বমুদ্রিত গ্রন্থই পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। বহু স্থলেই পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনাদি করিয়া আবার নূতন করিয়াই লিখিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা পাঠকগণের কিছু উপকার হইলেই চরিতার্থ হইব। ইতি—

বঙ্গাব্দ ১৩৪৭
২রা আশ্বিন
কলিকাতা।

শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ

সংক্ষিপ্ত বিষয় সূচী

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

প্রথম অধ্যায়ে

ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োজন-ব্যাখ্যায়-ন্যায়-দর্শনের প্রথমসূত্রোক্ত "নিঃশ্রেয়স" শব্দের অর্থ-বিচার। অভীষ্টরূপ নিঃশ্রেয়স দ্বিবিধ—দৃষ্ট ও অদৃষ্ট। নিঃশ্রেয়সমাত্রই ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োজন হইলেও অদৃষ্ট নিঃশ্রেয়স মোক্ষই ন্যায় শাস্ত্রের মুখ্য প্রয়োজন। ১—৪

দ্বিতীয় অধ্যায়ে

গৌতমোক্ত মুক্তির স্বরূপ ও তদ্বিষয়ে বিবাদ ও মতভেদের ব্যাখ্যা। আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি মাত্রই মুক্তি, এই মতের সমর্থনে ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের বিচার ও গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের কথা। গৌতমের মতে নিত্যসুখের অনুভব-বিশিষ্ট আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিই মুক্তি, এই প্রাচীন মতের সমর্থনে ভাসর্ব্বজ্ঞের কথা ও অন্যান্য কথা। ৫—১৫

তৃতীয় অধ্যায়ে

মুক্তির উপায়-বর্ণনে উপনিষদুক্ত আত্ম-দর্শন কিরূপে মুক্তির কারণ হয়—এই বিষয়ে গৌতমোক্ত যুক্তির ব্যাখ্যা। দ্বৈতবাদী গৌতমের মতে মুমুক্ষুর চরম সমাধির পরে নিজ আত্মার অলৌকিক সাক্ষাৎকার অবিদ্যার নিবৃত্তির দ্বারা মুক্তির চরম কারণ হইলেও পরমেশ্বরে পরাভক্তি বা শরণাগতি ব্যতীত কাহারও আত্ম-সাক্ষাৎকার হইতে পারে না, পরমেশ্বরের অনুগ্রহেই আত্ম-সাক্ষাৎকার জন্মে। উক্ত সিদ্ধান্তে প্রমাণ। ১৬—২২

চতুর্থ অধ্যায়ে

আত্মার শ্রবণ ও মননের এবং

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

পরে নিদিধ্যাসনের প্রয়োজন। শ্রবণ ও মননের স্বরূপ-ব্যাখ্যা। ঘ্রাণাদি বহিরিন্দ্রিয় হইতে এবং দেহ ও মন হইতে আত্মা ভিন্ন, এইরূপ মননের সাধন গৌতমোক্ত অনুমান প্রমাণরূপ নানা যুক্তির ব্যাখ্যা। ২৩—৩৮

পঞ্চম অধ্যায়ে

জীবাত্মার নিত্যত্ব ও পূর্ব্ব জন্মের সাধক গৌতমোক্ত নানা যুক্তির ব্যাখ্যা ও উহার সমর্থনে অন্যান্য কথা। ৩৯—৬৩

ষষ্ঠ অধ্যায়ে

কণাদ এবং গৌতমও অদ্বৈত বাদী, এই কথার প্রতিবাদ। আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতিও ঐরূপ কথা বলেন নাই। কণাদ ও গৌতমের সূত্রদ্বারা বিচার পূর্ব্বক তাঁহাদিগের দ্বৈতবাদিত্ব-প্রতিপাদন। ৬৫—৮১

সপ্তম অধ্যায়ে

কণাদ ও গৌতমের সম্মত "পরমাণু কারণবাদে"র ব্যাখ্যা ও যুক্তি। পরমাণু-খণ্ডনে বৌদ্ধাচার্য্য বসুবন্ধুর কারিকা ও তাহার ব্যাখ্যা। পরমাণুর অস্তিত্ব ও নিরবয়ত্ব-সমর্থনে গৌতমোক্ত যুক্তির ব্যাখ্যা। "অসৎকার্য্যবাদে"র ব্যাখ্যা ও সমর্থন। 'পরমাণুকারণ বাদে' ঈশ্বর জগতের উপাদান কারণ নহেন এবং আকাশ নিত্য। উক্ত মতের সমর্থনে ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের কথা ও বিচার। ৮২—১১৪

অষ্টম অধ্যায়ে

ন্যায়দর্শন ও বৈশেষিক দর্শনে বেদ বিরুদ্ধ অংশ পরিত্যাজ্য, এই মতের সমালোচনায় নানা কথা। কণাদ ও গৌতমের মত, তাঁহাদিগের কল্পিত নহে। দ্বৈতবাদী কণাদ ও গৌতমের মতানুসারে কতিপয় শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার দ্বারা দ্বৈত সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা। ১১৫—৩৭

নবম অধ্যায়ে

"ভগবদ্গীতা"র দ্বারাও জীবাত্মা

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

ও পরমাত্মার বাস্তবভেদরূপ দ্বৈত সিদ্ধান্তই বুঝা যায়—এই বিষয়ে দ্বৈতবাদীর কথা ও বিচার। ১৩৮—৫৩

দশম অধ্যায়ে

কণাদ ও গৌতমের সূত্র ও ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রভৃতির ব্যাখ্যানুসারে কণাদ ও গৌতমের সম্মত ঈশ্বর-তত্ত্বের ব্যাখ্যা। ১৫৪—৭২

একাদশ অধ্যায়ে

ন্যায় দর্শনোক্ত প্রমাণ পদার্থের স্বরূপব্যাখ্যা ও প্রত্যক্ষাদি চতুর্ব্বিধ প্রমাণের ব্যাখ্যা। ১৭৩—২০৩

দ্বাদশ অধ্যায়ে

বিচার পূর্ব্বক প্রমাণ পদার্থের প্রামাণ্য-স্থাপন। গৌতম-সম্মত 'পরতঃ প্রামাণ্য বাদে'র ব্যাখ্যা ও যুক্তি। গৌতম-মতে প্রমাণের চতুর্ব্বিধত্ব-সমর্থন। ২০৪—২৩

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে

বেদ প্রমাণ নহে, এই পূর্ব্ব পক্ষের স্থাপন ও খণ্ডনপূর্ব্বক বেদের প্রামাণ্য-সাধনে গৌতমোক্ত যুক্তির ব্যাখ্যা। বেদের পৌরুষেয়ত্ব ও অপৌরুষেয়ত্বাদি বিষয়ে আলোচনা। ২২৪—৪২

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে

ন্যায়দর্শনোক্ত আত্মাদি অপবর্গ পর্য্যন্ত দ্বাদশ 'প্রমেয়' পদার্থের স্বরূপ-ব্যাখ্যা ও তদ্‌বিষয়ে গৌতমের বিশিষ্ট মতের ব্যাখ্যা। ২৪৩—৭০

পঞ্চদশ অধ্যায়ে

ন্যায়দর্শনোক্ত 'সংশয়', 'প্রয়োজন', 'দৃষ্টান্ত', 'সিদ্ধান্ত', 'অবয়ব', 'তর্ক', 'নির্ণয়', 'বাদ', 'জল্প', 'বিতণ্ডা', 'হেত্বাভাস', 'ছল', 'জাতি' ও 'নিগ্রহস্থান',—এই চতুর্দ্দশ পদার্থের স্বরূপ-ব্যাখ্যা ও অন্যান্য নানা বিষয়ের আলোচনা। ২৭১—৩৪৫

ন্যায়-পরিচয়

প্রথম অধ্যায়

ন্যায়-শাস্ত্রের প্রয়োজন

সকল শাস্ত্রেরই প্রয়োজন আছে ; প্রয়োজন না বুঝিলে কোন শাস্ত্রেরই চর্চ্চায় কাহারও প্রবৃত্তি হয় না। মীমাংসাচার্য্য কুমারিল ভট্টও বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বস্যৈব হি শাস্ত্রস্য কর্ম্মণো বাপি কস্যচিৎ।
যাবৎ প্রয়োজনং নোক্তং তাবৎ তৎ কেন গৃহ্যতে ?॥"
"জ্ঞাতার্থং জ্ঞাতসম্বন্ধং শ্রোতুং শ্রোতা প্রবর্ত্ততে।
শাস্ত্রাদৌ তেন বক্তব্যঃ সম্বন্ধঃ সপ্রয়োজনঃ॥"

—শ্লোকবার্ত্তিক, ১২শ, ১৭শ শ্লোক।

অর্থাৎ সমস্ত শাস্ত্রেরই এবং যে কোন কর্ম্মেরই যে পর্য্যন্ত প্রয়োজন কথিত না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহা কেহই গ্রহণ করেন না। যে শাস্ত্রের প্রয়োজন ও সম্বন্ধ জ্ঞাত হইয়াছে, সেই শাস্ত্রই শ্রবণ করিতে শ্রোতা প্রবৃত্ত হন। অতএব কোন শাস্ত্রের প্রারম্ভে সেই শাস্ত্রের প্রয়োজন ও তাহার সহিত সেই শাস্ত্রের সম্বন্ধ বক্তব্য। এবং সেই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ও বক্তব্য। অতএব ন্যায়-শাস্ত্র-বক্তা মহর্ষি গৌতম প্রথমেই ন্যায় শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় ও প্রয়োজন ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি ন্যায়দর্শনে প্রথম সূত্র বলিয়াছেন—

প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তা-বয়ব-তর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভাস-চ্ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্ব-জ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ ॥

এই সূত্রে প্রথমে "প্রমাণ-প্রমেয়……নিগ্রহস্থানানাং" এই পদের দ্বারা প্রমাণ প্রভৃতি 'নিগ্রহ-স্থান' পর্য্যন্ত ষোড়শ প্রকার পদার্থের নাম কথিত হইয়াছে। প্রথমে প্রতিপাদ্য পদার্থের নাম-কথনকে "উদ্দেশ" বলে। উক্ত প্রমাণাদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান প্রযুক্ত নিঃশ্রেয়স লাভ হয়, ইহাই এই সূত্রের অর্থ। ইহার দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে যে, উক্ত প্রমাণাদি পদার্থ এই ন্যায় শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় এবং নিঃশ্রেয়স—ইহার প্রয়োজন। উক্ত প্রমাণাদি পদার্থের ব্যাখ্যা ও তৎসম্বন্ধে অন্যান্য কথা পরে পাওয়া যাইবে। এখন এই সূত্রোক্ত "নিঃশ্রেয়স" শব্দের অর্থ কি, ইহাই বুঝিতে হইবে।

"নিঃশ্রেয়স" শব্দের মুক্তি অর্থই প্রসিদ্ধ। কিন্তু কল্যাণ বা অভীষ্ট মাত্রও উহার দ্বারা বুঝা যায়। মহাভারতেও কল্যাণ অর্থে "নিঃশ্রেয়স" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।* পরন্তু মহর্ষি গৌতম পরে দ্বিতীয় সূত্রে এবং অন্যান্য সূত্রে মুক্তি প্রকাশ করিতে "অপবর্গ" শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন,—ইহাও লক্ষ্য করা আবশ্যক। অতএব বুঝা যায় যে, মহর্ষি এই সূত্রে "নিঃশ্রেয়স" শব্দের দ্বারা কেবল মুক্তিকে গ্রহণ করেন নাই; অন্য দৃষ্ট নিঃশ্রেয়সও গ্রহণ করিয়াছেন।

---

* কচ্চিৎ সহস্রৈর্মূর্খাণামেকং ক্রীণাসি পণ্ডিতম্।
পণ্ডিতো হ্যর্থকৃচ্ছ্রেষু কুর্য্যান্নিঃশ্রেয়সং পরম্ ॥—মহাভারত, সভা—৫।৩৫।
নিঃশ্রেয়সং কল্যাণম্।—নীলকণ্ঠ-কৃত টীকা।
সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।—গীতা, ৫।২।
"নিঃশ্রেয়সকরৌ" নিঃশ্রেয়সং মোক্ষং কুর্ব্বাতে।—শাঙ্কর ভাষ্য।

"ন্যায়বার্ত্তিক"কার উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, * নিঃশ্রেয়স দ্বিবিধ—দৃষ্ট ও অদৃষ্ট। তন্মধ্যে প্রমাণাদি পদার্থের তত্ত্ব-জ্ঞান প্রযুক্ত দৃষ্ট নিঃশ্রেয়স-লাভ হয়। কিন্তু আত্মাদি প্রমেয় পদার্থের তত্ত্ব-জ্ঞান প্রযুক্ত অদৃষ্ট নিঃশ্রেয়স-লাভ হয়। তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ নিঃশ্রেয়সের মধ্যে চরম নিঃশ্রেয়স মুক্তিই অদৃষ্ট নিঃশ্রেয়স। তদ্ভিন্ন সমস্ত নিঃশ্রেয়সই দৃষ্ট নিঃশ্রেয়স। ন্যায় দর্শনের প্রথম সূত্রে যে প্রমাণ ও প্রমেয় প্রভৃতি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্ব-জ্ঞান প্রযুক্ত নিঃশ্রেয়স-লাভ কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে আত্মা প্রভৃতি প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বসাক্ষাৎকারই মুক্তিরূপ চরম নিঃশ্রেয়স-লাভে চরম কারণ। কিন্তু সর্ব্বপ্রকার নিঃশ্রেয়স-লাভেই প্রমাণাদি পঞ্চদশ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক। তাহা হইলে ঐ প্রমাণাদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান যে, মুক্তিলাভার্থ অত্যাবশ্যক অনেক দৃষ্ট নিঃশ্রেয়স সম্পাদন করিয়া মুক্তি-লাভেরও প্রয়োজক হয়, ইহাও উদ্দ্যোতকরের ঐ কথার দ্বারা বুঝা যায়। সুতরাং উদ্দ্যোতকরও যে, গৌতমের প্রথম সূত্রোক্ত "নিঃশ্রেয়স" শব্দের দ্বারা নিঃশ্রেয়সমাত্রই গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা আমরা বুঝিতে পারি।

'তাৎপর্য্যটীকা'কার বাচস্পতি মিশ্র এই সূত্রে "নিঃশ্রেয়স" শব্দের দ্বারা চরম নিঃশ্রেয়স মুক্তিই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন এই সূত্রের ভাষ্য-শেষে ন্যায়-শাস্ত্রকে সর্ব্ব বিদ্যার প্রদীপ, সর্ব্ব কর্ম্মের উপায় ও সর্ব্ব ধর্ম্মের আশ্রয় বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন যে, বিচার পূর্ব্বক সমস্ত প্রয়োজন-সিদ্ধিতেই ন্যায়শাস্ত্র আবশ্যক। সেখানে

* নিঃশ্রেয়সং পুনর্দৃষ্টাদৃষ্টভেদাদ্ দ্বেধা ভবতি। তত্র প্রমাণাদি-পদার্থ-তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সং দৃষ্টং, নহি কশ্চিৎ পদার্থো জ্ঞায়মানো হানোপাদানোপেক্ষাবুদ্ধিনিমিত্তং ন ভবতীতি, এবঞ্চ কৃত্বা সর্ব্বে পদার্থা জ্ঞেয়তয়া উপক্ষিপ্যন্তে ইতি। পরন্তু নিঃশ্রেয়সমাত্মাদেস্তত্ত্ব-জ্ঞানাদ্ ভবতি।—ন্যায়বার্ত্তিক।

বাচস্পতি মিশ্রও ভাষ্যকারের এইরূপ তাৎপর্য্যই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।*

বস্তুতঃ ন্যায়-শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত বিচার দ্বারা কোন শাস্ত্রার্থ বুঝা যায় না। তাই ন্যায়-শাস্ত্রকে সর্ব্ব শাস্ত্রের প্রদীপ বলা হইয়াছে। পরন্তু বহু বিষয়েই বিচার করিয়া তত্ত্বনির্ণয় করিতে অনুমান প্রমাণ প্রধান অবলম্বন। গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও রাজনীতি প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয়েই যে অনুমান প্রমাণ অপরিহার্য্য এবং যাহা 'সকল লোক-যাত্রা-নির্ব্বাহক', সেই অনুমান প্রমাণের সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য ন্যায় শাস্ত্রেই বর্ণিত হইয়াছে। অতএব ন্যায়-শাস্ত্রের প্রয়োজন অসংখ্য।

কিন্তু চরম নিঃশ্রেয়স অপবর্গ বা মুক্তিই যে, ন্যায়-শাস্ত্রের মুখ্য প্রয়োজন, এ বিষয়ে সংশয় নাই। কারণ, মহর্ষি গোতম ন্যায়সূত্রের দ্বারা যে 'আন্বীক্ষিকী' বিদ্যার প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কেবল তর্ক-বিদ্যা নহে; কিন্তু তর্কবিদ্যাসহিত অধ্যাত্মবিদ্যা। তাই প্রথম সূত্রের ভাষ্য-শেষে বাৎস্যায়নও বলিয়াছেন—"ইহ ত্বধ্যাত্মবিদ্যায়া-মাত্মাদিজ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানং, নিঃশ্রেয়সাধিগমোঽপবর্গপ্রাপ্তিরিতি।" মহর্ষি গোতমও ইহা ব্যক্ত করিতে দ্বিতীয় সূত্র বলিয়াছেন—

দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানা-
মুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ॥

মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন যে, অপবর্গই এই শাস্ত্রের প্রয়োজন এবং প্রথম সূত্রোক্ত প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের মধ্যে আত্মাদি প্রমেয় পদার্থের যে তত্ত্বজ্ঞান, তাহাই সেই সমস্ত প্রমেয় পদার্থ-বিষয়ে সর্ব্বপ্রকার মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তির দ্বারা সেই অপবর্গের চরম কারণ। পরে ক্রমে ইহা ব্যক্ত হইবে।

---

* ভাষ্যকারস্তু নাস্ত্যেব তৎ প্রেক্ষাবতাং প্রয়োজনং, যত্রান্বীক্ষিকী ন নিমিত্তং ভবতীত্যাহ—"সেয়-মান্বীক্ষিকী"তি।—'তাৎপর্য্যটীকা'।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গৌতমোক্ত অপবর্গের স্বরূপ ও তদ্বিষয়ে মতভেদ

অপপূর্ব্বক 'বৃজ' ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয়ে 'অপবর্গ' শব্দ সিদ্ধ হয়। জীবের সংসারবন্ধনের বর্জ্জন অর্থাৎ সংসারমূলক সর্ব্বদুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই এখানে অপপূর্ব্বক বৃজ ধাতুর অর্থ। তাহা হইলে মুক্তিরই অপর নাম 'অপবর্গ' বলা যায়। উহা 'মোক্ষ' প্রভৃতি নামে এবং 'অমৃত' নামেও কথিত হইয়াছে। শ্রীভগবানও বলিয়াছেন—"জন্ম-মৃত্যু-জরা-দুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে॥" (গীতা—১৪।২০)

সর্ব্বপ্রকার সমস্ত দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি না হইলে কোন মতেই প্রকৃত মুক্তি হয় না। সুতরাং সর্ব্বমতেই উহা মুক্তির সামান্য লক্ষণ বলা যায়। তাই ন্যায় সূত্রকার গৌতম পরে অপবর্গের লক্ষণ সূত্র বলিয়াছেন—

তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গঃ॥ ১।১।২২

গৌতম ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে দুঃখের লক্ষণ সূত্র বলিয়াছেন—**বাধনা-লক্ষণং দুঃখম্।** সুতরাং এই সূত্রে প্রথমোক্ত 'তদ্' শব্দের দ্বারা পূর্ব্বসূত্রোক্ত সমস্ত দুঃখকে গ্রহণ করিয়া গৌতম বলিয়াছেন যে, সেই সমস্ত দুঃখের অত্যন্ত বিমোক্ষ অর্থাৎ তাহার আত্যন্তিক নিবৃত্তিই অপবর্গ।

বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদও বলিয়াছেন—

তদভাবে সংযোগাভাবোঽপ্রাদুর্ভাবশ্চ মোক্ষঃ। ৫।২।১৮

ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ব সূত্রে কণাদ অদৃষ্টের উল্লেখ করায় এই সূত্রে প্রথমোক্ত "তদ্" শব্দের দ্বারা সেই অদৃষ্টই গৃহীত হইয়াছে বুঝা যায়

জীবাত্মার ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নামক গুণ বিশেষই সেই অদৃষ্ট। তাহা হইলে কণাদের উক্ত সূত্রের দ্বারা বুঝা যায় যে, জীবের ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ সমস্ত অদৃষ্টের অভাবপ্রযুক্ত তাহার যে, সেই শরীরাদির সহিত সেই বিলক্ষণ সংযোগের অভাব এবং পুনর্ব্বার অন্য শরীরাদির সহিত বিলক্ষণ সংযোগের অপ্রাদুর্ভাব বা অনুৎপত্তি, তাহাই মুক্তি।

বস্তুতঃ জীবের জন্ম হইলেই নানা দুঃখ-ভোগ অবশ্যম্ভাবী। চিরকালের জন্য তাহার শরীরাদি-সম্বন্ধের উচ্ছেদ অর্থাৎ পুনর্জ্জন্মের নিবৃত্তি হইলেই আর কখনও তাহার কোন দুঃখভোগের সম্ভাবনাই থাকে না। শরীরাদির অভাবে কখনও সেই মুক্ত আত্মাতে জ্ঞানাদি কোন বিশেষ গুণই জন্মিতে পারে না। তাই বৈশেষিকাচার্য্যগণ কণাদের উক্ত সূত্রানুসারেই বলিয়াছেন যে, আত্মার জ্ঞানাদি সমস্ত বিশেষ গুণের অত্যন্ত উচ্ছেদই মুক্তি।

এখানে বলা আবশ্যক যে, ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতে আত্মা চৈতন্য ও সুখস্বরূপ নহে। কিন্তু চৈতন্য অর্থাৎ জ্ঞান তাহার বিশেষ গুণ এবং জীবাত্মার পক্ষে উহা অনিত্য। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এবং তজ্জন্য সুখ ও দুঃখও জীবাত্মার অনিত্য বিশেষ গুণ। সুতরাং যে সমস্ত কারণে জীবাত্মাতে ঐ জ্ঞান প্রভৃতি বিশেষ গুণ জন্মে, তাহার অত্যন্ত উচ্ছেদ হইলে আর কখনও সেই জীবাত্মাতে জ্ঞানাদি কোন বিশেষ গুণ জন্মিতে পারে না। সুখের কারণ ধর্ম্ম এবং দুঃখের কারণ অধর্ম্মের অত্যন্ত উচ্ছেদ হইলে আর কখনও তাহার সুখ-দুঃখের উৎপত্তি সম্ভবই হয় না। কিন্তু কোন জীবাত্মার সমস্ত বিশেষ গুণের অত্যন্ত উচ্ছেদ হইলেও তখন সেই আত্মার উচ্ছেদ হইতে পারে না। কারণ, আত্মা নির্ব্বিকার নিত্য। উক্ত মতে জীবাত্মার সমস্ত বিশেষ গুণের অত্যন্ত উচ্ছেদ হইলেই তখন তাহার স্বস্বরূপে অবস্থান হয়।

কিন্তু পূর্ব্বোক্ত মতে অনেক সম্প্রদায়ের ঘোর প্রতিবাদ এই যে, যদি মুক্ত আত্মার কোন সুখভোগ না হয় এবং তখন তাহার কোন চৈতন্যই না থাকে, তাহা হইলে সেই অবস্থা ত তাহার মূর্চ্ছাবস্থার তুল্য। সুতরাং উহা পুরুষার্থই হইতে পারে না। কারণ, পুরুষ বা জীব যাহা প্রার্থনা করে, তাহাকেই পুরুষার্থ বলে। কিন্তু কেহ কি নিজের মূর্চ্ছাবস্থাকে প্রার্থনা করে? এবং তাহার জন্য কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়? "নহি মূর্চ্ছাদ্যবস্থার্থং প্রবৃত্তো দৃশ্যতে সুধীঃ"—কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিকেই নিজের মূর্চ্ছাদি অবস্থালাভের জন্য প্রবৃত্ত দেখা যায় না।

এতদুত্তরে ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের কথা এই যে, কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই কখনও নিজের অচৈতন্যাবস্থা প্রার্থনা করেন না, ইহাও বলা যায় না। কারণ, অসহ্য বেদনায় কাতর হইয়া সময়ে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিও নিজের মূর্চ্ছাবস্থা প্রার্থনা করেন এবং অনেক সময়ে আত্মহত্যা করিতেও প্রবৃত্ত হন, ইহার বহু দৃষ্টান্ত আছে। সুতরাং কেবল দুঃখ-নিবৃত্তির উদ্দেশ্যেই সময়বিশেষে অচৈতন্যাবস্থাও যে পুরুষার্থ হয়, ইহা স্বীকার্য্য। বস্তুতঃ মুক্ত পুরুষের পূর্ব্বোক্তরূপ অবস্থা মূর্চ্ছাবস্থা বা তৎতুল্য কোন অবস্থাও নহে। কারণ, মূর্চ্ছাদি অবস্থার অবসান হইলে আবার নানা দুঃখভোগ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু মুক্তি হইলে আর কখনও তাহার কোন দুঃখেরই সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং উহাই পরম পুরুষার্থ।

পরন্তু সুখ এবং দুঃখনিবৃত্তি, এই উভয়ই জীবের কাম্য বা পুরুষার্থ। তন্মধ্যে সংসারবিরক্ত পুরুষের পক্ষে দুঃখনিবৃত্তিই অধিকতর প্রিয়। কারণ, যাঁহারা সংসারে সুখের জন্য বহু দুঃখভোগ করিয়া নিতান্ত বিরক্ত হন, তাঁহারা দুঃসহ দুঃখ হইতে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে চিরপ্রিয় বহু সুখও পরিত্যাগ করেন। তাই তখন তাঁহারা সুখেও অতি-বিরক্ত হইয়া বলেন যে—"আর সুখ চাই না, এখন এই সমস্ত যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইলেই বাঁচি, সুখ চেয়ে স্বস্তি ভাল।"

দুঃখনিবৃত্তিই এখানে স্বস্তি বা শান্তি। কিন্তু সুখভোগ করিতে হইলে দুঃখ-ভোগও অবশ্য করিতে হইবে। কারণ, সুখমাত্রই দুঃখানুষক্ত। অর্থাৎ একেবারে দুঃখসম্বন্ধশূন্য চিরস্থায়ী কোন সুখ নাই। তাই প্রকৃত মুমুক্ষু অধিকারী আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তির জন্য সর্ব্বপ্রকার সমস্ত সুখভোগেরই কামনা পরিত্যাগ করেন। একেবারে চিরশান্তি-লাভের জন্য তাঁহারা সুখদুঃখশূন্য অবস্থাই প্রার্থনা করেন। শান্ত রসের স্বরূপ ব্যাখ্যায় কোন পূর্ব্বাচার্য্যও বলিয়াছেন,—"ন যত্র দুঃখং ন সুখং ন চিন্তা ন দ্বেষরাগৌ নচ কাচিদিচ্ছা।"

ফলকথা, এই মতে চিরকালের জন্য আত্মার সেই যে সুখ-দুঃখশূন্যাবস্থা, তাহাই চির শান্তি এবং চরম পুরুষার্থ।* ছান্দোগ্য উপনিষদের শেষ অধ্যায়ের "ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্ত্যশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ" (৮।১২।১) এই শ্রুতি বাক্যই উক্তরূপ মুক্তি বিষয়ে প্রমাণ। কারণ "অশরীরং .... ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ" এই বাক্যের দ্বারা বুঝা যায় যে, মুক্ত আত্মা অশরীর হইয়া অবস্থান করেন, তখন তাহাতে প্রিয় ও অপ্রিয়—এই উভয়ই থাকে না। ক্লীবলিঙ্গ "প্রিয়" শব্দের অর্থ—সুখ এবং "অপ্রিয়" শব্দের অর্থ—দুঃখ। উক্ত শ্রুতি বাক্যে "অপ্রিয়" শব্দের অর্থ বৈষয়িক অনিত্য সুখ, ইহা বুঝিবার কোন কারণ নাই।

---

* সাংখ্যমতেও আত্মা নিত্যচৈতন্য স্বরূপ হইলেও—মুক্তিকালে কোন প্রকার সুখ ভোগ হয় না। ত্রিবিধ দুঃখের চির নিবৃত্তিই মুক্তি। "তত্ত্বসমাসে"ও শেষ সূত্র দেখা যায়—"ন পুনস্ত্রিবিধেন দুঃখেনাভিভূয়তে।" সেই দুঃখাভাবই মোক্ষ-সুখ বা ব্রহ্মানন্দ নামে শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। ভোগ্য সুখ কখনই নিরতিশয় ও চিরস্থায়ী হইতে পারে না। সুখ-দুঃখের অতীত অবস্থাও সুখ নামে কথিত হইয়াছে— "সুখং দুঃখসুখাত্যয়ঃ।"

অবশ্য ছান্দোগ্য উপনিষদের শেষ অধ্যায়ে পরে ও পূর্ব্বে ব্রহ্মলোক-প্রাপ্ত পুরুষের সম্বন্ধে ইচ্ছামাত্রে নানাবিধ সঙ্কল্প সিদ্ধি কথিত হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তিই প্রকৃত মুক্তি নহে। কারণ, অনেকের ব্রহ্মলোক হইতেও পুনরাবৃত্তি বা পুনর্জ্জন্ম হয়। তাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।" গীতা—(৮।১৬) কিন্তু ব্রহ্মলোকে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া যাঁহারা মহাপ্রলয়ে হিরণ্যগর্ভ—ব্রহ্মার সহিত মুক্তি লাভ করেন; তাঁহারাও যে, তখন কোন সুখ ভোগ করেন, ইহা ছান্দোগ্য উপনিষদে পরে কথিত হয় নাই। কিন্তু পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে,—"অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ"।

নব্য নৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায় "ঈশ্বরানুমান-চিন্তামণি" গ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত মত সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, সুখ ও দুঃখ-নিবৃত্তি—এই উভয়ই পুরুষার্থ। সর্ব্বত্রই যে, সুখলিপ্সাবশতঃই জীবের কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, ইহা বলা যায় না। কারণ কেবল দুঃখ-নিবৃত্তির জন্যও জীবের অনেক প্রবৃত্তি হইতেছে। সুতরাং সেই দুঃখ-নিবৃত্তিও পুরুষার্থ, ইহা স্বীকার্য্য। পরন্তু যদি সুখবিহীন দুঃখ-নিবৃত্তি পুরুষার্থ না হয়, তাহা হইলে দুঃখানুবিদ্ধ সুখও পুরুষার্থ হইতে পারে না। কিন্তু যে সুখের পূর্ব্বে ও পরে দুঃখভোগ অবশ্যম্ভাবী, সেই স্বর্গাদি সুখও পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। তাহা হইলে ঐরূপ সুখবিহীন আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিমাত্রও পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকার্য্য। উহাই পরম পুরুষার্থ মুক্তি।

পরন্তু সুখমাত্রই দুঃখানুবিদ্ধ ও অনিত্য। প্রকৃত মুমুক্ষু ইহা বুঝিয়া কেবল আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির জন্যই শাস্ত্র-বিহিত উপায়ের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহারা সুখলিপ্সু হন না। যে সমস্ত অবিবেকী ব্যক্তি সুখমাত্র-লিপ্সু হইয়া বহুতর দুঃখানুবিদ্ধ সুখের জন্য প্রিয়-

তমাকে "শিরো মদীয়ং যদি যাতু যাতু"* বলিয়া অর্থাৎ তোমার জন্য আমার মস্তক যায় যাউক, জনক-নন্দিনী সীতার জন্য দশাননও তাঁহার দশবদন ছিন্ন করিয়াছিলেন,—এই বলিয়া পরদারাদিতে প্রবৃত্ত হয় এবং "বরং বৃন্দাবনে রম্যে শৃগালত্বং ব্রজাম্যহং। ন তু বৈশেষিকীং মুক্তিং প্রার্থয়ামি কদাচন"—এইরূপ শ্লোক † পাঠ করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ মুক্তিকে উপহাস করে, তাহারা মুক্তিতে অধিকারীই নহে।

কিন্তু যে সমস্ত বিবেকী ব্যক্তি এই সংসার-কান্তারে দুঃখ-দুর্দ্দিনই অসংখ্য এবং সুখ-খদ্যোত অত্যল্প, এজন্য ইহা কুপিত সর্পের ফণা-মণ্ডলের ছায়ার তুল্য, ইহা বুঝিয়া আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য সুখকেও ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাই মুক্তিতে অধিকারী।

গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের উদ্ধৃত "শিরো মদীয়ং যদি যাতু যাতু", এই বাক্য কোন প্রাচীন শ্লোকের দ্বিতীয় চরণ। ঐ শ্লোকের দ্বারা পরদারপ্রবৃত্ত কামার্ত্ত পুরুষের প্রিয়তমার প্রতি উক্তি বর্ণিত হইয়াছে। সম্পূর্ণ শ্লোকটি এই,—"যুষ্মৎকৃতে খঞ্জনমঞ্জুলাক্ষি! শিরো মদীয়ং যদি যাতু যাতু। লূনানি নূনং জনকাত্মজার্থে দশাননেনাপি দশাননানি॥"

† এই শ্লোকটিও প্রসিদ্ধ আছে। গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও উক্ত শ্লোকের প্রথম চরণ উদ্ধৃত করায় উহাও প্রাচীন শ্লোক বুঝা যায়। উক্ত শ্লোকের দ্বারা কোন বৈষ্ণব বলিয়াছেন যে, বরং আমি বৃন্দাবনে শৃগাল হইব; কিন্তু আমি বৈশেষিক-দর্শনোক্ত মুক্তি কখনও প্রার্থনা করি না। গঙ্গেশ উপাধ্যায় ঐ স্থলে "পরদারাদিষু প্রবর্ত্তমানা বরং বৃন্দাবনে রম্যে ইত্যাদি বদন্তো নাত্রাধিকারিণঃ"—এইরূপ বলিয়া তৎকালীন কোন সম্প্রদায়বিশেষের প্রতিই কটাক্ষ সূচনা করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়।

* তস্মাদবিবেকিনঃ সুখমাত্রলিপ্সবো বহুতরদুঃখানুবিদ্ধমপি সুখমুদ্দিশ্য "শিরো মদীয়ং যদি যাতু যাত্বি"তি কৃত্বা পরদারাদিষু প্রবর্ত্তমানা "বরং বৃন্দাবনে রম্যে"—ইত্যাদি বদন্তো নাত্রাধিকারিণঃ। যে চ বিবেকিনোহস্মিন্ সংসারকান্তারে কিয়ন্তি দুঃখদুর্দ্দিনানি, কিয়তী বা সুখখদ্যোতিকেতি কুপিতফণিফণামণ্ডলচ্ছায়াপ্রতিমমিদমিতি মন্যমানাঃ সুখমপি হাতুমিচ্ছন্তি, তেহত্রাধিকারিণঃ।—ঈশ্বরানুমানচিন্তামণি।

ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও গৌতমোক্ত মুক্তির স্বরূপ-ব্যাখ্যায় পূর্ব্বোক্ত মতই সমর্থন করিয়াছেন এবং তদনুসারে উহাই নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ে প্রচলিত মত। কিন্তু বাৎস্যায়নের পূর্ব্বেও কোন নৈয়ায়িক সম্প্রদায় যে, গৌতমের মতে মুক্তিতে নিত্য সুখানুভূতিও সমর্থন করিতেন, ইহাও বাৎস্যায়নের বিচার দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। কারণ, বাৎস্যায়ন গৌতমের পূর্ব্বোক্ত অপবর্গ-লক্ষণ সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন—

"নিত্যং সুখমাত্মনো মহত্ত্বন্মোক্ষেঽভিব্যজ্যতে,
তেনাভিব্যক্তেনাত্যন্তং বিমুক্তঃ সুখী ভবতীতি কেচিন্মন্যন্তে,
তেষাং প্রমাণাভাবাদনুপপত্তিঃ।"

উক্ত মতের নিষ্প্রমাণত্ব সমর্থন করিতে বাৎস্যায়ন পরে বলিয়াছেন যে, মুক্তিকালে সেই নিত্য সুখের অনুভবকে নিত্যও বলা যায় না, অনিত্যও বলা যায় না। সুতরাং উহা কোন প্রমাণ-সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, নিত্য অথবা অনিত্য ভিন্ন কোন পদার্থ প্রমাণ-সিদ্ধ হয় না। কিন্তু আত্মার নিত্য সুখ স্বীকার করিয়া তাহার অনুভবকেও নিত্য পদার্থ বলিলে মুক্তির পূর্ব্বে সমস্ত দুঃখী জীবেও সতত সেই নিত্য সুখানুভব বিদ্যমান আছে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু সংসারী জীবের দুঃখ ভোগকালেও যে, তাহাতে নিত্য সুখের অনুভব থাকে, ইহা কখনই স্বীকার করা যায় না। সেই নিত্য সুখের অনুভব অনিত্য অর্থাৎ মুক্তিকালে উহা জন্মে, ইহাও বলা যায় না। কারণ মুক্তিকালে সেই অনুভবের উৎপাদক কোন কারণ থাকে না।

পরন্তু কোন ধর্ম্মবিশেষকে উহার উৎপাদক বলিলেও সেই ধর্ম্ম ও সেই নিত্য সুখানুভব চিরস্থায়ী বলা যায় না। কারণ উৎপন্ন ভাব পদার্থ মাত্রই বিনশ্বর, ইহা প্রমাণ সিদ্ধ। কিন্তু কোন কালে যাহার অবস্থা

বিনাশ হইবে, তাহা কোন মতেই মুক্তি নহে। মুক্তি পদার্থ সকল মতেই চিরস্থায়ী, নচেৎ তাহাকে প্রকৃত মুক্তি বলাই যায় না। অতএব মুক্তির-স্বরূপ প্রকাশক কোন কোন শাস্ত্রবাক্যে 'সুখ' বা 'আনন্দ' শব্দের প্রয়োগ থাকিলেও আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিই তাহার অর্থ বুঝিতে হইবে। কারণ পূর্ব্বোক্ত কারণে উহার মুখ্য অর্থ গ্রহণ করা যায় না।

বাৎস্যায়ন আরও অনেক বিচার করিয়া শেষ কথা বলিয়াছেন যে, মুক্ত পুরুষের কোনরূপ সুখ-ভোগে কামনা থাকিলে তাঁহাকে মুক্ত বলাই যায় না। কারণ কামনা বা বিষয়াভিলাষ বন্ধন বলিয়াই সর্ব্বসম্মত। কিন্তু কোন বন্ধন থাকিলে তাহাকে মুক্ত বলা যায় না। "নহি বন্ধনে সত্যপি কশ্চিন্মুক্ত ইত্যুচ্যতে।"

আর যদি তখন তাঁহার কোনরূপ সুখভোগে কিছুমাত্র কামনা না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিমাত্রকেও মুক্তি বলা যাইবে না কেন? যিনি সর্ব্বথা নিষ্কাম, তাঁহার কোন সুখভোগ না হইলেও তিনি মুক্ত হইবেন না কেন? পরন্তু চরম মুক্তিকালে সেই মুক্ত-পুরুষের সুখ-ভোগের সাধন শরীরাদি কিছুই না থাকায় তখন তাহার সুখ-ভোগ হইতেও পারে না। অতএব চরম তত্ত্ব-জ্ঞানের ফলে সমস্ত মিথ্যা জ্ঞানের নিবৃত্তি হওয়ায় যাহার আর কখনও পুনরাবৃত্তি বা জন্মলাভ হইবে না, সুতরাং কোনরূপ দুঃখভোগের সম্ভাবনাই নাই, তাঁহার সুখ-ভোগ না হইলেও মুক্তিলাভ স্বীকার করিতেই হইবে।

কিন্তু বাৎস্যায়নের অনেক পরে কাশ্মীরবাসী শৈব সম্প্রদায় বিশেষের আচার্য্য ভাসর্ব্বজ্ঞ—তাঁহাদিগের গুরু-পরম্পরাগত পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন মত সমর্থন করিতে **ন্যায়সার** গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, মুক্ত পুরুষের নিত্য

সুখের অনুভব শাস্ত্রে প্রমাণ সিদ্ধ।* সেই সমস্ত শাস্ত্র বাক্যে 'সুখ' শব্দ ও 'আনন্দ' শব্দের মুখ্য অর্থে কোন বাধক না থাকায়—লাক্ষণিক অর্থের কল্পনা করা যায় না।

বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন যে, মুক্ত পুরুষের নিত্য সুখের অনুভবকে নিত্যও বলা যায় না এবং অনিত্যও বলা যায় না। সুতরাং উহা শাস্ত্রার্থ হইতে পারে না। কিন্তু ভাসর্ব্বজ্ঞ বলিয়াছেন যে, সেই নিত্য সুখের অনুভবও নিত্যপদার্থ। সংসারাবস্থাতেও সমস্ত জীবাত্মাতে সেই নিত্যসুখ ও তাহার অনুভব বিদ্যমান থাকিলেও তখন পাপাদি প্রতিবন্ধকবশতঃ ঐ উভয়ের বিষয়বিষয়িভাব সম্বন্ধ জন্মে না। কিন্তু মুক্তিকালে সেই সমস্ত প্রতিবন্ধক না থাকায় তখন সেই নিত্য সুখ ও তাহার নিত্য অনুভবের বিষয়বিষয়িভাব সম্বন্ধ জন্মে, এবং সেই সম্বন্ধ উৎপন্ন-ভাব পদার্থ হইলেও উহার বিনাশের কোন কারণ না থাকায় কখনও উহার বিনাশ হইতে পারে না। সেই যে নিত্য সুখ, তাহা নিত্য সংবেদ্য। সেই সুখবিশিষ্ট যে, আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি, তাহাই মুক্তি।†

---

* ভাসর্ব্বজ্ঞ স্মৃতিবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—"সুখমাত্যন্তিকং যত্র বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্। তং বৈ মোক্ষং বিজানীয়াদ্ দুষ্প্রাপমকৃতাত্মভিঃ"। কিন্তু উক্তরূপ শাস্ত্র বচন সর্ব্বসম্মত নহে। এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, বাৎস্যায়ন প্রভৃতির ন্যায় দ্বৈতবাদী ভাসর্ব্বজ্ঞের মতেও জীবাত্মা নিত্য সুখস্বরূপ পর ব্রহ্ম নহেন। ভাসর্ব্বজ্ঞ অদ্বৈতমতানুসারে মুক্তির ব্যাখ্যা করেন নাই। তাঁহার মতে সমস্ত জীবাত্মাতে চির বিদ্যমান নিত্যসুখ মুক্তিকালে অভিব্যক্ত হয়। বাৎস্যায়নও উক্ত মতেরই খণ্ডন করিয়াছেন। "শাস্ত্রদীপিকার" তর্কপাদে মীমাংসক পার্থ সারথিমিশ্র উক্ত মতের ব্যাখ্যা করিয়া উহাকে আনন্দ মোক্ষবাদীর মত বলিয়াছেন। তাঁহার মতে উহা কুমারিল ভট্টের নিজ মত নহে। এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা মৎসম্পাদিত 'ন্যায় দর্শনের' চতুর্থ খণ্ডে ৩৪২—৫৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

† ভাসর্ব্বজ্ঞের "ন্যায়সারের" অষ্টাদশ টীকার মধ্যে প্রধান টীকাকার ভূষণ ইহা বিশেষ বিচার পূর্ব্বক সমর্থন করিয়াছেন। তাই শ্রী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য্য বেঙ্কট-

ভাসর্ব্বজ্ঞ প্রথমে আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিমাত্রই মুক্তি, এই মতেরও উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু উহা তাঁহাদিগের মতে বৈশেষিক দর্শনকার কণাদের মত। টীকাকার জয়সিংহ স্থূরি সেখানে ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন। বস্তুতঃ ভাসর্ব্বজ্ঞ গৌতমের মতের ব্যাখ্যা করিতেই "ন্যায়সারে"র শেষে বলিয়াছেন,—"অনেন সুখেন বিশিষ্টা আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তিঃ পুরুষস্য মোক্ষ ইতি।"

পরন্তু "সংক্ষেপশঙ্করজয়" গ্রন্থে মাধবাচার্য্য দুইটী শ্লোকের দ্বারা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন যে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের পরিভ্রমণকালে কোন স্থানে কোন নৈয়ায়িক গর্ব্বের সহিত তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, যদি তুমি সর্ব্বজ্ঞ হও, তাহা হইলে কণাদের সম্মত মুক্তি হইতে গৌতমের সম্মত মুক্তির বিশেষ কি—তাহা বল; নচেৎ সর্ব্বজ্ঞতা বিষয়ে প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ কর। তদুত্তরে শঙ্করাচার্য্য তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, *

নাথও ইহাই সমর্থন করিতে "ন্যায়-পরিশুদ্ধি" গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"অতএব হি ভূষণমতে নিত্যসুখ-সংবেদন-সিদ্ধিরপবর্গে সাধিতা"।—কাশী চৌখাম্বা সংস্করণ ১৭ পৃঃ।

"তত্রাপি নৈয়ায়িক আত্তগর্ব্বঃ কণাদপক্ষাচ্চরণাক্ষ-পক্ষে।
মুক্তের্ব্বিশেষং বদ সর্ব্ববিচ্চেৎ, নোচেৎ প্রতিজ্ঞাং ত্যজ সর্ব্ববিত্ত্বে।
অত্যন্তনাশে গুণসংগতের্যা স্থিতির্নভোবৎ কণভক্ষপক্ষে।
মুক্তিস্ত্বদীয়ে চরণাক্ষপক্ষে সানন্দসংবিৎ সহিতা বিমুক্তিঃ।

—"সংক্ষেপশঙ্করজয়" ১৬ অঃ ৬৮।৬৯।

* কণাদ নামের অর্থ গ্রহণ করিয়া উক্ত শ্লোকে মাধবাচার্য্য বৈশেষিক-দর্শনকার কণাদকে "কণভক্ষ" বলিয়াছেন এবং গৌতমের অক্ষপাদ নামের অর্থ গ্রহণ করিয়া গৌতমকে "চরণাক্ষ" বলিয়াছেন। দ্বিতীয় শ্লোকে "কণভক্ষ-পক্ষে" অর্থাৎ কণাদ-মতে। পরে "ত্বদীয়ে চরণাক্ষ-পক্ষে" অর্থাৎ তোমার সম্মত অক্ষপাদমতে। "ত্বদীয়ে" এই পদের দ্বারা বুঝা যায় যে, শঙ্করাচার্য্য সেই প্রশ্নকারী গর্ব্বিত নৈয়ায়িককে তাঁহার সম্প্রদায়ের সম্মত অক্ষপাদ মতই তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। কারণ মুক্তি বিষয়ে তিনি তখন কণাদ-

কণাদের মতে আত্মার সমস্ত বিশেষ গুণের অত্যন্ত উচ্ছেদ হইলে আকাশের ন্যায় স্থিতিই মুক্তি? আর তোমার সম্মত অক্ষপাদমতে আনন্দানুভূতির সহিত ঐরূপ অবস্থাই মুক্তি। মাধবাচার্য্যের ঐরূপ বর্ণনা অমূলক হইতে পারে না। "সর্ব্বদর্শনসিদ্ধান্তসংগ্রহ" গ্রন্থেও মুক্তির স্বরূপ বিষয়ে কণাদ ও গৌতমের উক্তরূপ মতভেদই কথিত হইয়াছে। সুতরাং প্রাচীনকালে কোন নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ে মুক্তি বিষয়ে গৌতমের উক্তরূপ বিশিষ্ট মতই যে প্রতিষ্ঠিত ছিল, এ বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু প্রচলিত ন্যায় সূত্রের দ্বারা উক্ত মত বুঝা যায় না।

ও অক্ষপাদের উক্তরূপ মতভেদ বলিতে না পারিলে সেই প্রশ্নকারী নৈয়ায়িক তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করিতেন না। কিন্তু "সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ" কার মাধবাচার্য্য অক্ষপাদ মতের ব্যাখ্যায় মুক্তি বিষয়ে বাৎস্যায়ন প্রভৃতির সম্মত প্রচলিত মতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তিনিই যে, "সংক্ষেপশঙ্করজয়" গ্রন্থকার, এই বিষয়েও প্রকৃত প্রমাণ পাই নাই।

তৃতীয় অধ্যায়

মুক্তির উপায়

শ্রুতি বলিয়াছেন,—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বা বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতং।"—বৃহদারণ্যক, ৪।৪।৫।

অর্থাৎ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য—নিজ পত্নী মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছিলেন যে, অরে মৈত্রেয়ি! মুক্তিলাভে ইচ্ছা হইলে আত্মা দ্রষ্টব্য অর্থাৎ আত্মার দর্শন কর্ত্তব্য। সেই আত্মদর্শনের জন্য প্রথমে আত্মা শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য, অর্থাৎ যথাক্রমে আত্মার শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন (ধ্যানাদি) কর্ত্তব্য। সুতরাং আত্মার দর্শনরূপ তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ, ইহাই উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা বুঝা যায়। আত্মার শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন, সেই আত্মদর্শনের উপায় হওয়ায় পরম্পরায় ঐ সমস্তও মুক্তির উপায়।

বস্তুতঃ অহঙ্কারের নিবৃত্তি ব্যতীত জীবের সংসার-নিবৃত্তি বা মুক্তি হইতে পারে না—ইহা যুক্তি সিদ্ধ। অতএব কি উপায়ে সেই অহ-ঙ্কারের নিবৃত্তি হইতে পারে, ইহা বুঝা আবশ্যক। মহর্ষি গৌতম পরে বলিয়াছেন—

দোষ-নিমিত্তানাং তত্ত্বজ্ঞানাদহঙ্কার-নিবৃত্তিঃ॥ ৪।২।১।

জীবের রাগ, দ্বেষ ও মোহের নাম 'দোষ'। শরীরাদি অনেক পদার্থ সেই দোষের নিমিত্ত। সেই সমস্ত পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান জন্য অহঙ্কারের নিবৃত্তি হয়,—ইহাই গৌতম উক্ত সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন। বস্তুতঃ জীবের নানা প্রকার মিথ্যাজ্ঞানই সংসারের নিদান। তত্ত্বজ্ঞানই

তাহার নিবর্ত্তক হইতে পারে। অতএব সেই তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির কারণ বলিয়া স্বীকার্য্য।

গৌতমের মতে আত্মাদি প্রমেয় পদার্থ বিষয়ে নানা প্রকার মিথ্যা-জ্ঞানই জীবের সংসারের নিদান। তন্মধ্যে অনাদিকাল হইতে জীবের নিজ দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিরূপ মিথ্যাজ্ঞানই অহঙ্কার। সুতরাং তাহার বিপরীত জ্ঞান অর্থাৎ নিজ দেহাদি আত্মা নহে,—এইরূপ জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান। সাধনার দ্বারা আত্মা ও শরীরাদি বিষয়ে চরম তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে সমস্ত মিথ্যা-জ্ঞানের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হওয়ায় মুক্তি লাভ হয়। কারণ সেই চরম তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে সেই জ্ঞানীর পূর্ব্ব সঞ্চিত সমস্ত কর্ম্ম অর্থাৎ প্রারব্ধ ভিন্ন সমস্ত ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া যায়। তাই ঐ তাৎপর্য্যেই শ্রুতি বলিয়াছেন,—"ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি।" (মুণ্ডক উপ) শ্রীভগবান্‌ও ঐ তাৎপর্য্যে বলিয়াছেন,—"জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥" (গীতা ৪।৩৮)

ফলকথা, তত্ত্বজ্ঞানের মহিমায় পুনর্জ্জন্মের কারণ সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম বিনষ্ট হয় এবং সেই তত্ত্বজ্ঞানীর আর কোন ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম উৎপন্ন হয় না। সুতরাং তাঁহার কখনও আর পুনর্জ্জন্ম হইতে পারে না। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—"নচ পুনরাবর্ত্ততে।"

কিন্তু চরম তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হয় না। ভোগ ব্যতীত উহার ক্ষয় হইতে পারে না।* প্রারব্ধ কর্ম্ম বলিতে কর্ম্ম-জ

* ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের প্রকৃতিখণ্ডের শেষে দেখা যায়—"অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্। দেবতীর্থসহায়েন কায়ব্যূহেন শুধ্যতি॥" (২৬।৭১) ইহা পূর্ব্বোক্ত প্রারব্ধ কর্ম্মের সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। বেদান্তদর্শনে বাদরায়ণও বলিয়াছেন,—"ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বা সম্পদ্যতে"। (৪।১।১৯) এই সূত্রে "তু" শব্দের দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্ম যে ভোগমাত্র নাশ্য, অর্থাৎ ভোগের দ্বারাই উহার ক্ষয় করিয়া পরে সেই তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ মুক্ত হন,—ইহাই ব্যক্ত হইয়াছে। উক্ত সূত্রে "ইতরে" এই

ধর্ম্মাধর্ম্ম বিশেষই বুঝিতে হইবে। যে কর্ম্ম বা ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল-ভোগের আরম্ভ হইয়াছে, তাহার নাম প্রারব্ধ কর্ম্ম। সেই ফল-ভোগ সমাপ্ত না হইলে তাহার বিনাশ হইতে পারে না। যেমন জীবের যে ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলস্বরূপ কোন শরীর বিশেষের সৃষ্টি হইয়াছে,—সেই ধর্ম্মাধর্ম্ম তাহার প্রারব্ধ কর্ম্ম। কারণ তাহার ফলারম্ভ হইয়াছে। সেই ফল-ভোগ সমাপ্ত না হইলে সেই শরীরের অবসান হইতে পারে না। অতএব চরম তত্ত্বজ্ঞানের পরেও সেই তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ জীবিত থাকেন। তখন তাঁহাকে **জীবন্মুক্ত** পুরুষ বলে। কোন কোন জীবন্মুক্ত পুরুষ স্বেচ্ছায় যোগবলে "কায়-ব্যূহ" নির্ম্মাণ অর্থাৎ নানা স্থানে নানা শরীর সৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা অল্প কালেই সমস্ত প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল-ভোগ করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করেন। কিন্তু অনেকে পরমেশ্বরের নির্দ্দেশ অনুসারে দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করেন এবং তাঁহাদিগের উপদেশেই শাস্ত্রসম্প্রদায়ও রক্ষিত হইয়াছে। সেই সমস্ত জীবন্মুক্ত পুরুষের যে মুক্তি, তাহা অপরা মুক্তি। ন্যায়-দর্শনে দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা ইহাও সূচিত হইয়াছে।

কিন্তু জীবন্মুক্ত পুরুষের দেহাবসানে যে মুক্তির লাভ হয়, তাহাই পরা মুক্তি বা চরম মুক্তি। উহারই নাম বিদেহকৈবল্য ও নির্ব্বাণ মুক্তি। উহাই ন্যায়-শাস্ত্রের চরম প্রয়োজন বা মুখ্য প্রয়োজন। চরম তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে ক্রমশঃ উহার লাভ হয়। যে ক্রমে সেই পরামুক্তির লাভ হয়, সেই ক্রম প্রদর্শন করিতে মহর্ষি গৌতম দ্বিতীয় সূত্র বলিয়াছেন :—

দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরো-
ত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ ॥

দ্বিতীয়া-দ্বিবচনান্ত পদের দ্বারা আরব্ধ-ফল ধর্ম্মাধর্ম্মই গৃহীত হইয়াছে। কারণ পূর্ব্বে বাদরায়ণ বলিয়াছেন,—"অনারব্ধকার্য্যে এব তু পূর্ব্বে তদবধেঃ।"

এই সূত্রে যথাক্রমে কথিত দুঃখ প্রভৃতির মধ্যে শেষোক্ত পদার্থ কারণ এবং তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বোক্ত পদার্থ তাহার কার্য্য। কারণের অভাবে কার্য্য জন্মে না। সুতরাং কারণের নিবৃত্তিতে কার্য্যের নিবৃত্তি বলা যায়। তাই গৌতম বলিয়াছেন যে, দুঃখ প্রভৃতির মধ্যে পর পরটির নিবৃত্তি প্রযুক্ত "তদনন্তর" অর্থাৎ তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বোক্ত পদার্থের নিবৃত্তি হওয়ায় অপবর্গ হয়। গৌতম পরে ধর্ম্ম-জনক শুভকর্ম্ম এবং অধর্ম্ম-জনক অশুভকর্ম্মকেই "প্রবৃত্তি" বলিয়াছেন। কিন্তু এই সূত্রে সেই কর্ম্মজন্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্মই "প্রবৃত্তি" শব্দের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। কারণ সেই ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ প্রবৃত্তিই জীবের জন্মের সাক্ষাৎ কারণ।

কর্ম্ম-জন্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের ফলেই অনাদিকাল হইতে জীবের নানাবিধ শরীর পরিগ্রহরূপ জন্ম হইতেছে। জন্ম হইলেই দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং দুঃখের কারণ **জন্ম**। সেই জন্মের কারণ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ **প্রবৃত্তি**। সেই প্রবৃত্তির কারণ রাগ ও দ্বেষরূপ **দোষ**। কারণ, বিষয়-বিশেষে আকাঙ্ক্ষারূপ রাগ ও দ্বেষবশতঃই মানব কর্ম্ম করিয়া তজ্জন্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম লাভ করে। সেই রাগ ও দ্বেষ না থাকিলে কর্ম্ম করিলেও ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম জন্মে না। সেই ধর্ম্মাধর্ম্মজনক রাগ ও দ্বেষরূপ দোষের কারণ নানাপ্রকার **মিথ্যাজ্ঞান**। কারণ আত্মাদি বিষয়ে নানারূপ ভ্রম জ্ঞানবশতঃই ঐ "দোষ" জন্মে। অতএব সেই দোষের আত্যন্তিক নিবৃত্তি করিতে তাহার কারণ মিথ্যাজ্ঞানের আত্যন্তিক নিবৃত্তি আবশ্যক।

কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত তাহা কোন উপায়েই সম্ভব হইতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে তাহার কার্য্য 'দোষের' নিবৃত্তি হয়। দোষের নিবৃত্তি হইলে তাহার কার্য্য—'প্রবৃত্তির' (ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের) নিবৃত্তি হয়। প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইলে তাহার কার্য্য

'জন্মের' নিবৃত্তি হয়। সেই জন্মের নিবৃত্তি হইলে সর্ব্ব দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়। উহাই নির্ব্বাণ মুক্তিরূপ অপবর্গ। কারণের নিবৃত্তি-প্রযুক্ত কার্য্যের নিবৃত্তি ক্রমেই ঐ অপবর্গের লাভ হয়। তাই মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন,——"দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ ॥

কিন্তু যে তত্ত্বজ্ঞান সমস্ত মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তির দ্বারা মুক্তির কারণ হয়, তাহা তত্ত্বসাক্ষাৎকার-স্বরূপ চরম তত্ত্বজ্ঞান। 'নিদিধ্যাসন' অর্থাৎ যোগ শাস্ত্রোক্ত ধ্যান, ধারণা ও সমাধি ব্যতীত তাহা হইতে পারে না। চরম সমাধি বিশেষের পরে তাহা জন্মে। তাই গৌতম পরে বলিয়াছেন, "**সমাধিবিশেষাভ্যাসাৎ** ॥" (৪।২।৩৮) কিন্তু প্রথমেই সেই সমাধি সম্ভব হয় না। প্রথমে 'যম' ও 'নিয়মের' দ্বারা এবং অধ্যাত্ম-শাস্ত্রোক্ত অন্যান্য উপায়ের দ্বারা আত্মসংস্কার কর্ত্তব্য। তাই গৌতম পরে বলিয়াছেন—

তদর্থং যম-নিয়মাভ্যামাত্ম-সংস্কারো
যোগাচ্চাধ্যাত্ম-বিধ্যুপায়ৈঃ ॥—৪।২।৪৬।

যোগ শাস্ত্রোক্ত "নিয়মের" মধ্যে ঈশ্বরপ্রণিধানই চরম। ঈশ্বরে সর্ব্বকর্ম্মার্পণ বা ভক্তিবিশেষই ঈশ্বরপ্রণিধান।* বস্তুতঃ পরমেশ্বরে পরাভক্তি ব্যতীত তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইতে পারে না। তাই শ্রুতি

---

* যোগদর্শনের সমাধিপাদে "ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্বা" এই সূত্রের ভাষ্যে ব্যাসদেব বলিয়াছেন-"প্রণিধানাদ্ ভক্তিবিশেষাদাবর্জ্জিত ঈশ্বরস্তমনুগৃহ্লাতি অভিধ্যানমাত্রেণ।" টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র ব্যাসদেবের ঐ কথার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, ঈশ্বর মুমুক্ষু যোগীর মানসিক, বাচিক ও কায়িক ভক্তিবিশেষ প্রযুক্ত আবর্জ্জিত অর্থাৎ অভিমুখীভূত হইয়া অভিধ্যানমাত্রের দ্বারা অর্থাৎ এই যোগীর এই অভীষ্ট সিদ্ধ হউক,—এইরূপ ইচ্ছামাত্রের দ্বারা তাঁহাকে অনুগ্রহ করেন। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা মৎসম্পাদিত ন্যায়দর্শনের পঞ্চমখণ্ডে ২০০—২০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বলিয়াছেন,—"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।" সেই পরা-ভক্তির ফলে পরমাত্মার দর্শন হইলে তখন তাঁহারই অনুগ্রহে শরণাগত মুমুক্ষু সাধকের নিজ আত্মার স্বরূপ দর্শন হয়। সুতরাং তখন তাঁহার 'হৃদয়-গ্রন্থি' অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অহঙ্কাররূপ মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট হওয়ায় আর কখনও পুনর্জ্জন্ম হইতে পারে না। তাই ঐ তাৎপর্য্যেই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।।" গীতা-(৮।১৬)

মুণ্ডক উপনিষদেও ঐ তাৎপর্য্যে কথিত হইয়াছে,—"ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥" (২।২। ৮) এবং ঐ তাৎপর্য্যেই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও কথিত হইয়াছে—"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়।" (৩।৮) সেই মহেশ্বরের দর্শনই মুক্তি লাভে একমাত্র পন্থা,—ইহা বলিলে উহা যে, মুক্তির চরম কারণ আত্মসাক্ষাৎকারের জনক, ইহাই বুঝা যায়। কারণ যাহাকে পন্থা বলা হয়, তাহাকে চরম কারণ বলা যায় না; ফলকথা, মুমুক্ষু মুক্তির চরম কারণ আত্ম-সাক্ষাৎকারের জন্য সেই পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইলে তখন তাঁহারই অনুগ্রহে তাহার সেই আত্ম-সাক্ষাৎ-কার-রূপ তত্ত্বজ্ঞান জন্মে। তাই ঐ শ্বেতাশ্বর উপনিষদেই কথিত হইয়াছে—"তং হ দেবমাত্ম-বুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ **শরণমহং প্রপদ্যে**" পরন্তু সর্ব্বশেষে কথিত হইয়াছে—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

পরমেশ্বরে এবং গুরুতে পরাভক্তি ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে জ্ঞানলাভ হয় না এবং আত্মজ্ঞানের জন্য মুমুক্ষু পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইবেন, ইহাও পূর্ব্বোক্ত শ্বেতাশ্বতর মন্ত্রে উপদিষ্ট হওয়ায় তত্ত্বজ্ঞানার্থী

মুমুক্ষুর পক্ষেও পরমেশ্বরে পরাভক্তি ও শরণাগতির অত্যাবশ্যকতা যে, সুপ্রাচীন শ্রৌত সিদ্ধান্ত, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

'ঋগ্‌বেদ-সংহিতা'র সপ্তম মণ্ডলের পঞ্চম অষ্টকে চতুর্থ অধ্যায়ে ৫৯ম সূক্তে **ত্র্যম্বকং যজামহে** ইত্যাদি প্রসিদ্ধ মন্ত্রের শেষে **মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ**—এই শ্রুতি বাক্যদ্বারাও পরমেশ্বরের নিকটে মুক্তির প্রার্থনা বুঝা যায়। বস্তুতঃ পরমেশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত মুক্তির কারণ আত্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে না। বেদান্ত দর্শনের ভাষ্যে (২।৩।৪১) অদ্বৈত-বাদী শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন,—"তদনুগ্রহহেতুকেনৈব চ বিজ্ঞানেন মোক্ষসিদ্ধির্ভবিতুমর্হতি। কুতঃ? তচ্ছ্রুতেঃ।"

মার্কণ্ডেয় পুরাণেও দেবীমাহাত্ম্যের শেষে (১৩ম অঃ) উক্ত শ্রৌত সিদ্ধান্ত প্রকাশের জন্যই উপাখ্যান দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে যে, মুমুক্ষু সমাধি নামক বৈশ্যের প্রার্থনানুসারে দেবী তাঁহাকে বর দান করিয়াছিলেন—**তব জ্ঞানং ভবিষ্যতি**।*

ন্যায় সূত্রকার মহর্ষি গৌতমও পরে (৪।১।২১শ সূত্রে) সিদ্ধান্তরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম সাপেক্ষ জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বরই সর্ব্বকর্ম্মের কারয়িতা ও ফলদাতা। তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত কাহারও কোন কর্ম্মই সফল হয় না, সুতরাং মুক্তিও হইতে পারে না। পরে **ন্যায়দর্শনে ঈশ্বর** প্রবন্ধে ইহা সুব্যক্ত হইবে।

---

* "সোঽপি বৈশ্যস্ততো জ্ঞানং বব্রে নির্ব্বিণ্ণমানসঃ।
মমেত্যহমিতি প্রাজ্ঞঃ সঙ্গ-বিচ্যুতিকারকং।।
বৈশ্যবর্য্য! ত্বয়া যশ্চ বরোঽস্মত্তোঽভিবাঞ্ছিতঃ।
তং প্রযচ্ছামি, সংসিদ্ধ্যৈ তব জ্ঞানং ভবিষ্যতি।"

চতুর্থ অধ্যায়

জীবাত্মার শ্রবণ-মননের প্রয়োজন ও ব্যাখ্যা

প্রশ্ন হয় যে, আত্মার শ্রবণ ও মননের প্রয়োজন কি? উহার দ্বারা ত কাহারও আত্মদর্শন জন্মে না।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, প্রথমে আত্মার শ্রবণ ও মনন না করিলে শ্রুতিবিহিত নিদিধ্যাসন করা যায় না। কারণ প্রথমে যেরূপে আত্মার শ্রবণ হইয়াছে, সেইরূপেই তাঁহাব মনন করিয়া পবে সেইরূপেই তাহার ধ্যানাদি করিতে হইবে। ইহাই পূর্ব্বোক্ত **শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ**" এই বৃহদারণ্যক শ্রুতি বাক্য দ্বারা উপদিষ্ট হইয়াছে। বস্তুতঃ আত্মার তত্ত্ব কি, ইহা প্রথমে শাস্ত্র হইতে শ্রবণ না করিলে মুমুক্ষু কিরূপে আত্মার ধ্যানাদি করিবেন? নিজদেহে যে আত্মবুদ্ধি আছে, তদনুসারে দেহই আত্মা, এইরূপে আত্মার ধ্যানাদি করিলে প্রকৃত আত্মদর্শন হইতে পারে না। সুতরাং আত্মতত্ত্বপ্রকাশক বেদাদি শাস্ত্র হইতেই প্রথমে আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিতে হইবে। শ্রবণ বলিতে এখানে কর্ণ দ্বারা কোন শব্দ শ্রবণ নহে। বেদাদি শব্দপ্রমাণ-জন্য আত্মার স্বরূপবিষয়ক যথার্থ শাব্দ বোধই আত্মার শ্রবণ। তাহাও প্রথমে শাস্ত্রসিদ্ধান্তবিৎ সদ্‌গুরুর উপদেশানুসারেই করিতে হইবে।

পূর্ব্বকালে মনের আত্মত্ববাদী কোন নাস্তিক, শ্রুতির কোন বাক্য-বিশেষের দ্বারাও মনই আত্মা, ইহা সমর্থন করিয়াছিলেন। এইরূপ দেহাত্মবাদী কোন নাস্তিক, শ্রুতির কোন বাক্যবিশেষের দ্বারাও দেহই আত্মা, ইহা সমর্থন করিয়াছিলেন। এইরূপ ইন্দ্রিয়াত্মবাদী কোন নাস্তিক

শ্রুতির কোন বাক্যবিশেষের দ্বারাও ইন্দ্রিয়বর্গই আত্মা, ইহা সমর্থন করিয়াছিলেন। এইরূপ কোন বৌদ্ধ, শ্রুতির কোন বাক্যবিশেষের দ্বারাও বুদ্ধি বা বিজ্ঞানই আত্মা, ইহা সমর্থন করিয়াছিলেন। এইরূপ অপর কোন বৌদ্ধ, শ্রুতির কোন বাক্যবিশেষের দ্বারাও শূন্যই আত্মা, ইহা সমর্থন করিয়াছিলেন। "বেদান্তসারে" সদানন্দ যোগীন্দ্রও সেই সমস্ত শ্রুতি বাক্যের উল্লেখ পূর্ব্বক এই সমস্ত কথা বলিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কোন মতই শ্রুতির সিদ্ধান্ত নহে। শ্রুতিতে পূর্ব্বপক্ষ-রূপেও অনেক মতের প্রকাশ হইয়াছে এবং অনেক স্থলে নিম্নাধিকারীকে ক্রমশঃ প্রকৃত তত্ত্ব বুঝাইবার উদ্দেশ্যে প্রথমে অন্যরূপ উপদেশও করা হইয়াছে। প্রাচীন কাল হইতে সেই সমস্ত অবলম্বন করিয়াই অনেক নাস্তিক, নিজ বুদ্ধিমূলক কুতর্কের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন মত সমর্থন করিয়াছেন। ঐ সমস্ত নাস্তিকমতের বীজও শ্রুতিতেই আছে। কিন্তু শ্রুতির যাহা সিদ্ধান্ত, তাহা শাস্ত্রানুসারে বিচার করিয়া বুঝিতে হইবে। বেদাদি কোন শাস্ত্র দ্বারা সমস্ত অধিকারীরই প্রথমে সিদ্ধান্ত বুঝিতে হইবে যে, আত্মার উৎপত্তি নাই, বিনাশ নাই। আত্মার কোন প্রকার বিকার নাই, আত্মা দেহাদিভিন্ন নিত্য। কারণ, শ্রুতি সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন—"অবিনাশী বা অরেহয়মাত্মানুচ্ছিত্তিধর্ম্মা" (বৃহদারণ্যক, ৪।৪।১০)। "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ", "অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণঃ"—(কঠ, ২।১।১৮)। শ্রীভগবান্ও বলিয়াছেন—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে"॥
"অচ্ছেদ্যোহয়মদাহ্যোহয়মক্লেদ্যোহশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোহয়ং সনাতনঃ॥"—গীতা, ২।২০।২৪।

আত্মার কখনও উৎপত্তি নাই, বিনাশও নাই ; আত্মা শাশ্বত নিত্য। আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য ; আত্মা সর্ব্বব্যাপী, আত্মা অচল অর্থাৎ গতি-

শূন্য এবং সনাতন। আত্মা—"ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে"—অর্থাৎ শরীর বিনষ্ট হইলেও আত্মার বিনাশ হয় না,—এই সমস্ত কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, আত্মা দেহ নহে, আত্মা ইন্দ্রিয় নহে, আত্মা মন নহে, আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন নিত্য। কারণ, দেহাদি অচ্ছেদ্য অদাহ্য নহে, সর্ব্বব্যাপী নহে—গতিহীন নহে। উক্তরূপে বিচার করিয়া শাস্ত্র দ্বারা আত্মা দেহাদি-ভিন্ন ও নিত্য, এইরূপ যে বোধ, তাহাই আত্মার শ্রবণ। প্রথমেই উহা কর্ত্তব্য।

কিন্তু উক্তরূপে আত্মার শ্রবণ করিলেও নিজ শরীরাদিতে আত্ম-বুদ্ধিরূপ অহঙ্কারের নিবৃত্তি হয় না। অসংখ্য মানব আত্মার নিত্যত্ব শ্রবণ করিলেও তাঁহাদিগের পূর্ব্ববৎ নিজশরীরাদিতে আত্মবুদ্ধির উদয় হইতেছে এবং তজ্জন্য কুসংস্কারের প্রভাবে তাঁহাদিগেরও পূর্ব্ববৎ নানাবিধ রাগদ্বেষাদির উদ্ভব হইতেছে। সুতরাং শাস্ত্রদ্বারা আত্মা দেহাদিভিন্ন নিত্য, এইরূপ শ্রবণ করিয়া, পরে ঐ শ্রবণরূপ-জ্ঞানজন্য সংস্কারকে দৃঢ় করিবার নিমিত্ত উক্তরূপে আত্মার মনন কর্ত্তব্য। যুক্তির দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্তের বিবেচন বা অবধারণই আত্মার মনন। অনুমান-প্রমাণকেই যুক্তি বলে। মীমাংসকসম্মত "অর্থাপত্তি"রূপ যুক্তিও গৌতমের মতে অনুমানবিশেষ। সুতরাং অনুমান-প্রমাণের দ্বারা —আত্মা দেহ নহে, আত্মা ইন্দ্রিয় নহে, আত্মা মন নহে, আত্মা দেহাদি-সমষ্টিরূপও নহে এবং আত্মা নিত্য—এইরূপ যে বোধ, তাহাই আত্ম-মনন। পূর্ব্বোক্ত শ্রবণের পরে উক্ত তত্ত্বের ধারণা বা ধ্যানই মনন নহে। কারণ উহা নিদিধ্যাসনের অন্তর্গত। কিন্তু মননের পরেই নিদিধ্যাসন বিহিত হইয়াছে। সুতরাং তৎপূর্ব্বে অনুমানপ্রমাণরূপ তর্কের দ্বারাই পূর্ব্বোক্তরূপে আত্মার মনন কর্ত্তব্য।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে "শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" এই উপদেশে ভাষ্যকার আচার্য্য শঙ্করও "মন্তব্যঃ" এই পদের ব্যাখ্যা

করিয়াছেন,—"পশ্চান্মন্তব্যস্তর্কতঃ।" অর্থাৎ আত্মার শ্রবণের পরে তর্কের দ্বারা মনন কর্ত্তব্য।* উক্ত "তর্ক" শব্দের দ্বারা শঙ্করও বেদান্ত বাক্যের অবিরোধী অনুমান প্রমাণই গ্রহণ করিয়াছেন।

বেদান্ত দর্শনের দ্বিতীয় সূত্র-ভাষ্যে শঙ্কর ইহা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, † বেদান্ত বাক্যের অর্থজ্ঞানের দৃঢ়তার নিমিত্ত বেদান্ত বাক্যের অবিরোধী অনুমান-প্রমাণও গ্রাহ্য। কারণ, শ্রুতিই তর্ককে সহায়রূপে স্বীকার করিয়াছেন। উক্ত স্থলে আচার্য্য শঙ্করের শেষ কথায় অনুমান-প্রমাণরূপ তর্ক দ্বারাই যে, আত্মার মনন কর্ত্তব্য, ইহা তাঁহারও সম্মত বুঝা যায়। তাই বৃহদারণ্যক-ভাষ্যে আত্মার নিত্যত্ব প্রতিপাদন করিতে তিনিও পরে—"ন্যায়াচ্চ" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা আত্মার নিত্যত্বসাধক "ন্যায়" অর্থাৎ অনুমান-প্রমাণরূপ যুক্তিও প্রদর্শন করিয়াছেন।

মহর্ষি গৌতমের ন্যায়-দর্শন অধ্যাত্ম অংশে মননশাস্ত্র। তাই তিনি ন্যায়-দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ে মুমুক্ষুর পক্ষে শ্রুতিবিহিত পূর্ব্বোক্তরূপ

---

* কঠোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় বল্লীতে আত্মাকে "অতর্ক্য" বলা হইয়াছে এবং পরে কথিত হইয়াছে,—"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া।" কিন্তু উক্ত শ্রুতি বাক্যে "তর্কেণ" এই একবচনান্ত "তর্ক শব্দের দ্বারা শাস্ত্রনিরপেক্ষ কেবল তর্কই বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকার শঙ্কর ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"অতর্ক্যমতর্ক্যঃ স্ববুদ্ধ্যভ্যূহেন কেবলেন তর্কেণ"। "নহি তর্কস্য নিষ্ঠা কচিদ্ বিদ্যতে।" "নৈষা তর্কেণ" স্ববুদ্ধ্যভ্যূহমাত্রেণ।" বস্তুতঃ নিজবুদ্ধি মূলক কেবল তর্কের দ্বারা আত্মার যথার্থ জ্ঞান হয় না।

† সৎসু তু বেদান্তবাক্যেষু জগতো জন্মাদিকারণবাদিষু তদর্থগ্রহণ-দার্ঢ্যায়ানুমানমপি বেদান্তবাক্যাবিরোধি প্রমাণং ভবন্ন নিবার্য্যতে। শ্রুত্যৈব চ সহায়ত্বেন তর্কস্যাভ্যুপেতত্বাৎ। তথাহি "শ্রোতব্যো মন্তব্য" ইতি শ্রুতিঃ "পণ্ডিতো মেধাবী গান্ধারানেবোপসংপদ্যেতৈবমেবেহাচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" (ছান্দোগ্য, ৬।১৪।২) ইতি চ পুরুষবুদ্ধিসাহায্যমাত্মনো দর্শয়তি।—শারীরকভাষ্য।

আত্মমননের জন্য অনুমান-প্রমাণরূপ বহু যুক্তিও প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। আত্মা ইন্দ্রিয় নহে, আত্মা দেহ নহে, আত্মা মন নহে, সুতরাং আত্মা ঐ দেহাদিসমষ্টিরূপও নহে এবং আত্মা অনাদি, নিত্য— ইহা তিনি বহু যুক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। এখন তাঁহার কথিত ও সূচিত সেই সমস্ত যুক্তিরও যথাসম্ভব ব্যাখ্যা কর্ত্তব্য।

মহর্ষি গৌতম প্রথমে আত্ম-পরীক্ষায় ইন্দ্রিয়াত্ম-বাদের খণ্ডন করিতে প্রথম সূত্র বলিয়াছেন—

দর্শনস্পর্শনাভ্যামেকার্থ-গ্রহণাৎ। ৩।১।১

অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা এবং ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা এক বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হওয়ায় আত্মা ইন্দ্রিয় নহে। তাৎপর্য্য এই যে, কেহ কোন বিষয়কে চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা দর্শন করিয়া ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা উহার ত্বাচ-প্রত্যক্ষ করিলে পরে তাহার এইরূপ জ্ঞান জন্মে যে,—যে আমি চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা ইহা দেখিয়াছি, সেই আমিই—ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছি। অতএব বুঝা যায় যে, উক্তস্থলে তাহার চক্ষুরিন্দ্রিয় ও ত্বগিন্দ্রিয় যথাক্রমে পূর্ব্বজাত প্রত্যক্ষদ্বয়ের কর্ত্তা নহে; কিন্তু তদ্ভিন্ন কোন এক পদার্থই ঐ প্রত্যক্ষদ্বয়ের কর্ত্তা। সুতরাং সেই পদার্থই আত্মা। কারণ, যে পদার্থ জ্ঞাতা অর্থাৎ জ্ঞানের আশ্রয়, তাহাই আত্মা। গৌতমের মতে জীবাত্মাতেই প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান জন্মে, ইহা মনে রাখিতে হইবে। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে।

পরন্তু আমি চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা দর্শন করিতেছি, ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা ত্বাচ-প্রত্যক্ষ করিতেছি,—ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করিতেছি, ইত্যাদি প্রকারে আমাদিগের যে, ঐ সমস্ত জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ জন্মে, তদ্দ্বারাও বুঝা যায় যে, আত্মা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন। কারণ, করণ হইতে কর্ত্তা ভিন্ন পদার্থ। নচেৎ চক্ষু আমি দেখিতেছি, কর্ণ আমি শুনিতেছি, এইরূপে আমার দর্শনাদি জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ জন্মে

না কেন? বিবক্ষাবশতঃ কখনও চক্ষু দেখিতেছে, কর্ণ শুনিতেছে, এই-রূপ বাক্য-প্রয়োগ হইলেও ঐরূপে কাহারও দর্শনাদি জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ জন্মে না। আমি কাণ, আমি অন্ধ, আমি বধির, এইরূপে যে বোধ হয়, তদ্দ্বারাও চক্ষুবাদি ইন্দ্রিয়ই আত্মা, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। কারণ ঐরূপ বোধ ভ্রমাত্মক। পরন্তু আমার চক্ষু কাণ বা অন্ধ, আমার কর্ণ বধির, এইরূপ বোধও হইয়া থাকে। সুতরাং যাহার চক্ষু কাণ বা অন্ধ, এই রূপ অর্থেই সেই ব্যক্তিতে কাণ বা অন্ধ শব্দের প্রয়োগ হয়, ইহাই বলিতে হইবে।

গৌতম পরে পূর্ব্বপক্ষ সূত্র বলিয়াছেন—**ন বিষয়-ব্যবস্থানাৎ**। অর্থাৎ আত্মা ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন নহে। যে হেতু ইন্দ্রিয়বর্গের বিষয়-নিয়ম আছে। অতএব ইন্দ্রিয়বর্গই নিজ নিজ বিষয়ের প্রত্যক্ষকর্ত্তা আত্মা। এই পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করিতে গৌতম বলিয়াছেন—

তদ্ব্যবস্থানাদেবাত্ম-সদ্ভাবাদপ্রতিষেধঃ॥ ৩।১।৩

অর্থাৎ ঘ্রাণাদি পঞ্চ বহিরিন্দ্রিয়ের বিষয়-নিয়মবশতঃই ইন্দ্রিয় ভিন্ন আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ হওয়ায় উহার প্রতিষেধ হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, গন্ধাদি পঞ্চ বিষয়ের মধ্যে গন্ধই ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয় এবং রসই রসনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয় এবং রূপই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয় এবং স্পর্শই ত্বগিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয় এবং শব্দই শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়—এইরূপ নিয়ম থাকায় প্রতিপন্ন হয় যে, কোন বহিরিন্দ্রিয় গন্ধাদি সর্ব্ব-বিষয়ের জ্ঞাতা হইতে পারে না। কিন্তু তদ্‌ভিন্ন কোন এক পদার্থই ঐ সমস্ত বিষয়ের প্রত্যক্ষকর্ত্তা আত্মা। পরন্তু যে আমি গন্ধের প্রত্যক্ষ করিতেছি, সেই আমিই রূপাদি বিষয়ের প্রত্যক্ষ করিতেছি, এইরূপ মানস প্রত্যক্ষের দ্বারা ঐ সমস্ত বিষয়ের জ্ঞাতা এক আত্মাই সিদ্ধ হয়।

ইন্দ্রিয়াত্মবাদ খণ্ডন করিতে গৌতম পরে আবার বলিয়াছেন—

সব্যদৃষ্টস্যেতরেণ প্রত্যভিজ্ঞানাৎ ॥ ৩।১।৯

'সব্যেন বামেন চক্ষুষা দৃষ্টস্য ইতরেণ দক্ষিণেন চক্ষুষা প্রত্যভিজ্ঞানাৎ' —অর্থাৎ বাম চক্ষুর দ্বারা দৃষ্ট বিষয়ের দক্ষিণ চক্ষুর দ্বারা প্রত্যভিজ্ঞা হওয়ায় চক্ষুরিন্দ্রিয় আত্মা নহে।

তাৎপর্য্য এই যে, ইন্দ্রিয়কে আত্মা বলিলে চক্ষুরিন্দ্রিয়কেই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের কর্ত্তা আত্মা বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে বাম চক্ষুর দ্বারা দৃষ্ট বিষয়ের দক্ষিণ চক্ষুর দ্বারা যে প্রত্যভিজ্ঞা হয়,—তাহা হইতে পারে না। কারণ, দক্ষিণ চক্ষু সে বিষয় পূর্ব্বে দেখে নাই। যে যাহা পূর্ব্বে দেখে নাই, সে তাহা প্রথমে দেখিলে তাহার 'সোঽয়ং' অর্থাৎ সেই পূর্ব্বদৃষ্ট বিষয় এই,—এইরূপে সেই প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে না। উক্তরূপ প্রত্যক্ষের নাম **প্রত্যভিজ্ঞা**। পূর্ব্বদৃষ্ট বিষয়ের সংস্কার জন্য স্মরণ ব্যতীত ঐরূপ প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে না। কিন্তু কেহ কোন বিষয়কে পূর্ব্বে বাম চক্ষুর দ্বারা দেখিয়া পরে সেই বাম চক্ষু বিনষ্ট হইলেও দক্ষিণ চক্ষুর দ্বারাও সেই বিষয়কে 'সোঽয়ং' এইরূপে প্রত্যক্ষ করে। অতএব চক্ষুরিন্দ্রিয়কে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের কর্ত্তা আত্মা বলা যায় না।

পরন্তু কাহারও চক্ষুরিন্দ্রিয় সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইলেও সেই ব্যক্তি তাহার পূর্ব্বদৃষ্ট অনেক বিষয় স্মরণ করিয়া বলে। কিন্তু সেই স্মরণ কর্ত্তা কে? বিনষ্ট চক্ষুরিন্দ্রিয়কে অথবা বর্ত্তমান অন্য কোন ইন্দ্রিয়কে সেই বিষয়ের স্মরণ-কর্ত্তা বলাই যায় না। অতএব ইন্দ্রিয় ভিন্ন কোন স্থায়ী পদার্থকে পূর্ব্বে সেই বিষয়ের দ্রষ্টা ও পরে স্মরণ কর্ত্তা বলিতে হইবে। সেই পদার্থই আত্মা।

ইন্দ্রিয় আত্মা নহে,—এই সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করিতে গৌতম পরে বলিয়াছেন—

ইন্দ্রিয়ান্তর-বিকারাৎ। ৩।১।১২

তাৎপর্য্য এই যে, কোন অম্লরসবিশিষ্ট ফলের রূপ দর্শন বা গন্ধ গ্রহণ হইলে তখন কাহারও রসনেন্দ্রিয়ের বিকার জন্মে অর্থাৎ জিহ্বায় জলের আবির্ভাব হয়। কিন্তু কেন তখন তাহার জিহ্বা জলার্দ্র হয়? ইহা বিচার করিলে বুঝা যায় যে, তখন তাহার সেই পূর্ব্বানুভূত অম্ল-রসের স্মরণ হওয়ায় তজ্জাতীয় রসাস্বাদে অভিলাষরূপ লোভ জন্মে। নচেৎ উহা হইতে পারে না। কারণ, যাহার তখন তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র লোভ জন্মে না, তাহার সেই ফল দেখিলেও ঐরূপ রসনেন্দ্রিয়ের বিকার হয় না, ইহা পরীক্ষিত সত্য। কিন্তু যাহার সেই ফলের রসাস্বাদে লোভ জন্মে, তাহার পূর্ব্বানুভূত তজ্জাতীয় রসের স্মরণ আবশ্যক। নচেৎ তাহার তদ্বিষয়ে লোভ জন্মিতে পারে না। সুতরাং উক্তস্থলে সেই অম্লরসের স্মরণকর্ত্তা কে? ইহা বিচার করিয়া বলা আবশ্যক।

সেই ব্যক্তির চক্ষুরিন্দ্রিয় অথবা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ই সেখানে সেই অম্লরসের স্মরণ করে, ইহা বলা যায় না, কারণ ঐ ইন্দ্রিয়দ্বয় কখনও অম্লরসের অনুভব করে নাই। অম্লরস চক্ষু বা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়ই নহে। সেই ব্যক্তির রসনেন্দ্রিয়ই উক্ত স্থলে পূর্ব্বানুভূত অম্লরসের স্মরণ করিয়া তজ্জাতীয় রসাস্বাদে অভিলাষী হয়, ইহাও বলা যায় না। কারণ, উক্ত স্থলে সেই ব্যক্তির রসনেন্দ্রিয় সেই ফলের রূপ দর্শনও করে নাই— গন্ধ গ্রহণও করে নাই। রূপ বা গন্ধ তাহার গ্রাহ্য বিষয়ই নহে। কিন্তু যে অম্লফলের রূপ দর্শন বা গন্ধ গ্রহণ করে, তাহারই সেখানে পূর্ব্বানুভূত অম্লরসের স্মরণ হওয়ায় রসনেন্দ্রিয়ের পূর্ব্বোক্তরূপ বিকার হইতে পারে এবং কাহারও তাহা হইয়া থাকে। অন্যের ঐরূপ হয় না। অতএব প্রতিপন্ন হয় যে, উক্ত স্থলে ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন কোন পদার্থই সেই অম্লফলের রূপ দর্শন বা গন্ধ গ্রহণ করিয়া তাহার পূর্ব্বানুভূত অম্লরসের স্মরণ করিয়া তজ্জাতীয় রসাস্বাদে অভিলাষী হয়। সেই পদার্থই আত্মা।

কেহ যদি বলেন, যে, স্মরণীয় বিষয়েই স্মৃতি জন্মে। আত্মা স্মরণীয় বিষয় নহে। সুতরাং তাহাতে কোন স্মৃতি জন্মে না। অতএব স্মৃতির দ্বারা পৃথক্ আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয় না। মহর্ষি গৌতম পরে নিজেই উক্ত পূর্ব্বপক্ষের উল্লেখপূর্ব্বক উহার খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন—

তদাত্ম-গুণত্বসদ্ভাবাদপ্রতিষেধঃ ॥ ৩।১।১৪

তাৎপর্য্য এই যে, স্মৃতি জ্ঞানবিশেষ, সুতরাং উহা গুণ-পদার্থ। কিন্তু উহা আত্মার গুণ হইলেই উহার উপপত্তি হয়, অর্থাৎ চিরস্থায়ী আত্মা ব্যতীত আর কোন পদার্থকেই স্মৃতির আশ্রয় বা আধার বলা যায় না। স্মরণীয় বিষয়কে স্মৃতির আধার বলা যায় না। কারণ বিনষ্ট বিষয়েও স্মৃতি জন্মিতেছে। কিন্তু যাহা বিনষ্ট, যাহা নাই, তাহা কখনই স্মৃতির আধার হইতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ই ভিন্ন ভিন্ন অনুভব জন্য ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার ও তজ্জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতির আধার হয়, ইহাও বলা যায় না। কারণ, কোন ইন্দ্রিয়ের ধ্বংস হইলেও তদ্দ্বারা পূর্ব্বানুভূত সেই বিষয়ের স্মৃতি জন্মে। বিনষ্ট ইন্দ্রিয় কখনই সেই স্মৃতির আধার হইতে পারে না। অতএব ইন্দ্রিয় আত্মা নহে।

দেহও আত্মা নহে

নাস্তিকশিরোমণি চার্ব্বাক বলিয়াছেন যে, দেহই স্মৃতির আধার; কারণ দেহই আত্মা, দেহই স্মরণ করে। কিন্তু ইহাও বলা যায় না। কারণ, বাল্য যৌবনাদিভেদে দেহেরও ভেদ হয়। আমার বাল্যকালে যে শরীর ছিল, এই বৃদ্ধকালে সেই শরীর নাই। শরীরের পরিমাণভেদ-প্রযুক্তও শরীরের ভেদ স্বীকার্য্য। সুতরাং অন্যান্য পরমাণুর সংযোগে আমার যে পৃথক্ শরীরের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহাও স্বীকার্য্য। তাহা হইলে আমি আমার বাল্যকালে দৃষ্ট কত বিষয় এখনও কেন স্মরণ করিতেছি?

আমি কে ? এই দেহই আমি হইলে বৃদ্ধকালীন এই দেহ কখনই তাহা স্মরণ করিতে পারে না। কারণ, এই দেহ বাল্যকালে না থাকায় ইহা তখন সেই সমস্ত বিষয় দর্শন করে নাই। সুতরাং তজ্জন্য কোন সংস্কারও এই দেহে নাই।

যদি বল যে, আমার বাল্যকালীন সেই শরীরে তৎকালে সেই সমস্ত বিষয়ের দর্শন জন্য যে সমস্ত সংস্কার জন্মিয়াছিল, তাহাই আমার এই দেহে সংক্রান্ত হওয়ায়, তজ্জন্যই আমার এই ভিন্ন দেহরূপ আত্মাও সেই সমস্ত বিষয় স্মরণ করে। কিন্তু ইহাও বলা যায় না। কারণ, সংস্কারের গতিক্রিয়া না থাকায় তাহার এক দেহ হইতে অন্য দেহে গতিবিশেষরূপ সংক্রম হইতে পারে না। আর তাহা হইলে মাতার কুক্ষিস্থ শিশুর শরীরেও মাতার শরীরস্থ সংস্কার সংক্রান্ত হয় না কেন ? সেই শিশুও পরে তাহার মাতার অনুভূত বিষয়ও স্মরণ করে না কেন ?

যদি বল, উপাদান-কারণ যে শরীর, তদ্‌গত সংস্কারই তাহার কার্য্যরূপ অন্য শরীরে সংক্রান্ত হয়, ইহাই নিয়ম। মাতার শরীর তাহার কুক্ষিস্থ শিশুর শরীরের উপাদান-কারণ নহে। কিন্তু ইহা বলিলে বাল্যকালীণ শরীরস্থ সংস্কারও বৃদ্ধকালীন শরীরে সংক্রান্ত হইতে পারে না। কারণ বাল্যকালীন সেই শরীর বহু পূর্ব্বে বিনষ্ট হওয়ায় তাহা কখনই বৃদ্ধকালীন শরীরের উপাদান-কারণ হইতে পারে না। যদি বল, বৃদ্ধকালীন শরীরে তজ্জাতীয় অন্য সংস্কারের উৎপত্তিই হইয়া থাকে, উহাই সংস্কারের সংক্রম। কিন্তু ইহাও বলা যায় না। কারণ, তাহাতে তজ্জাতীয় অন্য সংস্কারের উৎপাদক কারণ নাই। বৃদ্ধকালীন দেহ সেই সমস্ত বিষয়ের দর্শন না করায় তাহাতে তদ্বিষয়ে অন্য সংস্কারও জন্মিতে পারে না। যে যাহা কখনও অনুভব করে নাই, তাহার সে বিষয়ে কোন সংস্কারই জন্মিতে পারে না, ইহা সকলেরই স্বীকৃত সত্য। অতএব স্মৃতি দেহেরই গুণ, দেহই আত্মা, ইহাও কখনও বলা যায় না।

চৈতন্য বা জ্ঞান যে, শরীরের বিশেষ গুণ নহে অর্থাৎ শরীরই জ্ঞাতা বা আত্মা নহে,—ইহা সমর্থন করিতে মহর্ষি গৌতম পরে বলিয়াছেন—

যাবচ্ছরীরভাবিত্বাদ্রূপাদীনাম্ ॥ ৩।২।৪৭ ॥

তাৎপর্য্য এই যে,—যে কাল পর্য্যন্ত শরীর বিদ্যমান থাকে, সেই কাল পর্য্যন্ত তাহাতে কোন প্রকার রূপ, রস প্রভৃতি বিশেষ গুণও বিদ্যমান থাকে। অতএব জ্ঞান যদি শরীরেরই বিশেষ গুণ হয়, তাহা হইলে শরীর বিদ্যমান থাকা পর্য্যন্ত তাহাতে কোন প্রকার জ্ঞানও বিদ্যমান থাকিবে। শরীর কখনও জ্ঞানরূপ বিশেষ গুণ-শূন্য হইতে পারে না। কিন্তু শরীর বিদ্যমান থাকিলেও কোন কোন সময়ে তাহাতে কোন জ্ঞানই থাকে না। অতএব জ্ঞান শরীরের বিশেষ গুণ নহে।

দেহাত্মবাদী অবশ্যই বলিবেন যে, শরীরের সমস্ত বিশেষ গুণই রূপাদির ন্যায় শরীরস্থিতি পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে—এইরূপ নিয়মের কোন প্রমাণ নাই; শরীরের সমস্ত বিশেষ গুণই ত একজাতীয় নহে। সুতরাং শরীরে অস্থায়ী বিশেষ গুণও থাকিতে পারে। তাই মহর্ষি গৌতম পরে আবার বলিয়াছেন—

শরীরব্যাপিত্বাৎ ॥ ৩।২।৫০ ॥

অর্থাৎ জ্ঞান শরীরব্যাপী, শরীরের সর্ব্বাংশেই জ্ঞান জন্মে। অতএব জ্ঞান শরীরেরই বিশেষ গুণ—ইহা বলা যায় না। তাৎপর্য্য এই যে, শরীরের হস্তপদাদি সমস্ত অবয়বেই যখন জ্ঞান জন্মে, তখন সেই সমস্ত অবয়বকেই জ্ঞানের আধার বলিলে প্রত্যেক শরীরেই ভিন্ন ভিন্ন বহু জ্ঞাতা বা আত্মা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু হস্তপদাদি ভিন্ন

ভিন্ন অবয়বগুলি সমস্তই পৃথক্ পৃথক্ আত্মা—ইহা নিষ্প্রমাণ। পরন্তু যে আমি হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিতেছি, সেই আমিই চক্ষুর দ্বারা দর্শন করিতেছি, কর্ণ দ্বারা শুনিতেছি—এইরূপ বোধই জন্মে। প্রত্যেক শরীরেই যে, ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের কর্ত্তা বহু আত্মা—ইহা সকলেরই অনুভব-বিরুদ্ধ। আর প্রত্যেক শরীরেই বহু আত্মা স্বীকার করিলে সর্ব্বকার্য্যে সকলের ঐকমত্য কখনই সম্ভব না হওয়ায় কোন আত্মারই সর্ব্বকার্য্য-নির্ব্বাহ হইতে পারে না। পরন্তু অনেক সময়ে সকলের বৈমত্যমূলক বিরোধবশতঃ বহু অনর্থপাতেরও আপত্তি হয়। পরন্তু শরীরের প্রত্যেক অবয়বই জ্ঞাতা হইলে কোন ব্যক্তি যখন অপরকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করে, তখন তাহার সেই হস্তেই ত্বাচ প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞান ও তজ্জন্য সংস্কার জন্মে—ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু পরে কখনও সেই ব্যক্তির সেই হস্ত ছিন্ন হইলেও সেই ব্যক্তি কিরূপে তাহাকে স্মরণ করে? তাহার সেই পূর্ব্বোৎপন্ন প্রত্যক্ষের কর্ত্তা সেই হস্ত ত তখন তাহার নাই। তাহার সেই হস্তস্থিত সেই সংস্কার যে, তাহার অন্য কোন অবয়বে সংক্রান্ত হইতে পারে না, ইহার কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

পরন্তু শরীরেই চৈতন্য বা জ্ঞান জন্মে—ইহা বলিলে সেই শরীর-নির্ব্বাহক মূল পরমাণুতেও চৈতন্য স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, মূল-পরমাণুতে চৈতন্য না থাকিলে তাহার কার্য্যরূপ শরীরে চৈতন্য জন্মিতে পারে না। জ্ঞানেরই অপর নাম চৈতন্য এবং উহা গুণ পদার্থ। কিন্তু উপাদান কারণে যে বিশেষ গুণ থাকে, তাহাই তাহার কার্য্যদ্রব্যে তজ্জাতীয় বিশেষ গুণ উৎপন্ন করে। সুতরাং শরীরের সাক্ষাৎ উপাদান-কারণ হস্তপদাদির ন্যায় তাহার মূল পরমাণুতেও চৈতন্য স্বীকার্য্য। কিন্তু সেই মূল পরমাণুতে কিরূপে চৈতন্য জন্মিবে? চার্ব্বাক নিত্য চৈতন্য মানেন না; তাঁহার মতে সমস্তই অনিত্য। পরন্তু পরমাণুতে চৈতন্য

স্বীকার করিলে ঘট পটাদি সমস্ত জড় বস্তুকেও চেতন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু চার্ব্বাকও তাহা স্বীকার করেন না। সুতরাং শরীরেই চৈতন্য জন্মে, শরীরই জ্ঞাতা আত্মা, ইহা কিছুতেই বলা যায় না।

নাস্তিক-শিরোমণি চার্ব্বাক অতীন্দ্রিয় কোন পদার্থ মানেন নাই। সুতরাং তাঁহার মতে অতীন্দ্রিয় পরমাণু নাই; কিন্তু তিনি ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ু—এই চতুর্ভূত স্বীকার করিয়া তাহার অতি সূক্ষ্ম অংশও অবশ্য স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে,—যেমন গুড় ও তণ্ডুলে মাদকত্ব না থাকিলেও ঐ উভয় দ্রব্যের মিশ্রণে উৎপন্ন দ্রব্যে মাদকত্ব জন্মে, তদ্রূপ অতি সূক্ষ্ম চতুর্ভূতে চৈতন্য না থাকিলেও তাহাদিগের বিলক্ষণ সংযোগে উৎপন্ন শরীরে চৈতন্য জন্মে।

কিন্তু চার্ব্বাকের এই কথাও অগ্রাহ্য। কারণ, গুড় ও তণ্ডুলে একেবারেই মদশক্তি বা মাদকত্ব না থাকিলে ঐ উভয় দ্রব্যের মিশ্রণে উৎপন্ন মদ্যে কখনই মাদকত্ব জন্মিতে পারে না। তাহা হইলে যে কোন উভয় দ্রব্যের মিশ্রণে উৎপন্ন দ্রব্যমাত্রই মদ্যের ন্যায় মাদক কেন হয় না? ফল কথা, চৈতন্য বা জ্ঞানকে শরীরের গুণ বলিতে হইলে শরীরের হস্ত-পদাদি প্রত্যেক অবয়ব এবং তাহার মূল পরমাণুতেও চৈতন্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাহা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না; সুতরাং স্মৃতি নামক জ্ঞান যে, শরীরের গুণ—ইহাও বলা যায় না। পরন্তু নবজাত শিশুর প্রথম স্তন্যপানাদিতে ইচ্ছার কারণ—যে স্মৃতিবিশেষ, তাহা তাহার সেই শরীরে তখন জন্মিতেই পারে না। কারণ তৎপূর্ব্বে তাহার সেই শরীর কখনও স্তন্যপানাদিকে নিজের ইষ্টজনক বলিয়া অনুভব করে নাই। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে। ফল কথা, দেহও আত্মা নহে।

মন ও আত্মা নহে

পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, যে সমস্ত যুক্তির দ্বারা চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয় ও শরীর হইতে ভিন্ন আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে, সেই সমস্ত যুক্তির দ্বারা চিরস্থায়ী নিত্য মনেরই আত্মত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। অর্থাৎ চৈতন্য বা জ্ঞান, মনেরই গুণ—মনই জ্ঞাতা—ইহা বলা যায়। মহর্ষি গৌতম পরে নিজেই এই পূর্ব্বপক্ষের উল্লেখ করিয়া তদুত্তরে বলিয়াছেন—

জ্ঞাতুর্জ্ঞানসাধনোপপত্তেঃ সংজ্ঞাভেদমাত্রম্ ॥ ৩।১।১৬ ॥

তাৎপর্য্য এই যে—যে পদার্থ জ্ঞানের কর্ত্তা বা জ্ঞাতা, তাহার সমস্ত জ্ঞানেরই সাধন বা করণ আছে। নচেৎ তাহার কোন জ্ঞানই জন্মিতে পারে না। সুতরাং সেই জ্ঞাতার সুখ-দুঃখাদির প্রত্যক্ষেরও কোন করণ অবশ্য স্বীকার্য্য, তাহারই নাম **মন**। সুতরাং উহা জ্ঞানের কর্ত্তা বা জ্ঞাতা হইতে পারে না। কারণ, কর্ত্তা ও করণ ভিন্ন পদার্থ। তবে যদি জ্ঞাতাকে মন বলিয়া উহার সুখ-দুঃখাদি ভোগের করণ—পৃথক্ কোন অন্তরিন্দ্রিয়, অন্য নামে স্বীকার কর, তাহা হইলে নামভেদমাত্রই হইবে, পদার্থের কোন ভেদ হইবে না। কারণ সুখ-দুঃখাদি ভোগের কর্ত্তা এবং উহার করণ পৃথক্‌রূপে স্বীকৃত হইতেছে। কিন্তু সুখ-দুঃখাদি ভোগের করণরূপে যে অন্তরিন্দ্রিয় 'মন' নামে স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাকেই জ্ঞাতা বলা যাইবে না। কারণ উহা করণরূপেই সিদ্ধ হইয়াছে।

পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে,—জ্ঞাতার বাহ্য বিষয়ের প্রত্যক্ষেই করণ আছে, কিন্তু সুখ-দুঃখাদির প্রত্যক্ষে কোন করণ নাই। সুতরাং মনকে জ্ঞানের কর্ত্তাই বলিব। এতদুত্তরে মহর্ষি গৌতম পরে বলিয়াছেন—

নিয়মশ্চ নিরনুমানঃ ॥ ৩।১।১৭ ॥

তাৎপর্য্য এই যে, বাহ্ বিষয়ের প্রত্যক্ষে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় করণ, কিন্তু সুখ-দুঃখাদি-প্রত্যক্ষের কোন করণ নাই—এইরূপ নিয়ম নিষ্প্রমাণ। পরন্তু আমাদিগের বাহ্য বিষয়ের প্রত্যক্ষের ন্যায় সুখ-দুঃখাদির প্রত্যক্ষেরও অবশ্য কোন করণ আছে,—ইহাই অনুমান-প্রমাণসিদ্ধ। সেই করণই "মন" নামে কথিত হইয়াছে। সুতরাং উহাকে জ্ঞানের কর্ত্তা বা জ্ঞাতা বলা যায় না। কারণ, যাহা জ্ঞানেব করণ, তাহা জ্ঞানের কর্ত্তা হইতে পারে না। পরন্তু আমি চক্ষুর দ্বারা রূপ দর্শন করিতেছি, ঘ্রাণের দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করিতেছি, ইত্যাদি প্রকার মানস-প্রত্যক্ষের পরে যেমন চক্ষুরাদি করণকে জ্ঞানের কর্ত্তা হইতে ভিন্ন বলিয়াই বুঝা যায়, তদ্রূপ, আমি মনের দ্বারা সুখবোধ করিতেছি, দুঃখবোধ করিতেছি,—ইত্যাদি প্রকার মানস-প্রত্যক্ষের পরে মনকেও জ্ঞাতা হইতে ভিন্ন বলিয়াই বুঝা যায়। সুতরাং মন জ্ঞাতা নহে অর্থাৎ জ্ঞান মনের গুণ নহে। গৌতম পরে তদ্বিষয়ে আরও অনেক যুক্তি বলিয়াছেন।

এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, মহর্ষি গৌতম মনকে অতি সূক্ষ্ম পদার্থ বলিয়া সমর্থন করায় তদ্দ্বারাও জ্ঞানাদি যে, মনের ধর্ম্ম নহে অর্থাৎ মন জ্ঞাতা নহে,—ইহা প্রকটিত হইয়াছে। কারণ, অতিসূক্ষ্ম দ্রব্যের ন্যায় তদ্‌গত গুণাদিরও লৌকিক প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং জ্ঞান ও সুখ-দুঃখাদি মনের ধর্ম্ম হইলে সেই জ্ঞানাদির লৌকিক মানস প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। পরন্তু অতি সূক্ষ্ম মন জ্ঞাতা হইলে উহা শরীরের সর্ব্বাংশে বিদ্যমান না থাকায় সর্ব্ব শরীরে কখনও সেই মনন কোন জ্ঞান জন্মিতে পারে না। কিন্তু অনেক সময়ে শরীরের সর্ব্বাংশেই আত্মাতে জ্ঞান জন্মে। প্রবল শীতার্ত্ত ব্যক্তি সর্ব্বশরীরেই শীত বোধ করে। পীড়া বিশেষ হইলে রোগী সর্ব্বশরীরেই বেদনা বা ক্লেশ বোধ করে। সুতরাং সর্ব্বশরীরেই যে বোদ্ধা আত্মা আছে—ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু

মন আত্মা হইলে শরীরের সর্ব্বত্র উহার সত্তা সম্ভব হয় না। অতএব মন আত্মা নহে। আত্মা আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী। বৈশেষিক দর্শনে কণাদ বলিয়াছেন,—বিভবান্মহানাকাশস্তথাচাত্মা। (৭।১।২২) "বিভবাৎ" অর্থাৎ বিভুত্ব (সর্ব্বব্যাপিত্ব) বশতঃ আকাশ মহান্, সেইরূপ জীবাত্মাও মহান্। ন্যায়-সূত্রকার গৌতমেরও উহাই মত। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে।

---

* অবশ্য জীব অণু,—ইহাও প্রাচীন মত আছে। বৈষ্ণব দার্শনিকগণ উক্ত মতই সিদ্ধান্তরূপে সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু ন্যায়বৈশেষিকাদি সম্প্রদায়ের মতে প্রত্যেক জীবাত্মাই আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী। শ্রীভগবান্ও জীবাত্মার স্বরূপবর্ণনেই বলিয়াছেন—"নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ" (গীতা ২।২৪)। বিষ্ণুপুরাণেও স্পষ্ট কথিত হইয়াছে—"পুমান্ সর্ব্বগতো ব্যাপী আকাশবদয়ং যতঃ" ইত্যাদি (২।১৫।২৪)। উক্ত মতে নির্ব্বিকার নিরবয়ব জীবাত্মার সঙ্কোচ বিকাশ ও গতাগতি সম্ভবই নহে। সাংখ্যাদি সম্প্রদায়ের মতে জীবের স্থূল শরীর হইতে সূক্ষ্ম শরীরেরই উৎক্রান্তি ও গতাগতি হয় এবং উহাই শাস্ত্রে জীবের উৎক্রান্তি ও গতাগতি বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু কণাদ ও গৌতম সূক্ষ্ম শরীরের উল্লেখ না করায় তাঁহাদিগের মতে জীবের মনই সূক্ষ্ম শরীর স্থানীয়—ইহা বুঝা যায়। প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদও বলিয়াছেন যে, জীবের মৃত্যুর পরক্ষণে উৎপন্ন আতিবাহিক শরীরবিশেষের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জীবের সেই মনই পরলোকে গমন করে। অর্থাৎ স্থূল শরীর হইতে সেই মনেরই উৎক্রান্তি এবং পরলোকে গতি ও সময়ে ইহলোকে উৎপন্ন স্থূল শরীরের মধ্যে আগতি হয়। জীবাত্মার উপাধি সেই অন্তঃকরণ বা মনের সূক্ষ্মত্ব গ্রহণ করিয়াই শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে জীবকে অণু বলা হইয়াছে। কোন স্থলে জীবাত্মা দুর্জ্ঞেয়, এই তাৎপর্য্যেও তাহাকে অণু বলা হইয়াছে। শারীরকভাষ্যে (২।৩।২০) আচার্য্য শঙ্করও শেষে ঐরূপ কথাই বলিয়াছেন।

পঞ্চম অধ্যায়

জীবাত্মার নিত্যত্ব ও পূর্ব্বজন্মের সাধক যুক্তি

পূর্ব্বোক্ত নানা যুক্তির দ্বারা জীবাত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন, ইহা প্রতিপন্ন হইলেও জীবাত্মা যে নিত্য অর্থাৎ তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই—ইহা প্রতিপন্ন হয় না। তাই মহর্ষি গৌতম জীবাত্মার নিত্যত্ব-সাধক যুক্তি প্রকাশ করিতে পরে (৩।১।১৮) বলিয়াছেন—

পূর্ব্বাভ্যস্ত-স্মৃত্যনুবন্ধাজ্জাতস্য হর্ষ-ভয়-শোক-সম্প্রতিপত্তেঃ।

অর্থাৎ—নবজাত শিশুর হর্ষ, ভয় ও শোকের প্রাপ্তি হওয়ায় আত্মা নিত্য—ইহা অনুমান প্রমাণ-সিদ্ধ হয়। কারণ হর্ষ, ভয় ও শোক পূর্ব্বাভ্যস্ত বিষয়ের অনুস্মরণ জন্য উৎপন্ন হয়। তাৎপর্য্য এই যে,—নবজাত শিশুর হাস্য দেখিলে অনুমিত হয় যে, তাহার হর্ষ জন্মিয়াছে এবং তাহার শরীরে কম্প দেখিলে অনুমিত হয় যে, তাহার ভয় জন্মিয়াছে এবং তাহার রোদন শুনিলে অনুমিত হয় যে, তাহার শোক বা কোন দুঃখ জন্মিয়াছে। অভিলষিত বিষয়ের প্রাপ্তি হইলে যে সুখ জন্মে, তাহার নাম হর্ষ এবং অভিলষিত বিষয়ের অপ্রাপ্তি বা অভাবে যে দুঃখবিশেষ জন্মে, তাহার নাম শোক। কিন্তু কোন বিষয়কে নিজের ইষ্টজনক বলিয়া না বুঝিলে সে বিষয়ে কাহারও অভিলাষ বা আকাঙ্ক্ষা জন্মে না। সুতরাং নবজাত শিশুও যে তখন কোন বিষয়কে তাহার ইষ্টজনক বলিয়া বুঝিয়াই সে বিষয়ে অভিলাষী হয় এবং সেই বিষয়ের প্রাপ্তিতে হৃষ্ট এবং অপ্রাপ্তি বা অভাবে দুঃখিত হয়,—ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু সেই জন্মে প্রথমে তাহার এইরূপ বোধ সম্ভব হয় না। অতএব ইহা

স্বীকার্য্য যে—নবজাত শিশুর সেই আত্মা নিত্য। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে তাহার ঐরূপ বিষয়কে ইষ্টজনক বলিয়া বোধ হওয়ায় সেই বোধ জন্য সংস্কার-বশতঃ ইহজন্মেও প্রথমে তাহার সেই বিষয়ে ইষ্টজনকত্বের স্মৃতি জন্মে। সেই স্মৃতিরূপ জ্ঞান-জন্যই তাহার তজ্জাতীয় বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা জন্মে।

গৌতম পরে পূর্ব্বপক্ষ সূত্র বলিয়াছেন—**পদ্মাদিষু প্রবোধ-সংমীলনবৎ তদ্বিকারঃ॥** অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষ-বাদী বলিতে পারেন যে, নবজাত শিশুর হাস্যাদি, পদ্মাদির বিকাস ও মুদ্রণের ন্যায় তাহার দেহেরই তৎকালীন বিকার বা অবস্থাবিশেষ। উহার দ্বারা তাহার হর্ষাদির অনুমান হইতে পারে না। এতদুত্তরে গৌতম বলিয়াছেন—

নোষ্ণ-শীত-বর্ষাকালনিমিত্তত্বাৎ পঞ্চাত্মকবিকারাণাং। ৩।১।২০

অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত কথা বলা যায় না। কারণ পাঞ্চভৌতিক দ্রব্য পদ্মাদির সংকোচ ও বিকাস প্রভৃতি যে সমস্ত বিকার, তাহাও স্বাভাবিক নহে। তাহারও নিমিত্ত বা কারণ আছে। উষ্ণ, শীত ও বর্ষাকাল প্রভৃতিই তাহার নিমিত্ত। কিন্তু নবজাত শিশুর ঐ হাস্য, কম্প ও রোদনের নিমিত্ত কি? ইহা বলা আবশ্যক। পদ্মের ন্যায় সূর্য্যকিরণের সংযোগে ঐ শিশুর মুখ-বিকাস হয় না এবং রাত্রিকালে পদ্মের ন্যায় ঐ শিশুর নিয়ত মুখ-মুদ্রণও হয় না। সময়বিশেষে অন্য কোন কারণে তাহার মুখবিকাসাদি জন্মিলেও অনেক সময়ে তাহার প্রকৃত হাস্য, কম্প ও রোদন যে—যথাক্রমে হর্ষ, ভয় ও শোকজন্য—ইহা স্বীকার্য্য। সেই হাস্যাদির অন্য কোন কারণ বলা যায় না। আর যুবক ও বৃদ্ধ প্রভৃতি সকলের পক্ষেই হর্ষ ও শোক, যেরূপ হাস্য ও রোদনের কারণ বলিয়া সর্ব্বসম্মত; নবজাত শিশুর পক্ষেও তাহাই স্বীকার না করিয়া অভিনব কোন কারণ কল্পনা করিলে তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না। অতএব নবজাত শিশুর ঐ হাস্য ও রোদনের দ্বারা তাহার হর্ষ ও শোকের

অনুমান হওয়ায় তদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপে তাহার পূর্ব্বজন্ম সিদ্ধ হইলে আত্মার নিত্যত্বই সিদ্ধ হয়।

এইরূপ নবজাত শিশুর ভয়ের দ্বারাও তাহার পূর্ব্বজন্ম সিদ্ধ হওয়ায় আত্মার নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়। শ্রীমদ্ বাচস্পতি মিশ্র ইহা সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, নবজাত শিশু কখনও মাতার ক্রোড় হইতে কিছু স্খলিত হইলেই তখনই রোদন পূর্ব্বক কম্পিতকলেবরে হস্তদ্বয় বিক্ষিপ্ত করিয়া মাতার বক্ষঃস্থ মঙ্গলসূত্র জড়াইয়া ধরে—ইহা দেখা যায়। কিন্তু কেন সে ঐরূপ করে? যুবক ও বৃদ্ধ প্রভৃতির ন্যায় নবজাত শিশুও পতন-ভয়ে ভীত হইয়া পতন নিবারণের জন্য কেন ঐরূপ চেষ্টা করে? পতন যে দুঃখের কারণ, এইরূপ বোধ ব্যতীত তাহার তখন ভয়, দুঃখ এবং ঐরূপ চেষ্টা হইতে পারে না। কারণ, সমস্ত প্রাণীই পতন দুঃখের কারণ, এইরূপ বোধবশতঃই পতনভয়ে ভীত হয় এবং যথাশক্তি পতন নিবারণের জন্য চেষ্টা করে—ইহা সত্য। যে প্রাণী কোন স্থান হইতে পতনকে তাহার দুঃখের কারণ বলিয়া বুঝে না, সে কখনই সেই স্থান হইতে পতনভয়ে ভীত হয় না। সুতরাং পূর্ব্বোক্তস্থলে নবজাত শিশুরও ঐরূপ চেষ্টার দ্বারা মাতৃক্রোড় হইতে তাহার পতনভয় অনুমান-প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হওয়ায় তৎপূর্ব্বে—পতন যে, দুঃখের কারণ, এইরূপ বোধও তাহার অবশ্য স্বীকার্য্য।

অতএব অনুমান-প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, নবজাত শিশু, সেই আত্মা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে বহুবার পতনের পূর্ব্বাবস্থা ও তৎপরে পতনেরও অনুভব করিয়া উহা যে দুঃখের কারণ,—ইহাও অনুভব করিয়াছে। সুতরাং তজ্জন্য সেই আত্মাতে ঐ সমস্ত বিষয়ে সংস্কার আছে। ইহ জন্মে পূর্ব্বোক্ত স্থলে সেই সংস্কারবশতঃই পতনের পূর্ব্বাবস্থা বুঝিয়া তদ্দ্বারা তাহার ভাবী পতনের অনুমান করিয়া তাহা দুঃখজনক বলিয়া অনুমান করে। সুতরাং তখন সে পতন-ভয়ে ভীত

হইয়া সেই পতন নিবারণের জন্য ঐরূপ চেষ্টা করে। পতনের পূর্ব্বাবস্থা ও পতন—যাহা তাহার পূর্ব্বানুভূত, তাহার স্মৃতি ব্যতীত কখনই তাহার ঐরূপ ভয় জন্মিতে পারে না। সংস্কার ব্যতীতও তাহার সেই সমস্ত বিষয়ে স্মৃতি জন্মিতে পারে না। অতএব তাহার পূর্ব্বজন্ম অবশ্য স্বীকার্য্য। আত্মার উৎপত্তি না থাকিলেও—কোন অভিনব শরীরাদির সহিত বিলক্ষণ সম্বন্ধরূপ জন্ম আছে। অনাদিকাল হইতেই আত্মার ঐরূপ জন্ম স্বীকার্য্য হওয়ায় আত্মা নিত্য—ইহাও স্বীকার্য্য।

পূর্ব্বোক্ত সূত্রে "ভয়" শব্দের দ্বারা অজ্ঞানী জীবমাত্রের মৃত্যু-ভয়ও পূর্ব্ব জন্মের সাধকরূপে গৌতমের বিবক্ষিত বুঝা যায়। যোগদর্শনে পতঞ্জলি অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশের মধ্যে শেষে "অভিনিবেশ" নামে যে ক্লেশ বলিয়াছেন, তাহা বস্তুতঃ ঐ মৃত্যু-ভয়রূপ 'ক্লেশ'। কিন্তু ঐ মৃত্যু ভয়েরও কারণ বলিতে হইবে। মৃত্যুভয় জীবের স্বভাব বা মানসিক দৌর্ব্বল্যমাত্রের ফল বলা যায় না। মৃত্যুকে দুঃখের কারণ বলিয়া না বুঝিলে কাহারও মৃত্যুভয় জন্মিতে পারে না। কারণ যে জীব, যাহাকে তাহার দুঃখের কারণ বলিয়া পূর্ব্বে কখনও বুঝে নাই, সে জীব কখনও তাহা হইতে ভীত হয় না। অতএব ইহাই স্বীকার্য্য যে, সর্ব্বজীবই পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে মৃত্যুর দুঃখজনক পূর্ব্বাবস্থার অনুভব করায় তজ্জন্য সংস্কারবশতঃই পরজন্মেও মৃত্যুভয়-গ্রস্ত হয়। সময়বিশেষে অনেকের কোন কারণে সেই সংস্কার অভিভূত হইলেও সেই বদ্ধমূল অনাদি সংস্কার সাধারণ জীবের নষ্ট হয় না। সুতরাং সেই সংস্কারজন্য স্মৃতি-বশতঃই মৃত্যুভয় জন্মে। যোগদর্শনের ভাষ্যে ব্যাসদেব বিশেষ করিয়া ঐ মৃত্যু-ভয়কে জীবের পূর্ব্বজন্মের সাধকরূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

আত্মার নিত্যত্ব সিদ্ধ করিতে মহর্ষি গৌতম পরে আবার বলিয়াছেন—

প্রেত্যাহারাভ্যাসকৃতাৎ স্তন্যাভিলাষাৎ ॥ ৩।১।২১ ॥

অর্থাৎ নবজাত শিশুর যে প্রথম স্তন্য পানে ইচ্ছা, উহা তাহার পূর্ব্বজন্মে আহারের অভ্যাস জনিত। সুতরাং সেই ইচ্ছাপ্রযুক্তও তাহার পূর্ব্বজন্ম সিদ্ধ হওয়ায় আত্মার নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়। তাৎপর্য্য এই যে,—নবজাত শিশুর সর্ব্ব প্রথম স্তন্যপানকালে তাহার মুখের ক্রিয়া-বিশেষরূপ চেষ্টা দেখিয়া তদ্দ্বারা তাহার কারণ প্রযত্নরূপ প্রবৃত্তির অনুমান হয়। তাহা হইলে সেই প্রবৃত্তির দ্বারা সে বিষয়ে তাহার ইচ্ছার অনুমান হয়। কারণ, ইচ্ছা ব্যতীত প্রবৃত্তি জন্মে না। কিন্তু জ্ঞান ব্যতীতও ইচ্ছা জন্মে না। অতএব ঐ ইচ্ছার দ্বারা তাহার কারণ জ্ঞানের অনুমান হয়। যে বিষয়ে প্রথমে 'ইহা আমার ইষ্টজনক'—এইরূপ জ্ঞান জন্মে, সেই বিষয়ে সেই জ্ঞান-জন্য ইচ্ছা জন্মে এবং তজ্জন্য সে বিষয়ে প্রযত্নরূপ প্রবৃত্তি জন্মে এবং সেই প্রবৃত্তি-জন্যই সেই কার্য্যের অনুকূল শারীরিক ক্রিয়ারূপ চেষ্টা জন্মে। এইরূপ কার্য্য-কারণভাব সর্ব্বজনসিদ্ধ। আর বালক, যুবক ও বৃদ্ধ প্রভৃতি সকলেরই 'আহার আমার ইষ্টজনক'—এইরূপ স্মৃতিবশতঃ আহারে অভিলাষ জন্মে এবং তাহাদিগের সকলেরই আহারের পূর্ব্বাভ্যাসজনিত সংস্কারবশতঃই আহার যে, ক্ষুধার নিবর্ত্তক—এইরূপ স্মৃতি জন্মে, ইহাও সর্ব্বজনসিদ্ধ। সুতরাং নবজাত শিশুরও যে, সর্ব্বপ্রথম স্তন্যপানেচ্ছা, তাহার কারণরূপে তাহারও তখন 'আহার আমার ইষ্টজনক,'—এইরূপ স্মৃতি জন্মে, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে নবজাত শিশুর সেই স্মৃতির কারণরূপে তা[illegible] পূর্ব্ব জন্মের আহারাভ্যাসমূলক সংস্কারই স্বীকার্য্য। কারণ ইহ [illegible] সর্ব্বপ্রথমে তাহার ঐরূপ সংস্কার-লাভের কারণ নাই।

গৌতম পরে পূর্ব্বপক্ষ সূত্র বলিয়াছেন—**অয়সোঽয়স্কান্তাভিগমনবৎ তদুপসর্পণম্**॥ অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিবেন যে, 'অয়সঃ (লৌহস্য) অয়স্কান্তাভিমুখগমনবৎ' অর্থাৎ পূর্ব্বাভ্যাসমূলক সংস্কার ব্যতীতও বস্তুশক্তিবশতঃ লৌহ যেমন অয়স্কান্ত মণির (চুম্বকের)

অভিমুখে গমন করে, তদ্রূপ নবজাত শিশুর মুখ মাতৃস্তনের অভিমুখে গমন করে। গৌতম এই কথার খণ্ডন করিতে পরে বলিয়াছেন—

নান্যত্র প্রবৃত্ত্যভাবাৎ ॥ ৩।১।২৩ ॥

অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত কথা বলা যায় না। কারণ উক্ত স্থলে লৌহে প্রযত্নরূপ প্রবৃত্তি জন্মে না। অয়স্কান্তমণির অভিমুখে লৌহের যে গতি, তাহা প্রবৃত্তি-জন্য চেষ্টারূপ ক্রিয়া নহে, উহা ক্রিয়ামাত্র।

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন গৌতমের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অয়স্কান্তমণির অভিমুখে লৌহের গতিক্রিয়ারূপ যে প্রবৃত্তি, তাহার অবশ্য কোন নিয়ত কারণ আছে। নচেৎ লোষ্ট্র প্রভৃতি যে কোন দ্রব্যও অয়স্কান্তের অভিমুখে কেন গমন করে না? আর সেই লৌহই বা অন্য পদার্থে কেন ঐরূপ গমন করে না? সুতরাং লৌহই যে, অয়স্কান্তমণিরই অভিমুখে গমন করে, ইহাতে কোন নিয়ত কারণ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে ঐরূপ নবজাত শিশু যে, স্তন্যপানের জন্য মাতৃস্তনের অভিমুখেই গমন করে, ইহাতেও কোন নিয়ত কারণ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু নবজাত শিশু যে, আহারেচ্ছাবশতঃই মাতৃস্তনের অভিমুখে গমন করে অর্থাৎ সেই আহারেচ্ছা জন্যই তখন তাহার আহারে প্রযত্নরূপ প্রবৃত্তি জন্মে এবং তজ্জন্যই তাহার দেহে ঐরূপ চেষ্টা জন্মে—ইহাই স্বীকার্য্য। কারণ, আহারেচ্ছা ব্যতীত কখনও আহার বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মে না। সেই প্রবৃত্তি ব্যতীতও আহারের জন্য ঐরূপ চেষ্টা জন্মে না। সর্ব্বলোকসিদ্ধ কারণ ত্যাগ করিয়া উক্ত বিষয়ে অভিনব কোন কারণ কল্পনা করিলে তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না।

বস্তুতঃ নবজাত শিশুর মুখের মাতৃস্তনের অভিমুখে যে সাময়িক ক্রিয়া, তাহা কখনই অয়স্কান্তমণির অভিমুখে লৌহের গতির তুল্য বলা যায় না। কারণ, অয়স্কান্তমণির নিকটে লৌহ রাখিলে তখনই তাহা

ঐ মণিতে উপস্থিত হয়। কিন্তু মাতৃস্তনে নবজাত শিশুর মুখ সংলগ্ন করিয়া দিলেও অনেক সময়ে তাহার মুখে ক্রিয়া জন্মে না। সুতরাং যে সংস্কারবশতঃ নবজাত শিশু স্তন্যপানকে নিজের ইষ্টজনক বলিয়া স্মরণ করে, সেই সংস্কার উদ্‌বুদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার ঐরূপ স্মরণ না হওয়ায় স্তন্য-পানে ইচ্ছা জন্মে না—ইহাই স্বীকার্য্য। নচেৎ অয়স্কান্ত-মণির নিকটস্থ লৌহের ন্যায় মাতৃস্তনের নিকটস্থ শিশুর মুখ সর্ব্বত্র প্রথমেই কেন মাতৃস্তনে উপস্থিত হয় না?

পরন্তু অনেক সময়ে অনেক গৃহস্থ প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখিয়াছেন—তাঁহার গোশালায় গোবৎস প্রসূত হইয়া নিজেই দাঁড়াইয়া তাহার মাতার স্তন্যপান করিতেছে। তপোবনে ঋষিরা দেখিয়াছেন—মৃগশিশু প্রসূত হইয়াই স্বয়ং তাহার জননীর স্তন্যপানে প্রবৃত্ত হইতেছে। কিন্তু ঐ গোবৎস প্রভৃতি তখন কিরূপে মাতৃস্তন চিনিতে পারে? এবং সেই মাতৃস্তনে যে দুগ্ধ আছে এবং তাহাতে প্রতিঘাত করিলেই যে, দুগ্ধ নিঃসৃত হয় এবং সেই দুগ্ধপান যে ক্ষুধার নিবর্ত্তক, ইহাই বা কিরূপে বুঝিতে পারে? ঐ স্থলে ঐ সমস্ত বিষয়ে স্মৃতি ব্যতীত কখনই ঐ বিষয়ে ইচ্ছা ও তজ্জন্য প্রবৃত্তি ও তজ্জন্য ঐরূপ চেষ্টা হইতেই পারে না। সুতরাং পূর্ব্বজন্মের সংস্কারই তাহাদিগের ঐ বিষয়ে স্মৃতির কারণ বক্তব্য। অতএব তাহাদিগেরও পূর্ব্বজন্ম স্বীকার্য্য হওয়ায় আত্মার নিত্যত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য।

মৃগশিশু প্রসূত হইয়া স্বয়ংই তাহার জননীর স্তন্যপানে প্রবৃত্ত হইয়াছে—ইহা দেখিয়া আচার্য্য শঙ্করের শিষ্য সুরেশ্বরাচার্য্যও আত্মার নিত্যত্ববিষয়ে অনুমান-প্রমাণরূপ যুক্তি প্রকাশ করিতে "মানসোল্লাস" গ্রন্থে সরল সুন্দর ভাষায় বলিয়াছেন—

"পূর্ব্বজন্মানুভূতার্থ-স্মরণান্ মৃগশাবকঃ।
জননী-স্তন্য-পানায় স্বয়মেব প্রবর্ত্ততে॥ ৭৫॥

তস্মান্নিশ্চীয়তে স্থায়ীত্যাত্মা দেহান্তরেষ্বপি।
স্মৃতিং বিনা ন ঘটতে স্তন্যপানং শিশোর্যতঃ ॥” ৭৬ ॥

আত্মার নিত্যত্ব সিদ্ধ করিতে মহর্ষি গৌতম শেষে বলিয়াছেন—

বীতরাগ-জন্মাদর্শনাৎ ॥ ৩।১।২৪ ॥

তাৎপর্য্য এই যে, যাহার জন্মের পরে কখনও কোন বিষয়ে কিছু মাত্র রাগ বা অভিলাষ জন্মে না, যে সর্ব্বদা সর্ব্বথা বীতরাগ, এমন কোন প্রাণীর জন্ম দেখা যায় না। সমস্ত প্রাণীরই জন্মের পরে কোন সময়ে শারীরিক ক্রিয়া বা চেষ্টার দ্বারা তাহাকে কোন বিষয়ে সরাগ বলিয়া অনুমিত হয়। ক্ষুধা-তৃষ্ণাবশতঃ ভক্ষ্য-পেয়াদি বিষয়ে সমস্ত প্রাণীরই কখনও রাগ বা অভিলাষ অবশ্যই জন্মে—সন্দেহ নাই। সুতরাং প্রত্যেক জীবেরই প্রত্যেক জন্মের পূর্ব্বেই তাহার অন্য জন্ম স্বীকার্য্য; নচেৎ তাহার জন্মের পরে কোন বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা-রূপ রাগ জন্মিতে পারে না। কারণ পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের অনুস্মরণ ব্যতীত ঐ রাগ জন্মে না।

গৌতম পরে পূর্ব্বপক্ষসূত্র বলিয়াছেন—

সগুণদ্রব্যোৎপত্তিবৎ তদুৎপত্তিঃ ॥

অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদী নাস্তিক বলিবেন যে, যেমন সগুণ দ্রব্যের উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ যেমন ঘটাদি দ্রব্য রূপাদি গুণবিশিষ্ট হইয়া উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ সমস্ত জীব রাগ-বিশিষ্ট হইয়া উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ জীবের জন্মের পরে তাহার কোন রাগের উৎপত্তিতে পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের অনুস্মরণ অনাবশ্যক।

গৌতম এই শেষ পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করিতে পরে বলিয়াছেন—

ন সঙ্কল্পনিমিত্তত্বাদ্রাগাদীনাম্ ॥ ৩।১।২৬ ॥

অর্থাৎ সমস্ত জীব রাগ-বিশিষ্ট হইয়া উৎপন্ন হয়—ইহা বলা যায় না। কারণ জীবের রাগাদি সঙ্কল্প-নিমিত্তক অর্থাৎ সঙ্কল্প ব্যতীত কাহারও কোন

বিষয়ে রাগ জন্মে না। সঙ্কল্প শব্দের অর্থ এখানে সম্যক্ কল্পনারূপ মোহ বা ভ্রম বিশেষ।* গৌতম পরে চতুর্থ অধ্যায়ে ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন—

তেষাং মোহঃ পাপীয়ান্ নামূঢ়স্যেতরোৎপত্তেঃ ॥ ৪।১।৬ ॥

অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ ও মোহের মধ্যে মোহই সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। কারণ, মোহশূন্য ব্যক্তির রাগ ও দ্বেষ জন্মে না। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন সেখানে বলিয়াছেন যে, বিষয়বিশেষে যে সঙ্কল্প জীবের রাগ উৎপন্ন করে, তাহার নাম রঞ্জনীয় সঙ্কল্প এবং যে সঙ্কল্প দ্বেষ উৎপন্ন করে, তাহার নাম কোপনীয় সঙ্কল্প। ঐ দ্বিবিধ সঙ্কল্পই জীবের সেই বিষয়ে মিথ্যা-জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া উহা তাহার মোহ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু জীবের ঐ রাগ বা দ্বেষের জনক যে মোহরূপ সঙ্কল্প, তাহাও তাহার পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের অনুস্মরণ ব্যতীত জন্মে না। কারণ, যে জীব যে বিষয়কে পূর্ব্বে কখনও তাহার সুখের কারণ বলিয়া বুঝিয়াছে, সেই বিষয় বা তজ্জাতীয় বিষয়েই আবার তাহার আকাঙ্ক্ষারূপ রাগ জন্মে—এবং যে বিষয় পূর্ব্বে কখনও দুঃখের কারণ বলিয়া বুঝিয়াছে, সেই বিষয় বা তজ্জাতীয় বিষয়েই আবার তাহার দ্বেষ জন্মে; নচেৎ তাহা জন্মে না। সুতরাং পূর্ব্বানুভূত সেই বিষয়ের অনুস্মরণ-জন্যই প্রথমে তজ্জাতীয় বিষয়ে রাগজনক বা দ্বেষজনক মোহবিশেষরূপ সঙ্কল্প জন্মে এবং তজ্জন্যই সেই বিষয়ে রাগ বা দ্বেষ জন্মে—ইহাই স্বীকার্য্য। অতএব জীবের জন্মের পরে সর্ব্বপ্রথমে যে রাগ জন্মে, তাহাও পূর্ব্বো-

---

* "সঙ্কল্প" শব্দের কামনা অর্থ প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু কামের জনক সঙ্কল্প মোহবিশেষ। 'ভগবদ্গীতা'তেও কথিত হইয়াছে—"সঙ্কল্প-প্রভবান্ কামান্।" ৬।২৪। ভাষ্য-টীকাকার আনন্দগিরি উক্ত স্থলে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"সঙ্কল্পঃ শোভনাধ্যাসঃ"। অর্থাৎ যাহা বস্তুতঃ শোভন বা সমীচীন নহে, তাহার সমীচীনত্বরূপে যে অধ্যাস বা ভ্রম, তাহাই উক্তস্থলে "সঙ্কল্প" শব্দের অর্থ। ঐরূপ ভ্রমাত্মক সঙ্কল্প কামের মূল। তাই কথিত হইয়াছে—"সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামান্।"

রূপ সঙ্কল্প ব্যতীত জন্মিতে পারে না। ঘটাদি দ্রব্যে রূপাদি গুণের ন্যায় কখনই জীবের জ্ঞানমূলক রাগ জন্মিতে পারে না। জীবের যৌবনাদি কালে রাগের উৎপত্তিতে যেরূপ জ্ঞান, কারণ বলিয়া সর্ব্বসিদ্ধ; জীবের সর্ব্বপ্রথম রাগের উৎপত্তিতেও সেইরূপ জ্ঞানই অবশ্য কারণ বলিয়া স্বীকার্য্য। অভিনব কোন কারণ কল্পনায় কোন প্রমাণ নাই।

ফল কথা, জীবমাত্রেরই যখন জন্মের পরে বিষয়বিশেষে রাগ অবশ্যই জন্মে এবং সেই বিষয়ে সঙ্কল্প ব্যতীতও সেই রাগ জন্মিতে পারে না এবং পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের অনুস্মরণ ব্যতীতও সেই সঙ্কল্প জন্মিতে পারে না, তখন জীবমাত্রই পূর্ব্বজন্মে তজ্জাতীয় বিষয়কে সেইরূপে অনুভব করিয়াছে এবং তজ্জন্য তাহাতে ঐরূপ সংস্কার বিদ্যমান থাকে—ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। তাহা হইলে তৎপূর্ব্বজন্মেও সেই জীবের বিষয়বিশেষে সর্ব্বপ্রথম রাগের কারণরূপে ঐরূপ সঙ্কল্প এবং তাহার কারণরূপে তৎপূর্ব্বজন্মে অনুভূত সেই বিষয়ের সেইরূপে অনুস্মরণও স্বীকার্য্য। অতএব উক্তরূপে সমস্ত জীবেরই অনাদি জন্মপ্রবাহ ও অনাদি সংস্কার প্রবাহ স্বীকার্য্য। তাহা হইলে আত্মার সংস্কারপ্রবাহের অনাদিত্ববশতঃ ঐ অনাদি সংস্কারপ্রবাহের আশ্রয় আত্মারও অনাদিত্ব সিদ্ধ হয়। কারণ, অনাদি ভাব পদার্থের উৎপত্তি নাই ও বিনাশ নাই—ইহা অনুমান-প্রমাণসিদ্ধ। তাই মহর্ষি গৌতম শেষে **বীতরাগজন্মাদর্শনাৎ**—এই সূত্র দ্বারা উক্তরূপে আত্মার অনাদিত্ব সমর্থন করিয়া আত্মার নিত্যত্ব সাধন করিয়াছেন।

বস্তুতঃ আত্মার বিলক্ষণ শরীরাদি সম্বন্ধরূপ জন্মপ্রবাহ অনাদি। সুতরাং সৃষ্টিপ্রবাহও অনাদি—ইহাই আমাদিগের সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধান্ত। কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন—**সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ** (ঋগবেদসংহিতা ১০।১১০।৩)। বিধাতা যথাপূর্ব্ব চন্দ্রসূর্য্যাদির সৃষ্টি করিয়াছেন—ইহা বলিলে অনাদিকাল হইতেই তিনি জগৎ সৃষ্টি

করিতেছেন, ইহা বুঝা যায়। যে সময়ে তিনি জগতের সংহার করেন, সেই সময়ে প্রলয় হয়। প্রলয়ের পরে যে সমস্ত নূতন সৃষ্টি হইয়াছে ও হইবে, তাঁহারই আদি আছে। সেই তাৎপর্য্যেই শাস্ত্রে সৃষ্টির আদি কথিত হইয়াছে। কিন্তু সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টির পূর্ব্বেই কোন কালে অন্য সৃষ্টি হইয়াছে। যে সৃষ্টির পূর্ব্বে আর কখনও সৃষ্টি হয় নাই, এমন কোন সৃষ্টি নাই। বেদান্তদর্শনে বাদরায়ণও সৃষ্টিপ্রবাহ যে, অনাদি—এই বৈদিক সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।* শ্রীভগবান্‌ও বলিয়াছেন—"নান্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা"—গীতা ১৫।৩।

কিন্তু জীবের জন্মপ্রবাহ অনাদি হইলেও অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে অনন্ত জীব অনন্ত জন্মলাভ করিয়া অনন্ত বিচিত্র সংস্কার লাভ করিলেও সমস্ত জন্মেই সমস্ত প্রাক্তন সংস্কার উদ্‌বুদ্ধ হয় না। জীব নিজ কর্ম্মানুসারে যখন যেরূপ দেহ পরিগ্রহ করে, তখন ঐ কর্ম্মের বিপাকবশতঃ তাহার তদনুরূপ সংস্কারই উদ্‌বুদ্ধ হয়; অন্যান্য সংস্কার অভিভূত থাকে। কোন জীব মানবজন্মের পরে নিজ কর্ম্মানুসারে বানরদেহ বা গণ্ডারদেহ লাভ করিলে, তখন তাহার পূর্ব্বকালীন বানরজন্ম বা গণ্ডারজন্মে লব্ধ সংস্কারই উদ্‌বুদ্ধ হয় এবং উষ্ট্রদেহ লাভ করিলে পূর্ব্বকালীন উষ্ট্রজন্মের সংস্কারই তখন উদ্‌বুদ্ধ হয়। সুতরাং তখন তাহার মনুষ্যোচিত রাগাদি জন্মে না। তাই বৈশেষিকদর্শনে মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন—**জাতিবিশেষাচ্চ**—(৬।২।১৩)। কণাদ এই

---

* ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ।

উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ। বেদান্তদর্শন ২।১।৩৫।৩৬ সূত্র।

"সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ" ইতি চ মন্ত্রবর্ণঃ পূর্ব্বকল্পসদ্ভাবং দর্শয়তি। স্মৃতাবপ্যনাদিত্বং সংসারস্যোপলভ্যতে "ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে, নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা" (গীতা ১৫।৩) ইতি। পুরাণে চাতীতানাগতানাঞ্চ কল্পানাং ন পরিমাণমস্তীতি স্থাপিতম্।—শারীরকভাষ্য।

সূত্রের দ্বারা জাতি বা জন্মবিশেষও যে, ভক্ষ্যপেয়াদি বিষয়ে বিভিন্নরূপ রাগের হেতু হয়—ইহাও বলিয়াছেন। যোগদর্শনে মহর্ষি পতঞ্জলিও শাস্ত্র-যুক্তি-সম্মত এই সিদ্ধান্তই প্রকাশ করিয়াছেন।* মহর্ষি কণাদ পূর্ব্বে **অদৃষ্টাচ্চ** (৬।২।১২) এই সূত্রের দ্বারা বিশেষ করিয়া জীবের অদৃষ্ট-বিশেষকেও কোন কোন স্থলে রাগ ও দ্বেষের অসাধারণ হেতু বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ অদৃষ্টবিশেষবশতঃ সময়বিশেষে কোন স্থলে অনেক জীবের অভিভূত অন্যরূপ সংস্কারও যে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া থাকে, ইহাও বুঝা যায় এবং ইহার অনেক উদাহরণও প্রদর্শন করা যায়।

মূল কথা—জীবের প্রাক্তন সংস্কার ব্যতীত জন্মের পরে তাহার বিষয়-বিশেষে সঙ্কল্প ও তন্মূলক রাগাদি জন্মিতে পারে না। আর এই যে, বানরশিশু প্রসূত হইয়াই বৃক্ষের শাখায় আরোহণ করে, কোন কোন পক্ষিশাবক ডিম্ব হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াই উড়িয়া যায়, হংস শাবক জলে সন্তরণ করে, গণ্ডারশিশু প্রসূত হইয়াই তাহার মাতার নিকট হইতে পলায়ন করে, ইহা তাহাদিগের সেই সেই প্রাক্তন জন্মের সংস্কার ব্যতীত উপপন্ন হয় না। গণ্ডারীর তীক্ষ্ণধার জিহ্বার দ্বারা গণ্ডার শিশুর প্রথম গাত্রলেহন বড় কষ্টকর। তাই গণ্ডারশিশু প্রসূত হইয়াই প্রাক্তন গণ্ডার জন্মের সেই সংস্কারবশতঃ তাহার মাতা কর্ত্তৃক প্রথম গাত্রলেহনের কষ্টকরতা স্মরণ করিয়া তখনই সেই স্থান হইতে পলায়ন করে। পরে তাহার গাত্রচর্ম্ম কঠিন হইলে অনুসন্ধান করিয়া আবার তাহার মাতার নিকটে আসে—ইহা পরীক্ষিত সত্য। মানবের ন্যায় বহু পশু-পক্ষী প্রভৃতি জীবেরও নানা বিচিত্র কর্ম্ম বা বিচিত্র স্বভাব লক্ষ্য করিয়া বুঝিলে তাহাদিগের পূর্ব্বজন্ম অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়; নচেৎ

---

* "ততস্তদ্বিপাকানুগুণানামেবাভিব্যক্তির্বাসনানাম্।"
"জাতি-দেশ-কালব্যবহিতানামপ্যানন্তর্য্যং স্মৃতিসংস্কারয়োরেকরূপত্বাৎ।"—যোগদর্শন কৈবল্যপাদ ৮ম ও ৯ম সূত্র ও ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

জীবের নানারূপ স্বভাব বা বিচিত্র রুচিও কোনরূপেই উপপন্ন হইতে পারে না। মস্তিষ্কের জড় উপাদান বা পিতামাতার স্বভাবকে আশ্রয় করিয়া উহার কোন সমাধানই করা যায় না।

পরন্তু জীবমাত্রেরই যেমন প্রাক্তন সংস্কার ব্যতীত জন্মের পরে ভক্ষ্যপেয়াদি বিষয়ে বিচিত্র রাগ জন্মিতে পারে না; তদ্রূপ, মানবগণের যে বিদ্যাবিশেষে বিশিষ্ট অনুরাগ ও অধিকার, তাহাও প্রাক্তন সংস্কার ব্যতীত জন্মিতে পারে না। কারণ, মানবগণের মধ্যে সকলেই সকল বিদ্যায় সমান অনুরাগী ও অধিকারী হয় না। কেহ গণিতে বিরক্ত, কিন্তু ইতিহাসে অতীব অনুরক্ত। কেহ কর্কশ তর্কশাস্ত্রের চর্চ্চায় সতত সে বিষয়ে একাগ্রচিত্ত, কেহ কেবল কোমল কাব্য চর্চ্চায় সতত নিরত। কেহ আবার অধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া সতত সংগীত শিক্ষায় মত্ত। যে বিদ্যায় যাহার অধিক অনুরাগ জন্মে, সেই বিদ্যাতেই তাহার অধিক অধিকার জন্মে—ইহাও সর্ব্বসম্মত সত্য। কিন্তু কেন ঐরূপ হয়? মানবগণের বিদ্যাবিশেষে অধিক অনুরাগ ও অধিকারের মূল কি? ইহা বিচার করিয়া বুঝিতে গেলে পূর্ব্বজন্মে তাহার সেই বিদ্যার বিশেষ অভ্যাস বা অনুশীলন জন্য সংস্কারবিশেষই উহার মূল বলিয়া স্বীকার্য্য।

'তাৎপর্য্যটীকা'কার শ্রীমদ্ বাচস্পতি মিশ্রও ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, মনুষ্যত্বরূপে সকল মনুষ্য তুল্য হইলেও তাঁহাদিগের মধ্যে প্রজ্ঞা ও মেধার উৎকর্ষ ও অপকর্ষ আছে। মনোযোগপূর্ব্বক কোন বিদ্যার অভ্যাস করিলে সেই বিষয়ে প্রজ্ঞা ও মেধার বৃদ্ধি হয়—ইহাও পরীক্ষিত সত্য। সুতরাং কোন বিদ্যার অভ্যাস বা অনুশীলন যে, সেই বিদ্যাবিষয়ে প্রজ্ঞা ও মেধার বৃদ্ধির কারণ—ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। তাহা হইলে যে সমস্ত মানবের ইহ জন্মে কোন বিদ্যার অনুশীলনের পূর্ব্বে অথবা প্রারম্ভেই সেই বিষয়ে বিশেষ অনুরাগ এবং প্রজ্ঞা ও মেধার উৎকর্ষ বুঝা যায়, তাহাদিগের সেই বিষয়ে পূর্ব্বজন্মের অভ্যাসই উহ

কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, সে বিষয়ের অভ্যাস বা অনুশীলন ব্যতীত কখনই তাহাতে কাহারই বিশেষ অধিকার জন্মিতে পারে না ; কারণ ব্যতীত কার্য্য জন্মে না।

ফল কথা, মানববিশেষের যে বিদ্যাবিশেষে অত্যন্ত অনুরাগ এবং অল্প উপদেশেই অল্প সময়ের মধ্যেই তাহাতে বিশেষ অধিকার, তাহা তাহার পূর্ব্বজন্মের সংস্কার ব্যতীত কখনই সম্ভব হইতে পারে না। সেই বিষয়ে কিছু উপদেশ পাইলেই তখন তদ্দ্বারা তাহার সেই প্রাক্তন সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকে। পরন্তু কাহারও ইহজন্মে কোন উপদেশ ব্যতীতও অদৃষ্টবিশেষ বা অন্য কোন কারণে প্রাক্তন সংস্কার উদ্বুদ্ধ হওয়ায় বিনা উপদেশেও তাহার বিদ্যাবিশেষে অধিকার জন্মে, ইহারও অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

অমর কবি কলিদাসও "কুমার সম্ভবে"র প্রথম সর্গে হিমালয় দুহিতা পার্ব্বতীর বিদ্যার বর্ণন করিতে লিখিয়াছেন—

"তাং হংসমালাঃ শরদীব গঙ্গাং
মহৌষধিং নক্তমিবাত্ম-ভাসঃ।
স্থিরোপদেশামুপদেশকালে
প্রপেদিরে প্রাক্তন-জন্ম-বিদ্যাঃ" ॥ ৩০

অর্থাৎ যেমন শরৎকাল উপস্থিত হইলেই হংসমালা গঙ্গাকে প্রাপ্ত হয় এবং রাত্রিকাল উপস্থিত হইলেই বনস্থ মহৌষধিকে তাহার নিজ নিজ প্রভাসমূহ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ পার্ব্বতীর শিক্ষাকাল উপস্থিত হইলেই তাঁহার প্রাক্তন জন্মের সমস্ত বিদ্যা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রাক্তন জন্মের সমস্ত উপদেশ অর্থাৎ সেই সমস্ত শিক্ষাজনিত সংস্কারও ক্ষণস্থায়ী পদার্থ নহে, কিন্তু স্থির পদার্থ। ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায় জন্মান্তরবাদ স্বীকার করিলেও স্থির পদার্থ স্বীকার করেন নাই। কিন্তু স্থিরবাদী কালিদাস উক্ত শ্লোকে পার্ব্বতীকে "স্থিরোপদেশা" বলিয়া উক্ত বৌদ্ধ-

মতে অংশিত সূচনা করিয়া গিয়াছেন—ইহাও লক্ষ্য করা আবশ্যক। আর প্রকৃত বিষয়ে অবশ্য লক্ষ্য করিতে হইবে যে, উক্ত শ্লোকে কালিদাস দুইটি উপমার দ্বারা পার্ব্বতীর সেই জন্মে কাহারও উপদেশ ব্যতীতই প্রাক্তন জন্মের সেই সমস্ত সংস্কার উদ্‌বুদ্ধ হওয়ায় সেই সমস্ত বিদ্যার প্রাপ্তি হইয়াছিল, ইহা ব্যক্ত করিয়া কাহারও যে, ইহ জন্মে উপদেশ ব্যতীতও যে কোন কারণে প্রাক্তন সংস্কার বিশেষের উদ্বোধ হওয়ায় সহজেই বিদ্যাবিশেষের প্রাপ্তি হয়, এই মহাসত্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কালিদাসের প্রদর্শিত ঐ দুইটি উপমা ও উহার প্রয়োজন বুঝিলেই ইহা বুঝা যায়। প্রাচীন সমালোচক সত্যই বলিয়াছেন— "উপমা কালিদাসস্য"।

পরন্তু যে কালিদাস "কুমারসম্ভবে" ঐ কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার কবিত্বশক্তিও কেবল ঐহিক সংস্কার নহে। ইহ জন্মে শিক্ষা ও অভ্যাসের দ্বারাই সকলে তাঁহার ন্যায় কাব্য রচনা করিতে পারেন না। মহামনীষী মম্মট ভট্টও "কাব্য-প্রকাশের" প্রারম্ভে বলিয়াছেন—

"শক্তিঃ কবিত্ববীজরূপঃ সংস্কারবিশেষঃ। যাং বিনা কবিত্বং ন প্রসরেৎ, প্রসৃতং বা উপহসনীয়ং স্যাৎ॥"

কবিত্বের বীজরূপ সংস্কারবিশেষই কবিত্বশক্তি। উহা কেবল ঐহিক সংস্কার নহে। উহার মধ্যে প্রাক্তন সংস্কারই মূল ও প্রধান। ঐ শক্তি বা সংস্কার না থাকিলে কবিত্বের প্রকাশ বা কাব্য-রচনা সম্ভবই হয় না। কবির কাব্য-রচনায় যে শক্তি অত্যাবশ্যক, তাহাকে বলে কবির কর্ত্তৃত্ব-শক্তি। আর তাহার ঐ কাব্য বুঝিতে যে শক্তি অত্যাবশ্যক, তাহাকে বলে বোদ্ধৃত্বশক্তি। উহাও সংস্কারবিশেষ। উহা না থাকিলেও কাব্য বুঝা যায় না। তাই যাঁহার ঐ বোদ্ধৃত্ব শক্তি নাই, তাহার নিকটে উৎকৃষ্ট কাব্যও উপহাসাস্পদ হইয়া থাকে। সকলেই কাব্য-রসের আস্বাদ বা অনুভব করিতে পারেন না। যাঁহাদিগের সে বিষয়ে প্রাক্তন সংস্কার

উদ্‌বুদ্ধ হয়, সেই সমস্ত পুণ্যবান্‌ ব্যক্তিই কাব্যের রসাস্বাদ করিতে পাবেন।

ফলকথা, কাব্যের রসাস্বাদে যেমন প্রাক্তন সংস্কারও আবশ্যক, তদ্রূপ কাব্য-রচনাতেও প্রাক্তন সংস্কার আবশ্যক। অনেক ব্যক্তির যে সহসা অদ্ভুত কবিত্বের প্রকাশ হয়, তাহাতে তাঁহাদিগের বিজাতীয় প্রাক্তন সংস্কারই প্রধান কারণ। এই যে, সুপ্রাচীন কাল হইতে ভারতে কত কত দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত কবি এবং কত স্ত্রী কবি, কত স্থানে কত প্রকারে সংস্কৃত ভাষায় অতিশীঘ্র বহু বহু সুকঠিন সমস্যা পূরণ করিয়া অত্যদ্ভুত কবিত্বের প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন এবং এই বঙ্গ ভূমিতেও বহু বহু অপণ্ডিত কবিও বঙ্গভাষায় অতিশীঘ্র গুরুভাবপূর্ণ কত কত সঙ্গীতাদি-রচনা ও সমস্যাপূরণ করিয়া অতি বিস্ময়কর কবিত্বের প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, উহা তাঁহাদিগের সে বিষয়ে পূর্ব্বজন্মের বিজাতীয় সংস্কার ব্যতীত কখনই সম্ভব হইতে পারে না। কেবল ইহ জন্মে শিক্ষা বা অভ্যাস দ্বারা কাহারই ঐরূপ শক্তিলাভ হইতে পারে না।

অনেকে বলেন যে, কবিত্বশক্তি ও গানশক্তি প্রভৃতি ঈশ্বরদত্ত শক্তি। ঈশ্বরই বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে ঐ সমস্ত শক্তি প্রদান করেন। আর নবজাত শিশুর যে, আহারেচ্ছা—তাহাও ঈশ্বরেচ্ছাবশতঃই জন্মে। ঈশ্বরই তাহার জীবনরক্ষার্থ তখন তাহাকে ঐরূপ বুদ্ধি প্রদান করিয়া স্তন্য-পানাদিতে প্রবৃত্ত করেন। তাহার জীবন রক্ষার্থ তাহার মাতার স্তন ও তাহাতে দুগ্ধের সৃষ্টিও ত তিনিই করিয়াছেন। সুতরাং নবজাত শিশুর স্তন্যপানাদিবিষয়ে যে ইচ্ছা, তদ্দ্বারাও পূর্ব্বজন্ম সিদ্ধ হইতে পারে না।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, নবজাত শিশুর জীবনরক্ষার্থ ঈশ্বরই তাহাকে স্তন্যপানাদিতে প্রবৃত্ত করেন—ইহা সত্য; কারণ, তিনিই সর্ব্ব-জীবের সর্ব্বকর্ম্মের কারয়িতা। তিনি কর্ম্ম না করাইলে কোন জীব

কোন কর্ম করিতে পারে না। আর কবিত্বশক্তি ও গানশক্তি প্রভৃতিও তিনিই প্রদান করেন, ইহাও সত্য। কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে, সর্ব্বশক্তিমান্ করুণাময় পরমেশ্বর সকল মানবকেই কবিত্বশক্তি ও গানশক্তি প্রভৃতি প্রদান করেন না কেন? এবং সর্ব্বত্রই সর্ব্বজীবকে যথাসময়ে তাহাদিগের ইচ্ছানুসারে সমুচিত আহার প্রদান করেন না কেন? আর তিনি কোন সময়ে অনভিজ্ঞ সবল শিশুকেও দূষিত দুগ্ধাদি পানে প্রবৃত্ত করিয়া তাহার জীবনান্ত করেন কেন? আর তিনি বিজ্ঞ মানবগণকেও সময়ে অসাধু কর্ম্ম করাইয়া দুঃখ প্রদান করেন কেন? অন্তর্য্যামিরূপে তিনিই ত জীবের সর্ব্বকর্ম্মে প্রেরক। সুতরাং ইহার সমাধান করিতে হইলে পূর্ব্বজন্ম স্বীকার করিয়া ইহাই বলিতে হইবে যে, পরমেশ্বর সমস্ত জীবের পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মজন্য ধর্ম্মাধর্ম্মানুসারেই জীবকে সাধু ও অসাধু কর্ম্ম করাইতেছেন এবং তাহার ফল দান করিতেছেন। সর্ব্বজীবের বিচিত্র শরীরসৃষ্টিও তাহাদিগের পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মফল-ধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তক। তাই মহর্ষি গৌতমও পরে বলিয়াছেন—

পূর্ব্বকৃতফলানুবন্ধাত্তদুৎপত্তিঃ ॥ ৩।২।৬০ ॥

অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের বিচিত্র কর্ম্মফল ব্যতীত জীবের বিচিত্র শরীর সৃষ্টি হইতে পারে না। সকলেই সকল সময়ে স্বেচ্ছানুসারে জন্ম লাভ করিতে পারে না। অনন্ত জীবের যে অনন্ত বিচিত্র জন্ম ও তন্মূলক অনন্ত বিচিত্র অবস্থা, তাহা অন্য কোন রূপেই উপপন্ন হয় না। মহর্ষি গৌতম পরে বিচার পূর্ব্বক উক্ত বৈদিক সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়া তদ্দ্বারা আত্মার নিত্যত্ব সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। কারণ, অসংখ্য জীবের অসংখ্য বিচিত্র শরীর সৃষ্টির কারণরূপে প্রাক্তন কর্ম্মফল অবশ্য স্বীকার্য্য হইলে সমস্ত জীবই যে, অনাদিকাল হইতে নিজ কর্ম্মানুসারে বহুবার মানবজন্ম লাভ করিয়াও শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়াছে ও করিতেছে—ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য। সুতরাং সমস্ত জীবাত্মাই যে, অনাদি কাল হইতে

বিদ্যমান আছে—ইহাও স্বীকার্য্য। তাহা হইলে সমস্ত জীবাত্মার নিত্যত্বই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, অনাদি ভাবপদার্থ জীবাত্মার যেমন উৎপত্তি নাই; তদ্রূপ বিনাশের কোন কারণ না থাকায় কখনও বিনাশও সম্ভবই নহে। জীবের জন্মপ্রবাহ বা জগতের সৃষ্টিপ্রবাহ যে, অনাদি—ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

পরন্তু ইহাও প্রণিধানপূর্ব্বক বুঝা আবশ্যক যে, কর্ম্মের অভ্যাস ব্যতীত কোন জীবই কোন কর্ম্ম করিতে পারে না। সমস্ত জীবই নিজের অভ্যাসানুসারেই নানা কর্ম্ম করিতেছে। সুতরাং সমস্ত জীবই যে, পূর্ব্বজন্মের অভ্যাসবশতঃই নানা বিচিত্র কর্ম্ম করিতেছে—ইহাও স্বীকার্য্য। নচেৎ জীবের কর্ম্মবিশেষে অধিক অনুরাগ এবং বাল্যকাল হইতেই সেই কর্ম্মে অধিক প্রবৃত্তিও কখনই সম্ভব হইতে পারে না। আর এই যে, অনাদিকাল হইতে কত মানব স্বেচ্ছায় স্বভাবতঃ সাধু কর্ম্ম করিতেছে, তাহা তাহাদিগের পূর্ব্বজন্মের অভ্যাসবশতঃই করিতেছে। পিতার অধ্যয়নে অনুরাগ নাই, কোন বিদ্যাও নাই; কিন্তু পুত্র স্বেচ্ছায় সতত অধ্যয়নে নিরত। আবার বদ্ধমুষ্টি পিতার বালক-পুত্রও সতত দানে মুক্তহস্ত—ইহাও দেখা যায়। পিতা-মাতার সহস্র তিরস্কার ও বাধা সহ্য করিয়াও ভাগ্যবান্ পুত্র সতত তপস্যা ও ভগবদ্‌ভজনে নিরত, এরূপ দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু কেন এমন হয়? কেন তাহারা ঐরূপ অধ্যয়ন, দান ও তপস্যা করে? সমস্ত মানবই বা তুল্যভাবে কেন ঐ সমস্ত সাধু কর্ম্ম করে না? ভারতের শাস্ত্রবিশ্বাসী পূর্ব্বাচার্য্য ইহার উত্তর বলিয়া গিয়াছেন—

"জন্ম জন্ম যদভ্যস্তং দানমধ্যয়নং তপঃ।
তেনৈবাভ্যাসযোগেন তচ্চৈবাভ্যসতে নরঃ॥"

"ভামতী" টীকায় (২।১।৩৪) বাচস্পতি মিশ্রের উদ্ধৃত বচন)

বস্তুতঃ মানবের জন্মে জন্মে যেরূপ দান, অধ্যয়ন ও তপস্যাদি সাধু কর্ম্ম এবং হিংসা প্রভৃতি অসাধু কর্ম্ম অভ্যস্ত, মানব সেই পূর্ব্বাভ্যাস-বশতঃই তদনুরূপ সাধু বা অসাধু কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়—ইহাই সত্য। শ্রীভগবান্‌ও এই মহাসত্য প্রকাশ করিতে অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—"পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।" (গীতা ৬।৪৪)। শিশুপাল পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের ন্যায় জগতের পীড়ন করিয়াছিলেন, ইহার কারণ ব্যক্ত করিতে 'শিশুপালবধ' কাব্যে মহাকবি মাঘ বলিয়াছেন—

"সতী চ যোষিৎ প্রকৃতিশ্চ নিশ্চলা
পুমাংসমভ্যেতি ভবান্তরেষ্বপি।" ১।৭২।

অর্থাৎ সাধ্বী স্ত্রী ও নিশ্চলা প্রকৃতি জন্মান্তরেও সেই পুরুষকে প্রাপ্ত হয়। শিশুপালের ঐরূপ প্রকৃতি বা স্বভাব, তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের অভ্যাসজনিত সংস্কার-মূলক, ইহাই কবির বিবক্ষিত। ফলকথা, প্রাক্তন সংস্কার ব্যতীত জীবের বিচিত্র প্রকৃতি বা কর্ম্মপ্রবৃত্তিও কখনই সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং জীবের নানাবিধ প্রকৃতি বা প্রবৃত্তি এবং তন্মূলক নানাবিধ কর্ম্মদ্বারাও প্রাক্তন সংস্কার অনুমান-সিদ্ধ * হয়। প্রাক্তন সংস্কার যে, উহার ফল দ্বারা অনুমেয়, এই সিদ্ধান্ত সুচিরকাল হইতেই ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাই মহাকবি কালিদাস

* উক্ত শ্লোকে "সতীব যোষিৎ প্রকৃতিঃ সুনিশ্চলা"—এইরূপ পাঠ মল্লিনাথের সম্মত বুঝা যায়। কিন্তু "সাহিত্যদর্পণের" দশম পরিচ্ছেদে বিশ্বনাথ কবিরাজ "সতী যোষিৎ প্রকৃতিশ্চ নিশ্চলা"—এইরূপ পাঠের উল্লেখ করিয়া উক্ত শ্লোকে "দীপক" অলঙ্কারের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। উক্ত পাঠে দুইটি "চ" শব্দের দ্বারা সতী স্ত্রী ও নিশ্চলা প্রকৃতি এই উভয়েরই সমান প্রাধান্য বুঝা যায়। পরন্তু প্রকৃত স্থলে সতী স্ত্রীর সহিত শিশুপালের অসতী প্রকৃতির উপমাও কবির অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না।

রঘুবংশের প্রথম সর্গে মহামনা দিলীপের রাজোচিত মন্ত্রগুপ্তির বর্ণন করিতে ঐ সুপ্রসিদ্ধ সিদ্ধান্তকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন—

ফলানুমেয়াঃ প্রারম্ভাঃ সংস্কারাঃ প্রাক্তনা ইব ॥ ২০

বস্তুতঃ জীবের প্রাক্তন কর্ম্ম যখন অবশ্য স্বীকার্য্য, তখন জন্মান্তরবাদ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাই উহা আমাদিগের সর্ব্বশাস্ত্র-সম্মত সিদ্ধান্ত। জীবের প্রাক্তন কর্ম্ম ও জন্মান্তর—এই দুই মহাসত্যের বজ্রভিত্তির উপরে আমাদিগের সনাতন ধর্ম্মের মহিমময় মহামণ্ডপ সুপ্রতিষ্ঠিত আছে। তবে প্রশ্ন হয় যে, পূর্ব্বজন্মানুভূত সমস্ত বিষয়েরই স্মরণ কেন হয় না, আমরা পূর্ব্বজন্মে—কে ছিলাম, কোথায় কিরূপ ছিলাম, ইত্যাদি কোন বিষয়ই আমরা কেন স্মরণ করিতে পারি না।*

এতদুত্তরে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জীবের যে জন্মে যে প্রাক্তন সংস্কার উদ্‌বুদ্ধ হয়, তাহাই তাহার সেই বিষয়ে স্মৃতি উৎপন্ন করে। উদ্‌বুদ্ধ সংস্কারই স্মৃতির কারণ। যে সমস্ত সংস্কার অভিভূত থাকে—তাহা কোন স্মৃতি জন্মাইতে পারে না। সংস্কার থাকিলেই যে, সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ে স্মৃতি জন্মিবে, এইরূপ নিয়ম বলা যায় না। আমরা ইহ জন্মে অনুভূত সমস্ত বিষয়েরও কি সর্ব্বদা স্মরণ করিতেছি? পরন্তু গুরুতর পীড়াবশতঃ অনেকে সুপরিচিত ব্যক্তিকেও এবং অনেক পরিজ্ঞাত বিষয়ও ভুলিয়া যায়। পরে আবার সেই সমস্ত বিষয়ও স্মরণ করে। ঐরূপ জীবের মৃত্যু হইলে তখন সেই মৃত্যুই তাহার অনেক সুদৃঢ়

* গর্ভোপনিষদে স্পষ্ট কথিত হইয়াছে যে, নবম মাসে মাতৃগর্ভস্থ জীব যোগীর ন্যায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম স্মরণ করিয়া অনেক অনুতাপ করে এবং চিন্তা করে যে, এবার যদি এই যোনি হইতে মুক্ত হই, তাহা হইলে সেই সনাতন ব্রহ্মকে ধ্যান করিব। কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইলেই তখন আবার বৈষ্ণবী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া ঐ সমস্ত ভুলিয়া যায়। গর্ভোপনিষদের ঐ কথানুসারেই শাস্ত্রবিশ্বাসী সাধক রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন—"ছিলাম গর্ভে যখন যোগী তখন, ভূমে পড়ে খেলাম মাটী"।

সংস্কারও অভিভূত করে। কিন্তু পুনর্জ্জন্ম বা দেহান্তরপ্রাপ্তি হইলে তখন আবার অনেক প্রাক্তন সংস্কার উদ্‌বুদ্ধ হয়। যাহা সংস্কারকে উদ্‌বুদ্ধ করে, তাহাকে সংস্কারের উদ্বোধক বলে। সেই উদ্বোধক বহু প্রকার। মহর্ষি গৌতম ন্যায়দর্শনে (৩।২।৪১ সূত্রে) স্মৃতির কারণ সংস্কারের সেই সমস্ত উদ্বোধকের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে সর্ব্বশেষে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ অদৃষ্টেরও উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ, বহুস্থলে জীবের অদৃষ্টবিশেষও তাহার সংস্কারবিশেষের উদ্বোধক হইয়া থাকে। যেমন নবজাত শিশুর জীবনরক্ষক অদৃষ্টবিশেষই তাহার স্তন্যপানাদি বিষয়ে প্রাক্তন সংস্কারের উদ্বোধক হয়। এইরূপ যে স্থলে অন্য কোন উদ্বোধক নাই, কিন্তু সংস্কারের উদ্বোধ হইয়াছে, সেখানে অদৃষ্ট-বিশেষকেই সেই সংস্কারের উদ্বোধক বলিয়া বুঝিতে হইবে।

ফল কথা, ইহ জন্মে অনুভূত বহু বহু বিষয়েও যেমন সংস্কার থাকিলেও উদ্বোধকের অভাবে সেই সমস্ত সংস্কার সকল সময়ে সেই সমস্ত বিষয়ের স্মৃতি জন্মায় না, তদ্রূপ অসংখ্য প্রাক্তন সংস্কার বিদ্যমান থাকিলেও উদ্বোধকের অভাবে সেই সমস্ত সংস্কার উদ্‌বুদ্ধ না হওয়ায় তাহা সেই সমস্ত বিষয়ে স্মৃতি জন্মায় না। কিন্তু অনেক প্রাক্তন সংস্কার যে, সময়বিশেষে কোন উদ্বোধকবশতঃ উদ্‌বুদ্ধ হইয়া পূর্ব্বজন্মানুভূত অনেক বিষয়েরও স্মৃতি জন্মায়,—ইহা সত্য। এ বিষয়ে পূর্ব্বে অনেক উদাহরণ বলিয়াছি।

পরন্তু ইহা অনেকেই জানেন যে, সময়বিশেষে কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিলেও তখনই কাহারও তাহার প্রতি অত্যন্ত প্রীতি জন্মে। কত কালের সুপরিচিত পরমাত্মীয়ের ন্যায় তাহার সহিত ব্যবহার করিতে ইচ্ছা হয়; তাহাকে ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। তাহার উপকার করিতে উৎকট প্রবৃত্তি জন্মে। কেবল মানবের মধ্যে নহে, পশ্বাদির মধ্যেও ঐরূপ হইয়া থাকে—ইহা সত্য। কিন্তু কেন এমন হয়? ভারতের

প্রাচীন চিন্তাশীল শাস্ত্রবিশ্বাসী মনীষিগণ বুঝিয়াছেন যে, উক্তরূপ স্থলে সেই ব্যক্তি তাহার সেই দৃষ্ট ব্যক্তির সহিত তাহার পূর্ব্বজন্মের আত্মীয়তা স্মরণ করে। তখন তাহার সে বিষয়ে প্রাক্তন সংস্কার উদ্‌বুদ্ধ হয়। তাহার তখন সে বিষয়ে সম্পূর্ণ স্মৃতি না হইলেও সামান্যতঃ এই ব্যক্তি আমার আত্মীয় বা প্রিয়, এইরূপ অস্ফুট স্মৃতি অবশ্যই জন্মে। অনেক সময়ে অস্ফুটভাবে কাহারও তাহাকে পুত্র বা ভ্রাতা প্রভৃতি বলিয়াও মনে হয়। এইরূপ কখনও কেহ কোন ব্যক্তিবিশেষকে দেখিলেই সেই ব্যক্তির প্রতি তাহার সহসা অত্যন্ত অপ্রীতি জন্মে। তাহাকে ঘোর শত্রু বলিয়া মনে হয় এবং তাহার সহিত সহসা কলহ উপস্থিত হয় এবং তাহার সংসর্গপরিহারে এবং কখনও তাহার অপকারেও উৎকট প্রবৃত্তি হয়—ইহাও অনেকে জানেন। সুতরাং উক্তরূপ স্থলেও তাহার সেই ব্যক্তির সহিত পূর্ব্বজন্মের শত্রুতা বিষয়ে অস্ফুট স্মৃতি জন্মে—ইহাই স্বীকার্য্য। নচেৎ তখন তাহার ঐরূপ অবস্থা বা ব্যবহার সম্ভব হইতে পারে না।

এইরূপ কোন সময়ে কোন স্থানে কোন সুদৃশ্য দর্শন বা সুমধুর সংগীতাদি শ্রবণ করিলে সুখী ব্যক্তিও সহসা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হন, ইহাও অনেকেই জানেন। কিন্তু কেন ঐরূপ হয়, ইহা সকলে চিন্তা করেন না। ভারতের প্রাচীন পণ্ডিতগণ চিন্তা করিয়া উহার কারণ বলিয়াছেন যে, ঐরূপ স্থলে তখন সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই কাহারও সহিত তাহার পূর্ব্বজন্মের সৌহৃদ্য স্মরণ করে। ভারতের অমরকবি কালিদাস "অভিজ্ঞান-শকুন্তল" নাটকের পঞ্চম অঙ্কে ঐ মহাসত্যের ঘোষণা করিতে বলিয়াছেন—

"রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।

"তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তর-সৌহৃদানি ॥"

আবার ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর সভায় সমাগত সহস্র সহস্র সুযোগ্য নৃপতির মধ্যে ইন্দুমতী অজ রাজাকেই কেন বরণ করিয়াছিলেন; ইহা সমর্থন করিতেও কালিদাস রঘুবংশে বলিয়াছেন—"মনো হি জন্মান্তর-সংগতিজ্ঞং" (৭।১৫)। মনই জন্মান্তর সম্বন্ধ বুঝিতে পারে। অর্থাৎ অজ রাজার দর্শনের পরেই তাঁহার সহিত ইন্দুমতীর পূর্ব্বজন্মের সেই সম্বন্ধ বিষয়ে সুপ্ত সংস্কার প্রবুদ্ধ হইয়া তাহার স্মৃতি উৎপন্ন করিয়াছিল।

অনেকে প্রশ্ন করেন যে, কাহারও কি কখনও কোন উপায়ে পূর্ব্ব জন্মের সমস্ত বার্ত্তার স্মরণ হইয়াছে? তাহা কি সম্ভব? আমরা দৃঢ় বিশ্বাসে বলি, অবশ্যই সম্ভব। কারণ, ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

"বেদাভ্যাসেন সততং শৌচেন তপসৈব চ।
অদ্রোহেণ চ ভূতানাং জাতিং স্মরতি পৌর্ব্বিকীং"। (৪।১৪৮)

অর্থাৎ সতত বেদাভ্যাস, শৌচ, তপস্যা ও সর্ব্বভূতের অহিংসার দ্বারা মানব পূর্ব্বজন্ম স্মরণ করে। যাঁহাদিগের পূর্ব্বজন্মের স্মরণ হয়, তাঁহারা শাস্ত্রে "জাতিস্মর" নামে কথিত হইয়াছেন। পূর্ব্বকালে অনেক তপস্বী ও যোগী "জাতিস্মর" হইয়াছিলেন। পুরাণ এবং ইতিহাসে অনেক জাতিস্মরের উপাখ্যান বর্ণিত আছে। মহাতপস্বী জড়-ভরতের মৃগ-জন্মলাভ হইলেও তখনই পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি উপস্থিত হইয়াছিল এবং মৃগজন্মের পরে ব্রাহ্মণকুলে জন্মলাভ হইলেও তখন তাঁহার সেই প্রাক্তন মৃগজন্মের সম্পূর্ণ স্মৃতি উপস্থিত হইয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের অষ্টম ও নবম অধ্যায় পাঠ করিলে ইহা জানা যাইবে। যোগদর্শনে মহর্ষি পতঞ্জলিও স্পষ্ট বলিয়াছেন,—

সংস্কার-সাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ব্বজাতিবিজ্ঞানম্।—৩।১৮

অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের সেই সমস্ত অনুভব জন্য সংস্কার এবং শুভাশুভ কর্ম্মজন্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ সংস্কার—এই দ্বিবিধ সংস্কারের প্রত্যক্ষ হইলে পূর্ব্বজন্মের বিশেষ জ্ঞান জন্মে। যোগী তাঁহার যোগশক্তি দ্বারা ঐ সমস্ত সংস্কারেই চিত্ত-ধারণা করিতে পারেন। পরে তাঁহার ঐ ধারণাই ধ্যানরূপে পরিণত হয় এবং পরে ঐ ধ্যান সমাধিরূপে পরিণত হয়। সেই সমস্ত সংস্কারে সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত যোগীর ধারণা, ধ্যান ও সমাধির ফলে তাঁহার ঐ সমস্ত অতীন্দ্রিয় সংস্কারেরও অলৌকিক প্রত্যক্ষ জন্মে। সুতরাং তখন যে দেশে ও যে কালে যে কারণে তাঁহার ঐ সমস্ত সংস্কার জন্মিয়াছিল, সেই সমস্ত দেশ এবং কালাদিরও অবশ্য অলৌকিক প্রত্যক্ষ জন্মে। সুতরাং যোগী তখন পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে কোথায় কিরূপ ছিলেন, ইত্যাদি সমস্তই জানিতে পারেন। যোগীর পক্ষে ইহা অসম্ভব নহে। যোগদর্শনের ভাষ্যকার ব্যাসদেব ইহা সমর্থন করিতে—ভগবান্ আবট্য ও মহর্ষি জৈগীষব্যের সংবাদ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। মহর্ষি জৈগীষব্য ভগবান্ আবট্যের নিকটে তাঁহার দশমহাকল্পের জন্ম-পরম্পরার জ্ঞান বর্ণন করিয়াছিলেন। সংসারে সুখের অপেক্ষায় দুঃখই অধিক, সর্ব্বত্রই জন্ম ও সাংসারিক সুখাদি সমস্তই দুঃখময়—ইহাও তিনি বলিয়াছিলেন।

বস্তুতঃ পূর্ব্বকালে যে, সাধনাবিশেষের ফলে অনেকে জাতিস্মরত্ব লাভ করিয়াছিলেন—ইহা ঋষিগণের পরীক্ষিত সত্য। তাই মন্বাদি ঋষিগণ ঐ সত্য প্রকাশ করিয়া উহার উপায়ও বলিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালেও গৌতম বুদ্ধদেব, বোধি-বৃক্ষতলে সম্বোধি লাভ করিয়া তাঁহার অনেক জন্মের বার্ত্তা বলিয়াছিলেন—ইহা বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের "জাতক" গ্রন্থে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। এখনও অনেক জাতিস্মর যোগী জীবিত আছেন—সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা তাঁহাদিগকে জানি না। কোন কোন সময়ে কোন দেশে কোন জাতিস্মরের সংবাদ এখনও শুনা যায়। অবশ্য জাতিস্মরমাত্রই যে, তাঁহার সমস্ত পূর্ব্বজন্মের

সম্পূর্ণ স্মরণ করিয়াছেন, তাহা নহে। যাঁহার যেরূপ সাধনার ফলে পূর্ব্বজন্মের যে সমস্ত সংস্কার উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছে, সেই সমস্ত সংস্কার জন্য সেই সমস্ত বিষয়েই স্মরণ হইয়াছে।

পরন্তু অনেক সাধারণ মানবেরও যে, ধ্যানদ্বারা ক্রমে অনেক বিস্মৃত বিষয়েরও স্মরণ হয়—ইহাও সকলেরই স্বীকার্য্য। আমাদিগেরও অনেক সময়ে এমন ঘটে যে, কোন ব্যক্তিকে দেখিলেই তখন মনে হয়, ইহাকে কোথায় দেখিয়াছি। কিন্তু তাহাকে কোথায় দেখিয়াছি এবং তাহার পরিচয় কি, ইত্যাদি কিছুই মনে হয় না। পরে সেই বিষয়ে একাগ্র-চিত্তে ধ্যান করিলে ক্রমে কিছু কিছু মনে হয় এবং অনেক সময়ে দীর্ঘকাল ধ্যানের পরে সেই চিন্তিত বিষয়ের সম্পূর্ণ স্মৃতিও হয়। এইরূপ যে যোগী তাঁহার সমস্ত প্রাক্তন সংস্কারেরই দীর্ঘকাল ধ্যান করিতে সমর্থ এবং সেই ধ্যান তাঁহার সেই সমস্ত বিষয়ে সমাধিরূপে পরিণত হয়,—তিনি যে, কালে সেই সমস্ত সংস্কারের প্রত্যক্ষ করিবেন, ইহা অসম্ভব হইতে পারে না।

এখন বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত নানা যুক্তির দ্বারা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত আত্মা দেহাদিভিন্ন ও নিত্য—এই সিদ্ধান্তের মনন করিলে পূর্ব্বজাত শ্রবণরূপ-জ্ঞান-জন্য সংস্কার দৃঢ় হয়। তাহার পরে যোগশাস্ত্রোক্ত উপায়ে উক্তরূপে আত্মার ধ্যানাদি করিলে সময়ে সেই মুমুক্ষু যোগীর পূর্ব্বোক্ত-রূপেই নিজের আত্মার স্বরূপদর্শন হয়। কিন্তু চিত্তশুদ্ধি ও বৈরাগ্য ব্যতীত মুক্তিলাভে অধিকারই হয় না। সুতরাং মুক্তিলাভে অধিকার-লাভের জন্য প্রথমে বহু কর্ত্তব্য আছে। এবিষয়ে গৌতমের কথা পূর্ব্বে (২০শ পৃঃ) বলিয়াছি।

বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদও বলিয়াছেন—**আত্ম-কর্ম্মসু-মোক্ষো ব্যাখ্যাতঃ** (৬।২।১৬)—অর্থাৎ সমস্ত আত্ম-কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইলেই মোক্ষ হয়, ইহা কথিত হইয়াছে। 'উপস্কার'কার মহামনীষী

শঙ্কর মিশ্র ঐ সূত্রের ব্যাখ্যায় কণাদোক্ত "আত্মকর্ম্মসু"—এই বহু বচনান্ত পদের দ্বারা মুমুক্ষুর কর্ত্তব্য শ্রবণ মননাদি ও শমদমাদি সম্পত্তির সহিত ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার ও নিজের আত্ম-সাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পরমাত্মা ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার ব্যতীত মুমুক্ষুর মুক্তিলাভের চরম কারণ আত্মসাক্ষাৎকার হয় না। সুতরাং সেই পরমাত্মা ঈশ্বরের সাক্ষাৎকারের জন্য প্রথমে তাঁহারও শ্রবণের পরে মনন কর্ত্তব্য। তাই ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ পরমাত্মা ঈশ্বরের মননরূপ উপাসনার জন্যই ঈশ্বরবিষয়ে বহু অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন। মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য বৃহদারণ্যক উপনিষদের "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে "আত্মন্" শব্দের দ্বারা পরমাত্মাকেও গ্রহণ করিয়াছেন। পরমাত্মারও যে, শ্রবণের পরে অনুমান প্রমাণ দ্বারা মনন করিয়া পরে দর্শনের জন্য ধ্যানাদি কর্ত্তব্য—এবিষয়ে তিনি প্রমাণরূপে স্মৃতি বচনও উদ্ধৃত করিয়াছেন।* অতএব নৈয়ায়িকগণের ঈশ্বরানুমানের জন্য বহু বিচারও শাস্ত্রমূলক। উহা শাস্ত্র বিহিত ঈশ্বর মননের সহায়।

অবশ্য পরব্রহ্ম হইতে জীবাত্মা তত্ত্বতঃ অভিন্ন—এই মতে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারই মুমুক্ষুর আত্ম-সাক্ষাৎকার। কিন্তু কণাদ ও গৌতমের মতে মুমুক্ষুর ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হইলে তজ্জন্যই নিজের আত্ম-সাক্ষাৎকার জন্মে এবং উহাই তাঁহার সংসার নিদান সমস্ত মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তির দ্বারা মুক্তির চরম কারণ হয়। কারণ কণাদ ও গৌতম দ্বৈতবাদী। তাঁহাদিগের মতে জীবাত্মা ও পরব্রহ্ম তত্ত্বতঃ ভিন্ন। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

---

* "শ্রুতো হি ভগবান্ বহুশঃ শ্রুতি-স্মৃতীতিহাস-পুরাণাদিষু, ইদানীং মন্তব্যো ভবতি, 'শ্রোতব্যো মন্তব্য' ইতি শ্রুতেঃ, 'আগমেনানুমানেন ধ্যানাভ্যাসরসেন চ। ত্রিধা-প্রকল্পয়ন্ প্রজ্ঞাং লভতে যোগমুত্তম' মিতি স্মৃতেশ্চ"।—কুসুমাঞ্জলি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কণাদ ও গৌতম দ্বৈতবাদী

কিছুদিন পূর্ব্বে অদ্বৈতবাদী কোন কোন সুবিখ্যাত সুপণ্ডিতও এইরূপ কথা লিখিয়া গিয়াছেন যে, কণাদ এবং গৌতমেরও অদ্বৈতমতেই চরম তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। ব্যাখ্যা-কর্ত্তারা তাঁহাদিগের অন্যরূপ মতের ব্যাখ্যা করিলেও তাঁহাদিগের কোন কোন সূত্রের দ্বারাও অদ্বৈত মতই তাঁহাদিগের প্রকৃত সিদ্ধান্ত বুঝা যায়। কথাটা কিন্তু নূতন নহে। কারণ কাশ্মীরবাসী সদানন্দ যতিও তাঁহার **অদ্বৈত ব্রহ্মসিদ্ধি** গ্রন্থে সকল মুনিমতের সমন্বয়োদ্দেশ্যে বলিয়াছেন যে, * নানা মতের প্রকাশক সমস্ত মুনিরই অদ্বৈতমতেই চরম তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। কারণ, তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞতাবশতঃ ভ্রান্ত ছিলেন না। কিন্তু বাহ্যদৃষ্টি-তৎপর স্থূলদর্শী ব্যক্তিদিগের পক্ষে প্রথমে অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ অসম্ভব বলিয়া তাঁহারা নানাভাবে দ্বৈতমত-প্রতিপাদক নানা দর্শনশাস্ত্রও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তদ্দ্বারা স্থূলদর্শী বাহ্যদৃষ্টি-তৎপর ব্যক্তিদিগের নাস্তিক্য-নিবৃত্তি করাই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য। কিন্তু ঐ সমস্ত দর্শনে তাঁহাদিগের উপদিষ্ট দ্বৈতবাদ সিদ্ধান্তরূপে তাঁহাদিগের বিবক্ষিত নহে, তাঁহাদিগেরও অদ্বৈতবাদই সিদ্ধান্ত।

---

* "সর্ব্বেষাং প্রস্থানকর্ত্তৃণাং মুনীনাং বক্ষ্যমাণবিবর্ত্তবাদ এব পর্য্যবসানেনাদ্বিতীয়ে পরমেশ্বর এব বেদান্তপ্রতিপাদ্যে তাৎপর্য্যম্। ন হি তে মুনয়ো ভ্রান্তাস্তেষাং সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ— কিন্তু বহির্মুখপ্রবণানামাপাততঃ পরমপুরুষার্থেঽদ্বৈতমার্গে প্রবেশো ন সম্ভবতীতি নাস্তিক্য নিবারণায় তৈঃ প্রস্থানভেদা দর্শিতা—ন তু তাৎপর্য্যেণ"।—"অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি" প্রথম মুদ্গর।

সদানন্দ যতির ন্যায় মধুসূদন সরস্বতীও মহিম্নঃ স্তোত্রের "ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ"—ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় বেদাদিসর্ব্বশাস্ত্রপ্রস্থানভেদের বর্ণন করিয়া সর্ব্বশেষে সর্ব্বশাস্ত্রের সমন্বয়প্রদর্শনোদ্দেশ্যে এইরূপ বলিয়াছেন যে, অদ্বৈতসিদ্ধান্তেই সর্ব্বশাস্ত্রের চরম তাৎপর্য্য। কিন্তু প্রথমেই অদ্বৈত-মার্গে সকলের প্রবেশ অসম্ভব বলিয়া অধিকারিবিশেষের জন্য নানা শাস্ত্রে নানা মতের উপদেশ হইয়াছে। মহামনীষী মধুসূদন সরস্বতী গৌতমাদি ঋষিগণের কোন সূত্র দ্বারা তাঁহাদিগকে অদ্বৈতবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু সদানন্দ যতি ঐ উদ্দেশ্যে শেষে গৌতমের দুইটি সূত্রও উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং নব্য-বৈয়াকরণ নাগেশ-ভট্টও সেই সূত্র উদ্ধৃত করিয়া কল্পনাবলে গৌতমেরও অদ্বৈতমতেই চরম সম্মতি বলিয়াছেন। সে সব কথা পরে বলিব।

কিন্তু এখানে প্রথমে বলা আবশ্যক যে, পূর্ব্বোক্তভাবে সর্ব্বশাস্ত্রের সমন্বয়-ব্যাখ্যার দ্বারা কখনই সকল সম্প্রদায়ের চিরবিবাদ-নিবৃত্তির আশা নাই। কারণ, সকল সম্প্রদায়ই তাঁহাদিগের অভিমত মতকেই প্রকৃত সিদ্ধান্ত বলিয়া অন্যান্য আর্যমতের পূর্ব্বোক্তরূপ একটা উদ্দেশ্য বলিতে পারেন। সদানন্দ যতির পূর্ব্বে নব্যসাংখ্যাচার্য্য বিজ্ঞানভিক্ষুও সাংখ্যপ্রবচন-ভাষ্যের প্রারম্ভে তাঁহার নিজ মতকেই প্রকৃত সিদ্ধান্ত বলিয়া উহার বিরুদ্ধ ন্যায় বৈশেষিকাদি শাস্ত্রোক্ত মতের পূর্ব্বোক্তরূপ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তাহার ঐরূপ সমন্বয়-ব্যাখ্যা কি অন্য সম্প্রদায় গ্রহণ করিয়াছেন? অথবা কখনও করিবেন? সদানন্দ যতিও ত নিজমত সমর্থনের জন্য বিজ্ঞানভিক্ষুর উদ্ধৃত কোন বচন উদ্ধৃত করিয়াও তাঁহার অভিমত সমন্বয়ব্যাখা গ্রহণ করেন নাই। কারণ, বিজ্ঞানভিক্ষু সদানন্দ যতির অভিমত অদ্বৈতমতকে প্রকৃত সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তিনি উক্ত মতের প্রতিবাদই করিয়াছেন।

ফল কথা—সমস্ত দার্শনিক সম্প্রদায়ই যখন তাঁহাদিগের আচার্য্যোক্ত মতকে প্রকৃত সিদ্ধান্ত বলিয়াই বিশ্বাস করেন, তখন পূর্ব্বোক্তভাবে সমন্বয়-ব্যাখ্যা ব্যর্থ। তাই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও ঐভাবে সমন্বয়-ব্যাখ্যা করেন নাই। পরন্তু তিনি বেদান্তদর্শনের প্রথমসূত্র-ভাষ্যে আত্মার স্বরূপবিষয়ে নানা মতভেদ প্রকাশ করিতে দ্বৈতবাদী ঋষিদিগের মতও প্রকাশ করিয়াছেন এবং পরেও উক্ত বিষয়ে কপিল ও কণাদ প্রভৃতির দ্বৈতমত স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া অদ্বৈতমতের প্রতিষ্ঠার জন্য সেই সমস্ত আর্যমতেরও প্রতিবাদ করিয়াছেন। সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্রও কণাদ ও গৌতমের মত-ব্যাখায় তাঁহাদিগের দ্বৈতমতেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরন্তু তিনি "ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকা" গ্রন্থে গৌতমের কোন কোন সূত্র দ্বারা অদ্বৈত মতের খণ্ডনও করিয়া গিয়াছেন।* গৌতম যে, অদ্বৈতবাদী নহেন, ইহা-প্রতিপাদন করাই সেখানে বাচস্পতি মিশ্রের উদ্দেশ্য। নচেৎ সেখানে তাঁহার গৌতমের ঐরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজনই বুঝা যায় না।

পরন্তু বেদান্তদর্শনের চতুর্থ সূত্র-ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর, যেখানে কোন অংশে নিজমত সমর্থনের জন্য গৌতমের ন্যায়দর্শনের "দুঃখ-জন্ম—" ইত্যাদি দ্বিতীয় সূত্রটী "আচার্য্য-প্রণীত" বলিয়া সসম্মানে উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেখানেও "ভামতী" টীকায় শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, † গৌতমসম্মত তত্ত্বজ্ঞান কিন্তু উক্ত স্থলে আচার্য্য শঙ্করের অভিমত নহে। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপবিষয়ে আচার্য্য শঙ্কর গৌতমের মত গ্রহণ করেন নাই। কারণ, গৌতম দ্বৈতবাদী। সুতরাং তাঁহার মতে অদ্বৈতব্রহ্মজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান হইতে পারে না।

---

* ন্যায়দর্শন চতুর্থ অঃ ১ম আঃ ১৯শ, ২০শ, ও ৪১শ সূত্র ও "তাৎপর্য্যটীকা" দ্রষ্টব্য।

† "তত্ত্বজ্ঞানান্মিথ্যাজ্ঞানাপায় ইত্যেতাবন্মাত্রেণ সূত্রোপন্যাসঃ। ন ত্বক্ষপাদসম্মতং তত্ত্বজ্ঞানমিহ সম্মতম্।"—ভামতী ১।১।৪।

বস্তুতঃ মহর্ষি কণাদ ও গৌতমকে কখনও আমরা অদ্বৈতবাদী বলিয়া বুঝিতে পারি না। কারণ, অদ্বৈতমতে "জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ"। এক ব্রহ্মই প্রত্যেক জীবদেহে কল্পিত জীবভাবে অবস্থিত। সুতরাং সমস্ত জীবদেহেই জীবাত্মা বস্তুতঃ এক। কিন্তু জীবাত্মার উপাধি যে অন্তঃকরণ, তাহা প্রত্যেক জীবদেহে ভিন্ন এবং সুখ দুঃখাদি সেই সমস্ত অন্তঃকরণেরই বাস্তব ধর্ম্ম। উহা আত্মার বাস্তব ধর্ম্ম নহে। কিন্তু আত্মার উপাধি সেই অন্তঃকরণের ধর্ম্ম সুখ-দুঃখাদিই আত্মাতে আরোপিত হয়, এজন্য ঐ সমস্ত আত্মার ঔপাধিক ধর্ম্মনামে কথিত হইয়াছে।

কিন্তু কণাদ ও গৌতমের মতে জীবাত্মা প্রত্যেক জীবদেহে ভিন্ন এবং জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রযত্ন ও সুখ-দুঃখাদি সেই বিভিন্ন আত্মারই বাস্তব ধর্ম্ম; ঐ সমস্ত অন্তঃকরণ বা মনের ধর্ম্ম নহে। সুতরাং কণাদ ও গৌতমকে কিরূপে অদ্বৈতবাদী বলা যায়? জীবাত্মা ও তাহার মুক্তির স্বরূপবিষয়ে কণাদ সম্প্রদায়ের মত প্রকাশ করিতে শারীরকভাষ্যে আচার্য্য শঙ্করও বলিয়া গিয়াছেন যে, * তাঁহাদিগের মতে জীবাত্মা প্রতি শরীরে ভিন্ন, সুতরাং বহু এবং স্বভাবতঃ অচেতন, কিন্তু অতিসূক্ষ্ম মনের সহিত সংযোগবশতঃ সেই সমস্ত জীবাত্মাতে জ্ঞান ও ইচ্ছা প্রভৃতি নববিধ বিশেষ গুণ জন্মে এবং সেই সমস্ত বিশেষগুণের অত্যন্ত উচ্ছেদই তাঁহাদিগের মতে মুক্তি। বৃহদারণ্যক-ভাষ্যেও (৪।৩।২২) শঙ্কর স্পষ্ট বলিয়াছেন—"যথেচ্ছাদীনামাত্মধর্ম্মত্বং কল্পয়ন্তো বৈশেষিকা নৈয়ায়িকাশ্চ"।

---

* "সতি বহুত্বে বিভুত্বে চ ঘটকুড্যাদিসমানা দ্রব্যমাত্রস্বরূপাঃ স্বতোঽচেতনা আত্মানস্তদুপকরণানি চাণূনি মনাংস্যচেতনানি। তত্রাত্মদ্রব্যাণাং মনোদ্রব্যাণাঞ্চ সংযোগান্নবেচ্ছাদয়ো বৈশেষিকা আত্মগুণা উৎপদ্যন্তে। তে চাব্যতিরেকেণ প্রত্যেকমাত্মসু সমবয়ন্তি, স সংসারঃ। তেষাং নবানামাত্মগুণানামত্যন্তানুৎপাদো মোক্ষ ইতি কাণাদাঃ"।
—বেদান্তদর্শন ২।৩।৫০ সূত্রের শারীরকভাষ্য।

অদ্বৈতমতের প্রতিষ্ঠাতা মহামনীষী মধুসূদন সরস্বতীও 'ভগবদ্‌গীতা'র টীকায় বৈশেষিক সম্প্রদায়ের ন্যায় নৈয়ায়িক ও মীমাংসক প্রভৃতি অনেক সম্প্রদায়ের মতেও যে, জীবাত্মা—জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম এবং ভাবনা অর্থাৎ জ্ঞান জন্য সংস্কার, এই নববিধ বিশেষগুণবিশিষ্ট এবং প্রতি শরীরে ভিন্ন নিত্য ও বিশ্বব্যাপী—ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন ।†

কিন্তু অদ্বৈতমতনিষ্ঠ কোন মহামনীষীও কণাদ এবং গৌতমকেও অদ্বৈতবাদী বলিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা জ্ঞান-সুখাদি আত্মার ধর্ম্ম—ইহা সুস্পষ্ট বলেন নাই এবং আত্মার নানাত্ব বা একত্ববিষয়ে গৌতম কোন কথা স্পষ্ট বলেন নাই—এইরূপ অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু তাহা হইলে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ও মধুসূদন সরস্বতী, কি, কণাদ ও গৌতমের সূত্র না দেখিয়াই অথবা উহার প্রকৃতার্থ না বুঝিয়াই কেবল ব্যাখ্যাকারদিগের কথানুসারেই পূর্ব্বোক্ত ঐ সমস্ত কথা বলিয়া

† "নন্বাত্মনো নিত্যত্বে বিভুত্বে চ ন বিবদামঃ, প্রতিদেহমেকত্বন্তু ন সহামহে। তথাহি বুদ্ধি-সুখ-দুঃখেচ্ছা-দ্বেষ-প্রযত্ন-ধর্ম্মাধর্ম্ম-ভাবনাখ্যনববিশেষগুণবন্তঃ প্রতিদেহং ভিন্না এবং নিত্যা বিভবশ্চাত্মান ইতি বৈশেষিকা মন্যন্তে। ইমমেব চ পক্ষং তার্কিকমীমাংসকাদয়োঽপি প্রতিপন্নাঃ"।—ভগবদ্‌গীতা—দ্বিতীয় অঃ, ১৪শ শ্লোকের টীকা।

* সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী মহামহোপাধ্যায় পূজ্যপাদ চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় লিখিয়াছেন—"গৌতম ও কণাদ, জ্ঞান-সুখাদি আত্মার ধর্ম্ম—এ কথা স্পষ্ট ভাষায় বলেন নাই।" "আত্মা নিত্যজ্ঞানস্বরূপ নহে বা নিত্যজ্ঞান নাই—ইহা গৌতম ও কণাদ বলেন নাই। টীকাকারেরা তাহা বলিয়াছেন। যেরূপ বলা হইল, তৎপ্রতি মনোযোগ করিলে সুধীগণ বুঝিতে পারিবেন যে, ন্যায়াদি-দর্শনকর্ত্তাদের মত বেদান্তের বিরুদ্ধ, ইহা বলিবার বিশেষ হেতু নাই। বলিতে পারা যায় যে, বেদান্তমত তাঁহাদিগের অভিমত। পরন্তু অন্তঃকরণের সহিত তাদাত্ম্যাধ্যাসনিবন্ধন জ্ঞান-সুখাদি আত্মধর্ম্মরূপে প্রতীয়মান হয়, ইহা তাঁহারা খুলিয়া বলেন নাই। তাদৃশ সূক্ষ্ম বিষয় শিষ্যগণ সহসা বুঝিতে পারিবে না, এই বিবেচনাতেই তাঁহারা উহা অস্পষ্ট রাখিয়াছেন।" "গৌতম আত্মার নানাত্ব বা একত্ব বিষয়ে কোন কথা বলেন নাই।" ফেলোসিপের লেক্‌চার—পঞ্চম বর্ষ, ১৮০ পৃষ্ঠা।

গিয়াছেন? ব্যাখ্যাকারদিগের ঐ সমস্ত মতই কি, তাঁহাদিগের সেখানে খণ্ডনীয়? তাহা হইলে শারীরক ভাষ্যে কণাদ-সম্মত "আরম্ভবাদে"র খণ্ডন করিতে আচার্য্য শঙ্কর কণাদসূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন কেন? আর কণাদ ও গৌতমের কোন সূত্রের দ্বারা অদ্বৈত মত বুঝিতে পারিলে তিনি অদ্বৈতমত-সমর্থনে তাহাও কেন বলেন নাই?

বস্তুতঃ কণাদ ও গৌতম যে, দ্বৈতবাদী,—ইহা চিরপ্রসিদ্ধই আছে। তাঁহাদের সূত্রের দ্বারাও তাহাই বুঝা যায়। কিন্তু তাহা বুঝিতে হইলে তাঁহাদিগের অনেক সূত্রের পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। সংক্ষেপে তাহা সুব্যক্ত করা যায় না। তথাপি এখানে আবশ্যকবোধে কিছু বলিতেছি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মহর্ষি গৌতম, জ্ঞান ও ইচ্ছা প্রভৃতিকে জীবাত্মার নিজেরই বাস্তব গুণ বলিয়াছেন। তিনি যে স্মৃতিকে আশ্রয় করিয়া দেহাদি ভিন্ন নিত্য আত্মার অস্তিত্ব সমর্থন করিয়াছেন, ঐ স্মৃতিরূপ জ্ঞান যে, তাঁহার মতে আত্মার গুণ হইলেই উপপন্ন হয়, নচেৎ ঐ স্মৃতির উপপত্তিই হয় না—ইহা তিনি 'তদাত্মগুণত্বসদ্ভাবাদপ্রতিষেধঃ' (৩।১।১৪) এই সূত্রের দ্বারা স্পষ্ট বলিয়াছেন। পরন্তু জ্ঞান যে, অন্তঃকরণ বা মনের গুণ নহে—ইহাও তিনি পরে স্পষ্ট বলিয়াছেন এবং জ্ঞান আত্মারই ধর্ম্ম, কিন্তু ইচ্ছা প্রভৃতি মনের ধর্ম্ম, এই মতবিশেষেরও খণ্ডন করিয়া, জ্ঞানজন্য ইচ্ছা প্রভৃতিও জ্ঞানের আশ্রয় আত্মারই ধর্ম্ম—ইহাও তিনি সমর্থন করিয়াছেন।* পরন্তু স্মরণ-রূপ জ্ঞান যে, চিরস্থায়ী

"যুগপজ্‌জ্ঞেয়ানুপলব্ধেশ্চ ন মনসঃ।"
"জ্ঞস্যেচ্ছাদ্বেষনিমিত্তত্বাদারম্ভনিবৃত্ত্যোঃ।"
"যথোক্তহেতুত্বাৎ পারতন্ত্র্যাদকৃতাভ্যাগমাচ্চ ন মনসঃ।"
"পরিশেষাদ্ যথোক্তহেতূপপত্তেশ্চ॥"

ন্যায়দর্শন—তৃতীয় অধ্যায়, দ্বিতীয় আহ্নিক, ১৯শ-৩৪শ-৩৮শ ও ৩৯শ সূত্র দ্রষ্টব্য।

আত্মারই" বাস্তব ধর্ম—ইহা সমর্থন করিতে পরে আবার তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন—

স্মরণন্ত্বাত্মনো জ্ঞ-স্বাভাব্যাৎ ॥ ৩।২।৪০ ॥

অর্থাৎ আত্মা জ্ঞাতৃ-স্বভাব। জ্ঞাতাই পূর্ব্বে জানিয়াছে এবং পরে জানিবে এবং বর্ত্তমান কালেও জানিতেছে। সুতরাং ত্রিকালীন জ্ঞান-শক্তি বা জ্ঞানবত্তা চিরস্থায়ী জ্ঞাতা বা আত্মারই স্বভাব। অর্থাৎ জ্ঞান আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম না হইলেও স্বকীয় ধর্ম্ম—বাস্তব ধর্ম্ম, উহা ঔপাধিক ধর্ম্ম নহে। মহর্ষি গৌতম পরে চতুর্থ অধ্যায়ে 'প্রীতেরাত্মাশ্রয়ত্বাদপ্রতিষেধঃ' (৪।১।৫১) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা সুখ ও দুঃখ যে, আত্মারই ধর্ম্ম, ইহাও ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন। সুতরাং তিনি যে, তাঁহার নিজ মত অস্পষ্ট রাখিয়াছেন, "খুলিয়া বলেন নাই" এবং তাঁহার মত অদ্বৈত মতের বিরুদ্ধ নহে, পরন্তু অদ্বৈতমত তাঁহারও অভিমত—এই সমস্ত কথা আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারি না।

পরন্তু মহর্ষি গৌতম ন্যায়দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ে প্রথমে আত্ম-পরীক্ষায় এক আত্মার দৃষ্ট বিষয় অন্য আত্মা স্মরণ করিতে পারে না—এই সিদ্ধান্ত অনুসারেই আত্মা দেহাদি ভিন্ন ও নিত্য—এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন এবং স্মরণরূপ জ্ঞানকে আত্মারই ধর্ম্ম বলিয়াছেন! অতএব তাঁহার মতে—আত্মা এক নহে, আত্মা প্রতিদেহে ভিন্ন—বহু, ইহাও স্পষ্টই* বুঝা যায়। "ন্যায়বার্ত্তিক"কার প্রাচীন নৈয়ায়িক উদ্দ্যোতকর গৌতমের সূত্রানুসারে ইহাই বলিয়া গিয়াছেন।

আপত্তি হয় যে, সমস্ত জীবাত্মাই বিশ্বব্যাপী হইলে সমস্ত জীবদেহেই সমস্ত জীবাত্মার সংযোগ-সম্বন্ধ আছে। তাহা হইলে অন্যান্য সমস্ত জীব-

* বহুত্বঞ্চ অতএব—"দর্শনস্পর্শনাভ্যামেকার্থগ্রহণাৎ।" নান্যদৃষ্টমন্যঃ স্মরতীতি। "শরীরদাহে পাতকাভাবা"দিতি, সেয়ং সর্ব্বা ব্যবস্থা শরীরিভেদে সম্ভবতীতি।"—ন্যায়বার্ত্তিক।

দেহেও সমস্ত আত্মার জ্ঞানাদি জন্মে না কেন ?' এতদুত্তরে মহর্ষি গৌতম পরে বলিয়াছেন—

শরীরোৎপত্তিনিমিত্তবৎ সংযোগোৎপত্তিনিমিত্তং কর্ম্ম। ৩।২।৬৬।

তাৎপর্য্য এই যে, বিশ্বব্যাপী প্রত্যেক জীবাত্মারই সমস্ত জীবদেহের সহিত সংযোগ থাকিলেও যে জীবাত্মার অদৃষ্টবিশেষজন্য তাহার যে শরীর-বিশেষের সৃষ্টি হয়, সেই শরীরের সহিতই সেই জীবাত্মার বিলক্ষণ সংযোগ এবং তাহার সহিতই তাঁহার সেই মনের বিলক্ষণ সংযোগ জন্মে। তাহাতেও সেই অদৃষ্টবিশেষই নিমিত্ত। সেই অদৃষ্টবিশেষ-জন্য যে শরীরের সহিত যে আত্মার ও মনের বিলক্ষণ সংযোগ জন্মে, সেই আত্মাকেই সেই শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মা বলে। শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মাতেই যখন জ্ঞানাদি জন্মে, তখন যে আত্মা, যে শরীরাবচ্ছিন্ন, সেই শরীরেই সেই আত্মাতে জ্ঞানাদি জন্মিবে ; অন্যান্য শরীরের সহিত তাহার সংযোগ থাকিলেও সেই সমস্ত শরীর তাহার অদৃষ্টবিশেষজন্য না হওয়ায় সেই আত্মা সেই সমস্ত শরীরাবচ্ছিন্ন নহে।

অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায় গৌতমের উক্তরূপ উত্তর স্বীকার না করিলেও উক্ত সূত্রের দ্বারা গৌতমের মতে জীবাত্মা যে, আকাশের ন্যায় বিশ্বব্যাপী এবং প্রতি শরীরে ভিন্ন—ইহা স্বীকার করিতেই হইবে ; নচেৎ তাঁহার উক্তরূপ উত্তর সঙ্গতই হয় না। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও সেখানে গৌতমের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া তদনুসারেই তাঁহার ঐ উত্তরের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। পরন্তু মহর্ষি গৌতম উহার পরে শুভাশুভ কর্ম্মজন্য ধর্ম্মাধর্ম্মও যে, মনের গুণ নহে ; উহাও আত্মারই গুণ ; প্রত্যেক আত্মাই নিজকৃত-কর্ম্মফল ধর্ম্মাধর্ম্মজন্যই নানাবিধ জন্মলাভ করে—ইহাও বিচারপূর্ব্বক সমর্থন করিয়াছেন। তাহা হইলে যিনি প্রত্যেক জীবদেহে পৃথক্ পৃথক্ আত্মা স্বীকার করিয়া আত্মার বাস্তবভেদ স্বীকার করিয়াছেন এবং জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রযত্ন এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম ও তজ্জন্য সুখ ও দুঃখ,

জীবাত্মারাই বাস্তব গুণ বলিয়াছেন, তাঁহাকে কিরূপে অদ্বৈতবাদী বলা যায়?

এইরূপ মহর্ষি কণাদের সূত্র দ্বারাও জীবাত্মা যে, প্রতি শরীরে ভিন্ন—ইহাই তাঁহার সিদ্ধান্ত বুঝা যায়। কিরূপে বুঝা যায়, তাহাও এখানে বলিতেছি। কিন্তু বিশেষ প্রণিধানপূর্ব্বক বুঝিতে হইবে। বৈশেষিকদর্শনে কণাদ যথাক্রমে নিম্নলিখিত তিনটি সূত্র বলিয়াছেন—

সুখ-দুঃখ-জ্ঞান-নিষ্পত্ত্যবিশেষাদৈকাত্ম্যম্ ॥ ৩।২।১৯ ॥

নানাত্মানো ব্যবস্থাতঃ ॥ * ৩।২।২০।

শাস্ত্র-সামর্থ্যাচ্চ ॥ ৩।২।২১।

কণাদ প্রথমে "সুখ-দুঃখ"—ইত্যাদি সূত্রদ্বারা পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন যে, শরীর ভিন্ন ভিন্ন হইলেও সমস্ত শরীরে আত্মা এক। কারণ, সমস্ত শরীরেই নির্ব্বিশেষে সুখ-দুখ ও জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। তাৎপর্য্য এই যে, যেমন আকাশে সর্ব্বত্রই সমানভাবে শব্দের উৎপত্তি হওয়ায় শব্দের সমবায়িকারণ আকাশ এক বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছে, তদ্রূপ, আত্মাতেও সর্ব্বশরীরেই সুখ-দুঃখাদির উৎপত্তি হওয়ায় আকাশের ন্যায় আত্মাও বস্তুতঃ এক। উপাধিভেদে আকাশের ভেদের ন্যায় আত্মারও ভেদ আছে, কিন্তু উহা কাল্পনিক ভেদ। কণাদ প্রথমে উক্ত পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করিয়া পরে তাঁহার সিদ্ধান্ত সূত্র বলিয়াছেন—'নানাত্মানো ব্যবস্থাতঃ' ॥ অর্থাৎ জীবাত্মা নানা, যেহেতু ব্যবস্থা আছে।

---

* প্রচলিত "বৈশেষিকদর্শন" পুস্তকে "ব্যবস্থাতো নানা" এইরূপ সূত্র পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রশস্তপাদ-ভাষ্যের "ন্যায়কন্দলী" টীকায় শ্রীধর ভট্ট এবং "সূক্তি" টীকায় জগদীশ "নানাত্মানো ব্যবস্থাতঃ"—এইরূপ সূত্রপাঠই উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং উহাই প্রকৃত সূত্রপাঠ বুঝা যায়। শঙ্করমিশ্রের ব্যাখ্যার দ্বারাও উক্তরূপ সূত্রপাঠ বুঝিতে পারা যায়।

কণাদ পূর্ব্বে আকাশের একত্ব সিদ্ধ করিতে সিদ্ধান্ত'সূত্র বলিয়াছেন—"শব্দলিঙ্গাবিশেষাদ্ বিশেষলিঙ্গাভাবাচ্চ" (২।২।৩০) অর্থাৎ সর্ব্বত্রই আকাশে শব্দ জন্মে। সুতরাং শব্দই আকাশের সাধক হেতু হওয়ায় আকাশের সাধক হেতুর বিশেষ নাই এবং আকাশের ভেদসাধক কোন বিশেষ হেতুও নাই। অতএব আকাশ এক। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা কণাদ বলিয়াছেন যে, আত্মার ভেদসাধক সুখ-দুঃখাদির ব্যবস্থারূপ বিশেষহেতু থাকায় আত্মা নানা অর্থাৎ প্রতি শরীরে ভিন্ন।

তাৎপর্য্য এই যে, সমস্ত জীবাত্মাতেই সুখ-দুঃখাদির উৎপত্তি হইলেও তাহার "ব্যবস্থা" অর্থাৎ নিয়ম আছে। একের সুখ বা দুঃখ জন্মিলে তখন সকলেরই সুখ বা দুঃখ জন্মে না। কেহ যখন সুখী বা দুঃখী, তখন সকলেই সুখী বা দুঃখী নহে। এইরূপ কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, কেহ মূর্খ, কেহ পণ্ডিত—ইত্যাদি অসংখ্য প্রকারে জীবাত্মার নানারূপ অবস্থার যে নিয়ম সর্ব্বসম্মত, তাঁহাও জীবাত্মার ভেদসাধক হেতু। অর্থাৎ উহার দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, জীবাত্মা প্রতি শরীরে ভিন্ন। কারণ, সমস্ত জীবদেহে একই আত্মা হইলে তাহার উক্তরূপ সুখ-দুঃখাদির ব্যবস্থা বা নিয়মের উপপত্তি হয় না। তাই কণাদ বলিয়াছেন—'নানাত্মানো ব্যবস্থাতঃ।'

অবশ্যই আপত্তি হইবে যে, আত্মার একত্বই শাস্ত্রসিদ্ধ হইলে শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কোন যুক্তির দ্বারাই আত্মার বাস্তব নানাত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। তাই মহর্ষি কণাদ পরে তৃতীয় সূত্র বলিয়াছেন—'শাস্ত্র-সামর্থ্যাচ্চ' অর্থাৎ শাস্ত্রের সামর্থ্য-প্রযুক্তও আত্মা নানা। * তাৎপর্য্য এই যে,

* এখানে লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, কণাদের পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় সূত্রের যোগে "ব্যবস্থাতঃ" "শাস্ত্র-সামর্থ্যাচ্চ" আত্মানো নানা—এইরূপ ব্যাখ্যাই তাঁহার অভিপ্রেত। কারণ, কণাদ তৃতীয় সূত্রে "চ" শব্দের প্রয়োগ করিয়া উক্ত সূত্র যে, তিনি দ্বিতীয় সূত্রোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্যই বলিয়াছেন অর্থাৎ ঐ সূত্রের দ্বারা আত্মার নানাত্ব সিদ্ধান্তেরই উপসংহার

আত্মার নানাত্ব-বোধক বহু শাস্ত্রবাক্যও আছে, যদ্দ্বারা আত্মা নানা অর্থাৎ প্রতি শরীরে ভিন্ন—ইহাই বুঝা যায়; এবং সেই সমস্ত শাস্ত্রবাক্য আত্মার বাস্তব নানাত্ব প্রতিপাদনে সমর্থ; কারণ, আত্মার বাস্তব নানাত্বই যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু আত্মার একত্ব যুক্তি-বাধিত, সুতরাং কোন শাস্ত্রই উহা প্রতিপাদন করিতে সমর্থ নহে। মহর্ষি কণাদ উক্ত সূত্রে "শাস্ত্র" শব্দের পরে যোগ্যতাবোধক "সামর্থ্য" শব্দের প্রয়োগ করিয়া সূচনা করিয়াছেন যে, অর্থের যথার্থ যোগ্যতা-জ্ঞান—যথার্থ শাব্দবোধের কারণ; সুতরাং যে অর্থ অযোগ্য বা অসম্ভব, তাহা শাস্ত্রার্থ হইতে পারে না। সুতরাং যে সমস্ত শাস্ত্রবাক্য আত্মার একত্ব প্রতিপাদক বলিয়া গৃহীত হয়, তাহার অন্যরূপ তাৎপর্য্যই বুঝিতে হইবে। পরন্তু কণাদ পরে বলিয়াছেন—

"আত্মান্তরগুণানামাত্মান্তর-গুণেষ্বকারণত্বাৎ" ॥ ৬।১।৫॥ *

করিয়াছেন—ইহাই বুঝা যায়। কিন্তু কণাদের উক্ত সূত্রের দ্বারা ব্যাবহারিক অবস্থায় আত্মা নানা, পরমার্থতঃ আত্মা এক—এইরূপ তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। উক্ত সূত্রে ব্যাবহারিক অবস্থার বোধক কোন শব্দপ্রয়োগও তিনি করেন নাই। পরন্তু দ্বিতীয় সূত্রে "আত্মানঃ"—এইরূপ বহুবচনান্ত প্রয়োগ করিয়াও আত্মার বাস্তব নানাত্বই যে, তাঁহার সিদ্ধান্তরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন—ইহাই বুঝা যায়।

কিন্তু মহামহোপাধ্যায় পূজ্যপাদ চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় বৈশেষিক দর্শনের স্বকৃত ভাষ্যে কণাদকেও অদ্বৈতবাদী বলিবার উদ্দেশ্যে পূর্ব্বোক্ত স্থলে কণাদের প্রথমোক্ত "সুখ-দুঃখ"—ইত্যাদি সূত্রটিকে তাঁহার সিদ্ধান্তসূত্র বলিয়াই দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা ব্যাবহারিক অবস্থায় আত্মা নানা, কিন্তু পরমার্থতঃ আত্মা এক—এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং কণাদোক্ত আকাশের একত্বপ্রতিপাদক পূর্ব্বোক্ত সূত্রটির উল্লেখ করিয়া তুল্য যুক্তিতে কণাদের মতে আকাশের ন্যায় আত্মাও বস্তুতঃ এক—এইরূপ বলিয়াছেন। কণাদ কিন্তু আত্মার ভেদসাধক বিশেষ হেতু প্রদর্শন করিয়া আত্মা যে, আকাশের ন্যায় এক নহে, ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন।

* প্রচলিত বৈশেষিকদর্শন পুস্তকে "আত্মান্তর-গুণানামাত্মান্তরেঽকারণত্বাৎ" এইরূপ

"ন্যায়কন্দলী" টীকাকার শ্রীধর ভট্ট এবং "সূক্তি" টীকাকার জগদীশ প্রভৃতিও ,কণাদের মতে ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি যে, জীবাত্মারই গুণ—ইহার প্রমাণ প্রদর্শন করিতে কণাদের উক্ত সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীধর ভট্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে—দাতার দানজন্য যে ধর্ম্ম, তাহা প্রতিগ্রহীতার ধর্ম্ম উৎপন্ন করে—এই মতের খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যেই মহর্ষি কণাদ উক্ত সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, অন্য আত্মার সুখ-দুঃখাদি গুণ অপর আত্মার সুখ-দুঃখাদি গুণের কারণ না হওয়ায় অন্য আত্মাতে উৎপন্ন ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ গুণ, অন্য আত্মাতে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ গুণের কারণ হয় না। কিন্তু পরে শঙ্কর মিশ্র ও জগদীশ প্রভৃতি সরলভাবেই উক্ত সূত্রের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অন্য আত্মার ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি গুণ, অপর আত্মার সুখ-দুঃখাদি গুণের কারণ হয় না।

যে ব্যাখ্যাই হউক,—কণাদের মতে ধর্ম্মাধর্ম্ম ও সুখ-দুঃখাদি যে, জীবাত্মারই গুণ এবং জীবাত্মা যে, প্রতি শরীরে বস্তুতঃই ভিন্ন—ইহা তাঁহার উক্ত সূত্রের দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায়। উক্ত সূত্রে দুইবার "আত্মান্তর" শব্দের প্রয়োগ দ্বারাও প্রত্যেক জীবদেহে জীবাত্মার বাস্তব ভেদই প্রকটিত হইয়াছে। সুতরাং আত্মার একত্ব-প্রতিপাদন করিতে কণাদের পূর্ব্বোক্ত "সুখ-দুঃখ"—ইত্যাদি সূত্রটি যে, তাঁহার পূর্ব্বপক্ষ সূত্র এবং তিনি পরে দুই সূত্রের দ্বারা আত্মার একত্ববাদের খণ্ডন করিয়া নানাত্ববাদ বা দ্বৈতবাদই যে, সিদ্ধান্তরূপে সমর্থন করিয়াছেন—ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

সূত্রপাঠ আছে। শঙ্কর মিশ্রের ব্যাখ্যার দ্বারাও ঐরূপ সূত্রপাঠ গ্রহণ করা যায়। কিন্তু শ্রীধর ভট্ট ঐ সূত্রের পরভাগে "আত্মান্তরগুণেষ্বকারণত্বাৎ"—এইরূপ পাঠ উদ্ধৃত করায় উহাই প্রাচীন সম্মত ও প্রকৃত পাঠ বলিয়া বুঝা যায়। "সূক্তিটীকা"কার জগদীশও উক্তরূপ সূত্র পাঠই উদ্ধৃত করিয়াছেন।

স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, যে সূত্র দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ প্রকাশ করা হয়, তাহার নাম পূর্ব্বপক্ষ-সূত্র। সেই পূর্ব্বপক্ষরূপ মত, সূত্রকারের নিজমত নহে। উহা তাঁহার খণ্ডনীয় মতান্তর; সুতরাং যে সমস্ত সূত্র পূর্ব্বপক্ষসূত্র বলিয়াই নিঃসন্দেহে বুঝা যায়, তাহাও সিদ্ধান্তসূত্র বলিয়া গ্রহণ করিলে অন্যান্য সূত্রের সামঞ্জস্য কখনই হইতে পারে না। কারণ, সূত্রকারের খণ্ডিত বা অসম্মত মতকেও তাঁহার মত বলিয়া গ্রহণ করিলে কোনরূপেই তাহার সমস্ত সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য হইতে পারে না,—আবশ্যকবোধে এখানে ইহার আর একটি উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি—

মহর্ষি গৌতম ন্যায়দর্শনে দুইটি সূত্র বলিয়াছেন—

স্বপ্নবিষয়াভিমানবৎ-প্রমাণপ্রমেয়াভিমানঃ ॥ ৪।২।৩১ ॥

মায়া-গন্ধর্ব্বনগর-মৃগতৃষ্ণিকাবদ্বা ॥ ৪।২।৩২ ॥

উদ্ধৃত দুই সূত্র দ্বারা গৌতম পূর্ব্বপক্ষরূপে এই মতান্তর প্রকাশ করিয়াছেন যে—যেমন স্বপ্নে বিষয় না থাকিলেও তাহার অভিমান বা ভ্রম হয়, তদ্রূপ প্রমাণ ও প্রমেয় না থাকিলেও তাহার ভ্রম হয়। অথবা যেমন ঐন্দ্রজালিকের মায়াবশতঃ দৃষ্ট সেই সমস্ত বিষয় না থাকিলেও দর্শকদিগের সেইরূপ ভ্রম হয় এবং আকাশে গন্ধর্ব্বনগর না থাকিলেও গন্ধর্ব্বনগর বলিয়া ভ্রম হয় এবং মরীচিকা জল না হইলেও জল বলিয়া ভ্রম হয়, তদ্রূপ প্রমাণ ও প্রমেয় বলিয়া কোন পদার্থ বস্তুতঃ না থাকিলেও ইহা প্রমাণ, ইহা প্রমেয়—এইরূপ ভ্রম হয়। অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থার ন্যায় জাগ্রদবস্থায় অনুভূত সমস্ত বিষয়ও অসৎ, সুতরাং সেই সমস্ত বিষয়ের জ্ঞানও ভ্রম। স্বপ্নাদিস্থলের ন্যায় সর্ব্বত্রই অসতেরই ভ্রম হইতেছে।

গৌতম পরে উক্ত মতের খণ্ডন করিতে প্রথম সূত্র বলিয়াছেন—**হেত্বভাবাদসিদ্ধিঃ**। (৪।২।৩৩) অর্থাৎ হেতু না থাকায় কেবল দৃষ্টান্ত দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মত সিদ্ধ হইতে পারে না। গৌতম পরে আরও কতিপয় সূত্রের দ্বারা নিজ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া পূর্ব্বোক্ত

মতের খণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার পূর্ব্বোক্ত দুইটি সূত্র যে, পূর্ব্বপক্ষ সূত্র—ইহা নিঃসন্দেহেই বুঝা যায়। সমস্ত ব্যাখ্যাকারও তাহাই বুঝিয়াছেন।

কিন্তু "অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি" গ্রন্থে কাশ্মীরক সদানন্দ যতি, গৌতমেরও অদ্বৈতমতই চরম সিদ্ধান্ত—ইহা বলিবার উদ্দেশ্যে শেষে গৌতমের পূর্ব্বোক্ত দুইটি পূর্ব্বপক্ষ সূত্রও উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা দেখিয়া পরে অদ্বৈতমতনিষ্ঠ কোন মহামনীষীও ঐরূপ কথা লিখিয়াছেন। * কিন্তু আমরা ইহা একেবারেই বুঝিতে পারি না। কারণ, সিদ্ধান্ত সূত্র না দেখিয়া পূর্ব্বপক্ষ সূত্রের দ্বারাই সূত্রকারের সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করা যায় না। গৌতম পূর্ব্বপক্ষরূপে যে মতের প্রকাশ করিয়া পরে বিচার-পূর্ব্বক উহার খণ্ডন করিয়াছেন, সেই মতই তাঁহার সিদ্ধান্ত মত—ইহা কিছুতেই বলা যায় না।

পরন্তু গৌতমের ঐ দুই পূর্ব্বপক্ষ সূত্রোক্ত মত যে, বেদান্তের অদ্বৈতমতই নিশ্চিত—ইহাও আমরা বুঝিতে পারি না। স্বপ্ন এবং মায়াদি দৃষ্টান্তের উল্লেখ দেখিয়াও তাহা বুঝা যায় না। কারণ, যাঁহারা বিজ্ঞানমাত্রবাদী, যাঁহাদিগের মতে জ্ঞান ভিন্ন জ্ঞেয় বিষয়ের সত্তা নাই, তাঁহারাও স্বপ্নাদি দৃষ্টান্তের দ্বারা উক্ত মত সমর্থন করিয়াছেন। অদ্বৈত-বাদী ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাঁহাদিগের উক্তমত খণ্ডন করিয়া "অনির্ব্বাচ্য-বাদ" সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার সমর্থিত অদ্বৈত মতে জগৎপ্রপঞ্চ, সৎও নহে,—অসৎও নহে। সৎ বা অসৎ বলিয়া উহার নির্ব্বচন করা যায় না। কিন্তু বিজ্ঞানবাদীর মতে জ্ঞান ভিন্ন জ্ঞেয় অসৎ। জ্ঞান হইতে ভিন্ন জ্ঞেয় বিষয়ের সত্তাই নাই। উক্তরূপ বিজ্ঞানবাদও অতি

* মহামহোপাধ্যায় পূজ্যপাদ চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় লিখিয়াছেন—"এই সকল সূত্র স্পষ্ট ভাষায় বেদান্তমতের অনুবাদ করিতেছে। ব্যাখ্যাকর্ত্তারা অবশ্য সূত্রগুলির তাৎপর্য্য অন্যরূপ বর্ণন করিয়াছেন"। ফেলোসিপের লেক্‌চার—পঞ্চম বর্ষ, ৪৭ পৃষ্ঠা।

প্রাচীন মত। বিষ্ণুপুরাণেও (৩।১৮) উক্ত মতের প্রকাশ হইয়াছে। বেদান্তদর্শনেও (২।২।২৮।২৯) উক্ত মতের খণ্ডন হইয়াছে। ভাষ্যকার আচার্য্য শঙ্কর সেখানে **বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ**—এই সূত্রের দ্বারা উক্ত মতের খণ্ডন করিতে স্বপ্নাদি জ্ঞান এবং জাগ্রদবস্থার সমস্ত জ্ঞান যে, তুল্য নহে, ইহা বুঝাইয়া—বিজ্ঞানবাদীর প্রদর্শিত স্বপ্নাদি যে, তাঁহার উক্ত মত-সমর্থনে দৃষ্টান্তই হয় না—ইহাও প্রতিপাদন করিয়াছেন। সুতরাং গৌতমোক্ত ঐমত যে, শঙ্কর সমর্থিত অদ্বৈতমত—ইহাও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

বস্তুতঃ পূর্ব্বোক্ত দুইটি পূর্ব্বপক্ষ-সূত্রে গৌতম যে সমস্ত দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া পূর্ব্বপক্ষরূপে যে মতের প্রকাশ করিয়াছেন—তাহা সুপ্রাচীন বিজ্ঞানবাদ। "তাৎপর্য্যটীকা"কার বাচস্পতি মিশ্রও তাহাই বলিয়াছেন। কিন্তু মহামনীষী নাগেশ ভট্ট—ইহা স্বীকার করিয়াও গৌতমকেও অদ্বৈতবাদী বলিবার উদ্দেশ্যে "বৈয়াকরণসিদ্ধান্তমঞ্জুষা" গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, † গৌতম বিজ্ঞানবাদের খণ্ডন করায় এবং উক্ত স্থলে বাচস্পতি মিশ্রও গৌতমের সূত্রের দ্বারা সেইরূপ ব্যাখ্যা করায় "অনির্ব্বাচ্যবাদ" যে, গৌতমের সূত্রসম্মত, ইহা অর্থতঃ উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ গৌতম শ্রুতিমূলক অদ্বৈতমতের খণ্ডন করেন নাই—কিন্তু বিজ্ঞানবাদের খণ্ডন করিয়া অদ্বৈতমতেই তাঁহার সম্মতি সূচনা করিয়া গিয়াছেন। উক্তস্থলে বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যার দ্বারাও তাহাই বুঝা যায়।

কিন্তু মহর্ষি গৌতম, পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানবাদের খণ্ডন করাতেই যে,

---

† গৌতমোঽপি—"স্বপ্নবিষয়াভিমানবদয়ং প্রমাণ-প্রমেয়াভিমানঃ।" "মায়া-গন্ধর্ব্বনগর-মৃগতৃষ্ণিকাবদ্বা।" "হেত্বভাবাদসিদ্ধিরিত্যাহ"........."এবঞ্চ অনির্ব্বচনীয়তা-বাদস্য সূত্রসম্মতত্বমর্থাদুক্তপ্রায়ম্, তস্য শ্রুতিমূলকত্বেন "হেত্বভাবাদসিদ্ধি"রিত্যনেন খণ্ডনাসম্ভবাচ্চ।"—"মঞ্জুষা—তিঙর্থনিরূপণ"—কাশী চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, ৮৭২।৭৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কিরূপে তাঁহার অদ্বৈতমতে সম্মতি বুঝা যায়, ইহা আমরা কোনরূপেই বুঝিতে পারিনা। দ্বৈতবাদী অন্যান্য আচার্য্যও ত বিজ্ঞানবাদের খণ্ডন করিয়াছেন। তাই বলিয়া কি তাঁহাদিগকেও অদ্বৈতবাদী বলিতে পারা যায়? আর বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যার দ্বারাই বা তাহা কিরূপে বুঝা যায়? পরন্তু বাচস্পতি মিশ্র যে, অন্যত্র গৌতমের মত-ব্যাখ্যায় তাঁহার কোন কোন সূত্র দ্বারা বেদান্তের অদ্বৈতমতের খণ্ডনই করিয়াছেন, তাহাও ত দেখা আবশ্যক। সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী নাগেশ ভট্ট যে, তাহা দেখেন নাই—ইহাও আমি বলিতে পারি না।

সে যাহা হউক, শেষ কথা—কণাদ ও গৌতমের সূত্রের দ্বারা তাঁহারা যে অদ্বৈতবাদী নহেন, ইহা সহজেই বুঝা যায়। কারণ, তাঁহারা পরমাণুর নিত্যত্ব স্বীকার করিয়া "আরম্ভবাদে"রই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর উক্ত মতের খণ্ডন করিতে উহা বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মত বলিয়া উল্লেখ করায় তিনি গৌতমের মতের প্রতিবাদ করেন নাই—ইহাও কিন্তু বলা যায় না। কারণ, মহর্ষি গৌতম ন্যায়দর্শনে কণাদের অপেক্ষায় সুস্পষ্টরূপে পরমাণুর নিত্যত্ব ও "আরম্ভ-বাদে"র সমর্থন করিয়াছেন। "আরম্ভবাদে"র ব্যাখ্যায় পরে তাহা দেখাইব। তবে বৈশেষিক-দর্শনে প্রথমে মহর্ষি কণাদই "আরম্ভবাদে"র প্রকাশ করায় উক্ত মত প্রথমে বৈশেষিকমত বা কণাদমত বলিয়াই প্রসিদ্ধিলাভ করে। সেই প্রসিদ্ধি অনুসারেই আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতি ঐরূপই উল্লেখ করিয়াছেন—ইহাই আমরা বুঝি।

আরম্ভবাদী কণাদ ও গৌতমের মতে পরব্রহ্মের ন্যায় আকাশ, কাল, দিক্ ও জীবাত্মা—এই সমস্ত দ্রব্যপদার্থও বিশ্বব্যাপী ও নিত্য এবং

---

* বৃহদারণ্যকভাষ্যে (৪।৩।২২) আচার্য্য শঙ্কর "বৈশেষিকা নৈয়ায়িকাশ্চ"—এইরূপে প্রথমে বৈশেষিক সম্প্রদায়েরই উল্লেখ করিয়াছেন। পরন্তু ঐতরেয় উপনিষদের ভাষ্যে (২য় অঃ) শঙ্কর "অত্র কাণাদাদয়ঃ পশ্যন্তি"—ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা যে মতের উল্লেখ

পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয়—এই চতুর্ব্বিধ পরমাণু অতি সূক্ষ্ম ও নিত্য। আচার্য্য শঙ্কর-শিষ্য সুরেশ্বরাচার্য্যও উক্ত মতের প্রকাশ করিতে "মানসোল্লাস" গ্রন্থে বলিয়াছেন—

"কালাকাশদিগাত্মানো নিত্যাশ্চ বিভবশ্চ তে।
চতুর্ব্বিধাঃ পরিচ্ছিন্না নিত্যাশ্চ পরমাণবঃ॥"
"ইতি বৈশেষিকাঃ প্রাহুস্তথা নৈয়ায়িকা অপি"॥ দ্বিতীয় অঃ

কিন্তু অদ্বৈতবাদে পরব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নিত্য নহে এবং মায়াসহিত পরব্রহ্ম বা পরমেশ্বরই জগতের মূল উপাদান-কারণ। কিন্তু আরম্ভবাদে ভিন্ন ভিন্ন পরমাণুসমূহই ভিন্ন ভিন্ন জন্যদ্রব্যের মূল উপাদান-কারণ। পরন্তু অদ্বৈতবাদে আত্মা এক; আরম্ভবাদে, আত্মা বহু। অদ্বৈতবাদে আত্মা চৈতন্যস্বরূপ, চৈতন্য বা জ্ঞান, তাঁহার গুণ নহে, কিন্তু আরম্ভবাদে আত্মা চৈতন্যস্বরূপ নহেন, কিন্তু চৈতন্য বা জ্ঞান, তাহার গুণ। তন্মধ্যে পরমাত্মার চৈতন্য নিত্য, জীবাত্মার চৈতন্য অনিত্য। সুতরাং সময়বিশেষে—জীবাত্মা জড়। অদ্বৈতবাদে জীবাত্মা বস্তুতঃ নির্গুণ; জ্ঞান, ইচ্ছা বা সুখ-দুঃখাদি অন্তঃকরণেরই ধর্ম্ম, কিন্তু আরম্ভবাদে জীবাত্মা সগুণ; জ্ঞান, ইচ্ছা ও সুখ-দুঃখাদি জীবাত্মারই বাস্তব গুণ। আরম্ভবাদে জগৎ সত্য, কিন্তু অদ্বৈতবাদে মায়ামূলক জগৎ মিথ্যা। অর্থাৎ জগতের পারমার্থিক সত্তা নাই, কিন্তু ব্যবহারিক সত্তা আছে। অন্যান্য কথা পরে ব্যক্ত হইবে।

পূর্ব্বক প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহা কণাদের ন্যায় গৌতমেরও মত। তাই সেখানে শঙ্করও উক্ত মতের যুক্তি বলিতে পরে গৌতমের ন্যায় দর্শনের "যুগপজ্‌জ্ঞানানুৎপত্তির্মনসো-লিঙ্গং" (১।১।১৬) এই সূত্রেরও উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং শঙ্কর যে, গৌতমের কোন সূত্রের উল্লেখ পূর্ব্বক তাঁহার মতের প্রতিবাদ করেন নাই—ইহাও সত্য নহে। কিন্তু কেহ কেহ ঐরূপ মন্তব্যও প্রকাশ করিয়াছেন।

সপ্তম অধ্যায় *

'আরম্ভবাদে'র ব্যাখ্যা ও বিচার

শিষ্য। কণাদ ও গৌতমের মতকে 'আরম্ভবাদ' বলা হয় কেন, উক্ত 'আরম্ভ' শব্দের অর্থ কি?

গুরু। পরমাণু প্রভৃতি উপাদানকারণরূপ দ্রব্যে অসৎ অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে অবিদ্যমান অবয়বী দ্রব্যের উৎপত্তিই 'আরম্ভ' নামে কথিত হওয়ায় উক্ত মত 'আরম্ভবাদ' নামে কথিত হইয়াছে। উহার প্রসিদ্ধ প্রাচীন নাম **পরমাণুকারণবাদ**। বেদান্তদর্শনের ভাষ্যে (২।২।১১) আচার্য্য শঙ্করও বলিয়াছেন—"পরমাণুকারণবাদ ইদানীং নিরাকর্ত্তব্যঃ।"

মহর্ষি গৌতম আরম্ভবাদের মূল যুক্তি প্রকাশ করিতে পরে চতুর্থ অধ্যায়ে বলিয়াছেন—

ব্যক্তাদ্ব্যক্তানাং প্রত্যক্ষ-প্রামাণ্যাৎ॥ ৪।১।১১॥

'ব্যক্তাৎ কারণাৎ ব্যক্তানাং উৎপত্তিঃ' অর্থাৎ ব্যক্ত কারণ হইতে ব্যক্ত কার্য্যের উৎপত্তি হয়—ইহা প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ। ভাষ্যকার বলিয়াছেন—'ব্যক্তঞ্চ খলু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যং, তৎসামান্যাৎ কারণমপি ব্যক্তং' অর্থাৎ যদিও ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য দ্রব্যই "ব্যক্ত" শব্দের অর্থ, কিন্তু সেই সমস্ত কার্য্যদ্রব্যের মূল কারণ পরমাণুও তাহার সজাতীয়, এজন্য এইসূত্রে "ব্যক্ত" শব্দের দ্বারা পরমাণুও গৃহীত হইয়াছে। পরন্তু এই সূত্রে "ব্যক্তাৎ" এই পদের দ্বারা সূচিত হইয়াছে যে, সাংখ্য-শাস্ত্র-বক্তা মহর্ষি

---

* অনেক পাঠকের পক্ষে সুবোধ হইবে মনে করিয়া এই অধ্যায় হইতে তিন অধ্যায়, গুরু শিষ্যের বাদ প্রতিবাদরূপে লিখিত হইয়াছে।

কপিলোক্ত 'অব্যক্ত' অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি মহর্ষি গৌতমের সম্মত নহে, অর্থাৎ 'প্রকৃতিপরিণামবাদ' তাঁহার সম্মত নহে, কিন্তু আরম্ভবাদই তাঁহার সম্মত। "ন্যায়মঞ্জরী"কার জয়ন্ত ভট্টও এই সূত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"ব্যক্তাদিতি কপিলাভ্যুপগত-ত্রিগুণাত্মকাব্যক্ত-রূপ-কারণ-নিষেধেন পরমাণূনাং শরীরাদৌ কার্য্যে কারণত্ব মাহ।" ফল কথা, প্রত্যক্ষমূলক অনুমান প্রমাণের দ্বারা অদৃষ্ট বা অতীন্দ্রিয় মূল কারণ পরমাণুর অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়, ইহাই এই সূত্রের দ্বারা মহর্ষি গৌতমের বিবক্ষিত। তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—"দৃষ্টো হি রূপাদিগুণ-যুক্তেভ্যো মৃৎপ্রভৃতিভ্যস্তথাভূতস্য দ্রব্যস্যোৎপাদঃ, তেন চ অদৃষ্টস্যানুমানমিতি।"

তাৎপর্য্য এই যে, রূপাদি গুণবিশিষ্ট মৃত্তিকাদি স্থূল ভূত হইতে তজ্জাতীয় অন্য দ্রব্যের (ঘটাদি দ্রব্যের) উৎপত্তি দৃষ্ট হয়, অতএব তদ্দৃষ্টান্তে অদৃষ্ট অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় মূল কারণ পরমাণু সমূহ অনুমান প্রমাণসিদ্ধ হয়। পরন্তু ঘটাদি দ্রব্যে যে রূপরসাদি বিশেষ গুণ জন্মে, তাহার মূল পরমাণুতেও তজ্জাতীয় বিশেষগুণ অনুমানসিদ্ধ হয়। কারণ, দ্রব্যের উপাদান কারণের যে সমস্ত বিশেষ গুণ, তজ্জন্যই তাহার কার্য্য দ্রব্যে তজ্জাতীয় বিশেষ গুণ জন্মে,—ইহাও বহু দ্রব্যে প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। যেমন রক্তসূত্র-নির্ম্মিত বস্ত্রে রক্তরূপই জন্মে, নীলরূপ জন্মে না। তাই কথিত হইয়াছে—"কারণগুণাঃ কার্য্যগুণমারভন্তে।" অর্থাৎ কারণ-দ্রব্যগত গুণ, কার্য্যদ্রব্যে তজ্জাতীয় গুণ উৎপন্ন করে। কিন্তু এই নিয়ম, বিশেষ গুণের সম্বন্ধেই কথিত হইয়াছে।

"মানসোল্লাস" গ্রন্থে শঙ্কর-শিষ্য সুরেশ্বরাচার্য্যও "আরম্ভবাদে"র বর্ণনায় বলিয়াছেন—"পরমাণুগতা এব গুণা রূপরসাদয়ঃ। কার্য্যে সমানজাতীয়মারভন্তে গুণান্তরম্।" টীকাকার রামতীর্থ লিখিয়াছেন—"সমানজাতীয়মিতি বিশেষগুণাভিপ্রায়ম্"

শিষ্য। সাংখ্যসূত্র-কার মহর্ষি কপিল বলিয়াছেন,—"নাণু-নিত্যতা, তৎকার্য্যত্ব-শ্রুতেঃ।" (৫।৮৭) অর্থাৎ পরমাণুর কার্য্যত্ব বা জন্যত্ববিষয়ে শ্রুতি থাকায় পরমাণু নিত্য নহে। পরমাণুর অনিত্যত্ব বিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণ থাকিলে অন্য কোন প্রমাণ দ্বারাই ত উহার নিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং উক্ত মত শ্রুতি বিরুদ্ধই হয়।

গুরু। পরমাণুর অনিত্যত্ব বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ কি আছে,—ইহা ত সাংখ্যসূত্র-কার বলেন নাই। ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুও তাহা দেখাইতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি উক্ত সাংখ্যসূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন যে, যদিও কালবশে লোপাদি প্রযুক্ত আমরা এখন সেই শ্রুতি বাক্য দেখিতে পাই না, তথাপি মহর্ষি কপিলের উক্ত সূত্র এবং "অণ্ব্যো মাত্রা বিনাশিন্যো দশার্দ্ধানাঞ্চ যাঃ স্মৃতাঃ" এই (১।২৭) মনুস্মৃতির দ্বারা সেই শ্রুতি বাক্য অনুমেয়। বিজ্ঞানভিক্ষুর বিবক্ষা এই যে, পূর্ব্বোক্ত কপিল সূত্ররূপ স্মৃতি ও মনুস্মৃতি যখন শ্রুতিমূলক, তখন ঐ স্মৃতির দ্বারা উহার সমানার্থ মূলভূত শ্রুতিবাক্য অনুমান প্রমাণ-সিদ্ধ। ঐরূপ শ্রুতিকেই অনুমিত শ্রুতি বলা হইয়াছে।

কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষুর ঐ কথার উত্তরে বক্তব্য এই যে, "নাণুনিত্যতা, তৎকার্য্যত্ব-শ্রুতেঃ" এই সূত্রটি যে, মহর্ষি কপিলেরই সূত্র—ইহা সর্ব্বসম্মত

ইত্যাদি। সুতরাং উক্ত মতে পরমাণুদ্বয়ের দ্বিত্ব সংখ্যা-জন্য দ্ব্যণুকে যে পরিমাণ জন্মে, তাহা সংখ্যা হইতে বিজাতীয় গুণ হইলেও উক্ত নিয়মে ব্যভিচার নাই। কারণ, সংখ্যা ও পরিমাণ, দ্রব্যমাত্রের সামান্য গুণ। উহা বিশেষ গুণ নহে। বিশেষ গুণের কোন লক্ষণই বলা যায় না,—ইহা পরে কোন বৈদান্তিক গ্রন্থকার বলিলেও নব্য নৈয়ায়িকগণ বিশেষগুণের নির্দ্দোষ লক্ষণ বলিতে অসমর্থ হন নাই। বাহুল্যভয়ে সে সমস্ত দুর্ব্বোধ কথার প্রকাশ এখানে সম্ভব নহে। রূপাদি চতুর্ব্বিংশতি গুণ পদার্থের মধ্যে বিশেষ গুণ ও সামান্য গুণের বিভাগ "ভাষা-পরিচ্ছেদে"ও পাওয়া যাইবে।

নহে। বিজ্ঞানভিক্ষু তাহা বলিলেও সাংখ্যশাস্ত্রের যে, অনেক অংশ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—ইহা তিনিও পূর্ব্বে বলিয়াছেন। * পরন্তু মহর্ষি গৌতম পূর্ব্বে **নাণুনিত্যত্বাৎ** (৪।২।২৪) এই সূত্রের দ্বারা পরমাণু যে নিত্য,—ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন এবং পরে বিচার পূর্ব্বক পরমাণুর নিরবয়বত্ব সমর্থন করিয়া নিত্যত্বই সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং গৌতমের সেই সমস্ত সূত্রের দ্বারা পরমাণুর নিত্যত্ব-বোধক মূল শ্রুতিরও অনুমান করিতে পারি এবং সেই শ্রুতি কালবশে বিলুপ্ত হওয়ায় আমরা তাহা দেখিতে পাই না—ইহাও বিজ্ঞান-ভিক্ষুর ন্যায় বলিতে পারি। কপিলের সাংখ্যসূত্র শ্রুতিমূলক, কিন্তু গৌতমের ন্যায়-সূত্র শ্রুতিমূলক নহে—ইহা ত কখনই সর্ব্বসম্মত হইবে না।

আর বিজ্ঞানভিক্ষু যে, "অণ্ব্যো মাত্রা বিনাশিন্যো দশার্দ্ধানাঞ্চ যাঃ স্মৃতাঃ"—এই মনুবচনের দ্বারা পরমাণুর অনিত্যত্ব বুঝিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। কারণ, উক্ত বচনে "দশার্দ্ধানাং মাত্রাঃ বিনাশিন্যঃ" এই কথার দ্বারা দশের অর্দ্ধ অর্থাৎ ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের যে সমস্ত মাত্রা অর্থাৎ সূক্ষ্ম অংশ, (সাংখ্যাদি শাস্ত্রোক্ত পঞ্চতন্মাত্র) তাহারই বিনাশিত্ব কথিত হইয়াছে এবং সেই সমস্ত "মাত্রা" অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্রের সূক্ষ্মত্ব প্রকাশ করিতেই "অণ্ব্যঃ" এই বিশেষণ পদের দ্বারা উহাকে অণু-পরিমাণবিশিষ্ট বলা হইয়াছে। উক্ত বচনের প্রথমে গুণবাচক "অণু" শব্দেরই স্ত্রী প্রত্যয়ান্ত "অণ্বী" শব্দের প্রথমার বহুবচনে "অণ্ব্যঃ" এইরূপ প্রয়োগ হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত পরমাণু অর্থে "অণু" শব্দের প্রয়োগ হয়

---

* কালার্কভক্ষিতং সাংখ্য-শাস্ত্রং জ্ঞানসুধাকরম্।
কলাবশিষ্টং ভূয়োঽপি পূরয়িষ্যে বচোঽমৃতৈঃ।
(সাংখ্য-প্রবচন-ভাষ্যের প্রথমে বিজ্ঞানভিক্ষুর শ্লোক।)

নাই—ইহা বুঝা আবশ্যক। ফল কথা, 'মনুসংহিতা'র উক্ত বচনে "মাত্রা" শব্দের অর্থ পূর্ব্বোক্ত পরমাণু নহে।

পরন্তু কণাদ ও গৌতমের মতে আকাশ বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী নিত্য দ্রব্য। সুতরাং তাহার মূল কোন পরমাণু নাই। কিন্তু সাংখ্যাদি মতে আকাশেরও মূল তন্মাত্র (শব্দতন্মাত্র) আছে। উক্ত বচনেও "মাত্রা" শব্দের দ্বারা আকাশের সেই সূক্ষ্ম অংশরূপ তন্মাত্রও গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং উক্ত "মাত্রা" শব্দের দ্বারা পরমাণু গ্রহণ করাও যায় না। বস্তুতঃ পঞ্চতন্মাত্রই কণাদ ও গৌতমের সম্মত পরমাণু নহে। তাহা হইতে উৎপন্ন কোন সূক্ষ্ম ভূতও পরমাণু নহে। কিন্তু পৃথিব্যাদি চতুর্ভূতের যাহা সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম অংশ, যাহার উৎপত্তি, বিনাশ এবং কোনরূপ পরিণাম বা বিকারও নাই, তাহাই কণাদ ও গৌতমসম্মত পরমাণু। উহার উৎপত্তি ও বিনাশের কোন কারণ না থাকায় উহা নিত্য।

শিষ্য। ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায় কি, উক্তরূপ নিত্য পরমাণুর বোধক কোন শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন? অথবা তাঁহারাও সেই শ্রুতির অনুমানই করিয়াছেন?

গুরু। মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের "বিশ্বতশ্চক্ষু-রুত"—ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ মন্ত্রকেই (১) আরম্ভবাদের মূল শ্রুতি বলিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, উক্ত মন্ত্রের তৃতীয় পাদে

১। "বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতো মুখো বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতঃ পাৎ। সংবাহুভ্যাং ধমতি, সংপতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ"। শ্বেতাশ্বতর ৩।৩।

"ষষ্ঠেন পরমাণুরূপপ্রধানাধিষ্ঠেয়ত্বং, তে হি গতিশীলত্বাৎ পতত্রব্যপদেশাঃ, পূতন্তীতি। "সংধমতি" "সংজনয়ন্নি"তি চ ব্যবহিতোপসর্গসম্বন্ধঃ, তেন সংযোজয়তি সমুৎপাদয়ন্নিত্যর্থঃ।" ("ন্যায়কুসুমাঞ্জলি"—পঞ্চমস্তবক—তৃতীয়কারিকা-ব্যাখ্যার শেষভাগ দ্রষ্টব্য)

যে "পতত্র" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, উহার অর্থ পরমাণু। পরমাণু-সমূহ গতিশীল, সুতরাং গত্যর্থ "পত" ধাতু-নিষ্পন্ন ঐ "পতত্র" শব্দটি ঐ পরমাণুর বৈদিক সংজ্ঞা। উক্ত মন্ত্রের পরার্দ্ধবাক্যে "পতত্রৈঃ পরমাণুভিঃ সংজনয়ন্ সমুৎপাদয়ন্ সংধমতি সংযোজয়তি"—এইরূপ ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝা যায় যে, পরমেশ্বর সৃষ্টির পূর্ব্বে সেই নিত্য পরমাণু-সমূহে অধিষ্ঠান করতঃ সেই সমস্ত পরমাণুর দ্বারা সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত প্রথমে তাহাতে সংযোগ উৎপন্ন করেন। ফল কথা—উক্ত মন্ত্রে "পতত্র" শব্দের অর্থ পূর্ব্বোক্ত নিত্য পরমাণু। পরমাণু, পক্ষীর 'পতত্রের' (পক্ষের) ন্যায় বায়ুর সাহায্যে উড়িয়া যায়। সুতরাং পক্ষসদৃশ বলিয়াও উক্ত মন্ত্রে উহা "পতত্র" নামে কথিত হইতে পারে।

অবশ্য উদয়নাচার্য্যের উক্তরূপ ব্যাখ্যা অন্য সম্প্রদায় গ্রহণ করেন নাই এবং করিবেন না। কিন্তু বিভিন্ন মতের সমর্থক অন্যান্য আচার্য্যগণও যে, শ্রুতির ব্যাখ্যায় অনেক স্থলে কষ্ট কল্পনাও করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং অনেক স্থলে গৌণ বা লাক্ষণিক অর্থেরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন—ইহাও ত অস্বীকার করা যাইবে না। সে যাহা হউক, পূর্ব্বোক্তরূপ পরমাণু যে অনিত্য—এ বিষয়ে কোন শ্রুতি প্রদর্শন করিতে না পারিলে পরমাণুর নিত্যত্ব-সাধক অনুমানকে ত তুমি শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিতে পারিবে না। সুতরাং অনুমান-প্রমাণের দ্বারাই পরমাণুর নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়—ইহা বলিলে তোমার আর কি বক্তব্য আছে ?

শিষ্য। অনুমান প্রমাণ দ্বারাই বা কিরূপে পরমাণুর নিত্যত্ব সিদ্ধ হইবে। কোন দ্রব্যে অপর দ্রব্যের সংযোগ জন্মিলে সেই দ্রব্যের কোন অংশেই সেই সংযোগ জন্মে। সর্ব্বাংশে কোন সংযোগ জন্মে না। কিন্তু আপনার কথিত পরমাণুর যখন কোন অংশ বা অবয়ব নাই, তখন তাহাতে অপর পরমাণুর সংযোগ সম্ভবই হয় না। সুতরাং উহাতে সংযোগ স্বীকার করিতে হইলে উহার অংশও স্বীকার করিতে হইবে।

তাহা হইলে ত আর উহাকে নিত্য বলা যায় না। পরন্তু নিরংশ পরমাণুতে অপর পরমাণুর সংযোগ স্বীকার করিলেও সেই সংযোগজন্য যে দ্রব্য জন্মিবে, তাহা ত স্থূল হইতে পারে না। সুতরাং "পরমাণু-কারণবাদ"ও উপপন্ন হয় না। 'শারীরক ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্করও এই সমস্ত কথা বলিয়াছেন।

শুরু। পরমাণু খণ্ডন 'করিতে মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ই ঐরূপ অনেক কথা বলিয়াছিলেন। আমি এখানে তাঁহাদিগের কথা তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি। বিজ্ঞানবাদী প্রখ্যাত বৌদ্ধাচার্য্য বসুবন্ধু তাঁহার "বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি" গ্রন্থে "বিংশতিকা" কারিকার মধ্যে বলিয়াছেন—

"ন তদেকং ন চানেকং বিষয়ঃ পরমাণুশঃ।
ন চ তে সংহতা যস্মাৎ পরমাণুর্ন সিধ্যতি ॥
ষট্‌কেন যুগপদ্‌ যোগাৎ পরমাণোঃ ষড়ংশতা।
ষণ্ণাং সমানদেশত্বাৎ পিণ্ডঃ স্যাদণুমাত্রকঃ ॥" *

প্রথম কারিকার দ্বারা হীনযান বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বৈভাষিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সম্মত বাহ্য বিষয়ের সত্তা খণ্ডন করিতে বসুবন্ধু বলিয়াছেন যে, তাঁহাদিগের স্বীকৃত বাহ্য বিষয়কে অবয়বিরূপ একও বলা যায় না, অনেকও বলা যায় না এবং সংহত অর্থাৎ পুঞ্জীভূত বা মিলিত পরমাণুসমষ্টিরূপও বলা যায় না। কারণ পরমাণুই সিদ্ধ হয় না। কেন সিদ্ধ হয় না? ইহা সমর্থন করিতে দ্বিতীয় কারিকার দ্বারা বলিয়াছেন যে, পরমাণু স্বীকার করিয়া তাহাতে অপর পরমাণুর সংযোগ স্বীকার করিলে পরমাণুই সিদ্ধ হয় না। কারণ, মধ্যস্থিত কোন একটি

* বসুবন্ধুর অন্যান্য কারিকা ও তাহার ব্যাখ্যা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত মৎসম্পাদিত "ন্যায়দর্শনের" পঞ্চম খণ্ডে ১০৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পরমাণুতে যখন তাহার ঊর্দ্ধ, অধঃ এবং চতুষ্পার্শ, এই ছয় দিক্ হইতে ছয়টি পরমাণু আসিয়া যুগপৎ অর্থাৎ একই সময়ে সংযুক্ত হয়, তখন সেই পরমাণুর "ষড়ংশতা" অর্থাৎ ছয়টি অংশ আছে—ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, সেই পরমাণুর একই প্রদেশে একই সময়ে ছয়টি পরমাণুর সংযোগ হইতে পারে না। যে প্রদেশে এক পরমাণুর সংযোগ জন্মে, সেই প্রদেশেই তখনই আবার অন্য পরমাণুর সংযোগ সম্ভব হয় না। সুতরাং উক্ত স্থলে সেই মধ্যস্থিত পরমাণুর ভিন্ন ভিন্ন ছয়টি অংশ বা প্রদেশেই ভিন্ন ভিন্ন ছয়টি পরমাণুর সংযোগ জন্মে—ইহাই স্বীকার্য্য। তাহা হইলে আর উহাকে পরমাণু বলা যায় না। কারণ, যাহার অংশ নাই, যাহা সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম, তাহাই পরমাণু বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

আর যদি সেই মধ্যস্থিত পরমাণুর একই প্রদেশে যুগপৎ ছয়টি পরমাণুর সংযোগ স্বীকার করা যায়, অথবা পরমাণুর কোন অংশ না থাকিলেও তাহাতে অপর পরমাণুর সংযোগ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে—"পিণ্ডঃ স্যাদণুমাত্রকঃ",—অর্থাৎ সেই সপ্ত পরমাণুর সংযোগজন্য যে পিণ্ড বা দ্রব্য জন্মিবে অথবা সেই সংযুক্ত সপ্ত পরমাণুসমষ্টিরূপ যে পিণ্ড বা দ্রব্য, তাহা স্থূল হইতে পারে না, সুতরাং তাহা দৃশ্য হইতে পারে না। কারণ কোন দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশে অন্যান্য দ্রব্যের সংযোগ প্রযুক্তই সেই দ্রব্য স্থূল বা দৃশ্য হয়।

কিন্তু মহর্ষি গৌতমও প্রথমে পূর্ব্বপক্ষরূপে পরমাণুর সাবয়বত্ব সমর্থন করিতে পূর্ব্বোক্ত কথারও চিন্তা করিয়া শেষ সূত্র বলিয়াছেন—**সংযোগোপপত্তেশ্চ** ॥ (৪।২।২৪) ॥ পরে উক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করিতে সিদ্ধান্ত সূত্র বলিয়াছেন—

অনবস্থাকারিত্বাদনবস্থানুপপত্তেশ্চাপ্রতিষেধঃ ॥ ৪।২।২৫ ॥

অর্থাৎ পরমাণুর যে নিরবয়বত্ব, তাহার প্রতিষেধ করা যায় না, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত হেতুর দ্বারা পরমাণুর সাবয়বত্ব সিদ্ধ হয় না। কেন

সিদ্ধ হয় না? তাই বলিয়াছেন—**অনবস্থাকারিত্বাৎ**। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত হেতুর দ্বারা পরমাণুর অবয়ব বা অংশ আছে—ইহা সিদ্ধ হইলে ঐ হেতুর দ্বারা সেই অবয়বের অবয়ব আছে এবং সেই অবয়বেরও অবয়ব আছে—এইরূপে অনন্ত অবয়ব-পরম্পরার সিদ্ধির আপত্তি হয়। ঐরূপ আপত্তির নাম "অনবস্থা"। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষবাদীর ঐ হেতু অনবস্থা দোষের প্রযোজক হওয়ায় উহার দ্বারা পরমাণুর অবয়ব সিদ্ধ হইতে পারে না। পূর্ব্বপক্ষবাদী অবশ্যই বলিবেন যে, প্রমাণ-সিদ্ধ "অনবস্থা" যে দোষ নহে—ইহা ত সকলেরই স্বীকার্য্য। তাই মহর্ষি গৌতম উক্ত সূত্রে পরে বলিয়াছেন—**অনবস্থানুপপত্তেশ্চ**। অর্থাৎ উক্তরূপ অনবস্থার উপপত্তিও না হওয়ায় উহা স্বীকার করা যায় না।

তাৎপর্য্য এই যে, যে অনবস্থা প্রমাণ দ্বারা উপপন্ন এবং যাহা স্বীকার করিলে কোন দোষ হয় না, সেই অনবস্থাই স্বীকার করা যায়। কারণ, সেই অনবস্থা প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া উহা দোষই নহে। কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপ অনবস্থা স্বীকার করা যায় না। কারণ, যদি পরমাণুর অবয়ব এবং সেই অবয়বের অবয়ব প্রভৃতি অনন্ত অবয়ব স্বীকার করা যায়, অর্থাৎ যদি সাবয়ব দ্রব্যের অবয়ব-বিভাগের কুত্রাপি অন্তই না থাকে, তাহা হইলে পর্ব্বতের অবয়ব-বিভাগের যেমন কুত্রাপি অন্ত নাই, তদ্রূপ, সর্ষপের অবয়ব-বিভাগেরও কুত্রাপি অন্ত না থাকায় সর্ষপ ও পর্ব্বত উভয়ই অনন্ত অবয়ববিশিষ্ট হওয়ায় ঐ উভয়েরই তুল্যতা স্বীকার করিতে হয়। অর্থাৎ সর্ষপ ও পর্ব্বতের গুরুত্ব এবং পরিমাণ, তুল্য—ইহা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাহা স্বীকার করা যায় না। কারণ, সর্ষপের গুরুত্ব ও পরিমাণ অপেক্ষায় পর্ব্বতের গুরুত্ব ও পরিমাণ যে অধিক—ইহা প্রমাণ-সিদ্ধ সত্য। ঐ সত্যের অপলাপ করিয়া নিজমত-সমর্থনের জন্য সর্ষপ ও পর্ব্বতকে কখনই তুল্যপরিমাণ বলা যায় না। এইরূপ অন্যান্য ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত সাবয়ব দ্রব্যকেই সমপরিমাণ বলা যায় না। সুতরাং ইহ

স্বীকার করিতেই হইবে যে, সর্ষপের অবয়ব-পরম্পরার বিভাগ করিতে করিতে এমন কোন ক্ষুদ্র অংশে ঐ বিভাগের শেষ হয়, যাহার আর কোন অংশ নাই। সেই অতিক্ষুদ্র অংশই পরমাণু। এইরূপ পর্ব্বতের অবয়ব ও তাহার অবয়ব প্রভৃতি অবয়ব-পরম্পরারও বিভাগ হইলে সর্ব্বশেষে যে অতি সূক্ষ্ম অংশে ঐ বিভাগের শেষ হয়, তাহাই পরমাণু। তাহা হইলে সর্ষপের অবয়ব-পরম্পরার সংখ্যা হইতে পর্ব্বতের অবয়ব-পরম্পরার সংখ্যাধিক্যবশতঃ সর্ষপ হইতে পর্ব্বত বড়—ইহা উপপন্ন হওয়ায় ঐ উভয়ের তুল্যপরিমাণত্বের আপত্তি হইতে পারে না।

শিষ্য। একটি সর্ষপের অংশ এবং তাহার অংশ প্রভৃতি অবয়ব-পরম্পরার সম্পূর্ণ বিভাগ হইলে ত সর্ব্বশেষে কিছুই থাকে না, তখন ত শূন্যই পর্য্যবসিত হয়। সুতরাং আপনার কথিত পরমাণু নামক অতি সূক্ষ্ম দ্রব্যের অস্তিত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইবে?

গুরু। সর্ষপের অবয়ব-পরম্পরার সম্পূর্ণ বিভাগ হইলে সর্ব্বশেষে যদি কিছুই না থাকে তাহা হইলে সেই চরম বিভাগ কোথায় থাকিবে? সেই চরম বিভাগেরও ত আশ্রয় দ্রব্য থাকা আবশ্যক। আর দৃষ্টান্তরূপে শ্রুতিও ত বলিয়াছেন—"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ"। (শ্বেতাশ্বতর উপ)। কিন্তু কোন কেশাগ্রের শতাংশের শতাংশের অংশ অলীক হইলে তাহা ত ঐ স্থলে দৃষ্টান্ত বলাই যায় না। সুতরাং চরম বিভাগের আশ্রয় অতি সূক্ষ্ম দ্রব্য যে, অবশ্য আছে—ইহা ত পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি বাক্যের দ্বারাও সিদ্ধ হয়। মহর্ষি গৌতমও সর্ব্বাভাব-বাদীর মত খণ্ডন করিতে পূর্ব্বে বলিয়াছেন—

'ন প্রলয়োঽণুসদ্ভাবাৎ ॥৪।২।১৬॥

অর্থাৎ 'প্রলয়' (সর্ব্বাভাব) বলা যায় না। কারণ, জন্যদ্রব্যের অবয়ব-পরম্পরার চরম বিভাগের পরে আর কিছুই থাকে না—ইহা বলা যায় না। কারণ পরমাণুর সত্তা আছে। গৌতমের তাৎপর্য্য ব্যক্ত

করিতে বাৎস্যায়ন পরে বলিয়াছেন—"বিভাগস্ত চ বিভজ্যমানহানির্নোপপদ্যতে"। তাৎপর্য্য এই যে, যে দ্রব্যদ্বয়ের বিভাগ জন্মে, তাহাকে বলে বিভজ্যমান দ্রব্য। বিভাগমাত্রই সেই দ্রব্যদ্বয়ে জন্মে ও থাকে। সুতরাং যাহা চরম বিভাগ, তাহাও কোন দুইটি দ্রব্যে জন্মিবে ও থাকিবে। অতএব চরম বিভাগ জন্মিয়াছে, কিন্তু তাহার আধার সেই বিভজ্যমান দুইটি দ্রব্য নাই, অর্থাৎ সেই চরম বিভাগের পরে আর কিছুই থাকে না—ইহা কখনই উপপন্ন হয় না। কারণ, নিরাশ্রয় বিভাগ অলীক। সুতরাং সেই চরমবিভাগেরও আশ্রয় দুইটি দ্রব্য অবশ্য স্বীকার্য্য হওয়ায় পরমাণু সিদ্ধ হয়। কারণ, সেই দুইটি অতীন্দ্রিয় দ্রব্যই দুইটি পরমাণু। প্রচলিত মতে পরমাণুদ্বয়ের সংযোগজন্য সর্ব্বপ্রথম যে দ্রব্য জন্মে, তাহার নাম "দ্ব্যণুক" এবং সেই দ্ব্যণুকত্রয়ের সংযোগজন্য পরে যে, দ্বিতীয় দ্রব্য জন্মে, তাহার নাম "ত্রসরেণু"। ঐ ত্রসরেণুই স্থূল জন্য দ্রব্যের মধ্যে প্রথম দ্রব্য। প্রথমে উহাতেই স্থূলত্ব বা মহৎ পরিমাণ উৎপন্ন হওয়ায় উহার প্রত্যক্ষ জন্মে। ঐ যে, গবাক্ষরন্ধ্রে সূর্য্যকিরণের মধ্যে গতিশীল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেণু দেখা যাইতেছে,—উহার নাম "ত্রসরেণু"। "ত্রস" শব্দের অর্থ জঙ্গম। সুতরাং মনে হয়, জঙ্গম বা গতিশীল রেণু বলিয়া ঐ অর্থে "ত্রসরেণু" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। যাহা হউক—উহা যে, সুপ্রাচীন পারিভাষিক সংজ্ঞা—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, মনু বলিয়াছেন—

"জালান্তরগতে ভানৌ যৎ সূক্ষ্মং দৃশ্যতে রজঃ।
প্রথমং তৎ প্রমাণানাং ত্রসরেণুং প্রচক্ষতে" ॥ ৮।১৩২ *

---

* মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন—"জালসূর্য্যমরীচিস্থং ত্রসরেণু রজঃ স্মৃতং" (আচার অধ্যায় ৩৬০ শ্লোক)। সেখানে টীকাকার অপরার্কও ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"গবাক্ষপ্রবিষ্টাদিত্যকিরণেষু যৎ সূক্ষ্মং বৈশেষিকোক্তনীত্যা দ্ব্যণুকত্রয়ারব্ধং দৃশ্যতে রজঃ, তৎ ত্রসরেণুরিতি মন্বাদিভিঃ স্মৃতং"। "বীরমিত্রোদয়" স্মৃতিনিবন্ধেও (২৯৪ পৃঃ) ঐ ব্যাখ্যাই দেখা যায়।

পরমাণুর পরিচয় প্রকাশ করিতে মহর্ষি গৌতম পরে বলিয়াছেন—

পরং বা ত্রুটেঃ ॥ ৪।২।১৭

অর্থাৎ "ত্রুটি" হইতে পরই পরমাণু। বাচস্পতিমিশ্র প্রভৃতি পূর্ব্বাচার্য্যগণ বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত "ত্রসরেণুর" অপর নামই "ত্রুটি"। নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি নিজ মতানুসারে বলিয়াছেন—"ত্রুটাবেব বিশ্রামাৎ।" অর্থাৎ তাঁহার নিজমতে জন্য-দ্রব্যের অবয়ব-পরম্পরার যে বিভাগ, তাহার ঐ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ত্রসরেণুতেই বিশ্রাম। ঐ "ত্রসরেণুর" আর কোন অংশ না থাকায় উহাই সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম দ্রব্য ও নিত্য। অনেক মীমাংসকেরও উহাই মত। কিন্তু মহর্ষি গৌতম পূর্ব্বোক্ত সূত্রে "পর" শব্দ ও অবধারণার্থক "বা" শব্দের প্রয়োগ করিয়া ত্রসরেণু হইতে পরই পরমাণু অর্থাৎ ত্রসরেণু পরমাণু নহে—ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। পরন্তু পরমাণু, যে অতীন্দ্রিয়—ইহা তিনি পূর্ব্বে (২।১।৩৬শ সূত্র-শেষে) "অতীন্দ্রিয়ত্বাদণূনাং" এই উক্তির দ্বারা স্পষ্ট বলিয়াছেন। বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদের—"তস্য কার্য্যং লিঙ্গং" [৪।১।২] এই সূত্র দ্বারাও মূল কারণ পরমাণুর অতীন্দ্রিয়ত্বই ব্যক্ত হইয়াছে। 'চরক-সংহিতা'তেও 'শারীরস্থানে' (৭ম অঃ) শরীরের মূল অবয়ব পরমাণুসমূহের অতীন্দ্রিয়ত্ব স্পষ্ট কথিত হইয়াছে।

শিষ্য। গৌতমও প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ত্রসরেণুকেই পরমাণু বলেন নাই কেন? তাহা কি বলা যায় না? ত্রসরেণুরও যে, অবয়ব বা অংশ আছে, সে বিষয়ে প্রমাণ কি?

গুরু। পরমাণুপুঞ্জবাদী বৈভাষিক বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে কোন সম্প্রদায়, শেষে গবাক্ষরন্ধ্রগত সূর্য্যকিরণের মধ্যে দৃশ্যমান ত্রসরেণুকেই পরমাণু বলিয়া পরমাণুপুঞ্জের প্রত্যক্ষত্ব সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধসম্প্রদায়ের প্রবল প্রতিবাদী মহানৈয়ায়িক উদ্দ্যোতকর

"ন্যায়বার্ত্তিকে" তাঁহাদিগের উক্ত মতেরও উল্লেখপূর্ব্বক খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, দৃশ্যমান ত্রসরেণুরও অবয়ব বা অংশ আছে, যেহেতু, উহা আমাদিগের বহিরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য দ্রব্য মাত্রই সাবয়ব—ইহা দৃশ্যমান বহু দ্রব্যেই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং তদ্-দৃষ্টান্তে ত্রসরেণুর অবয়ব বা অংশ আছে—ইহা অনুমানপ্রমাণ-সিদ্ধ। উদ্দ্যোতকরের উক্তরূপ অনুমানের অনুসরণ করিয়াই পরবর্ত্তী ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ—"ত্রসরেণুঃ সাবয়বঃ, চাক্ষুষদ্রব্যত্বাৎ, ঘটবৎ"—ইত্যাদি প্রকার অনুমান-প্রয়োগ করিয়া ত্রসরেণুর সাবয়বত্ব-সাধন করিয়াছেন। যাঁহারা 'ত্রসরেণু'তেই অবয়ব-বিভাগের বিশ্রাম স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কথা এই যে—পূর্ব্বোক্তরূপ অনুমান করিলে ত্রসরেণুর অবয়বের অবয়ব ও তাহার অবয়ব প্রভৃতি অনন্ত অবয়ব স্বীকারে অনবস্থা দোষ হয় এবং পরমাণুও সিদ্ধ হয় না।

কিন্তু 'অনবস্থা' দোষ সম্বন্ধে মহর্ষি গৌতমের নিজের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ত্রসরেণুর অবয়ব-বিভাগের কুত্রাপি বিশ্রাম স্বীকার না করিলে যে, সর্ষপ ও পর্ব্বতের তুল্য পরিমাণাপত্তি হয়—ইহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। সুতরাং উক্ত ত্রসরেণুর অবয়ব-বিভাগের কোন অতি সূক্ষ্ম দ্রব্যে বিশ্রাম স্বীকার করিতেই হইবে। সেই অতি সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় দ্রব্যই পরমাণু।

এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, ত্রসরেণুর ষষ্ঠ ভাগই পরমাণু, ইহা মহর্ষি কণাদ ও গৌতম বলেন নাই। তাঁহাদিগের সূত্রে ঐরূপ কোন কথা নাই। ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের পরবর্ত্তী বহু আচার্য্যের মতেই ত্রসরেণুর অংশ আছে এবং তাহারও অংশ আছে—ইহা অনুমান প্রমাণ-সিদ্ধ। ত্রসরেণুর অবয়ব দ্ব্যণুক এবং দ্ব্যণুকের অবয়ব পরমাণু—ইহাই ন্যায়বৈশেষিকসম্প্রদায়ে প্রচলিত মত। উক্ত বিষয়ে মতান্তরও আছে। সে যাহা হউক, মূল কথা, উক্ত রূপ নিরবয়ব পরমাণু

অবশ্য স্বীকার্য্য হইলে পরমাণুদ্বয়ের সংযোগও অবশ্য স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ ও বিভাগ ব্যতীত সৃষ্টি ও প্রলয় হইতে পারে না। পরমাণুপুঞ্জবাদী বৈভাষিক বৌদ্ধসম্প্রদায়ের অন্তর্গত কোন সম্প্রদায় পুঞ্জীভূত পরমাণুসমূহের মধ্যে কোন পরমাণুই অপর পরমাণুকে স্পর্শ করে না, অর্থাৎ পরমাণুসমূহের পরস্পর সংযোগই জন্মে না,—এইরূপ মতেরও সমর্থন করিয়াছিলেন—ইহা বৌদ্ধগ্রন্থ "তত্ত্বসংগ্রহ-পঞ্জিকা"য় বৌদ্ধাচার্য্য কমলশীলের ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝা যায় এবং পরমাণু-পুঞ্জবাদী কোন বৈভাষিক বৌদ্ধসম্প্রদায় যে, সংযোগকে কোন অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়াই স্বীকার করিতেন না, তাঁহাদিগের মতে দ্রব্যদ্বয়ের বিশেষ প্রত্যাসত্তি অর্থাৎ নিকটবর্ত্তিতা-বিশেষই সংযোগ—ইহাও ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের বিচারের দ্বারাও বুঝা যায়। কিন্তু বাৎস্যায়ন (২।১।৩৬শ সূত্র-ভাষ্যে) বিশেষ বিচার পূর্ব্বক উক্ত মতের খণ্ডন পূর্ব্বক সংযোগ নামে অতিরিক্ত গুণ পদার্থ সমর্থন করিয়াছেন।

বস্তুতঃ কণাদ ও গৌতমের মতে পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ স্বীকার্য্য। নচেৎ পরমাণুদ্বয়জন্য প্রথমে 'দ্ব্যণুক' নামক অবয়বী দ্রব্যের উৎপত্তিই হইতে পারে না। 'দ্ব্যণুক' নামক অবয়বীর অবয়বদ্বয় অর্থাৎ অংশভূত পরমাণুদ্বয়ই সেই দ্ব্যণুকের উপাদান কারণ। সুতরাং সেই পরমাণু-দ্বয়ের পরস্পর সংযোগই সেই দ্ব্যণুকের অসমবায়িকারণ নামে, স্বীকৃত হইয়াছে। কারণ, উপাদানভূত অবয়বের পরস্পর সংযোগ ব্যতীত অবয়বী দ্রব্যের উৎপত্তি হয় না। যেমন ঘটের উপাদান, অবয়বদ্বয়ের ('কপাল ও 'কপালিকা' নামক অংশদ্বয়ের) পরস্পর, বিলক্ষণ সংযোগ না হইলে ঘট জন্মে না। এবং সূত্র সমূহের পরস্পর বিলক্ষণ সংযোগ না হইলে বস্ত্র জন্মে না। পরন্তু মহর্ষি গৌতম ন্যায় দর্শনের দ্বিতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে বিচার পূর্ব্বক অবয়ব হইতে পৃথক্ অবয়বী দ্রব্যের উৎপত্তি সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষসিদ্ধ সমস্ত দ্রব্যকে

পরমাণুপুঞ্জমাত্র বলিলে কোন দ্রব্যেরই প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না। কারণ, প্রত্যেক পরমাণুই যখন অতীন্দ্রিয়, তখন মিলিত পরমাণুসমষ্টিরও প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। প্রত্যেক পরমাণু হইতে সেই সমস্ত মিলিত পরমাণুসমষ্টিকে বস্তুতঃ কোন পৃথক্ দ্রব্য বলা যায় না। পৃথক্ দ্রব্য বলিতে হইলে পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ জন্য অবয়বী দ্রব্যের উৎপত্তি-ক্রমে স্থূল অবয়বীদ্রব্যের উৎপত্তিই স্বীকার্য্য।

শিষ্য। তাহা হইলে উক্ত মতে সংযোগমাত্রই যে, অব্যাপ্যবৃত্তি, ইহা বলা যায় না। কারণ, পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ স্বীকার করিলে উহাকে প্রাদেশিক সংযোগ বলা যাইবে না। অতএব ঐ সংযোগকে ব্যাপ্যবৃত্তিই বলিতে হইবে। কিন্তু সংযোগমাত্রই যে, অব্যাপ্যবৃত্তি, ইহাই ত প্রত্যক্ষমূলক অনুমান প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয়।

গুরু। 'অব্যাপ্যবৃত্তি' শব্দের তুমি কি অর্থ গ্রহণ করিয়াছ? সংযোগমাত্রই তাহার আশ্রয় দ্রব্যের কোন প্রদেশ বা অংশ বিশেষেই বর্ত্তমান হয়, সর্ব্বাংশ ব্যাপ্ত করিয়া বর্ত্তমান হয় না, এই অর্থে সংযোগ-মাত্রকেই 'অব্যাপ্যবৃত্তি' বলা যায় না। কারণ, আত্মা ও মনের সংযোগ ঐরূপ নহে। আত্মার কোন প্রদেশ বা অংশ নাই। কণাদ ও গোতমের মতে মনও পরমাণুর ন্যায় নিরবয়ব অতি সূক্ষ্ম দ্রব্য পদার্থ। সুতরাং আত্মা ও মনের সংযোগ যে, প্রাদেশিক নহে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। তাহা হইলে নিরবয়ব দ্রব্যে যে, সংযোগ জন্মেই না, ইহাও বলা যায় না।

মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য **আত্মতত্ত্ববিবেক** গ্রন্থে বৌদ্ধমত-খণ্ডনে অনেক কথা বলিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে তাঁহার কথার সমর্থন করিতে সেখানে টীকাকার রঘুনাথশিরোমণি বলিয়াছেন যে, কোন দ্রব্যদ্বয়ে সংযোগের উৎপত্তিতে সেই দ্রব্যদ্বয় যেমন কারণ; তদ্রূপ, তাহার কোন অবয়ব বা অংশও তাহাতে কারণ নহে। সংযোগের

প্রাত তাহার আধার কোন দ্রব্যের অংশবিশেষকে কারণ বলা অনাবশ্যক। তবে যে দ্রব্যের অংশ আছে, তাহাতে অংশবিশেষেই সংযোগ জন্মে। কারণ, সংযোগের স্বভাব এই যে, উহা সাবয়ব দ্রব্যে কোন প্রদেশবিশেষেই জন্মে। কিন্তু নিরবয়ব দ্রব্যের সংযোগ ঐরূপ হইতেই পারে না। কারণ, সেই দ্রব্যের কোন প্রদেশ বা অংশই নাই। তবে অনেক মূর্ত্ত দ্রব্যের সহিত পরমাণুর যে সংযোগ জন্মে, তাহাও বিভিন্ন দিগ্‌বিশেষেই জন্মে, অর্থাৎ পরমাণুর প্রদেশ না থাকিলেও পূর্ব্ব পশ্চিম প্রভৃতি দিগ্‌বিশেষেই তাহাতে অন্য পরমাণু বা অন্যান্য মূর্ত্ত দ্রব্যের সংযোগ উৎপন্ন হওয়ায় ঐ সংযোগও অব্যাপ্যবৃত্তি, ইহা বলা যায়। কারণ, যেমন দেশবিশেষাবচ্ছিন্ন পদার্থকে 'অব্যাপ্যবৃত্তি' বলে, তদ্রূপ দিগ্‌বিশেষাবচ্ছিন্ন পদার্থকেও অব্যাপ্যবৃত্তি বলা যায়। উক্ত স্থলে সেই দিগ্‌বিশেষ কিন্তু পরমাণুর কোন কল্পিত প্রদেশ নহে। উহা পূর্ব্ব পশ্চিমাদি দিক্। কেহ কেহ সংযোগবিশেষের ব্যাপ্যবৃত্তিত্বও স্বীকার করিয়াছেন।

শিষ্য। পরমাণুর কোন অংশ বা প্রদেশ না থাকায় তাহাতে অপর পরমাণুর সংযোগ-জন্য কোন দ্রব্য জন্মিলেও তাহাতে প্রথিমা বা স্থূলত্ব জন্মিতে পারে না, সুতরাং পরমাণুতে অপর পরমাণুর সংযোগ স্বীকার করিলেও কিরূপে স্থূল দ্রব্য-সৃষ্টির উপপত্তি হইবে,—তাহা ত আপনি বলেন নাই। আর পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ স্বীকার করিলে পরমাণুত্রয় এবং ততোঽধিক পরমাণুর পরস্পর সংযোগও ত স্বীকার্য্য। তাহা হইলে পরমাণুত্রয় এবং ততোঽধিক পরমাণুর সংযোগেই বা কোন দ্রব্য জন্মিবে না কেন? এবং দ্ব্যণুকত্রয়ের সংযোগে যেমন "ত্রসরেণু" নামক দ্রব্য জন্মে; তদ্রূপ দ্ব্যণুকদ্বয়ের সংযোগেই বা কোন দ্রব্য জন্মে না কেন? ইহাও ত বক্তব্য।

গুরু। অবশ্য বক্তব্য। প্রথমে বক্তব্য এই যে, আরম্ভবাদী ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতে বহু পরমাণু কোন দ্রব্যের উপাদান কারণ হয় না। অর্থাৎ বহু পরমাণুর সাক্ষাৎ সংযোগে কোন দ্রব্য জন্মে না। শ্রীমদ্ বাচস্পতিমিশ্র "তাৎপর্য্যটীকা" ও "ভামতী" টীকায় [২।২।১১] বৈশেষিক সম্প্রদায়ের "পরমাণুবাদ-প্রক্রিয়া"র বর্ণন করিতে তাঁহাদিগের উক্ত সিদ্ধান্তের যুক্তি বলিয়াছেন যে, যদি কোন ঘটের নির্ব্বাহক সমস্ত পরমাণুকেই সেই ঘটের সাক্ষাৎ উপাদান কারণ বলা যায়, তাহা হইলে যখন মুদ্গরাঘাতে সেই ঘট চূর্ণ হয়, তখন একেবারে সেই সমস্ত পরমাণুরই পরস্পর বিভাগ হইবে। কারণ, দ্রব্যের উপাদানকারণ যে সমস্ত অবয়ব, তাহার বিভাগ অথবা বিনাশ ব্যতীত তাহাতে উৎপন্ন সেই দ্রব্যের কখনই বিনাশ হইতে পারে না। কিন্তু পরমাণু-সমূহের নিত্যত্ববশতঃ তাহার বিনাশ সম্ভব না হওয়ায় উহার বিভাগ জন্যই ঐ স্থলে সেই ঘটের বিনাশ বলিতে হইবে। সুতরাং মুদ্গরাঘাতে সেই ঘটের উপাদান সমস্ত পরমাণুরই পরস্পর বিশ্লেষ বা বিভাগ হওয়ায় সেখানে তখন আর সেই ঘটের কোন অবয়বেরই প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ, পরমাণুসমূহ অতীন্দ্রিয়। কিন্তু মুদ্গরাঘাতে ঘট চূর্ণ হইলেও সেখানে সেই ঘটের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবয়ব-চূর্ণ মৃত্তিকাদি দেখা যায়। অতএব ইহা স্বীকার্য্য যে, সেই সমস্ত পরমাণুই সেই ঘটের সাক্ষাৎ উপাদান কারণ নহে। তাই ঘট চূর্ণ হইলেও তখনই সমস্ত পরমাণুর বিভাগ হয় না।

কিন্তু পরমাণুদ্বয়ে বহুত্ব সংখ্যা না থাকায় তাহার পরস্পর সংযোগই প্রথমে দ্রব্য উৎপন্ন করে। সেই দ্রব্যেরই নাম দ্ব্যণুক। সেই দ্ব্যণুকের পরিমাণও অণুপরিমাণ। কারণ, মহর্ষি কণাদ, দ্রব্যে মহৎ পরিমাণের উৎপত্তিতে সেই দ্রব্যের উপাদান কারণের (১) বহুত্ব সংখ্যা, অথবা (২) মহৎপরিমাণ, অথবা (৩) প্রচয় বিশেষ অর্থাৎ শিথিল সংযোগ

বিশেষকেই কারণ বলিয়াছেন।* কিন্তু "দ্ব্যণুক" নামক প্রথমোৎপন্ন দ্রব্যের উপাদান কারণ যে পরমাণুদ্বয়, তাহাতে বহুত্ব সংখ্যাও নাই, মহৎপরিমাণও নাই এবং তাহাতে তুলপিণ্ডের ন্যায় শিথিল সংযোগ-বিশেষও নাই। সুতরাং কারণের অভাবে ঐ "দ্ব্যণুক" নামক দ্রব্যে মহৎপরিমাণ জন্মে না। কিন্তু উহাতেও পরমাণুদ্বয়ের দ্বিত্ব-সংখ্যাজন্য অণুপরিমাণই জন্মে। তাই ঐ দ্ব্যণুকও 'অণু' বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু 'ত্রসরেণু'র উপাদান কারণ দ্ব্যণুকত্রয়ের বহুত্বসংখ্যাজন্য ত্রসরেণুতে মহৎপরিমাণ বা স্থূলত্ব জন্মে; তাই ত্রসরেণুর প্রত্যক্ষ হয়। কারণের অভাবে দ্ব্যণুকে মহৎপরিমাণ উৎপন্ন না হওয়ায় দ্ব্যণুকের প্রত্যক্ষ হয় না।

এইরূপ, "দ্ব্যণুক"দ্বয়ের সংযোগজন্য কোন দ্রব্যের উৎপত্তি স্বীকার করিলেও তাহাতে স্থূলত্ব বা মহৎপরিমাণ জন্মিতে পারে না। কারণ, ঐ দ্ব্যণুকদ্বয়ে বহুত্বসংখ্যা ও মহৎপরিমাণ প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত কারণত্রয়ের কোনটিই নাই। সুতরাং দ্ব্যণুকদ্বয়ের সংযোগ জন্য কোন দ্রব্য জন্মিলে উহাও সেই দ্ব্যণুকমাত্র-পরিমিতই হইবে, উহা স্থূল হইতে পারে না। অতএব দ্ব্যণুক-দ্বয়ের সংযোগজন্য কোন দ্রব্যের উৎপত্তি স্বীকার ব্যর্থ বলিয়া উহা স্বীকৃত হয় নাই। কিন্তু দ্ব্যণুকত্রয়ের সংযোগজন্যই "ত্রসরেণু" নামক প্রথম স্থূল দ্রব্যের উৎপত্তি স্বীকৃত হইয়াছে এবং উহারই উপাদান-কারণরূপে প্রথমে অণুপরিমাণ "দ্ব্যণুক" দ্রব্যের উৎপত্তি স্বীকৃত হইয়াছে। নচেৎ উপাদান-কারণের অভাবে ত্রসরেণুর উৎপত্তি হইতে পারে না। একেবারে ষট্‌পরমাণুই উহার সাক্ষাৎ উপাদান কারণ বলা যায় না।

---

* "কারণবহুত্বাৎ কারণমহত্ত্বাৎ প্রচয়বিশেষাচ্চ মহৎ।" শারীরক-ভাষ্যে (২।২।১১) আচার্য্য শঙ্করের উদ্ধৃত কণাদ-সূত্র। প্রচলিত বৈশেষিক দর্শন পুস্তকে "কারণবহুত্বাচ্চ" (৭।১।৯) এইরূপ সূত্র দেখা যায়। শঙ্কর মিশ্রের পূর্ব্ব হইতেই উক্ত কণাদসূত্র বিকৃত হইয়াছে, ইহা তাঁহার ব্যাখ্যার দ্বারাও বুঝা যায়।

"আরম্ভবাদে"র মূল অসৎকার্য্যবাদ

প্রথমেই বলিয়াছি যে—পরমাণু প্রভৃতি উপাদান কারণে দ্ব্যণুকাদি কার্য্যদ্রব্য পূর্ব্বে কোনরূপে বিদ্যমান থাকে না। উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য অসৎ—এই মতের নাম **অসৎকার্য্যবাদ**। এই 'অসৎকার্য্যবাদ'ই আরম্ভবাদের মূল। কারণ, 'সৎকার্য্যবাদে' আরম্ভবাদের উপপত্তি হইতে পারে না। তাই মহর্ষি কণাদ ও গৌতম অসৎকার্য্যবাদেরই সমর্থন করিয়াছেন। * মীমাংসক সম্প্রদায়ও অসৎকার্য্যবাদ গ্রহণ করিয়া আরম্ভবাদী। কিন্তু ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতে বিশেষ এই যে, সর্ব্ব জীবের সর্ব্বকর্ম্মাধ্যক্ষ সেই মহেশ্বরের ইচ্ছাবশতঃ সময়ে প্রলয় ও পুনঃ সৃষ্টি হয়। আদি সৃষ্টিকর্ত্তা মহেশ্বরই প্রথমে জীবগণের অদৃষ্টসমষ্টিরূপ প্রকৃতি এবং সেই সমস্ত নিত্য পরমাণুরূপ প্রকৃতিতে ঈক্ষণ করেন। তিনিই সর্ব্ব জীবের সমস্ত অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতা। সুতরাং সৃষ্টির প্রথমে অধিষ্ঠাতার অভাবে অচেতন অদৃষ্টজন্য পরমাণুতে সংযোগ-জনক ক্রিয়া জন্মিতে পারে না—ইহাও বলা যায় না। সর্ব্ব প্রথমে বায়ু-পরমাণুতে এবং মতান্তরে জল-পরমাণুতে ক্রিয়া জন্মে। বৈশেষিক মতে "সৃষ্টি-সংহার-বিধি" প্রশস্তপাদভাষ্যে দ্রষ্টব্য।

শিষ্য। "অসৎকার্য্যবাদ" কিরূপে স্বীকার করা যায়। যাহা অসৎ, তাহার কি উৎপত্তি হইতে পারে? তাহা হইলে আকাশকুসুম প্রভৃতিরও উৎপত্তি হয় না কেন? আর যে পদার্থ পূর্ব্বে তাহার উপাদান কারণে কোনরূপেই বিদ্যমান থাকে না, তাহার উৎপত্তি হইলে তিল হইতে তৈলের ন্যায় বালুকা হইতেও তৈলের উদ্ভব কেন হয় না? পরন্তু যে

---

* বৈশেষিক দর্শনে "ক্রিয়াগুণ-ব্যপদেশাভাবাৎ প্রাগসৎ" (৯।১।১)। ন্যায়দর্শনে "উৎপাদ-ব্যয়-দর্শনাৎ"। "বুদ্ধিসিদ্ধন্তু তদসৎ" (৪।১।—৪৮।৪৯ সূত্র দ্রষ্টব্য।)

কারণ হইতে যে কার্য্যের উদ্ভব হয়, সেই কারণের সহিত সেই কার্য্যের সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক। সুতরাং কার্য্যমাত্রই যে, তাহার উপাদান কারণে পূর্ব্বেও কোনরূপে বিদ্যমান থাকে—ইহা স্বীকার্য্য। শ্রীভগবান্‌ও স্পষ্ট বলিয়াছেন—"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" (গীতা—২।১৬), অর্থাৎ অসতের উৎপত্তি নাই এবং সতের বিনাশ নাই।

গুরু। "সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী"তে সাংখ্যমতানুসারে "সৎকার্য্যবাদ" সমর্থন করিতে বাচস্পতি মিশ্রও 'ভগবদ্‌গীতা'র উক্ত শ্লোকার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়াছেন বটে, কিন্তু 'ভগবদ্‌গীতা'র ঐস্থলে আত্মার নিত্যত্ব প্রতিপাদন করিতে সৎকার্য্যবাদের উল্লেখ অনাবশ্যক ও অসঙ্গত। ঐ শ্লোকের দ্বারা আত্মাতে অসৎ অর্থাৎ অবিদ্যমান শীত উষ্ণ প্রভৃতির সত্তা নাই এবং সৎস্বভাব আত্মার অভাব অর্থাৎ কখনও বিনাশ নাই—ইহাই কথিত হইয়াছে। টীকাকার শ্রীধরস্বামীও সরলভাবে উক্তরূপ অর্থেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মীমাংসাচার্য্য পার্থসারথি মিশ্রও "শাস্ত্রদীপিকার" তর্কপাদে ভগবদ্‌গীতার উক্ত শ্লোকের উল্লেখপূর্ব্বক আত্মার নিত্যত্ব প্রতিপাদন করিতে মধ্যে ঐ শ্লোকের দ্বারা যে, সৎকার্য্যবাদের কথন সংগত হয় না, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকার রামানুজ ঐ শ্লোকের ভাষ্যে স্পষ্টই লিখিয়াছেন—"অত্র সৎকার্য্যবাদস্যাসংগতত্বান্ন তৎপরোঽয়ং শ্লোকঃ"।

আর যে, বলিয়াছ—যাহা অসৎ, তাহার উৎপত্তি হইতে পারে না—তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, যাহা একেবারে অসৎ অর্থাৎ অলীক, তাহার কখনও উৎপত্তি হইতে পারে না—ইহা সত্য; কিন্তু ঘটাদি কার্য্য ত একেবারে অসৎ বা অলীক নহে। উৎপত্তির পরে যাহার সত্তা সিদ্ধ হয়, তাহাকে "অলীক" বলা যায় না। যদি বল, উৎপত্তির পূর্ব্বে ঘটাদি কার্য্যের সত্তা না থাকিলে তখন ধর্ম্মী না থাকায় অসত্ত্বরূপ ধর্ম্মও তাহাতে থাকিতে পারে না। কিন্তু সৎকার্য্যবাদীর মতেও উৎপত্তির পূর্ব্বে ঘটের উপাদান সেই মৃত্তিকায় ঘটত্বরূপে ঘট বিদ্যমান থাকে না—ইহা

স্বীকার্য্য। তাহা হইলে তখন ঘটের অসত্তা ত স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ ঘটত্ববিশিষ্ট দ্রব্যই "ঘট" শব্দের বাচ্য। সুতরাং সেই ঘট-রূপ ধর্ম্মী না থাকিলেও তাহাতে অসত্ত্বরূপ ধর্ম্ম স্বীকার্য্য। কাল ভেদে অসত্ত্ব ও সত্ত্বরূপ ধর্ম্মদ্বয় থাকিতে পারে।

আর যে বলিয়াছ,—তিল হইতে যেমন তৈলের উদ্ভব হয়, তদ্রূপ বালুকা হইতে তৈলের উদ্ভব হয় না কেন ? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, তিল তৈলের কারণ, বালুকা তৈলের কারণই নহে। তিল হইতে তৈলের উৎপত্তি দেখিয়াই তাহাতে তৈলের কারণত্ব-নিশ্চয় হইয়াছে, কিন্তু বালুকা হইতে তৈলের উৎপত্তি না দেখায় তাহাতে তৈলের কারণত্ব-নিশ্চয় হয় নাই। আর সৎকার্য্যবাদীই বা পূর্ব্বে কিরূপে নিশ্চয় করিয়াছেন যে, সেই মৃত্তিকাবিশেষেই সেই ঘট বিদ্যমান থাকে, সূত্রাদিতে উহা বিদ্যমান থাকে না। তাঁহারাও ত মৃত্তিকাবিশেষ হইতেই ঘটের উৎপত্তি দেখিয়াই উহা নিশ্চয় করিয়াছেন। নচেৎ তাঁহারাও উহা কখনও জানিতে পারিতেন না। তাহা হইলে মৃত্তিকাবিশেষই ঘটের উপাদান কারণ বলিয়া তাহাতেই পূর্ব্বে অবিদ্যমান ঘটের উৎপত্তি হয়, সূত্রাদি ঘটের উপাদান কারণ না হওয়ায় তাহাতে ঘটের উৎপত্তি হয় না, এইরূপ বলিবার বাধা কি আছে ?

সৎকার্য্যবাদী সাংখ্যসম্প্রদায়ের শেষ কথা এই যে, উপাদানকারণ ও কার্য্য বস্তুতঃ অভিন্ন। উপাদান মৃত্তিকারূপে সেই ঘট পূর্ব্বে বিদ্যমান থাকিলেও তাহা হইতে কার্য্যরূপে তাহার আবির্ভাবের জন্যই কারণের ব্যাপার আবশ্যক হয়। কিন্তু তাহা হইলে সেই আবির্ভাবকে ত অসৎই বলিতে হইবে। সৎকার্য্যবাদী নিজ সিদ্ধান্ত-ভঙ্গ-ভয়ে তাহা বলিতে না পারিয়া সেই আবির্ভাবকেও সৎ বলিতে বাধ্য হইলে তাঁহার মতে সেই আবির্ভাবের জন্যও কারণের ব্যাপার অনাবশ্যক হয়। কারণ, পূর্ব্বে সেই ঘটের ন্যায় তাহার আবির্ভাবও বিদ্যমান থাকিলে কিসের জন্য

কুম্ভকার প্রযত্ন করিবে? যদি বলিতে হয় যে, সেই আবির্ভাবের আবির্ভাবের জন্যই কুম্ভকার প্রযত্ন করে,—তাহা হইলে ত সেই আবির্ভাবকে অসৎই বলিতে হইবে। নচেৎ সেই আবির্ভাবের আবির্ভাব এবং তাহারও আবির্ভাব প্রভৃতি অনন্ত আবির্ভাব স্বীকারে সৎকার্য্যবাদীর মতে অনবস্থাদোষ অনিবার্য্য।

কিন্তু সেই ঘটকে পূর্ব্বে অসৎ বলিয়া স্বীকার করিলে তাহার উৎপত্তির জন্য কারণের ব্যাপার আবশ্যক ও সার্থক হয় এবং সেই উৎপত্তির উৎপত্তি ও তাহার উৎপত্তি প্রভৃতি স্বীকারে অনবস্থা দোষ হয় না। কারণ, সেই সমস্ত উৎপত্তিও বস্তুতঃ সেই ঘট হইতে অভিন্ন পদার্থ, কিন্তু তাহা হইলেও ঘটমাত্রগত ঘটত্ব নামক ধর্ম্ম এবং উৎপত্তি-মাত্রগত উৎপত্তিত্ব নামক ধর্ম্মের ভেদ থাকায় অর্থ-পুনরুক্ত দোষ হয় না। কারণ, একধর্ম্মরূপে একই পদার্থের পুনরুক্তি হইলেই অর্থ-পুনরুক্ত দোষ হইয়া থাকে। অর্থাৎ যেমন "ঘটঃ কলসঃ"—এইরূপ প্রয়োগ করিলে ঘটত্ব ও কলসত্ব একই ধর্ম্ম বলিয়া অর্থ-পুনরুক্ত দোষ হয়; এইরূপ "ঘট উৎপদ্যতে" এইরূপ প্রয়োগ করিলে অর্থ-পুনরুক্ত দোষ হয় না। কারণ, ঘটের উৎপত্তি বস্তুতঃ সেই ঘট হইতে অভিন্ন পদার্থ হইলেও উৎপত্তি মাত্রই তাহা হইতে অভিন্ন পদার্থ নহে। সুতরাং উৎপত্তিমাত্রস্থ যে উৎপত্তিত্ব নামক ধর্ম্ম, তাহা ঘটত্ব হইতে ভিন্ন পদার্থ হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত বাক্যে অর্থ-পুনরুক্ত দোষ হইতে পারে না। এইরূপ আরও অনেক সূক্ষ্ম বিচার করিয়া ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায় "অসৎকার্য্যবাদ"ই সমর্থন করিয়াছেন। * 'সৎকার্য্যবাদে'র ন্যায় উক্ত 'অসৎকার্য্যবাদ'ও অতি-প্রাচীন মত। শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে বেদস্তুতির মধ্যে (৮৭।২৫) উক্ত 'অসৎকার্য্যবাদে'রও প্রকাশ হইয়াছে।

* এবিষয়ে বিস্তৃত বিচার মৎসম্পাদিত ন্যায়দর্শনের চতুর্থ খণ্ডে ২৩১-৪ ও পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শিষ্য। তৈত্তিরীয় উপনিষদের দ্বিতীয় বল্লীর প্রথম ভাগে "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য এবং তৃতীয় বল্লীর প্রথম ভাগে "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা বুঝা যায় যে, সেই পরব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত কারণ হইলেও উপাদান কারণ। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" এই শ্রুতি বাক্যে "যতঃ" এই পদে পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারা উক্ত 'যদ্'শব্দগ্রাহ্য পরব্রহ্ম যে, সর্ব্ব ভূতের উপাদান কারণ—ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। কারণ, পাণিনি সূত্র বলিয়াছেন—"জনিকর্ত্তুঃ প্রকৃতিঃ" (১।৪।৩০)। উক্ত সূত্রে "প্রকৃতি" শব্দের অর্থ উপাদান কারণ। শারীরক ভাষ্যে (১।৪।২৩) শঙ্করাচার্য্যও ইহা বলিয়াছেন। তাহা হইলে পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয়—এই চতুর্ব্বিধ পরমাণুসমূহই যে, সজাতীয় জন্য ভূতবর্গের মূল উপাদান কারণ এবং পঞ্চম ভূত আকাশের উৎপত্তি নাই, উহা নিত্য —ইহা কিরূপে গ্রহণ করিব। "আকাশঃ সম্ভূতঃ" এইরূপ স্পষ্টার্থ শ্রুতিবাক্যসত্ত্বেও আকাশের উৎপত্তি নাই, এই মত কিরূপে গ্রহণ করা যায়?

গুরু। পাণিনির সূত্রানুসারে সর্ব্বত্র উপনিষদের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করা যায় না। উক্ত তৈত্তিরীয় উপনিষদের দ্বিতীয় বল্লীতে "অন্নাদ্বৈ প্রজা জায়ন্তে" এবং পরে "অন্নাদ্ ভূতানি জায়ন্তে" এইরূপ শ্রুতি বাক্যও আছে। পাণিনির উক্ত সূত্রে "প্রকৃতি" শব্দের অর্থ কেবল উপাদান কারণ নহে, কিন্তু কারণমাত্র, ইহাও বহু-সম্মত মত আছে। কারণ উৎপত্তি ক্রিয়ার কর্ত্তৃকারকের নিমিত্ত কারণবোধক শব্দের উত্তরও পঞ্চমী বিভক্তির বহু প্রয়োগ হইয়াছে। *

* "সিদ্ধান্তকৌমুদী"কার ভট্টোজি দীক্ষিতও ঐ সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"জায়মানস্য হেতুরুপাদানং স্যাৎ। ব্রহ্মণঃ প্রজা জায়ন্তে"। "তত্ত্ববোধিনী" ব্যাখ্যাকার জ্ঞানেন্দ্র সরস্বতী ঐস্থলে লিখিয়াছেন—"ইহ প্রকৃতিগ্রহণং হেতুমাত্রপরমিতি বৃত্তিকৃন্মতং,

অবশ্য "আকাশঃ সম্ভূতঃ" এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারা আকাশের উৎপত্তি স্পষ্ট বুঝা যায়। কিন্তু ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতে উক্ত শ্রুতি বাক্যে "সম্ভূত" শব্দের দ্বারা অভিব্যক্তিরূপ গৌণ উৎপত্তিই বুঝিতে হইবে। পরব্রহ্ম হইতে আকাশ উৎপন্ন হয় নাই, কিন্তু অভিব্যক্ত হইয়াছে,—ইহাই তাৎপর্য্য। কারণ, আকাশ বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী। সুতরাং তাহার উৎপত্তি অসম্ভব। পরন্তু অনুমান প্রমাণের ন্যায় শব্দ প্রমাণের দ্বারাও আকাশের নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়। আকাশের নিত্যত্ববাদ সমর্থন করিতে বেদান্ত দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে বাদরায়ণও পূর্ব্বোক্ত তাৎপর্য্যে বলিয়াছেন—**গৌণ্যসম্ভবাৎ ॥ শব্দাচ্চ ॥** (৩।৪)।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য পূর্ব্বপক্ষরূপেই উক্ত মতের ব্যাখ্যা করিতে প্রথমোক্ত সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন যে,† আকাশে পৃথিব্যাদি দ্রব্যের

"পুত্রাৎ প্রমোদো জায়তে" ইত্যুদাহরণাৎ"। উক্ত মতানুসারে "শব্দশক্তি-প্রকাশিকা" গ্রন্থে কারক প্রকরণে অপাদান ব্যাখ্যায় জগদীশ তর্কালঙ্কারও "ধর্ম্মাত্মুৎপদ্যতে সুখং" এবং "দণ্ডাজ্জায়তে ঘটঃ" এইরূপ প্রয়োগের উল্লেখ করিয়াছেন। "ব্যুৎপত্তিবাদ" গ্রন্থের পঞ্চমী-প্রকরণে গদাধর ভট্টাচার্য্যও পাণিনির উক্ত সূত্রে "প্রকৃতি" শব্দের অর্থ কারণমাত্র—ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন। তিনি উহা সমর্থন করিতে ভট্টিকাব্যের প্রথম সর্গে "প্রাক্ কেকয়ীতো ভরতস্ততোঽভূৎ" এবং "বায়োর্জাতঃ", "দণ্ডাদ্ ঘটো জায়তে" ইত্যাদি প্রয়োগ প্রদর্শন করিয়াছেন। বস্তুতঃ মনুসংহিতার "আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ (৩।৭৬) এবং ভাগবতের "ততঃ সপ্তদশে জাতঃ সত্যবত্যাং পরাশরাৎ" (১।৩।২১) এবং ভগবদ্গীতার "সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে" (২।৬২) এইরূপ বহু প্রামাণিক প্রয়োগও প্রদর্শন করা যায়। মতান্তরে ঐসমস্ত স্থলে হেত্বর্থে পঞ্চমীর প্রয়োগ হইয়াছে।

† "পৃথিব্যাদিবৈধর্ম্ম্যাচ্চ বিভুত্বাদিলক্ষণাদাকাশস্য অজত্ব-সিদ্ধিঃ। তস্মাদ্ যথা লোকে আকাশং কুরু আকাশো জাত ইত্যেবং জাতীয়কো গৌণঃ প্রয়োগো ভবতি, যথা চ ঘটাকাশঃ করকাকাশো গৃহাকাশ ইত্যেকস্যাপি আকাশস্য ইত্যেবং জাতীয়কো ভেদব্যপদেশো গৌণো ভবতি, বেদেঽপি "আরণ্যানাকাশেষালভেরন্" ইতি, এবমুৎপত্তি-শ্রুতিরপি গৌণী দ্রষ্টব্যা। শারীরকভাষ্য (২।৩।৩)।

বৈধর্ম্ম্য বিভুত্বাদি থাকায় আকাশের অজত্ব বা অনুৎপত্তি সিদ্ধ হয়। অতএব যেমন ভূগর্ভে পূর্ব্ব হইতেই আকাশ বিদ্যমান থাকিলেও তাহার অভিব্যক্তি বা প্রকাশ থাকে না—কিন্তু মৃত্তিকা খনন করিলে তখন সেই বিদ্যমান আকাশেরই প্রকাশ হয়; তদ্রূপ সৃষ্টির প্রথমে পরমেশ্বর কর্ত্তৃক নিত্য বিদ্যমান আকাশের প্রকাশ হয়। সুতরাং যেমন মৃত্তিকা-খননকারীর প্রতি 'আকাশং কুরু' অর্থাৎ আকাশ কর, এইরূপ গৌণ প্রয়োগ হয় এবং মৃত্তিকা খননের পরে 'আকাশো জাতঃ' অর্থাৎ আকাশ হইয়াছে, এইরূপ গৌণ প্রয়োগ হয়; তদ্রূপ "আকাশঃ সম্ভূতঃ"—এইরূপ গৌণ প্রয়োগ হইয়াছে—ইহাই বুঝিতে হইবে।

পরে "**শব্দাচ্চ**" এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর, বৃহদারণ্যক উপনিষদের "বায়ুশ্চান্তরীক্ষঞ্চৈতদমৃতম্" (২।৩।৩) এই শ্রুতিবাক্য এবং "আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ" এই শ্রুতি বাক্য এবং তৈত্তিরীয় উপনিষদের "আকাশশরীরং ব্রহ্ম" "আকাশ আত্মা"—এই সমস্ত শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, পূর্ব্ব-পক্ষ-বাদীর মতে আকাশের নিত্যত্ব শ্রুতি-সিদ্ধ। সুতরাং "আকাশঃ সম্ভূতঃ" এই শ্রুতি বাক্যে "সম্ভূত" শব্দটি আকাশের পক্ষে গৌণার্থ। একই "সম্ভূত" শব্দ একত্র গৌণার্থ ও অন্যত্র মুখ্যার্থ হইতে পারে। বাদরায়ণ পরে দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা সমর্থন করিতে তৃতীয় সূত্র বলিয়াছেন—**স্যাচ্চৈকস্য ব্রহ্মশব্দবৎ** (২।৩।৫)। ভাষ্যকার শঙ্কর বাদরায়ণের তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, উক্ত তৈত্তিরীয় উপনিষদেই "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব, তপো ব্রহ্ম" (৩।২) এই শ্রুতিবাক্যে যেমন 'ব্রহ্মন্' শব্দের প্রথমে মুখ্য অর্থে ও পরে গৌণ অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে, তদ্রূপ,......"আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যেও সম্ভূত শব্দের গৌণ ও মুখ্য অর্থে প্রয়োগ হইতে পারে।

পরব্রহ্মের ন্যায় আকাশও নিত্য পদার্থ হইলে পরব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব-শ্রুতি এবং এক ব্রহ্ম বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান-শ্রুতি কিরূপে উপপন্ন হইবে? এতদুত্তরে ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের কথাও উক্তস্থলে শঙ্করাচার্য্য পরে বলিয়াছেন। পরন্তু জগৎ কর্ত্তা পরমেশ্বর জগতের কেবল নিমিত্ত কারণ, (উপাদান কারণ নহেন) এই মত-সমর্থনে শঙ্করাচার্য্য পূর্ব্বে যে সমস্ত যুক্তি বলিয়াছেন, * তাহাও অবশ্য দ্রষ্টব্য। সেই সমস্ত যুক্তি বুঝিলে ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের প্রাচীন পরম্পরাগত অনেক যুক্তিও বুঝা যাইবে। "ভামতী"টীকাকার বাচস্পতিমিশ্র প্রভৃতি সেই সমস্ত প্রাচীন যুক্তির ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

অবশ্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য পরে উপনিষদনুসারে বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া বিচার পূর্ব্বক শ্রৌতসিদ্ধান্তরূপে ইহাই সমর্থন করিয়াছেন যে, আকাশও অনিত্য এবং পরমেশ্বরই আকাশাদি জগৎ প্রপঞ্চের নিমিত্ত কারণ হইয়াও উপাদান কারণ। নচেৎ ছান্দোগ্য উপনিষদে যে, এক ব্রহ্ম-বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের উপদেশ ও পরে তাহার অনেক দৃষ্টান্ত কথিত হইয়াছে, তাহা উপপন্ন হয় না। কিন্তু পরব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ হইলেই তাঁহার বিজ্ঞানে সর্ব্ব-বিজ্ঞান উপপন্ন হয়। কারণ, উপাদান কারণ হইতে তাহার কার্য্যের বাস্তব ভেদ না থাকায় উপাদান কারণ

---

* বেদান্তদর্শনের "প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ" (১।৪।২৩) এই সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করিতে বলিয়াছেন, "তত্র নিমিত্তকারণমেব তাবৎ কেবলং স্যাদিতি প্রতিভাতি, কস্মাৎ? ঈক্ষাপূর্ব্বককর্তৃত্বশ্রবণাৎ······ঈক্ষাপূর্ব্বকঞ্চ কর্তৃত্বং নিমিত্ত-কারণেষ্বেব কুলালাদিষু দৃষ্টং।·········ঈশ্বরত্বপ্রসিদ্ধেশ্চ। ঈশ্বরাণাং হি রাজবৈবস্বতাদীনাং নিমিত্তকারণত্বমেব কেবলং প্রতীয়তে। তদ্বৎ পরমেশ্বরস্যাপি নিমিত্তকারণত্বমেব যুক্তং প্রতিপত্তুম্। [কার্য্যঞ্চেদং জগৎ সাবয়বমচেতনমশুদ্ধঞ্চ দৃশ্যতে, কারণেনাপি তস্য তাদৃশেনৈব ভবিতব্যম্; কার্য্যকারণয়োঃ সারূপ্যদর্শনাৎ" ইত্যাদি। 'ভামতী' টীকায় বাচস্পতিমিশ্র উক্ত মতের ব্যাখ্যায় একটি শ্লোক লিখিয়াছেন—"ঈক্ষাপূর্ব্বক-কর্তৃত্বং প্রভুত্বমসরূপতা। নিমিত্তকারণেষ্বেব নোপাদানেষু কর্হিচিৎ।"

বিজ্ঞাত হইলেই বস্তুতঃ তাহার সমস্ত কার্য্য বিজ্ঞাত হয়। অতএব পরমেশ্বরের জগদুপাদানত্ব শ্রুতিসিদ্ধ হওয়ায় উহাই প্রকৃত সিদ্ধান্ত।

কিন্তু উক্ত মতেও আকাশের নিত্যত্ববোধক পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রুতি বাক্যের যথা শ্রুতার্থ-রক্ষা হয় নাই। পরন্তু ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতে পরমেশ্বরের জগদুপাদানত্ব যুক্তিযুক্ত না হওয়ায় উহা শাস্ত্রার্থ হইতে পারে না। তাঁহাদিগের মতে মৃত্তিকাবিশেষ যেমন ঘটের উপাদান কারণ এবং সূত্রসমূহ যেমন বস্ত্রের উপাদান কারণ; তদ্রূপ পরমেশ্বর জগতের মূল উপাদান কারণ—ইহা বলা যায় না। কারণ, উপাদান কারণভূত দ্রব্য পদার্থের রূপাদি বিশেষগুণ জন্যই তাহার কার্য্যভূত দ্রব্য পদার্থে তজ্জাতীয় রূপাদি বিশেষগুণ জন্মে। যেমন রক্তসূত্র নির্ম্মিত বস্ত্র রক্তবর্ণই হয়, নীল বর্ণ হয় না। কিন্তু চেতন পরমেশ্বর হইতে তাঁহার কার্য্য জড় জগৎ বিজাতীয় বা অত্যন্ত বিসদৃশ হওয়ায় তাঁহাকে জগতের উপাদান কারণ বলা যায় না। পরন্তু পরমেশ্বর ঈক্ষণ পূর্ব্বক জগতের সৃষ্টি-কর্ত্তা এবং পরে নিজেই সংহার-কর্ত্তা। শ্রুতি বলিয়াছেন,—"স ঐক্ষত"। "স তপোঽতপ্যত। সতপস্তপ্‌ত্বা ইদং সর্ব্বম-সৃজত।" "যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ"। জ্ঞানই তাঁহার তপস্যা। তিনি জ্ঞানপূর্ব্বক অর্থাৎ পূর্ব্বকল্পে সৃষ্ট জগতের পর্য্যালোচন পূর্ব্বক তদনুসারে পূর্ব্ববৎ আবার জগতের সৃষ্টি করেন। কিন্তু যিনি ঐরূপ সৃষ্টি-কর্ত্তা, তাঁহার নিমিত্ত কারণত্বই যুক্তিযুক্ত। যেমন বিচার পূর্ব্বক গৃহাদির কর্ত্তা ও সংহর্ত্তা ব্যক্তি, সেই গৃহাদির নিমিত্ত কারণ বলিয়াই লোকসিদ্ধ।

পরন্তু যিনি উপাদান কারণের অধ্যক্ষ বা অধিষ্ঠাতা; তিনি নিমিত্ত কারণই হইবেন। শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন—

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরং।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥ গীতা—৯।১০

উক্ত শ্লোকের দ্বারা বুঝা যায় যে, পরমেশ্বর প্রকৃতির অধ্যক্ষ বা অধিষ্ঠাতা হওয়ায় তিনি অসাধারণ নিমিত্ত কারণ। পরার্দ্ধে নিমিত্ত কারণ বোধক "হেতু" শব্দের দ্বারা তাঁহার সেই নিমিত্তকারণত্বই ব্যক্ত করা হইয়াছে,—ইহাও বুঝা যায়। নচেৎ উক্ত "হেতু" শব্দ প্রয়োগের প্রয়োজন কি? অবশ্য "প্রকৃতি" শব্দের নানা অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে। কিন্তু ক্লীবলিঙ্গ 'প্রধান' শব্দ ও 'প্রকৃতি' শব্দের উপাদান কারণ অর্থ প্রসিদ্ধ। "প্রধানং প্রকৃতিঃ স্ত্রিয়াং"। (অমরকোষ)। পূর্ব্বোদ্ধৃত ভগবদ্‌গীতার শ্লোকে "প্রকৃতি" শব্দের অর্থ উপাদান কারণ। পরমেশ্বর তাহার অধ্যক্ষ অর্থাৎ অধিষ্ঠাতা। তাঁহার অধিষ্ঠান ব্যতীত অচেতন উপাদান, কার্য্য-জনক হইতে পারে না। ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতে সেই মূল উপাদান কারণ চতুর্ব্বিধ পরমাণু।* কিন্তু সেই সমস্ত উপাদান কারণের অধিষ্ঠাতা পরমেশ্বর জগতের অসাধারণ নিমিত্ত কারণ। তাই তিনি শাস্ত্রে জগতের সনাতন বীজ বলিয়াও কথিত হইয়াছেন। "ভাষাপরিচ্ছেদে"র মঙ্গলাচরণ-শ্লোকে নৈয়ায়িক বিশ্বনাথও বলিয়াছেন—"তস্মৈ নমঃ কৃষ্ণায় সংসারমহীরুহস্য বীজায়।"

বস্তুতঃ পরমেশ্বর জগতের উপাদান কারণ না হইলেও উপাদান কারণের সদৃশ। উপাদান কারণ যেমন তাহার কার্য্যের আশ্রয়; তদ্রূপ

* ভাষ্যকার শঙ্কর নিজ মতানুসারে উক্ত শ্লোকে "প্রকৃতি" শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "মম মায়া ত্রিগুণাত্মিকা অবিদ্যালক্ষণা প্রকৃতিঃ।" কিন্তু ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায় নিজ মতানুসারে উক্ত শ্লোকে উপাদান কারণ-বোধক "প্রকৃতি" শব্দের দ্বারা পরমাণুই গ্রহণ করিয়াছেন। "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি"র পঞ্চম স্তবকে তৃতীয় কারিকার বিবরণে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের "বিশ্বতশ্চক্ষুরুত" ইত্যাদি মন্ত্রের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন,—"বচনৈ পরমাণুরূপপ্রধানাধিষ্ঠেয়ত্বম্"। পরে চতুর্থকারিকার বিবরণে—তিনি ভগবদ্‌গীতার "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ" ইত্যাদি শ্লোকার্দ্ধও উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেখানে "প্রকাশ" টীকাকার বর্দ্ধমান উপাধ্যায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"প্রকৃতিঃ পরমাণুঃ।"

পরমেশ্বর তাঁহার কার্য্য সর্ব্বজগতের চরম আশ্রয়। উপাদান কারণে যেমন তাহার কার্য্যদ্রব্য প্রোত বা অনুস্যূত থাকে; তদ্রূপ, পরমেশ্বরেই সমস্ত জগৎ প্রোত আছে। সুতরাং তাঁহার সেই সর্ব্বাশ্রয়ত্বাদি সুব্যক্ত করিবার জন্যই শাস্ত্রে অনেক স্থানে নানাভাবে তিনি উপাদান কারণের ন্যায় কীর্ত্তিত হইয়াছেন। নানারূপ উপমা ও রূপক অলঙ্কারের দ্বারাও তাঁহার সর্ব্বাশ্রয়ত্বাদি ব্যক্ত করিয়া তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কারণ—ইহাই ব্যক্ত করা হইয়াছে। শ্রীভগবান্‌ও বলিয়াছেন—

"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥ গীতা—৭।৭। *

অবশ্য এক ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইলেই সমস্ত বিজ্ঞাত হয়, ইহা উপনিষদে উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তদ্দ্বারা পরমেশ্বরের জগদুপাদানত্ব প্রতিপন্ন হয় না। কারণ, "যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি ভগবন্তমধোক্ষজং।" যোগিগণই যোগজ-সন্নিকর্ষ দ্বারা সেই ভগবান্ মহেশ্বরের অলৌকিক মানস প্রত্যক্ষ করেন। সেই মহেশ্বরই সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বাশ্রয় ও সর্ব্বান্তর্য্যামী। যে সময়ে মুমুক্ষু যোগী সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব, সর্ব্বাশ্রয়ত্ব ও সর্ব্বান্তর্য্যামিত্বরূপে

---

* ভাষ্যকার শঙ্কর ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"মত্তঃ পরমেশ্বরাৎ পরতরমন্যৎ কারণান্তরং কিঞ্চিন্নাস্তি ন বিদ্যতে, অহমেব জগৎকারণমিত্যর্থঃ।" কিন্তু "পরতর' শব্দের দ্বারা শ্রেষ্ঠ অর্থই বুঝা যায়। টীকাকার শ্রীধরস্বামীও এখানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"মত্তঃ সকাশাৎ পরতরং শ্রেষ্ঠং জগতঃ সৃষ্টিসংহারয়োঃ স্বতন্ত্রং কারণং কিঞ্চিদপি নাস্তি।" পরন্তু উক্ত শ্লোকের শেষে "সূত্রে মণিগণা ইব" এই দৃষ্টান্ত বাক্য কিরূপে সার্থক ও সুসংগত হইবে—ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক। উক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা সরলভাবে বুঝা যায় যে, সূত্রে গ্রথিত মণিসমূহ যেমন সেই আশ্রয়ভূত সূত্র হইতে বস্তুতঃই ভিন্ন পদার্থ; তদ্রূপ জগদাশ্রয় চেতন পরমেশ্বর হইতে তাঁহার আশ্রিত জগৎ বস্তুতঃ ভিন্ন পদার্থ। ভাষ্যকার শঙ্কর উক্ত শ্লোকে অনুক্ত দৃষ্টান্তেরও উল্লেখপূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"দীর্ঘতন্তুষু পটবৎ সূত্রে চ মণিগণা ইব।" কিন্তু উক্ত শ্লোকে "দীর্ঘতন্তুষু বস্ত্রবৎ" এইরূপ চতুর্থ চরণই কেন উক্ত হয় নাই, ইহাও চিন্তনীয়।

সেই মহেশ্বরের প্রত্যক্ষ করেন, তখন সমস্ত পদার্থই সেই অলৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় হওয়ায় তাঁহার সমস্তই বিজ্ঞাত হয়। তখন তাঁহার অশ্রুত শ্রুত হয়, অমত মত হয়, অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাত (সাক্ষাৎকৃত) হয়। আর চরম ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের ফলে মুমুক্ষু যোগীর নিজ আত্মার সাক্ষাৎকার হওয়ায় তখন তাঁহার পূর্ব্বকৃত শ্রবণ মননাদি সমস্তই সফল হয়। তখন তাঁহার আর কিছুই জ্ঞাতব্য থাকে না। ফল কথা, পরমেশ্বর জগতের কেবল নিমিত্ত কারণ হইলেও তাঁহার বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের উপপত্তি হইতে পারে। মধ্বাচার্য্য প্রভৃতিও নিজ মতানুসারে উহার উপপাদন করিয়াছেন।

অবশ্য ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ব-বিজ্ঞানের দৃষ্টান্ত-প্রদর্শনের জন্য পরে কথিত হইয়াছে—"যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্"—ইত্যাদি। শারীরক ভাষ্যে (১।৪।২৩) আচার্য্য শঙ্কর পরে উক্ত শ্রুতি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—"ইত্যুপাদানগোচর এব আম্নায়তে।" অর্থাৎ তাঁহার মতে দৃষ্টান্ত-বোধক ঐ সমস্ত শ্রুতি বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, উপাদান কারণ বিজ্ঞাত হইলেই সমস্ত বিজ্ঞাত হয়; যেমন এক মৃত্তিকাপিণ্ডরূপ উপাদান কারণ বিজ্ঞাত হইলেই তাহার কার্য্য সমস্ত মৃন্ময় দ্রব্য বিজ্ঞাত হয়। কারণ সেই উপাদান কারণ হইতে তাহার কার্য্য বস্তুতঃ ভিন্ন নহে। সুতরাং উপাদান কারণই সত্য, কিন্তু তাহাতে কল্পিত কার্য্য মিথ্যা। তাই পরে কথিত হইয়াছে—"মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্।"

কিন্তু প্রাচীনকাল হইতে ছান্দোগ্য উপনিষদের ঐ সমস্ত শ্রুতি-বাক্যেরও নানারূপ তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যা হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালেও আচার্য্য শঙ্করের তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যার বহু প্রতিবাদ হইয়াছে। বস্তুতঃ শঙ্করের ব্যাখ্যাতেও বহু বক্তব্য আছে। প্রথম কথা,—ঐ সমস্ত

শ্রুতিবাক্যে এক মৃৎপিণ্ড 'প্রভৃতি যে, উপাদান কারণরূপেই গৃহীত হইয়াছে—ইহা সহজে বুঝা যায় না। কারণ যে কোন এক মৃত্তিকা-পিণ্ড সমস্ত মৃন্ময় দ্রব্যের উপাদান কারণ হয় না। পরন্তু ছান্দোগ্য উপনিষদে ঐস্থলে পরে কথিত হইয়াছে—"যথা সৌম্যৈকেন নখ-নিকৃন্তনেন সর্ব্বং কার্ষ্ণায়সং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং" ইত্যাদি। অর্থাৎ একটি নখছেদক অস্ত্র বিজ্ঞাত হইলে সমস্ত "কার্ষ্ণায়স" (কৃষ্ণ লৌহনির্ম্মিত দ্রব্য) বিজ্ঞাত হয়। কিন্তু যে কোন একটি নখ ছেদক অস্ত্র সমস্ত কৃষ্ণ লৌহ-নির্ম্মিত দ্রব্যের উপাদান কারণ হয় না। উক্ত স্থলে "সর্ব্ব" শব্দের অর্থ-সংকোচ করিয়া কোন এক মৃত্তিকা-পিণ্ডকে তজ্জন্য সমস্ত মৃন্ময় দ্রব্যের উপাদান কারণরূপে বুঝিলেও কিরূপে তাহা সম্ভব হইবে—ইহাও বিচার্য্য। যে মৃত্তিকাপিণ্ড ঘটের উপাদান-কারণ হয়,—তাহাই যে, পরে আবার অন্য মৃন্ময় দ্রব্যের উপাদান হয়, ইহা সর্ব্বত্র সম্ভব হয় না।

পরন্তু আচার্য্য শঙ্করের মতে মৃত্তিকাও ত পারমার্থিক সত্য নহে, এক ব্রহ্মই পারমার্থিক সত্য। তাহা হইলে "মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যং" এইরূপ উক্তি কিরূপে সংগত হইবে এবং উক্ত বাক্যে "মৃত্তিকা" শব্দের পরে 'ইতি' শব্দের প্রয়োগ কেন হইয়াছে—ইহাও চিন্তনীয়। আর মৃত্তিকাকে ব্যবহারিক সত্য বলিলে কিরূপে উহা পারমার্থিক সত্য পরব্রহ্মের দৃষ্টান্ত হইবে, ইহাও বিচার্য্য। অবশ্য কোন দৃষ্টান্তই সর্ব্বাংশে সমান হয় না, ইহা সত্য। আর ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত ঐ সমস্ত দৃষ্টান্ত যে, সর্ব্বাংশে সমান হইতেই পারে না, ইহা সকল মতেই স্বীকার্য্য। কিন্তু ঘটাদি মৃন্ময় দ্রব্যের উপাদান মৃত্তিকা যদি ব্যবহারিক সত্যই হয়, তাহা হইলেও ঘটাদি দ্রব্যকেও একেবারে অসত্য বা অসৎ বলা যাইবে না। পরন্তু ঘটাদি দ্রব্য কল্পিত মিথ্যা, উপাদান কারণ মৃত্তিকা হইতে উহার বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই—ইহা

সর্ব্বসম্মত না হওয়ায় দৃষ্টান্ত বলা যায় না। অসৎকার্য্যবাদী ন্যায় বৈশেষিকাদি সম্প্রদায় উপাদান কারণ ও তাহার কার্য্যের বাস্তব ভেদই সমর্থন করিয়াছেন। তত্ত্ববাদী মধ্বাচার্য্যও জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বর হইতে জীব ও জগতের ঐকান্তিক ভেদবাদের প্রধান সমর্থক।

যাহা হউক, এখন প্রকৃত কথায় সংক্ষেপে এক প্রকার বক্তব্য এই যে, উক্ত শ্রুতি বাক্যে নিত্যার্থক "সত্য" শব্দের দ্বারা স্থায়িত্বমাত্রই বিবক্ষিত এবং তৎপূর্ব্বে "বাচারম্ভণ" শব্দের দ্বারা অস্থায়িত্বমাত্রই বিবক্ষিত—ইহাও আমরা বুঝিতে পারি। "বাচা" শব্দের অর্থ—বাক্য, "আরম্ভণ" শব্দের অর্থ—উৎপত্তি বা সৃষ্টি। বাচয়া সংজ্ঞাশব্দ-যুক্ত-বাক্যেন আরম্ভণং সৃষ্টির্যস্য, এইরূপ ব্যাখ্যার দ্বারা "বাচারম্ভণ" শব্দের অর্থ—সৃষ্ট বস্তু, ইহা বুঝা যায়। কারণ, সৃষ্ট বস্তুমাত্রই তাঁহার সংজ্ঞা-বিশেষ-যুক্ত বাক্যাবলম্বনে সৃষ্ট হয়। যেমন মৃত্তিকা হইতে ঘটাদি কোন দ্রব্যের নির্ম্মাণের পূর্ব্বে নির্ম্মাতা 'আমি ঘট করিব' অথবা 'শরাব করিব', এইরূপ কোন সংজ্ঞাবিশেষযুক্ত বাক্য অবলম্বন করেন। নচেৎ, বিবিধ নামক বিবিধ প্রকার দ্রব্য-সৃষ্টি হইতে পারে না। পরমেশ্বরের সৃষ্টিও ঐরূপ—ইহা শ্রুতি সিদ্ধ।* সৃষ্ট ভাব বস্তু মাত্রই বিনশ্বর অস্থায়ী। সুতরাং উপনিষদে অস্থায়িত্ব—তাৎপর্য্যেই "বাচারম্ভণ" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে—ইহা বুঝা যায়।

তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যের এইরূপ তাৎপর্য্যও বুঝিতে পারি যে, ঘটাদি দ্রব্য ও মৃত্তিকার কার্য্যকারণভাব-বিজ্ঞ ব্যক্তি, কোন

---

* ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন—"তথা প্রজাপতেরপি স্রষ্টুঃ সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং বৈদিকাঃ শব্দা মনসি প্রাদুর্ব্বভূবুঃ, পশ্চাত্তদনুগতানর্থান্ সসর্জ্জেতি গম্যতে। তথাচ শ্রুতিঃ "স ভূরিতি ব্যাহরৎ স ভূমিমসৃজত" (তৈ-ব্রা ২।২।৪।২) ইত্যেমাদিকা ভূরাদি-শব্দেভ্য এব মনসি প্রাদুর্ভূতেভ্যো ভূরাদিলোকান্ সৃষ্টান্ দর্শয়তি"।—শারীরক-ভাষ্য (১।৩।২৮)।

মৃত্তিকাপিণ্ড দেখিলে তখন তাহার তজ্জন্য সমস্ত মৃন্ময় দ্রব্য বিজ্ঞাত হয়। কিরূপে তাহা বিজ্ঞাত হয়? তাই পরে কথিত হইয়াছে—"বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং" ইত্যাদি। অর্থাৎ তিনি তখন বুঝিতে পারেন যে, এই মৃত্তিকা হইতে বিবিধ মৃন্ময় দ্রব্য নির্ম্মিত হয়, কিন্তু সেই সমস্ত বিকারভূত দ্রব্য এবং তাহার নামধেয় অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন নাম, বাচারম্ভণ অর্থাৎ অস্থায়ী। কিন্তু "মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" অর্থাৎ সেই সমস্ত মৃন্ময় দ্রব্যের মূল মৃত্তিকাই স্থায়ী। "মৃত্তিকা" শব্দের পরে প্রকারার্থ "ইতি" শব্দের দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে যে, মৃত্তিকাত্ব প্রকারে অর্থাৎ মৃত্তিকাত্বরূপেই মৃত্তিকা স্থায়ী, কিন্তু ঘটত্বাদিরূপে উহা স্থায়ী নহে।

এইরূপ যোগী যখন জগৎ-কর্তৃত্বরূপে সেই পরমেশ্বরের প্রত্যক্ষ করেন, তখন তিনি বুঝিতে পারেন যে, পরমেশ্বরের সৃষ্ট সমগ্র জগৎ কিছুই স্থায়ী নহে, কিন্তু পরমেশ্বর চিরস্থায়ী সত্য। উক্তরূপে এক পরমেশ্বরের বিজ্ঞানেই তখন তাঁহার সমস্ত জগতের তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারও হয়। সুতরাং তখন তাঁহার অশ্রুত শ্রুত হয়, অমত মত হয়, অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাত (সাক্ষাৎকৃত) হয়। আর চরম ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের ফলে তাঁহার নিজের আত্ম-সাক্ষাৎকার হওয়ায় তখন তিনি কৃতকৃত্য হন। তখন তাঁহার আর কোন জ্ঞাতব্য থাকে না।

কিন্তু উক্তমতে তখন পরমেশ্বরে জীব ও জগতের ভেদ দর্শন হইলেও পরমেশ্বরের অনুগ্রহলাভের জন্য পূর্ব্বে তাঁহাকে সর্ব্বস্বরূপ বলিয়া ধ্যান করিতে হইবে। সর্ব্বত্র ব্রহ্মভাবনা এবং ভেদে অভেদ-ধ্যান, সাধকের অবশ্য কর্ত্তব্য উপাসনা-বিশেষ। তাই শাস্ত্রে নানাস্থানে এবং পরমেশ্বরের নানাস্তবে তাঁহার সর্ব্বস্বরূপতার বর্ণন হইয়াছে। আমরা তন্ত্রে 'জগদ্ধাত্রীকল্পে' জগদ্ধাত্রী-স্তবের প্রথমে পাঠ করি—

পরমাণুস্বরূপে চ দ্ব্যণুকাদি-স্বরূপিণি।
স্থূলাতিস্থূলরূপে চ জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে॥

অষ্টম অধ্যায়

কণাদ ও গৌতমের মত তাঁহাদিগের কল্পিত নহে

শিষ্য। আপনি কণাদ ও গৌতমের কোন মতকেই শ্রুতি-বিরুদ্ধ বলিবেন না,—ইহা আমি বুঝিয়াছি। কিন্তু অক্ষপাদ গৌতম-প্রণীত ন্যায়দর্শনে এবং কণাদ-প্রণীত বৈশেষিক দর্শনে কোন কোন অংশ যে, শ্রুতিবিরুদ্ধ, সুতরাং সেই অংশ পরিত্যাজ্য—ইহা ত শাস্ত্রেই কথিত হইয়াছে।

গুরু। কোন্ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে? শাস্ত্রে উহা কথিত হইলে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি পূর্ব্বাচার্য্যগণ তাহা বলেন নাই কেন? তাঁহারা কি, সেই শাস্ত্রবচন জানিতেন না? আর যদি পরবর্ত্তী বিজ্ঞানভিক্ষুর উদ্ধৃত পরাশরোপপুরাণের বচনকে * তুমি শাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ কর, তাহা হইলে তাঁহার উদ্ধৃত পদ্মপুরাণ-বচনের অপরাধ কি? সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যের প্রারম্ভে বিজ্ঞানভিক্ষু, "মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ"—ইত্যাদি যে সমস্ত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, ঐ সমস্ত বচনে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যাত "মায়াবাদ"কে অবৈদিক ও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলা হইয়াছে। কোন কোন বৈষ্ণবাচার্য্যও ঐ সমস্ত

---

* "অক্ষপাদ-প্রণীতে চ কাণাদে সাংখ্য-যোগয়োঃ।
ত্যাজ্যঃ শ্রুতিবিরুদ্ধোঽংশঃ শ্রুত্যেকশরণৈর্নৃভিঃ।
জৈমিনীয়ে চ বৈয়াসে বিরুদ্ধাংশো ন কশ্চন।
শ্রুত্যা বেদার্থবিজ্ঞানে শ্রুতিপারং গতৌ হি তৌ॥"
(সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ষুর উদ্ধৃত বচন।)

বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু "অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি" গ্রন্থে কাশ্মীরক সদানন্দ যতি, "সাংখ্যভাষ্য-কৃদ্ভিশ্চোদাহৃতং—এই কথা বলিয়া সাংখ্য-ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুর উদ্ধৃত "অক্ষপাদপ্রণীতে চ"—ইত্যাদি বচনদ্বয় উদ্ধৃত করিয়া নিজ মত সমর্থন করিলেও বিজ্ঞানভিক্ষুর উদ্ধৃত "মায়াবাদ-মসচ্ছাস্ত্রং"—ইত্যাদিবচনের কোন বিচার বা উল্লেখ করেন নাই কেন?

যদি বল, বিজ্ঞানভিক্ষুর উদ্ধৃত অদ্বৈতবাদের নিন্দা-বোধক ঐ সমস্ত বচন অসঙ্গত ও বিরুদ্ধার্থ বলিয়া উহা প্রমাণ হইতেই পারে না। পরবর্ত্তী কালে ঐ সমস্ত বচন রচিত হইয়া পদ্মপুরাণে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। আমিও বলি, তথাস্তু। কিন্তু তাহা হইলে সদানন্দ যতি, বিজ্ঞানভিক্ষুর উদ্ধৃত উক্ত বচনকেও কিরূপে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিবেন? উক্ত বচনে কথিত হইয়াছে যে,—ন্যায়বৈশেষিক এবং সাংখ্য ও যোগদর্শনে শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশ আছে। জৈমিনির পূর্ব্বমীমাংসাদর্শন এবং ব্যাসের বেদান্তদর্শনে শ্রুতিবিরুদ্ধ কোন অংশ নাই। কারণ, তাঁহারা উভয়েই শ্রুতির পারগামী। কিন্তু অদ্বৈতবাদী শঙ্করের মতেও কি, জৈমিনির পূর্ব্ব-মীমাংসাদর্শনে শ্রুতিবিরুদ্ধ কোন অংশ নাই? বেদান্তদর্শনের "দেবতাধিকরণে"র ভাষ্যে শঙ্কর দেবতাদিগেরও বিগ্রহ বা দেহ আছে এবং তাঁহাদিগেরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে জৈমিনির যে বিরুদ্ধ মতের খণ্ডন করিয়াছেন; তাহা কি, তাঁহার মতে শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে? তাহা হইলে শঙ্কর-মতাবলম্বী অদ্বৈতবাদী—সদানন্দ যতিও ত বিজ্ঞানভিক্ষুর উদ্ধৃত উক্ত বচনের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে পারেন না। কারণ, উক্ত বচনে স্পষ্ট কথিত হইয়াছে—"জৈমিনীয়ে চ বৈয়াসে বিরুদ্ধাংশো ন কশ্চন।"

পরন্তু কেহ সমন্বয়ের ব্যর্থ বাসনায় ন্যায়াদি-দর্শনের মতকেও বেদান্ত-মতের অবিরুদ্ধ বলিলে তিনি ত উক্ত বচনের প্রামাণ্য স্বীকার করিতেই পারেন না। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে অদ্বৈতমতনিষ্ঠ কোন মহামনীষীও

বিজ্ঞানভিক্ষুর উদ্ধৃত উক্ত বচনকে শিরোধার্য্য করিয়া "অপরাপর দর্শনের মত পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিঃশঙ্কচিত্তে আমরা বেদান্তদর্শনের মতের অনুসরণ করিতে পারি"—ইত্যাদি কথাও লিখিয়া গিয়াছেন। * কিন্তু উক্ত বচনানুসারে জৈমিনির দর্শনেও শ্রুতিবিরুদ্ধ কোন অংশ না থাকিলে তাহাও পরিত্যাজ্য হইবে কেন? আর বেদান্তদর্শনের যে প্রকৃত মত কি, সে বিষয়েও ত অনেক প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন মত আছে। সুতরাং নিঃশঙ্কচিত্তে বেদান্তদর্শনের কোন্ মতের অনুসরণ কর্ত্তব্য, ইহাও ত আমরা নিঃশঙ্কচিত্তে বলিতে পারি না। অতএব বিজ্ঞানভিক্ষুর উদ্ধৃত উক্ত বচনকে আশ্রয় করিলেই বা সকল বিবাদ-নিবৃত্তির আশা কোথায়?

অবশ্য মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বে কথিত হইয়াছে—

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাস্তান্ন তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্" ॥ ৫।১২

অন্যত্র উক্ত বচনের পরার্দ্ধে "নাপ্রতিষ্ঠিততর্কেণ গম্ভীরার্থস্য নিশ্চয়ঃ"—এইরূপ পাঠ আছে, ইহা উক্ত শ্লোকের টীকায় নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন। বস্তুতঃ অপ্রতিষ্ঠিত তর্কের দ্বারা গম্ভীর তত্ত্ব অর্থাৎ অতি দুর্জ্ঞেয় অচিন্ত্য

---

* অদ্বৈতমত-নিষ্ঠ মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় ন্যায়াদি দর্শনের মতকে বেদান্তমতের অবিরুদ্ধ বলিয়াও বিজ্ঞানভিক্ষুর উদ্ধৃত পরাশরোপপুরাণের "অক্ষপাদপ্রণীতে চ ইত্যাদি বচনদ্বয় উদ্ধৃত করিয়া এবং তদনুসারে জৈমিনির দর্শনে বেদবিরুদ্ধ কোন অংশ নাই, ইহা বলিয়া লিখিয়াছেন—

"পরাশর বলিতেছেন—অন্যান্য দর্শনে কোন কোন অংশ শ্রুতিবিরুদ্ধ আছে। এ অবস্থায় মহাজনদিগের উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া অপরাপর দর্শনের মত পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিঃশঙ্কচিত্তে আমরা বেদান্তদর্শনের মতের অনুসরণ করিতে পারি। তাহাতে কিছুমাত্র অনিষ্টাপাতের আশঙ্কা নাই। বরং বেদান্তদর্শনের মতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া অন্যান্য দর্শনের মতের অনুসরণ করিলে অনিষ্টাপাতের আশঙ্কা আছে, ইহা সাহস সহকারে বলিতে পারা যায়।" "ফেলোসিপের লেক্‌চর' পঞ্চম বর্ষ ৭১ ও ১৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অলৌকিক তত্ত্বের নির্ণয় হইতে পারে না। "তর্ক" শব্দের অর্থ এখানে অনুমান। শ্রুতিনিরপেক্ষ নিজবুদ্ধিমাত্র-কল্পিত তর্ক এবং শ্রুতি-বিরুদ্ধ তর্কই অপ্রতিষ্ঠিত তর্ক। উহাকেই বলে কুতর্ক। বেদান্তদর্শনের "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ,—ইত্যাদি সূত্রেও ঐরূপ তর্কেরই অপ্রতিষ্ঠা বলা হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্করও তর্কমাত্রকেই অপ্রতিষ্ঠ বলেন নাই। কারণ তাহা বলাই যায় না। পরন্তু বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় সূত্র-ভাষ্যে শঙ্করও বলিয়াছেন—"শ্রুত্যৈব চ সহায়ত্বেন তর্কস্যাভ্যুপেয়ত্বাৎ।" পূর্ব্বে (২৬শপৃঃ) তাঁহার সেই সমস্ত কথা বলিয়াছি। ফল কথা, অলৌকিক বা অচিন্ত্য পদার্থে শ্রুত্যনুসারী অনুমানরূপ তর্কই গ্রাহ্য। ঐ তাৎপর্য্যেই কূর্ম্ম পুরাণে কথিত হইয়াছে—"শ্রুতিসাহায্য-রহিতমনুমানং ন কুত্রচিৎ।"

কিন্তু মহর্ষি কণাদ ও গৌতম যে শ্রুতি জানিতেন না, অথবা জানিয়াও তাহার কোন অপেক্ষা না করিয়া কেবল তর্কের দ্বারাই ঐ সমস্ত মতের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, অথবা তাঁহারা শাস্ত্র অপেক্ষাও অনুমান প্রমাণরূপ তর্ককে প্রবল বলিয়াছেন, ইহা ত আমরা বলিতে পারি না। কারণ, তাঁহারাও শাস্ত্র-বিরুদ্ধ অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করেন নাই। তাই মহর্ষি গৌতমও কোন বিষয়ে নিজ মত-সমর্থন করিতে সূত্র বলিয়াছেন—**শ্রুতি-প্রামাণ্যাচ্চ** (৩।১।৩১)। মহর্ষি কণাদও আত্মার নানাত্ব সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে শেষ সূত্র বলিয়াছেন—**শাস্ত্র-সামর্থ্যাচ্চ** (৩।২।২১)। কণাদ আরও অনেকস্থলে কোন কোন বিষয়ে বেদকেই প্রমাণ বলিয়া সে বিষয়ে স্বতন্ত্র অনুমান প্রমাণ নাই—ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। সুতরাং কণাদ ও গৌতমের মত যে, তাঁহাদিগের নিজ-বুদ্ধি কল্পিত—ইহা বলা যায় না।

বস্তুতঃ সমস্ত আর্ষমতেরই মূল বেদ। কিন্তু বেদের বহু অংশ বিলুপ্ত এবং সুপ্রাচীন বহু শ্লোক এবং বহু সূত্রও বিলুপ্ত হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (২।৪) দেখা যায়…শ্লোকাঃ সূত্রাণি অনুব্যাখ্যা-

নানি ব্যাখ্যানানি অস্যৈব এতানি সর্ব্বাণি নিঃশ্বসিতানি।” সুতরাং ন্যায়-দর্শনের মূলভূত অনেক শ্লোক বা সূত্রও যে, সুপ্রাচীন কালে বিদ্যমান ছিল—ইহাও আমরা বুঝিতে পারি। বস্তুতঃ ন্যায়শাস্ত্র বেদের উপাঙ্গ—ইহা পুরাণেই কথিত হইয়াছে। মহর্ষি গৌতম পরে ন্যায়সূত্রের রচনা করিলেও তিনি নিজ বুদ্ধি দ্বারা কোন পৃথক্ ন্যায় শাস্ত্রের স্রষ্টা নহেন। অক্ষপাদ ঋষির সম্বন্ধে যে, ন্যায়শাস্ত্র প্রতিভাত হইয়াছিল, ইহা ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও সর্ব্বশেষে বলিয়া গিয়াছেন। আর অদ্বৈতবাদী যে সদানন্দ যতি, “অক্ষপাদ-প্রণীতে চ”-ইত্যাদি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তিনিও ত পরে বলিয়াছেন যে, গৌতমাদি মুনিগণ ন্যায়াদি শাস্ত্রের স্মর্ত্তা, কিন্তু বুদ্ধি পূর্ব্বক কর্ত্তা নহেন।*

পরন্তু প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে বেদের নানা “অর্থবাদ” বাক্যকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার নানারূপ ব্যাখ্যার দ্বারাও অদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ নানা মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সেই সমস্ত মত ও তাহার প্রতিপাদক সাংখ্যাদি দর্শন প্রাচীনকালে “প্রবাদ” নামেও কথিত হইয়াছে। ‘বাক্যপদীয়’ গ্রন্থে মহামনীষী ভর্ত্তৃহরিও ঐরূপ বলিয়াছেন।‡ যোগ দর্শনভাষ্যে (৪।২১) ব্যাসদেবও বলিয়াছেন—“সাংখ্যযোগাদয়স্তু প্রবাদাঃ”।† সুতরাং বেদার্থের ব্যাখ্যাভেদেও যে, অনেক মতভেদের প্রকাশ হইয়াছে—ইহাও স্বীকার্য্য। তাহা হইলে কোন্ মত যে, শ্রুতিবিরুদ্ধ এবং কোন্‌মত শ্রুতিসম্মত—ইহাই বা আমরা

---

* গৌতমাদিমুনীনাং তত্তচ্ছাস্ত্র-স্মারকত্বমেব শ্রূয়তে, ন তু বুদ্ধিপূর্ব্বককর্তৃত্বং। তদুক্তং “ব্রহ্মাদ্যা ঋষিপর্য্যন্তাঃ স্মারকা ন তু কারকা” ইতি। “অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি” ১ম মুদ্গর।

‡ “তস্যার্থবাদরূপাণি নিশ্চিত্য স্ববিকল্পজাঃ।
একত্বিনাং দ্বৈতিনাঞ্চ প্রবাদা বহুধা মতাঃ॥” ৭।

† সাংখ্যাশ্চ যোগাশ্চ ত এবাদয়ো যেষাং বৈশেষিকাদি-প্রবাদানাং, সাংখ্যযোগাদয়ঃ প্রবাদাঃ। (বাচস্পতি মিশ্র-কৃত টীকা)।

কিরূপে বলিতে পারি? শ্রুতিপ্রামাণ্যবাদী কোন আচার্য্যই ত শ্রুতি-বিরুদ্ধ অনুমানরূপ তর্কের প্রামাণ্য স্বীকার করেন নাই।

সত্য বটে, একই সময়ে একই স্থানে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমস্ত তার্কিককে উপস্থিত করিয়া তর্ক দ্বারা সকলের ঐকমত্যে কোন সিদ্ধান্ত-নির্ণয় একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু ঐরূপ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমস্ত বেদব্যাখ্যা-সমর্থ পণ্ডিতগণকে একত্র উপস্থিত করিয়া সকলের ঐকমত্যে প্রকৃত বেদার্থ-নির্ণয় করাও ত একেবারেই অসম্ভব। তর্ক দ্বারা সিদ্ধান্ত-নির্ণয় করিতে গেলে যেমন তার্কিকের বুদ্ধিভেদমূলক তর্কের ভেদ-প্রযুক্ত নানা মতভেদ অবশ্যম্ভাবী, তদ্রূপ বেদের ব্যাখ্যা দ্বারা সিদ্ধান্ত-নির্ণয় করিতে গেলেও ত ব্যাখ্যাভেদে নানা মতভেদ অবশ্যম্ভাবী। কারণ, বিচার ব্যতীত অতি দুর্ব্বোধ বেদার্থ-নির্ণয় হইতেই পারে না। তর্ক ব্যতীতও বেদার্থ-বিচার হইতে পারে না। বেদার্থে বিবাদ হইলে সেখানে যে, তর্ক-বিশেষের দ্বারাই প্রকৃতার্থ-নির্দ্ধারণ করিতে হইবে—ইহা ত আচার্য্য শঙ্করও বলিয়াছেন এবং পরে তিনি মনু-বচনের দ্বারাও উহা সমর্থন করিয়াছেন।* সুতরাং বেদার্থ-নির্ণয়ে তর্ক যখন সকলেরই অপরিহার্য্য, তখন তর্কের ভেদে বেদার্থ-বিষয়েও মতভেদ অবশ্যই হইবে। নির্ব্বিবাদে সেই বেদার্থ-নির্ণয় না হওয়া পর্য্যন্তও কেহ কাহারও তর্ককে বেদবিরুদ্ধ বলিয়াও প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না। সুতরাং অলৌকিক

---

* শ্রুত্যর্থ-বিপ্রতিপত্তৌ চার্থাভাস-নিরাকরণেন সম্যগর্থ-নির্দ্ধারণং তর্কেণৈব বাক্য-বৃত্তিনিরূপণেন ক্রিয়তে। মনুরপি চৈবং মন্যতে—

"প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্।
ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা" ইতি
"আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদ-শাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ।" (১২।১০৫-১০৬)

ইতি চ ব্রুবন্।—শারীরক ভাষ্য ২।১।১১।

অচিন্ত্য তত্ত্ব-নির্ণয়ের জন্য শ্রুতিদেবীকে আশ্রয় করিলেও সকল বিবাদ-নিবৃত্তির আশা কোথায়?

শিষ্য। বৃহদারণ্যক উপনিষদে কথিত হইয়াছে—"অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ" (৪।৩।১৫)। এবং পূর্ব্বে কাম ও সঙ্কল্লাদির উল্লেখ করিয়া কথিত হইয়াছে—"এতৎ সর্ব্বং মন এব।" পরেও স্পষ্ট কথিত হইয়াছে—"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ"। সুতরাং ঐ সমস্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা জীবাত্মা যে, অসঙ্গ অর্থাৎ নির্গুণ নির্লেপ এবং ইচ্ছাবিশেষরূপ কাম এবং তাহার কারণ জ্ঞান ও তাহার ফল সুখ-দুঃখাদি যে, মনেরই ধর্ম্ম—ইহা ত স্পষ্টই বুঝা যায়। আর জীবাত্মা যে, পরব্রহ্ম হইতে তত্ত্বতঃ অভিন্ন—ইহা ত শ্রুতির "তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মাস্মি"—ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ মহাবাক্যের দ্বারা সুস্পষ্টই বুঝা যায়। সুতরাং কণাদ ও গোতমের পূর্ব্বোক্ত মত যে, শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে—ইহা ত আমি বুঝিতে পারি না।

গুরু। কথা অনেক। সুতরাং সঙ্ক্ষেপেই ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের কথা যথামতি তোমাকে বলিতেছি।

প্রথম কথা—"অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ"—এই শ্রুতি-বাক্যে "অসঙ্গ" শব্দের অর্থ—নিষ্ক্রিয় নির্ব্বিকার। উহার দ্বারা আত্মা যে, বস্তুতঃ নির্গুণ—ইহা প্রতিপন্ন হয় না। কেহ কেহ বলেন যে, আত্মা অসঙ্গ অর্থাৎ সংঘাতরূপ নহে। আত্মা অসংহত পুরুষ—ইহাই তাৎপর্য্য। যাহাতে নানা বস্তুর সঙ্গ বা সংশ্লেষ থাকে, তাহাই সংহত পদার্থ। কিন্তু আত্মা ঐরূপ নহে। আত্মা নানাবস্তুর সমষ্টিরূপ নহে।

অবশ্য বৃহদারণ্যক উপনিষদে কথিত হইয়াছে,—"এতৎ সর্ব্বং মন এব"।—কিন্তু সেখানে পূর্ব্বে মন, বাক্য ও প্রাণকে জীবাত্মার জ্ঞানাদির প্রধান সাধন বলিবার জন্য প্রথমে মনের সহিত জীবাত্মার বিলক্ষণ সংযোগ ব্যতীত জীবাত্মার জ্ঞানাদি জন্মে না,—ইহাই কথিত হইয়াছে।

পরে "মনসা হ্যেব পশ্যতি, মনসা শৃণোতি"—এই বাক্যের দ্বারা মনই যে, জীবাত্মার দর্শনাদি জ্ঞানের প্রধান সাধন—ইহাই কথিত হইয়াছে। পরে কামাদির উল্লেখ করিয়া কথিত হইয়াছে—"এতৎ সর্ব্বং মন এব।" * কিন্তু শেষোক্ত ঐ বাক্যের দ্বারা কামাদিকে মনই বলা হইয়াছে, মনের ধর্ম্ম বলা হয় নাই। কারণ ও কার্য্যের অভেদ-প্রকাশের দ্বারা কামাদির উৎপাদক কারণসমূহের মধ্যে মনের প্রাধান্য-খ্যাপনই ঐরূপ প্রয়োগের উদ্দেশ্য। উহাকে বলে, ঔপচারিক প্রয়োগ। যেমন অন্যত্রও শ্রুতি বলিয়াছেন—"অন্নং বৈ প্রাণিনাং প্রাণাঃ"; ইহা সর্ব্বসম্মত ঔপচারিক বাক্য। কারণ অন্নই প্রাণ নহে। ফলকথা, "এতৎ সর্ব্বং মন এব" এই বাক্যের দ্বারা কামাদি যে—মনেরই ধর্ম্ম, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। পরন্তু পূর্ব্বোক্ত "মনসা হ্যেব পশ্যতি, মনসা শৃণোতি" এই বাক্যের দ্বারা জ্ঞান যে, আত্মারই ধর্ম্ম,—ইহাই বুঝা যায়। কারণ, জীবাত্মাই মনের দ্বারা দর্শন ও শ্রবণ করিলে সেই জ্ঞান তাহাতেই জন্মে অর্থাৎ জীবাত্মাই সেই জ্ঞানের আশ্রয়—ইহাই বুঝা যায়।

পরন্তু জীবাত্মার স্বরূপবর্ণনায় প্রশ্ন উপনিষদে কথিত হইয়াছে—"এষ হি দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্ত্তা, বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ।" ৪।৯।

উক্ত শ্রুতিবাক্যে "দ্রষ্টা" ইত্যাদি পদের দ্বারা জীবাত্মাই যে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়জন্য সমস্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কর্ত্তা এবং অন্যান্য সমস্ত জ্ঞানেরও কর্ত্তা—ইহা স্পষ্ট কথিত হইয়াছে। কিন্তু জীবাত্মা ঐ সমস্ত জ্ঞানের আশ্রয় না হইলে তাহাকে উহার কর্ত্তা বলা যায় না। কারণ, জ্ঞানের আশ্রয়ত্বই জ্ঞানের কর্ত্তৃত্ব। পরে কথিত হইয়াছে—"বিজ্ঞানাত্মা"।

---

* "ত্রীণ্যাত্মনেঽকুরুতেতি মনো বাচং প্রাণং তান্যাত্মনেঽকুরুতান্যত্র মনা অভূবন্নাদর্শ-মন্যত্র মনা অভূবং নাশ্রৌষমিতি, মনসা হ্যেব পশ্যতি মনসা শৃণোতি। কামঃ সংকল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব।"—বৃহদারণ্যক ১।৫।৩।

ভাষ্যকার শঙ্কর ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"বিজানাতীতি বিজ্ঞানং কর্ত্তৃ কারকরূপং, তদাত্মা তৎস্বভাবো বিজ্ঞাতৃস্বভাব ইত্যর্থঃ"। বেদান্ত দর্শনে বাদরায়ণ বলিয়াছেন—"তদ্গুণসারত্বাৎ তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ" (২।৩।২৯)। শ্রীভাষ্যকার রামানুজ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"তদ্গুণ-সারত্বাদ্ বিজ্ঞান-গুণসারত্বাদাত্মনো বিজ্ঞানমিতি ব্যপদেশঃ। বিজ্ঞান-মেবাস্য সারভূতো গুণঃ"। রামানুজের মতে জীবাত্মা স্বপ্রকাশ অণু চৈতন্যস্বরূপ হইলেও জন্য জ্ঞান তাহার সারভূত বা প্রধান গুণ। কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতে গুণ পদার্থ দ্রব্যাশ্রিত। আত্মা,—জ্ঞানের আশ্রয় বিভু দ্রব্য পদার্থ; জ্ঞানস্বরূপ নহে। কিন্তু আত্মা বিজ্ঞাতৃস্বভাব, এজন্যই শাস্ত্রে "বিজ্ঞান" নামেও কথিত হইয়াছে।

এইরূপ জীবাত্মাই শুভাশুভ কর্ম্মের কর্ত্তা এবং তাহার ফল-ভোক্তা। তাই শাস্ত্রে জীবাত্মার সম্বন্ধেই শুভাশুভ কর্ম্মের বিধি ও নিষেধ উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রীভগবান্ও অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—"নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং"—(গীতা ৩।৮)। প্রশ্নোপনিষদের পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যেও জীবাত্মাকে কর্ত্তা বলা হইয়াছে। তদনুসারে বেদান্তদর্শনেও "কর্ত্তা, শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ" (২।৩।৩৩) ইত্যাদি কতিপয় সূত্রের দ্বারা জীবাত্মার কর্ত্তৃত্ব সমর্থিত হইয়াছে। শ্রীভাষ্যকার রামানুজ সেখানে ঐ সমস্ত সূত্রের দ্বারা আত্মার বাস্তব কর্ত্তৃত্বেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং ভগবদ্গীতার "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা আত্মার বাস্তব কর্ত্তৃত্বের অভাব শ্রীভগবানের বিবক্ষিত নহে, ইহাও বলিয়া তাঁহার নিজের ঐ ব্যাখ্যা সমর্থন করিয়াছেন।[১] পরন্তু তিনিও প্রশ্নোপনিষদের পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি বাক্যানুসারে জীবাত্মার জ্ঞানাদি গুণবত্তাও সমর্থন করিয়াছেন।

১। শ্রীভাষ্যকার রামানুজ ভগবদ্গীতার "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে" (৩।২৭)—এই শ্লোকের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, জীবাত্মার বাস্তব কর্ত্তৃত্বই নাই, সর্ব্বজীবেরই আমি কর্ত্তা, এইরূপ জ্ঞান,

অবশ্য বৃহদারণ্যক উপনিষদে কথিত হইয়াছে—"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ" (৪।৪।৭)। কিন্তু তৎপূর্ব্বে "আত্মনস্তু কামায়"—এইরূপ বাক্যও ত বহুবার কথিত হইয়াছে। সুতরাং তদ্দ্বারা ইচ্ছাবিশেষরূপ কাম ও কাম্য সুখ যে, আত্মার ধর্ম্ম—ইহাও ত সরলভাবেই বুঝা যায়। ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায় তাহাই বুঝিয়া বলিয়াছেন যে, ইচ্ছা-বিশেষরূপ কাম, সাক্ষাৎসম্বন্ধে জীবাত্মারই ধর্ম্ম এবং জ্ঞান, প্রযত্ন ও সুখ-দুঃখাদিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জীবাত্মারই ধর্ম্ম। কিন্তু মনের সহিত বিলক্ষণ সংযোগ ব্যতীত জীবাত্মাতে ঐ সমস্ত জন্মে না। সুতরাং আত্মসংযুক্ত মনেও ঐ সমস্ত আত্মধর্ম্ম পরম্পরাসম্বন্ধে থাকে। তাই সেই পরম্পরাসম্বন্ধ-তাৎপর্য্যেই শ্রুতি বলিয়াছেন—"কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ"। এবং সাক্ষাৎসম্বন্ধ তাৎপর্য্যেই শ্রুতি বলিয়াছেন—"আত্মনস্তু কামায়"। এইরূপ সাক্ষাৎসম্বন্ধ তাৎপর্য্যেই লোকে আমার জ্ঞান, আমার ইচ্ছা, আমার সুখ, আমার দুঃখ, এইরূপ প্রয়োগ হইয়া

ভ্রম—ইহা উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য নহে। কিন্তু সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির সম্বন্ধ-প্রযুক্তই জীবাত্মার সাংসারিক কর্ম্মে কর্ত্তৃত্ব। নচেৎ কেবল জীবাত্মা কোন কর্ম্মের কর্ত্তা হইতে পারে না—ইহাই তাৎপর্য্য। ভগবদ্গীতায় পরে "তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ" (১৮।১৬) ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা ঐ তাৎপর্য্যই ব্যক্ত করা হইয়াছে। রামানুজ ভগবদ্গীতার অন্যান্য শ্লোকের উল্লেখ করিয়াও তাঁহার ব্যাখ্যাত তাৎপর্য্যের সমর্থন করিয়াছেন। ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণও ভগবদ্গীতার উক্ত শ্লোকের উক্তরূপ তাৎপর্য্যই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের মতে উক্ত শ্লোকে "প্রকৃতি" শব্দের অর্থ জীবের অদৃষ্ট। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—ইহা জীবের অদৃষ্টবিশেষেরই নাম। সেই অদৃষ্ট জন্য জীবের জ্ঞান ও ইচ্ছা-বিশেষরূপ গুণ উৎপন্ন হওয়ায় জীব নানা কর্ম্ম করে। ঐ তাৎপর্য্যেই শ্রুতি বলিয়াছেন—"গুণান্বয়ো যঃ ফলকর্ম্মকর্ত্তা কৃতস্য তস্যৈব স চোপভোক্তা" (শ্বেতাশ্বতর ৫।৭)। ফলকথা, আমি কর্ত্তা, এইরূপ জ্ঞান জীবের ভ্রম নহে। কিন্তু আমিই কর্ত্তা, আমার কর্ত্তৃত্ব স্বাধীন—এইরূপ জ্ঞানই ভ্রম। তাই ঐ তাৎপর্য্যেই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।"

থাকে এবং পরম্পরাসম্বন্ধ তাৎপর্য্যে—আমার মনের জ্ঞান, মনের ইচ্ছা, মনের সুখ, মনের দুঃখ,—এইরূপও প্রয়োগ হইয়া থাকে। আত্মাতে উৎপন্ন সুখ, সাক্ষাৎসম্বন্ধে মনে না থাকিলেও মনে উহার পরম্পরাসম্বন্ধ-বিশেষ গ্রহণ করিয়াই নৈয়ায়িক গ্রন্থকার বিশ্বনাথ পঞ্চাননও "সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী"র প্রারম্ভে প্রয়োগ করিয়াছেন—"মনসো মুদং বিতনুতাং"।

মূল কথা, জীবাত্মা যে নির্গুণ, জ্ঞানাদি যে, তাহার বাস্তব গুণ নহে—ইহা কণাদ ও গৌতম স্বীকার করেন নাই। আমি জানিতেছি, আমি ইচ্ছা করিতেছি, আমি সুখী, আমি দুঃখী, ইত্যাদি প্রকার সার্ব্বজনীন বোধকে তাঁহারা ভ্রম বলেন নাই। মীমাংসক প্রভৃতি আরও অনেক সম্প্রদায় জ্ঞানাদিকে আত্মারই বাস্তব গুণ বলিয়াছেন। আর আত্মাতে বস্তুতঃ কোন গুণ পদার্থ না থাকিলে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে "বুদ্ধের্গুণেনাত্মগুণেন চৈব," ইত্যাদি (৫।৮) অনেক শ্রুতি-বাক্যের কিরূপে উপপত্তি হইবে—ইহাও তুমি চিন্তা করিবে।

আর যে তুমি "তত্ত্বমসি" এবং "অহং ব্রহ্মাস্মি"—ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যের উল্লেখ করিয়াছ, তৎসম্বন্ধে ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের কথা এই যে, ঐ সমস্ত বাক্যের দ্বারা জীব ও পরব্রহ্মের অভেদই তত্ত্ব—ইহা উপদিষ্ট হয় নাই। কিন্তু "সোঽহং" অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম এইরূপ ধ্যানের কর্ত্তব্যতাই উপদিষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ উক্তরূপে আত্মোপাসনা-বিধানেই ঐ সমস্ত বাক্যের তাৎপর্য্য। প্রাচীন মীমাংসক সম্প্রদায় নিজ মতানুসারে উপনিষদের সমস্ত অর্থবাদ বাক্যেরই উপাসনা ক্রিয়াবিশেষেই তাৎপর্য্য বলিয়াছেন। কিন্তু ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায় তাহা স্বীকার করেন নাই।

শিষ্য। ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে আরুণি ও তৎপুত্র শ্বেতকেতুর সংবাদে কোনরূপ উপাসনার কথা নাই। কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্ব-প্রভৃতিরই উপদেশ হইয়াছে। উক্ত অধ্যায়ে দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথমে কথিত হইয়াছে,—"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং।" পরে কথিত

হইয়াছে,—"তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইত্যাদি। পরে তৃতীয় খণ্ডে কথিত হইয়াছে—"সেয়ং দেবতৈক্ষত, হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি।" পরে অষ্টম খণ্ড হইতে ষোড়শ খণ্ড পর্য্যন্ত উপসংহারে কথিত হইয়াছে,—"স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।" ঐরূপ উপক্রম ও উপসংহারের দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এই জগৎ ব্রহ্মাত্মক অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে জগতের বাস্তব পৃথক্ সত্তা নাই। জীবও বস্তুতঃ ব্রহ্মই। আরুণি তাঁহার পুত্র শ্বেতকেতুকে তত্ত্বোপদেশই করিয়াছেন যে—এই সমস্তই সেই ব্রহ্মাত্মক, সেই ব্রহ্ম সত্য, তিনি আত্মা, হে শ্বেতকেতো! ত্বং তৎ (ব্রহ্ম) অসি, অর্থাৎ তুমি সেই ব্রহ্ম আছ। সুতরাং উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা জীব যে, সেই পরব্রহ্ম হইতে তত্ত্বতঃই অভিন্ন—ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। নচেৎ উক্ত (তত্ত্বমসি) বাক্যে "অসি" এই ক্রিয়া পদের প্রয়োগও ব্যর্থ হয়। শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা সরলভাবে যে অর্থ বুঝা যায়, তাহাই কি প্রকৃতার্থ বলিয়া গ্রাহ্য নহে?

গুরু। জীবাত্মা যে, পরমাত্মা হইতে ভিন্ন,—ইহাও ত বহু শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা সরলভাবেই বুঝা যায়। পরে তাহা বলিব। এখন বল দেখি, শাস্ত্রবাক্য আছে—"সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা"। কিন্তু উক্ত বাক্য দ্বারা ঘণ্টা যে, সমস্ত বাদ্য হইতে অভিন্ন—ইহাই কি তুমি বুঝিবে? এবং শাস্ত্রবাক্য আছে—"শালগ্রামঃ স্বয়ং হরিঃ।" কিন্তু শালগ্রাম শিলা—যাহা হরি পূজার প্রতীক, তাহা কি বস্তুতঃই স্বয়ং হরি? উক্ত বাক্যের দ্বারা সরল ভাবে তাহাই ত বুঝা যায়। আবার বৃষোৎসর্গ কার্য্যে সেই বৃষকে প্রদক্ষিণ করিয়া যজমান যে মন্ত্র পাঠ করিবেন, তাহার প্রথমে আছে—"ধর্ম্মোঽসি ত্বং চতুষ্পাদঃ"। *

* "ধর্ম্মোঽসি ত্বং চতুষ্পাদশ্চতস্রস্তে প্রিয়াস্ত্বিমাঃ। চতুর্ণাং পোষণার্থায় ময়োৎসৃষ্টা ত্বয়া সহ" ইত্যাদি মৎস্যপুরাণোক্ত মন্ত্র, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কৃত—"ছন্দোগ বৃষোৎসর্গতত্ত্ব" দ্রষ্টব্য।

উক্ত বাক্যে "অসি", এই ক্রিয়াপদেরও প্রয়োগ আছে। কিন্তু তাই বলিয়া তুমি কি বুঝিবে, সেই বৃষ বস্তুতঃই চতুষ্পাদ ধর্ম্ম? বস্তুতঃ সেই বৃষ চতুষ্পাদ ধর্ম্ম নহে। কিন্তু বৃষোৎসর্গ-কর্ত্তা সেই যজমান, তখন সেই বৃষকে চতুষ্পাদ ধর্ম্মরূপে ভাবনা করিবেন,—ইহাই উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। এইরূপ যিনি শালগ্রাম শিলায় হরিপূজা করিবেন, তিনি তখন সেই শালগ্রাম শিলাকে স্বয়ং হরি বলিয়া ভাবনা করিবেন, ইহাই "শালগ্রামঃ স্বয়ং হরিঃ",—এই শাস্ত্র বাক্যের তাৎপর্য্য। এইরূপ যিনি পূজক, তিনি ঘণ্টাকে সমস্ত বাদ্যরূপে ভাবনা করিবেন এবং অন্য বাদ্য না থাকিলেও কেবল ঘণ্টা-বাদ্যদ্বারাও তাঁহার পূজা সিদ্ধ হইবে, ইহাই "সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা"—এই শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য্য। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্য্যেই শাস্ত্রে ঐ সমস্ত বাক্য কথিত হইয়াছে। শাস্ত্রে বিধিবাক্য কথিত না হইলে অনেকস্থলে অর্থবাদ বাক্যের দ্বারাই বিধিবাক্য বুঝিতে হয়।

এইরূপ "সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা" এই অর্থবাদবাক্যের ন্যায় "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম," "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং," "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং," "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ"—ইত্যাদি অর্থবাদ বাক্যের দ্বারাও ঐরূপে ভাবনারূপ উপাসনার বিধিও বুঝিতে পারি। এবং "শালগ্রামঃ স্বয়ং হরিঃ", "ধর্ম্মোঽসি ত্বং চতুষ্পাদঃ"—ইত্যাদি অর্থবাদবাক্যের ন্যায় "তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মাস্মি," "সোঽহং"—ইত্যাদি অর্থবাদবাক্যের দ্বারা ঐরূপে ভাবনারূপ উপাসনার বিধিও বুঝিতে পারি। অর্থাৎ মুমুক্ষু সাধক সমগ্র জগৎকে এবং নিজেকে ব্রহ্ম বলিয়া ভাবনা করিবেন। তিনি বস্তুতঃ ব্রহ্ম না হইলেও "সোঽহং"—অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম, এইরূপ ভাবনা করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিবেন। পরন্তু মৈত্রী উপনিষদে "সোঽহংভাবেন পূজয়েৎ" (২।১) এইরূপ বিধিবাক্যই কথিত হইয়াছে। আর তোমার কথিত ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রথমেও কিন্তু "উপাসীত" এই ক্রিয়াপদের

প্রয়োগ হইয়াছে। পরে তৃতীয় অধ্যায়ে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত"—এই বাক্যে "উপাসীত" এই ক্রিয়াপদের দ্বারা উক্তরূপে উপাসনার বিধানই হইয়াছে। নচেৎ উক্ত শ্রুতিবাক্যে "উপাসীত" এই ক্রিয়াপদের প্রয়োগ ব্যর্থ হয়।

পরন্তু ছান্দোগ্য উপনিষদে পরে "মনো ব্রহ্মে-ত্যুপাসীত (৩।১৮) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা বিশেষরূপে মনঃ প্রভৃতি অনেক পদার্থে যে, ব্রহ্ম ভাবনারূপ উপাসনা বিহিত হইয়াছে—ইহা ত আচার্য্য শঙ্করও স্বীকার করিয়াছেন এবং তিনিও উহাকে ব্রহ্মদৃষ্টির অধ্যাস বলিয়াছেন। যাহা বস্তুতঃ ব্রহ্ম নহে, তাহাতে ব্রহ্মবুদ্ধিই ব্রহ্মদৃষ্টির অধ্যাস। বেদান্ত-দর্শনেও "ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ" (৪।১।৫) এই সূত্রের দ্বারা উক্তরূপ ব্রহ্মদৃষ্টি সমর্থিত হইয়াছে। ভাষ্যকার আচার্য্য শঙ্করও সেখানে উপনিষদের অনেক শ্রুতিবাক্যের দ্বারা উহা সমর্থন করিয়াছেন এবং তিনি সেখানে বিষ্ণুপ্রতিমায় বিষ্ণুবুদ্ধিকে উহার দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। নির্গুণ ব্রহ্মবাদী আচার্য্য শঙ্করও শাস্ত্রানুসারে শালগ্রাম শিলায় হরিপূজার কর্ত্তব্যতা সমর্থন করায় অন্য প্রসঙ্গে পূর্ব্বেও বলিয়াছেন—"যথা শালগ্রামে হরিঃ।"—শারীরক ভাষ্য (১।২।৭)।

ফলকথা, ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতে সমস্ত জীব, ব্রহ্ম হইতে তত্ত্বতঃ ভিন্ন পদার্থ হইলেও তাহাতে ব্রহ্মদৃষ্টি কর্ত্তব্য। সর্ব্বজীবে ব্রহ্ম ভাবনাও সাধকের প্রধান উপাসনা। সমস্ত জীবকে এক ব্রহ্ম বলিয়া ভাবনা করিলে সমস্ত জীবে অভেদ বুদ্ধি জন্মে। উহা ভ্রমবুদ্ধি হইলেও উহার ফলে সাধকের আত্ম-পর ভেদবুদ্ধিমূলক রাগদ্বেষাদি দোষের ক্ষয় হওয়ায় চিত্তশুদ্ধি হয়। তাই শাস্ত্রে সর্ব্বজীবে ব্রহ্ম ভাবনারূপ উপাসনার উপদেশ হইয়াছে। পরন্তু ছান্দোগ্য উপনিষদে "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং" এই শ্রুতিবাক্য দ্বারা সমগ্র জগৎ ও জীবে পরব্রহ্মের বাস্তব ভেদ নাই—

ইহা বিবক্ষিত নহে, কিন্তু তদীয়ত্বই বিবক্ষিত। অর্থাৎ সমগ্র জগৎ ও জীব সেই পরব্রহ্মের অধীন, তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত—ইহাই তাৎপর্য্য।

সত্য বটে, ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত স্থলে কথিত হইয়াছে,—"অনেন জীবেনাত্মনানু প্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি"। কিন্তু উহার দ্বারা সেই পরব্রহ্মই যে, সমস্ত জীবদেহে জীবরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন—ইহা কিরূপে বুঝিব? তিনি নিত্য মুক্ত হইয়াও পুনঃ পুনঃ সংসার-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া পুণ্য-পাপের ফল ভোগ করিতেছেন—ইহা কিরূপে উপপন্ন হইবে? তাঁহার ঐ জীবভাব অনির্ব্বচনীয় অবিদ্যা-কল্পিত মিথ্যা; সুতরাং তাঁহার বন্ধন ও সুখ-দুঃখভোগাদি সমস্তই মিথ্যা—ইহা বলিলে সেই অবিদ্যা কোথায় থাকে—ইহা বক্তব্য। নিত্য সর্ব্বজ্ঞ সেই পরব্রহ্মে অবিদ্যা থাকিতে পারে না। তিনি অবিদ্যার বশবর্ত্তী নহেন—ইহা সর্ব্বসম্মত। সেই অবিদ্যা জীবে থাকে, ইহাও উক্ত মতে বলা যায় না। কারণ, উক্তমতে সেই অবিদ্যাই পরব্রহ্মের জীবভাবের কল্পক। কিন্তু প্রলয়কালে সেই জীবভাবের অভাবে জীব না থাকায় তখন ঐ অবিদ্যা কোথায় থাকিবে? পরব্রহ্মের জীবভাব যেমন ঐ অবিদ্যাকে অপেক্ষা করে; তদ্রূপ, ঐ অবিদ্যাও নিজের আশ্রয় লাভের জন্য জীবভাবকে অপেক্ষা করায় "অন্যোন্যাশ্রয়" দোষ অনিবার্য্য। এ বিষয়ে অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের কথার উত্তরে ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়েরও বহু কথা আছে। সংক্ষেপে তাহার কিছুই বলা যায় না। পূর্ব্বোক্তরূপ অবিদ্যার খণ্ডনে রামানুজের **শ্রীভাষ্যে** (২।১।১৫) এবং মাধ্ব সম্প্রদায়ের **ন্যায়ামৃত** প্রভৃতি গ্রন্থে পাণ্ডিত্য পূর্ণ বিচার বুঝিলে ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের অনেক কথাও জানিতে পারিবে।

বস্তুতঃ উক্ত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে "অনেন জীবেনাত্মনা" এই স্থলে তৃতীয়া বিভক্তির অর্থ কি এবং বিশ্বব্যাপী

পরব্রহ্মের জীবদেহে অনু প্রবেশ কি—ইহাই প্রথমে বুঝা আবশ্যক। অনেকে বিচার পূর্ব্বক উক্ত স্থলে সহার্থে তৃতীয়া বিভক্তিরই সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে, উহার দ্বারা জীবদেহে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অনুপ্রবেশের সমকালীনত্ব ব্যক্ত করা হইয়াছে। জীবদেহের সহিত বিলক্ষণ সংযোগই জীবদেহে অনু প্রবেশ। অর্থাৎ প্রথমে জীবদেহের সৃষ্টি হইলেই তখন যে জীবাত্মার নিজ কর্ম্মানুসারে যে দেহে বিলক্ষণ সংযোগরূপ অনু প্রবেশ হয়, সেই কালেই সর্ব্বদর্শী পরব্রহ্ম তাঁহার প্রত্যক্ষ সেই জীবাত্মার সহিত সেই দেহে অন্তর্য্যামিরূপে অনু প্রবিষ্ট হন—ইহাই তাৎপর্য্য। অনেকের মতে উক্ত শ্রুতিবাক্যে "জীব" শব্দের অর্থ জীবান্তর্য্যামী ঈশ্বর। 'আত্মন্' শব্দের অর্থ স্বরূপ। "জীবেনাত্মনা" জীবান্তর্য্যামি-স্বরূপেণ। প্রথমে "অনেন" এই একবচনান্ত পদের দ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, যিনি সমস্ত জীবের এক অন্তর্য্যামী, তিনিই ব্যষ্টি জীবের অর্থাৎ প্রত্যেক জীবেরও অন্তর্য্যামী। উক্ত শ্রুতিবাক্যের আরও অনেকরূপ ব্যাখ্যা হইয়াছে।

ফল কথা, এই মতে পরমেশ্বর সমস্ত জীবদেহের হৃদয়দেশে অন্তর্য্যামি-রূপেই অনুপ্রবিষ্ট হন।* তাঁহার সেই অন্তর্য্যমনই তাঁহার অনুপ্রবেশ। এবং নিত্যসিদ্ধ সর্ব্বব্যাপী জীবাত্মার সেই হৃদয়দেশরূপ উপাধির সহিত বিলক্ষণ সংযোগই তাহার হৃদয়রূপ গুহায় প্রবেশ। তাই ঐ তাৎপর্য্যেই

* শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে কথিত হইয়াছে—"ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি" (২৯।৩৪)। সেখানে টীকাকার শ্রীধর স্বামীও ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"জীবানাং কলয়া পরিকলনেন অন্তর্য্যামিতয়া প্রবিষ্ট ইতি দৃষ্ট্বা, ইত্যর্থঃ"। পরে দশম স্কন্ধে কথিত হইয়াছে—"কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাং" (১৪।৫৫)। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত আত্মার আত্মা, ইহা বলিলে তিনিই যে, সমস্ত জীবাত্মা নহেন, কিন্তু তিনি সমস্ত জীবাত্মার এক অন্তর্য্যামী আত্মা, ইহা বুঝা যায়। তাই শ্রীধরস্বামীও তৃতীয় স্কন্ধে উক্ত স্থলে পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অবশ্য অন্যত্র অন্যরূপ ব্যাখ্যাও আছে।

উভয় আত্মার সম্বন্ধেই শ্রুতি বলিয়াছেন—"গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে" (কঠ ৩।১)। তন্মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে প্রবিষ্ট যে পরমাত্মা, তিনি সমস্ত জীবাত্মার আত্মা। সমস্ত জীবাত্মা তাঁহার শরীরসদৃশ। এক তিনিই তাহাতে আত্মত্বরূপে অধিষ্ঠিত। তাই শ্রুতি তাঁহাকে 'আত্মস্থ" আত্মা ও "সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" বলিয়াছেন। এইরূপ বৃহদারণ্যক উপনিষদের অন্তর্য্যামি-ব্রাহ্মণের প্রয়োজন ও তাৎপর্য্য বুঝিয়া তদনুসারেই অন্যান্য শ্রুতি বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে।

পরন্তু ছান্দোগ্য উপনিষদের "বহু স্যাং প্রজায়েয়"—এই শ্রুতি বাক্যের দ্বারাও পরমেশ্বর যে, অসংখ্য জীবরূপেও বহু হইয়াছেন,—ইহা প্রতিপন্ন হয় না। ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতে পরমেশ্বর প্রথমে পতি-পত্নীরূপে এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রাদিরূপে বহু হইতে ইচ্ছা করিয়া সেই সমস্ত প্রকৃষ্ট-দেহাদি ধারণ করেন। উক্ত শ্রুতিবাক্যে "প্রজায়েয়" এই পদে প্রকৃষ্ট-বোধক প্রশব্দের দ্বারা ইহাই ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু তিনি ব্রহ্মাদিরূপে বহু হইলেও বস্তুতঃ তিনি একই। অদ্বিতীয় একই তিনি সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের জন্য তাঁহার ইচ্ছাশক্তিরূপ মায়াবশতঃ বহুরূপে বহু হইয়াছেন। তাঁহার সেই সমস্ত উপাধিমূলক ভেদ যাহা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বাস্তব ভেদ নহে। উপনিষদেও নানাস্থানে নানারূপে তাঁহার নানা উপাধিমূলক ভেদ বর্ণন করিয়া আবার সেই সমস্ত ভেদের অবাস্তবত্ব প্রকাশ করিতেই নানারূপে পুনঃ পুনঃ সেই পরমেশ্বরের একত্ব ঘোষিত হইয়াছে। তিনি ভিন্ন আর কিছুরই বাস্তব সত্তা নাই,—ইহা সেই সমস্ত শ্রুতি বাক্যের তাৎপর্য্য নহে। আর সেই পরমেশ্বরই সমস্ত জীব ও জগতের সর্ব্বত্র অন্তর্য্যামিরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ঐ সমস্ত পদার্থেরই একমাত্র নিয়ন্তা হওয়ায় ঐ তাৎপর্য্যে তিনি জীব ও জগৎ হইয়াছেন, এইরূপ কথাও উক্ত হইয়াছে। যেমন কোন মহাশক্তি পুরুষ কোন রাজার গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার একমাত্র নিয়ন্তা হইলে লোকে তখন

তাঁহাকে বলে, তিনিই সর্ব্বময় কর্ত্তা, তিনিই রাজা হইয়াছেন"। ঐরূপ বাক্যকে বলে, ঔপচারিক বাক্য। উপনিষদে অনেক স্থলে অনেক ঔপচারিক বাক্য এবং অনেক রূপকেরও প্রয়োগ হইয়াছে। সুতরাং বিচার করিয়াই তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে।

শিষ্য। লক্ষণা স্বীকার করিয়া ও কষ্ট কল্পনা করিয়া উপনিষদের ঐ সমস্ত বাক্যের অন্যরূপ তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যার কারণ কি? জীব ও পরব্রহ্মের বাস্তব ভেদ প্রমাণ-সিদ্ধ হইলে অবশ্য বাধ্য হইয়া ঐ সমস্ত মহাবাক্যের অন্যরূপও তাৎপর্য্য কল্পনা করিতে হয়। কিন্তু জীব ও পরব্রহ্মের ভেদই যে সত্য, এ বিষয়ে উপনিষদে কি প্রমাণ আছে? পরব্রহ্ম হইতে জীবের ঔপাধিক কল্পিত ভেদ ত অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ও স্বীকার করেন। সেই কল্পিত ভেদবশতঃই সংসার কালে জীবের সমস্ত ব্যবহার চলিতেছে এবং সেই কল্পিতভেদানুসারেই শাস্ত্রে বিধি ও নিষেধের উপদেশ হইয়াছে। তাই অনেক স্থলে সেই কল্পিত ভেদই কথিত হইয়াছে।

গুরু। তাহা হইলে অদ্বৈতবাদী অনেক আচার্য্যও "তত্ত্বমসি"—এই মহাবাক্যে 'তৎ'-পদবাচ্য ও 'ত্বং'-পদ-বাচ্য অর্থের ভেদ স্বীকার করিয়া মুখ্যার্থের বাধবশতঃ তৎ-পদ ও ত্বং-পদের লক্ষণা স্বীকার করিয়াছেন কেন? "আদিত্যো যূপঃ", "আয়ুর্ঘৃতং" ইত্যাদি বহু বেদবাক্যেও ত লাক্ষণিক পদের প্রয়োগ হইয়াছে। আর উপনিষদের ব্যাখ্যায় আচার্য্য শঙ্করও কি, কুত্রাপি কষ্ট কল্পনা করিতে বাধ্য হন নাই? কঠোপনিষদের তৃতীয় বল্লীর প্রথমে আছে,—"ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে।" কিন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই সুকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করেন,—ইহা সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ। তাই শঙ্কর সেখানে তাঁহার ভাষ্যে বলিয়াছেন,—"একস্তত্র কর্ম্মফলং ভুঙ্‌ক্তে, নেতরঃ, তথাপি পাতৃসম্বন্ধাৎ 'পিবন্তৌ' ইত্যুচ্যেতে ছত্রিন্যায়েন।" আরও দেখা আবশ্যক, আচার্য্য

শঙ্করও ছান্দোগ্যে উক্ত সমাধানে সন্তুষ্ট না হওয়ায় শারীরক-ভাষ্যে (১।২।১১) পরে আবার বলিয়াছেন,—"যদ্বা জীবস্তাবৎ পিবতি, ঈশ্বরস্তু পায়য়তি, পায়য়ন্নপি পিবতীত্যুচ্যতে।" অর্থাৎ "পিবন্তৌ" এই পদের দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, জীব কর্ম্মফল ভোগ করে, কিন্তু ঈশ্বর জীবকে কর্ম্মফল ভোগ করান। পরে শঙ্করের ঐরূপ কল্পনাও কি বাধ্যতামূলক কষ্ট-কল্পনা নহে ?

পরন্তু মুণ্ডক উপনিষদে কথিত হইয়াছে,—"স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্মৈব ভবতি, নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি।" (৩।২।৯)। উক্ত বাক্যের দ্বারা সরলভাবে বুঝা যায় যে, যিনি সেই ব্রহ্মকে জানেন, তিনি "ব্রহ্মৈব ভবতি" অর্থাৎ ব্রহ্মই হন। "অস্য কুলে অব্রহ্মবিৎ ন ভবতি" অর্থাৎ ইহার বংশে অব্রহ্মজ্ঞ জন্মে না। ইহা ব্রহ্মজ্ঞানের প্রশংসাবাদ। কিন্তু অদ্বৈতমতে যিনি বস্তুতঃ ব্রহ্মই আছেন, তিনি ব্রহ্মই হন,—এই কথা কিরূপে সংগত হইবে ? তাঁহার ঐ স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মভাবকে ব্রহ্মজ্ঞানের ফল বলাই যায় না। পরন্তু মুণ্ডক উপনিষদের প্রথমে কথিত হইয়াছে—"অথ পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।" (১।১।৫)। কিন্তু সেই অক্ষর পরব্রহ্মের প্রাপ্তি কি ? ভাষ্যকার শঙ্কর সেখানে বলিয়াছেন—"অবিদ্যায়া অপায় এব হি পরপ্রাপ্তির্নার্থান্তরম্।" অর্থাৎ বন্ধনের কারণ অবিদ্যার নিবৃত্তিই পরপ্রাপ্তি বা ব্রহ্মপ্রাপ্তি,—উহা কোন পৃথক্ পদার্থ নহে। তাহা হইলে পরে "ব্রহ্মৈব ভবতি" এই বাক্যের দ্বারাও অবিদ্যার নিবৃত্তিমাত্রই বুঝিতে হইবে। অতএব শঙ্করের মতেও উক্ত বাক্যের যথাশ্রুতার্থ গ্রহণ করা যায় না।

পরন্তু উক্ত মুণ্ডক উপনিষদে পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে—"তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" (৩।১।৩)। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, ব্রহ্মের যে পরম সাম্য লাভ করেন, সেই সাম্য কি ? ভাষ্যকার শঙ্কর ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"অদ্বয়লক্ষণমেতৎ পরমং সাম্য-

মুপৈতি প্রতিপদ্যতে।", কিন্তু অদ্বয়ত্ব বা অভেদ "সাম্য" শব্দের মুখ্য অর্থ নহে। "সাম্য" শব্দের মুখ্য অর্থ—সাধর্ম্ম্য বা সাদৃশ্য। ভগবদ্‌গীতাতেও কথিত হইয়াছে—"**মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ**" (১৪।২)। সেখানেও ভাষ্যকার শঙ্কর উক্ত "সাধর্ম্ম্য" শব্দের মুখ্য অর্থ গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু মুখ্য অর্থেরই প্রাধান্যবশতঃ অন্যান্য সম্প্রদায় উক্ত "সাম্য" ও "সাধর্ম্ম্য" শব্দের মুখ্য অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন।

ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতেও ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্মের পরম সাদৃশ্য লাভ করেন,—ইহাই মুণ্ডক উপনিষদে পূর্ব্বোক্ত "পরমং সাম্যমুপৈতি" এই শ্রুতি বাক্যের অর্থ। সুতরাং পরে **ব্রহ্মৈব ভবতি,** ইহা ঔপচারিক বাক্য। উক্ত বাক্যেরও তাৎপর্য্যার্থ এই যে, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্মের অত্যন্ত সদৃশ হন।* অর্থাৎ যেমন রাজার বহু সাদৃশ্যপ্রাপ্তি-বশতঃ প্রধান রাজপুরুষকে লোকে রাজাই বলে; তদ্রূপ, ব্রহ্মজ্ঞ মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মের বহু সাদৃশ্য লাভ করায় ঐ তাৎপর্য্যেই শ্রুতি বলিয়াছেন, "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।" এই প্রাচীন ব্যাখ্যার দৃষ্টান্ত প্রকাশ করিয়া আচার্য্য শঙ্করের শিষ্য সুরেশ্বরও "মানসোল্লাস" গ্রন্থে বলিয়াছেন,—"নচৌপচারিকং বাক্যং রাজবদ্রাজপূরুষে।"

পরন্তু কঠোপনিষদের প্রথমবল্লীর শেষে কথিত হইয়াছে—

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।
এবং মুনের্ব্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম॥

---

* গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় "ব্রহ্মৈব ভবতি" এই বাক্যে "এব" শব্দের দ্বারাই সাদৃশ্য অর্থের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কারণ, 'অমরকোষে'র অব্যয়বর্গে "এব" শব্দের সাদৃশ্য অর্থও কথিত হইয়াছে। বলদেব বিদ্যাভূষণ তাহার উল্লেখ করিয়া "সিদ্ধান্তরত্ন" গ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত "ব্রহ্মৈব ভবতি" এই বাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—ব্রহ্মসদৃশো ভবতি। মধ্বাচার্য্যের ব্যাখ্যাও ঐরূপ।

উক্ত শ্রুতি বাক্যের দ্বারা সরলভাবে ইহাই বুঝা যায় যে, যেমন কোন শুদ্ধ (নির্ম্মল) জলে অপর শুদ্ধ জল নিঃক্ষিপ্ত হইলে সেই জল "তাদৃগেব ভবতি" অর্থাৎ সেই পূর্ব্বস্থ জলের সদৃশই হয়; ব্রহ্মজ্ঞ মুনির আত্মা অর্থাৎ মুক্ত আত্মা "এবং ভবতি" অর্থাৎ তাদৃশই হন। সুতরাং সংসার-কালে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদই থাকে, কিন্তু মুক্তিকালে অভেদ হয়, এই যে মতান্তর আছে, তাহাও উক্ত বাক্যদ্বারা বুঝা যায় না। কিন্তু উহার দ্বারা মুক্ত আত্মা যে, ব্রহ্মই হন না, কিন্তু ব্রহ্মের সদৃশ হন,—ইহাই স্পষ্ট বুঝা যায়। দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ তাহাই বুঝিয়াছেন। তবে ব্রহ্মের সহিত তখন মুক্ত আত্মার কিরূপ সাদৃশ্য প্রাপ্তি হয়, এ বিষয়ে তাঁহাদিগের মধ্যে সম্প্রদায়-ভেদে নানা মত আছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামী স্কন্দপুরাণের বচনের দ্বারা উক্ত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, নির্ব্বাণ মুক্তি হইলে সেই মুক্ত আত্মার যে পরব্রহ্মের তাদাত্ম্য-প্রাপ্তি হয়, তাহা মিশ্রতারূপ তাদাত্ম্য। অভেদরূপ তাদাত্ম্য নহে। কারণ, পরব্রহ্মের যে স্বতন্ত্রতা প্রভৃতি নিত্য বিশেষণ আছে, তাহা মুক্তিকালেও জীবাত্মাতে সম্ভব হয় না। যেমন কোন জলে অপর জল নিঃক্ষিপ্ত হইলে তখন সেই উভয় জলের মিশ্রতারূপ তাদাত্ম্যই হয়, কিন্তু অভেদরূপ তাদাত্ম্য হয় না। কারণ, সেই জল-মিশ্রণে পূর্ব্বস্থ জলের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু সেই মিশ্রতারূপ তাদাত্ম্যবশতঃ তখন সেই উভয় জলের অবিভাগ হওয়ায় ভেদ প্রতীতি হয় না।

* শ্রীজীব গোস্বামী "সর্ব্বসংবাদিনী" গ্রন্থে বেদান্তসূত্রের মধ্বাচার্য্যের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াই লিখিয়াছেন—"যথা লোকে উদকমুদকান্তরেণৈকীভূতমিতি ব্যবহ্রিয়মাণমপি ভিন্নবস্তুত্বাত্তদন্তর্ভূতমেব ভবতি, নতু তদেব ভবতীত্যেবং স্যাদত্রাপি। তথা চ শ্রুতিঃ—"যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি·········। স্কান্দে চ "উদকে তূদকং সিক্তং

যাহা হউক, মূল কথা, কঠোপনিষদের উক্ত শ্রুতি বাক্যে তাদৃগেব ভবতি ও এবং ভবতি এইরূপ উক্তির দ্বারা বুঝা যায় যে, মুক্তি হইলেও তখন সেই আত্মাতে পরব্রহ্মের ভেদ থাকে। সুতরাং সেই ভেদ নিত্য।

পরন্তু শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের প্রথম অধ্যায়েও ষষ্ঠমন্ত্রের পরভাগে কথিত হইয়াছে—

পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি ॥

উক্ত শ্রুতি বাক্যের দ্বারাও সরলভাবে বুঝা যায় যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ নিত্য, উহা কল্পিত নহে। কারণ, উক্ত শ্রুতি বাক্যের দ্বারা "আত্মানং প্রেরিতারঞ্চ (অন্তর্য্যামিণং পরমাত্মানঞ্চ) পৃথক্ ভিন্নং মত্বা জ্ঞাত্বা……তেন জ্ঞানেন অমৃতত্বং মোক্ষং এতি প্রাপ্নোতি" এইরূপ অর্থই সরলভাবে বুঝা যায়। তাহা হইলে বুঝা যায় যে, নিজের আত্মা ও পরমাত্মার অভেদ দর্শন মুক্তির কারণ নহে। কিন্তু ভিন্নরূপে উভয় আত্মার স্বরূপদর্শন মুক্তির কারণ। তাই পরেই আবার সেই সিদ্ধ ভেদেরও পুনরুক্তি হইয়াছে—"জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ।" (১।৯)। 'দ্বৌ অজৌ জ্ঞাজ্ঞৌ ঈশানীশৌ' অর্থাৎ উভয় আত্মাই অজ (উৎপত্তি-শূন্য), কিন্তু তন্মধ্যে পরমাত্মা জ্ঞ (সর্ব্বজ্ঞ) জীবাত্মা অজ্ঞ। পরমাত্মা ঈশ, জীবাত্মা অনীশ। পরে উভয় আত্মার এইরূপে ভেদ-প্রকাশের প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য কি ? পরন্তু জীব অবিদ্যাকল্পিত হইলে 'দ্বৌ অজৌ' এইরূপ উক্তি কিরূপে সংগত হইবে এবং "দ্বৌ" এই পদের প্রয়োজন

মিশ্রমেব যথা ভবেৎ। নচৈতদেব ভবতি, যতো বৃদ্ধিঃ প্রজায়তে॥ এবমেব হি জীবোঽপি তাদাত্ম্যং পরমাত্মনা। প্রাপ্নোতি নাসৌ ভবতি, স্বাতন্ত্র্যাদিবিশেষণাৎ"। "তত্ত্বসন্দর্ভে"র টীকায় রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য স্কন্দ পুরাণের উক্ত বচনে "তাদাত্ম্য" শব্দের ব্যাখ্যা করিতে লিখিয়াছেন—"তাদাত্ম্যং মিশ্রতাং"। "নাসৌ ভবতীতি ন পরমাত্মা ভবতি।"

কি ? ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক। "দ্বৌ" এবং "অজৌ" এই দুইটি পদের দ্বারা অনাদি সত্য জীবাত্মা ও পরমাত্মার দ্বিত্ব বা দ্বৈত যে, সত্য—ইহা কি বুঝা যায় না ?

পরন্তু উক্ত শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের শেষ অধ্যায়ে "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা সর্ব্বজীবের অন্তর্য্যামী নির্গুণ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণশূন্য ও সর্ব্ব জীবের সর্ব্বকর্ম্মাধ্যক্ষ সাক্ষী পরমাত্মার একত্ব প্রকাশ করিতে, পরে আবার কথিত হইয়াছে—

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্ ॥ ৬।১৩ ॥

উক্ত শ্রুতিবাক্যে "চেতনানাং" এবং পরে আবার **বহূনাং** এই বহুবচনান্ত "বহু" শব্দের প্রয়োগের দ্বারা বুঝা যায় যে, জীবাত্মার বহুত্ব বাস্তব, উহা কল্পিত নহে। নচেৎ পরে আবার "**বহূনাং**" এই পদ-প্রয়োগের প্রয়োজন কি ? তাহা হইলে বহু জীবাত্মা ও এক পরমাত্মার ভেদ যে—বাস্তব সত্য, ইহাও উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে, বুঝা যায়। জীবাত্মার বাস্তববহুত্ব-বাদী সকল সম্প্রদায়ই ইহাই বুঝিয়া জীবাত্মা ও পরব্রহ্মের বাস্তব ভেদ সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে বেদান্তদর্শনের **ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ** (১।১।২১) এবং **অধিকন্তু ভেদ-নির্দ্দেশাৎ** (২।১।২২) এই দুই সূত্রের দ্বারাও জীবাত্মা ও পরব্রহ্মের বাস্তব ভেদই কথিত হইয়াছে। উপনিষদ্ ও ব্রহ্ম-সূত্রের দ্বারা সকলেই যে, তোমার অভিমত অদ্বৈতসিদ্ধান্তই বুঝিবেন,—ইহা কোন কালেই সম্ভব নহে।

নবম অধ্যায়

ভগবদ্গীতায় দ্বৈতবাদীর দৃষ্টি

শিষ্য। প্রাচীনকাল হইতেই ঋষিগণের মধ্যেও উপনিষদের অনেক শ্রুতি বাক্যের নানারূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার দ্বারা নানা মতের প্রকাশ হইয়াছে—ইহা সত্য। বেদান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে ভগবান্ বাদরায়ণও 'আশ্মরথ্য', 'ঔড়ুলোমি' এবং 'কাশকৃৎস্ন' মুনির মত ভেদেরও উল্লেখ করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্করের মতে কাশকৃৎস্ন মুনির মতই শ্রুত্যনুসারী হওয়ায় উহাই 'ব্রহ্মসূত্র'কার বাদরায়ণের সম্মত। তাই সেখানে দ্বাবিংশ সূত্রের ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—"ঔড়ুলোমি-পক্ষে পুনঃ স্পষ্টমেব অবস্থান্তরাপেক্ষৌ ভেদাভেদৌ গম্যেতে। তত্র কাশকৃৎস্নীয়ং মতং শ্রুত্যনুসারীতি গম্যতে, প্রতিপিপাদয়িষিতার্থা-নুসারাৎ "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ" ইত্যাদি। পরন্তু 'ভগবদ্গীতা'র দ্বারাও উক্ত সিদ্ধান্তই বুঝা যায়। 'ভগবদ্গীতা'য় যে সিদ্ধান্ত উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাই কি প্রকৃত সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রাহ্য নহে?

গুরু। অবশ্যই গ্রাহ্য, শিরোধার্য্য। কিন্তু 'ভগবদ্গীতা'য় যে, আচার্য্যশঙ্কর-সমর্থিত অদ্বৈতসিদ্ধান্তই উপদিষ্ট হইয়াছে, ইহাও কি আমরা বলিতে পারি? বহু আচার্য্য ভগবদ্গীতার দ্বারাও জীব ও পরব্রহ্মের বাস্তব দ্বৈতসিদ্ধান্ত এবং অনেকে দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্তই বুঝিয়া ব্যাখ্যা ও বিচার দ্বারা তাহা সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের সকল কথাই যে অগ্রাহ্য, ইহাও ত আমরা বলিতে পারি না। তাঁহাদিগের সকল কথাও বিচার করিয়া বুঝিতে হইবে। অদ্বৈতবাদে অতিনিষ্ঠাবশতঃ প্রথমেই অন্যান্য বিরুদ্ধ মতের অবজ্ঞা করিলে বিচার

করিয়া অদ্বৈত মত বুঝা হয় না। অতএব ভগবদ্গীতায় দ্বৈতবাদীর দৃষ্টি কিরূপ, তাহাও দেখিতে হইবে। অদ্বৈতবাদী ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষে দ্বৈতবাদীর যে সমস্ত কথার উল্লেখ করিয়া নিজ মত-সমর্থনে বহু বিচার করিয়াছেন, সেই সমস্ত কথাও বিচার করিয়া বুঝিতে হইবে।

শিষ্য। বিচারের অন্ত নাই। কিন্তু মনোযোগ পূর্ব্বক 'ভগবদ্গীতা'র আদ্যন্ত পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, 'ভগবদ্গীতা'য় জীবাত্মা ও পরমাত্মার অদ্বৈতসিদ্ধান্তই উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রথমেই ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে আত্মার যে স্বরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা ত পরব্রহ্মেরই স্বরূপ। "য এনং বেত্তি হন্তারং" ইত্যাদি এবং "অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা পরমাত্মাই জীবাত্মা,—ইহাই বুঝা যায়। আর পরে বহু শ্লোকের দ্বারা সুস্পষ্টই বুঝা যায় যে, পরব্রহ্ম হইতে জীব বস্তুতঃ ভিন্ন নহে। জীব পরব্রহ্মেরই অংশ।

গুরু। মনোযোগপূর্ব্বক 'ভগবদ্গীতা'র আদ্যন্ত পাঠ করাও অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার। আর যেরূপ মনোযোগের দ্বারা 'ভগবদ্গীতা'র প্রকৃত সিদ্ধান্ত বুঝা যায়, তাহা ত বহুসাধন সাপেক্ষ। যাহা হউক, পরের কথা পরে বলিব, এখন প্রথমে দ্বিতীয় অধ্যায়ের কথাই বলি। "অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততং"—এই কথা ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতে জীবাত্মার সম্বন্ধেও উপপন্ন হয়। কারণ, উক্ত মতে পরমাত্মার ন্যায় জীবাত্মাও সর্ব্বব্যাপী। পরন্তু দ্বিতীয় অধ্যায়ে জীবাত্মার নিত্যত্ব বুঝাইতে তাঁহাতে পুনঃ পুনঃ পরমাত্মার অনেক সাধর্ম্ম্যই কথিত হইয়াছে। কিন্তু তদ্দ্বারা জীবাত্মা যে, পরমাত্মা হইতে অভিন্ন—ইহা প্রতিপন্ন হয় না। কারণ জীবাত্মায় পরমাত্মার যে বৈধর্ম্ম্য আছে, তদ্দ্বারা ভেদই সিদ্ধ হয়। আর জীবাত্মা হন্তা নহে—এই কথার তাৎপর্য্য, ইহাও বুঝা যায় যে, জীবাত্মা স্বতন্ত্রভাবে হন্তা নহে। জীবাত্মার হন্তৃত্বও পরমেশ্বর-

পরতন্ত্র। পরমেশ্বরই সমস্ত জীবের কর্ম্মানুসারে সাধু ও অসাধু কর্ম্মের কারয়িতা। শ্রীভগবান্‌ও পরে বলিয়াছেন--"ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব, নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।" (১১।৩৩)।

পরন্তু দ্বিতীয় অধ্যায়ে "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" ইত্যাদি শ্লোকে "সৎ" শব্দের দ্বারা যে, সামান্যতঃ আত্মস্বরূপই গৃহীত হইয়াছে—ইহাই ব্যক্ত করিতে পরবর্ত্তী শ্লোকে ক্লীব লিঙ্গ "তদ্" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। তাহা হইলে "তৎ" আত্ম-স্বরূপং, 'অবিনাশি তু' অবিনাশ্যেব বিদ্ধি, এইরূপ ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝা যায় যে, আত্ম-স্বরূপ বিনাশশীলই নহে। কারণ, "যেন সর্ব্বমিদং ততং;" যৎকর্ত্তৃক সমস্ত ব্যাপ্ত, অর্থাৎ যাহা সর্ব্বব্যাপী পদার্থ, তাহা অবিনশ্বর। ন্যায়বৈশেষিক মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই সর্ব্বব্যাপী। জীবাত্মার অণুত্ববাদী কোন কোন বৈষ্ণবাচার্য্য কেবল জীবত্মার সম্বন্ধেও উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

বস্তুতঃ ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে আত্মার নিত্যত্ব প্রতিপাদন করিতে প্রথমে "নত্বেবাহং" ইত্যাদি শ্লোকে "অহং" এই পদের দ্বারা পরমাত্মারও উল্লেখ হওয়ায় পরে উভয় আত্মারই নিত্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে—ইহা বুঝা যায়। জীবদেহে জীবাত্মার ন্যায় সেই দেহস্থ অন্তর্য্যামী পরমাত্মাও অবধ্য—ইহাও উক্ত স্থলে বক্তব্য। আর জীবাত্মার অবিনাশিত্ব প্রতিপাদন করিতে দৃষ্টান্তরূপেও পরমাত্মার অবিনাশিত্ব কথিত হইতে পারে। ফল কথা, দ্বিতীয় অধ্যায়ের ঐ সমস্ত শ্লোকের দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার বাস্তব অভেদ প্রতিপন্ন করা যায় না। কারণ, আত্মার চিরস্থায়িত্ব প্রকাশ করিতে শ্রীভগবান্ প্রথমে বলিয়াছেন—

নত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃ পরম্॥ ২।১২।

উক্ত শ্লোকে প্রথমে "অহং" "ত্বং" এবং "ইমে" এই বহুবচনান্ত পদের দ্বারা এবং পরে "সর্ব্বে বয়ং" এইরূপ বহুত্ববোধক উক্তির দ্বারা অর্জ্জুন এবং সেই সমস্ত নৃপতির আত্মা এবং পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ যে, পরস্পর ভিন্ন—ইহাই স্পষ্ট বুঝা যায়। নচেৎ পরে আবার "সর্ব্বে বয়ং" এইরূপ উক্তির প্রয়োজন কি? এবং একাত্মবাদে ঐ স্থলে "সর্ব্ব" শব্দ ও বহুবচন-প্রয়োগ কিরূপে সংগত হইবে—ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক। ভাষ্যকার শঙ্করও ইহা চিন্তা করিয়া বলিয়াছেন—"দেহভেদানুবৃত্ত্যা বহুবচনং, নাত্ম-ভেদাভিপ্রায়েণ।"

কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন এবং যুদ্ধার্থ উপস্থিত নৃপতিবর্গের দেহের ভেদ গ্রহণ করিয়া উক্ত শ্লোকে পরে "সর্ব্বে বয়ং" এইরূপ বহু বচনান্ত প্রয়োগ অনাবশ্যক। পরন্তু ঐ শ্লোকে "বয়ং" এই পদের দ্বারা সেই সমস্ত আত্মাই গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং আত্মার বহুত্ব ব্যক্ত করিয়া সমস্ত আত্মার পরস্পর পারমার্থিক সত্যভেদই ব্যক্ত করা হইয়াছে—ইহা বুঝা যায়। তাই ভাষ্যকার রামানুজ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"যথাহং সর্ব্বেশ্বরঃ পরমাত্মা নিত্য ইতি নাত্র সংশয়ঃ, তথৈব ভবন্তঃ ক্ষেত্রজ্ঞা আত্মানোঽপি নিত্যা এবেতি মন্তব্যাঃ। এবং ভগবতঃ সর্ব্বেশ্বরাদাত্মনাঞ্চ পরস্পরং ভেদঃ পারমার্থিক ইতি ভগবতৈব উক্তমিতি প্রতীয়তে।" অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ হইতে অন্যান্য সমস্ত আত্মারও পরস্পর ভেদ পারমার্থিক, ইহা উক্ত স্থলে ভগবান্ই বলিয়াছেন—ইহা বুঝা যায়।

রামানুজ ইহা সমর্থন করিতে পরে বলিয়াছেন,—"অজ্ঞান-মোহিতং প্রতি তন্নিবৃত্তয়ে পারমার্থিকনিত্যত্বোপদেশ-সময়ে 'অহং ত্বমিমে সর্ব্বে বয়'মিতি ব্যপদেশাৎ, ঔপাধিকাত্মভেদবাদে হি আত্ম-ভেদস্য অতাত্ত্বিকত্বেন তত্ত্বোপদেশসময়ে ভেদনির্দ্দেশো ন সংগচ্ছতে।" তাৎপর্য্য এই যে, আত্মার ভেদ ঔপাধিক অবাস্তব হইলে যে সময়ে শ্রীভগবান্

অজ্ঞান-মোহিত অর্জ্জুনের অজ্ঞান-নিবৃত্তির জন্য তাঁহাকে আত্মার বাস্তব নিত্যত্বের উপদেশ করেন, তখন অবাস্তব ভেদের উপদেশ করিতে পারেন না। তত্ত্বোপদেশ কালে কল্পিত মিথ্যা ভেদের-নির্দ্দেশ সংগত হয় না। সুতরাং উক্ত শ্লোকে 'অহং' 'ত্বং' 'ইমে' "সর্ব্বে বয়ং" এইরূপ উক্তির দ্বারা যে আত্ম-ভেদ স্পষ্ট কথিত হইয়াছে, তাহাও আত্মার নিত্যেত্বর ন্যায় পারমার্থিক—ইহাই সিদ্ধান্ত বুঝা যায়। রামানুজ পরে জীবাত্মার বাস্তব বহুত্ব যে, শ্রুতি-সিদ্ধ—ইহা প্রতিপাদন করিতে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

পরন্তু পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ হইতে অর্জ্জুন প্রভৃতির আত্মার বাস্তব ভেদ না থাকিলে শ্রীভগবান্ আত্মার চিরস্থায়িত্ব প্রতিপাদন করিতে উক্ত স্থলে অর্জ্জুনকে এই কথাই কেন বলেন নাই যে, তুমি এবং এই সমস্ত নরপতি চিরকালই আছ এবং চিরকালই থাকিবে। কারণ, আমি চিরস্থায়ী। আমা হইতে কোন আত্মা বস্তুতঃ পৃথক্ নহে। কিন্তু শ্রীভগবান্ পরেই তাঁহার ঈশ্বরত্ব ব্যক্ত করিয়াই বলিয়াছেন, "ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন" ইত্যাদি। (৩,২২-৩০)। তাঁহার শেষোক্ত ঐ উক্তির দ্বারাও তাঁহা হইতে কর্ম্ম-কর্ত্তা জীবাত্মা যে, ভিন্ন—ইহা বুঝা যায়। তাই তিনি অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—"নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং।"

শিষ্য। মায়ার অধীশ্বর পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর। সুতরাং তাঁহা হইতে অবিদ্যা-বশবর্ত্তী অসর্ব্বজ্ঞ অনীশ্বর জীবের ভেদ অবশ্যই স্বীকার্য্য। তবে সেই ভেদ—বাস্তব কি কল্পিত, ইহাই বিচার্য্য। কিন্তু ভগবদ্‌গীতার দ্বারা ঐ ভেদ যে, বাস্তব নহে, অভেদই বাস্তব—ইহাই স্পষ্ট বুঝা যায়। কারণ পরে দশম অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে—

"অহমাত্মা গুড়াকেশ! সর্ব্বভূতাশয়-স্থিতঃ।" (২০ শ)। পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে দেহী জীবকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া তৃতীয় শ্লোকেই কথিত হইয়াছে—"ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।" পরে পঞ্চদশ অধ্যায়ে স্পষ্ট কথিত হইয়াছে—"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" (৭ম)। জীবলোকে আমারই অংশ জীবভূত, ইহা বলিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনিই সমস্ত জীব-দেহে জীবভাব-প্রাপ্ত। সুতরাং পরমার্থতঃ জীব তাঁহা হইতে ভিন্ন তত্ত্ব নহে।

গুরু। ভগবদ্‌গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে "মমৈবাংশো জীবলোকে" ইত্যাদি শ্লোকে "অংশ" শব্দের দ্বারাও অদ্বৈতবাদী নিজমত সমর্থন করিয়াছেন, ইহা সত্য। কিন্তু উক্ত শ্লোকের পরে সপ্তদশ শ্লোক কথিত হইয়াছে—"**উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ**। যো লোকত্রয়-মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥" ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, সেই ত্রিলোক-ধারক অব্যয় ঈশ্বর পরমাত্মা, উত্তম পুরুষ এবং তিনি পূর্ব্বোক্ত ক্ষর পুরুষ ও অক্ষর পুরুষ হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন, সুতরাং তিনি জীবাত্মা হইতেও বস্তুতঃ ভিন্ন। নচেৎ পরে উক্ত শ্লোকের প্রয়োজন কি? উক্ত শ্লোকে কেবল জড় পদার্থ হইতে উত্তম পুরুষ পরমাত্মা ভিন্ন, ইহা বলা হয় নাই। ভেদবাদী আচার্য্যগণ বিচার পূর্ব্বক উক্ত শ্লোকে "তু" শব্দ ও "অন্য" শব্দের দ্বারা জীবাত্মা হইতেও পরমাত্মার বাস্তব ভেদ সমর্থন করিয়াছেন। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত "মমৈবাংশো জীবলোকে" ইত্যাদি শ্লোকে "অংশ" শব্দের দ্বারা যে, অভেদই বিবক্ষিত—ইহা কিরূপে বুঝিব?

পরন্তু সাবয়ব দ্রব্য পদার্থের অবয়ব অর্থাৎ ভাগ বা একদেশই "অংশ" শব্দের মুখ্য অর্থ। কিন্তু নির্ব্বিকার নিরবয়ব পরব্রহ্মের অবয়বরূপ অংশ সম্ভবই নহে। বেদান্ত দর্শনের "অংশো নানাব্যপ-দেশাৎ" ইত্যাদি (২।৩।৪৩) সূত্রের ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্করও ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"অংশ ইব অংশো নহি নিরবয়বস্য মুখ্যো হংশঃ সম্ভবতি।"

অর্থাৎ নিরয়ব পরমেশ্বরের মুখ্য অংশ সম্ভব না হওয়ায় উক্ত সূত্রে "অংশ" শব্দের গৌণ অর্থ—অংশতুল্য। ভগবদ্গীতার উক্ত শ্লোকের ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর নিজমতানুসারে সমাধান করিতে বলিয়াছেন—"নৈষ দোষো হবিদ্যাকৃতোপাধিপরিচ্ছিন্ন একদেশোঽংশ ইব কল্পিতোঽযত: ।" কিন্তু জীব যে, জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের ন্যায় অথবা ঘটাকাশ পটাকাশ প্রভৃতির ন্যায় কল্পিতভেদবিশিষ্ট অবাস্তব, ইহা অন্যান্য সম্প্রদায় স্বীকার করেন নাই। আচার্য্য শঙ্করের সম্মত অনির্ব্বচনীয় অবিদ্যা, বহুবিবাদ-গ্রস্ত। পরন্তু উক্ত মতে পরব্রহ্ম-রূপে জীব সনাতন হইলেও পরব্রহ্মের জীবভাব এবং তাঁহার সেই কল্পিত অংশ, সনাতন নহে। কিন্তু উক্ত শ্লোকে প্রথমোক্ত **অংশঃ** এই পদেরই বিশেষণ পদ পরে কথিত হইয়াছে—**সনাতনঃ**। অনেকের মতে সেই অংশও সনাতন না হইলে শেষোক্ত ঐ বিশেষণের উপপত্তি হয় না।

বস্তুতঃ 'ভগবদ্গীতা'র উক্ত শ্লোকে "অংশ" শব্দ যে, গৌণার্থ—ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। তাহা হইলে উক্ত গৌণার্থ "অংশ" শব্দের দ্বারা অন্যরূপ তাৎপর্য্যও বুঝা যাইতে পারে। ন্যায় বৈশেষিকাদি সম্প্রদায়ের মতে উক্ত "অংশ" শব্দের দ্বারা পরমেশ্বর ও জীবের প্রভু-ভৃত্যবৎ সম্বন্ধই ব্যক্ত হইয়াছে। 'শাস্ত্রদীপিকা'র তর্কপাদে মীমাংসাচার্য্য পার্থসারথিমিশ্রও উক্ত "অংশ" শব্দের দ্বারা ঐরূপ তাৎপর্য্যই ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং উহাও যে, প্রাচীন ব্যাখ্যা, ইহা শারীরক-ভাষ্যে (২।৩।৪৩) আচার্য্য শঙ্করের কথার দ্বারাও বুঝা যায়। অর্থাৎ রাজা যেমন তাঁহার আশ্রিত ও কার্য্য-সম্পাদক অমাত্যাদিকে তাঁহার অংশ বলেন, তদ্রূপ সর্ব্বজীবের প্রভু পরমেশ্বর সমস্ত জীবকে তাঁহার কার্য্য-সম্পাদক বলিয়া তাঁহার অংশ বলিয়াছেন। উক্ত "অংশ" শব্দের গৌণ অর্থ—অংশ-তুল্য। যেমন জীবের শরীরের হস্ত পদাদি অংশ, সেই শরীর-সাধ্য নানা কার্য্যের সম্পাদক; তদ্রূপ সমস্ত জীবই সেই পরমেশ্বরের

কার্য্য সম্পাদক হওয়ায় তাঁহার অংশ-তুল্য। বস্তুতঃ জীবের সত্তা ব্যতীত পরমেশ্বরের সৃষ্ট্যাদি কার্য্য সম্ভবই হয় না।* তাই জীব পরমেশ্বরের সহকারী শক্তি-বিশেষ বলিয়া ভগবদ্‌গীতায় ঐ তাৎপর্য্যেই পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে......"প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥" (৭।৫) বিষ্ণুপুরাণেও কথিত হইয়াছে—"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।" (৬।৭।৬১) অর্থাৎ জীব পরমেশ্বরের স্বরূপ-শক্তি হইতে ভিন্ন দ্বিতীয় শক্তি। সহকারী অর্থেও "প্রকৃতি," "শক্তি" ও "অংশ" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। ফলকথা, ভগবদ্‌গীতার উক্ত শ্লোকে গৌণার্থ "অংশ" শব্দের দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের বাস্তব অভেদ, নির্ব্বিবাদে প্রতিপন্ন করা যায় না।

অবশ্য ভগবদ্‌গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে প্রথমে জীবকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া পরেই কথিত হইয়াছে—"ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।" কিন্তু সেখানে পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত দেহাভিমানী জীবরূপ ক্ষেত্রজ্ঞই পরশ্লোকে "ক্ষেত্রজ্ঞ" শব্দের দ্বারা গৃহীত হইলে "ক্ষেত্রজ্ঞং তঞ্চ মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত"—এইরূপ স্পষ্ট উক্তি কেন হয় নাই? বস্তুতঃ

* জীবের অণুত্ববাদী মধ্বাচার্য্য বরাহপুরাণের বচনানুসারে পরমেশ্বরের স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ, এই দ্বিবিধ অংশ বলিয়া মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহাদি অবতারগণকে তাঁহার স্বাংশ বা স্বরূপাংশ বলিয়াছেন এবং সমস্ত জীবকে তাঁহার বিভিন্নাংশ বলিয়া তাঁহা হইতে স্বরূপতঃ ভেদই সমর্থন করিয়াছেন। তদনুসারে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণও উক্ত দ্বিবিধ অংশ বলিয়াছেন এবং বিষ্ণুপুরাণের (৬।৭।৬১) বচনানুসারে জীবকে পরমেশ্বরের স্বরূপ শক্তি হইতে ভিন্ন দ্বিতীয় শক্তি বলিয়াছেন। তাই বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় 'সিদ্ধান্তরত্ন' গ্রন্থের অষ্টমপাদে লিখিয়াছেন—"স চ তদ্‌ভিন্নোঽপি তচ্ছক্তিত্বেন তদংশো নিগদ্যতে।" "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থে কবিরাজ গোস্বামীও 'সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের' নিকটে শ্রীচৈতন্যদেবের উক্তিরূপে লিখিয়াছেন—"গীতা শাস্ত্রে জীবরূপ শক্তি করি মানে। হেন জীবে অভেদ কহ ঈশ্বরের সনে? ॥" মধ্য-ষষ্ঠ।

জীবাত্মাকে যেমন ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হইয়াছে, তদ্রূপ অন্য অর্থে অন্তর্য্যামী পরমাত্মাকেও ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হইয়াছে। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে সেই অর্থ ব্যক্ত করিয়া কথিত হইয়াছে—"ক্ষেত্রাণি হি শরীরাণি বীজঞ্চাপি শুভাশুভং। তানি বেত্তি স যোগাত্মা ততঃ ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে ॥" (৩৫১ অঃ)। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও বলদেব বিদ্যাভূষণ, শান্তিপর্ব্বের উক্ত বচনানুসারে ভীষ্মপর্ব্বীয় ভগবদ্‌গীতার পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যেমন প্রজাগণ নিজ নিজ ক্ষেত্রকেই জানে, কিন্তু রাজা সেই সমস্ত ক্ষেত্রকেই জানেন; তদ্রূপ, প্রত্যেক জীব নিজ নিজ শরীররূপ ক্ষেত্রকে আত্মা বলিয়া জানে; এই অর্থেই পূর্ব্বে "ক্ষেত্রজ্ঞ" বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু সেই সমস্ত জীবের স্বামী সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর সমস্ত জীবের সমস্ত শরীররূপ সমস্ত ক্ষেত্রকেই জানেন। তিনি সর্ব্বজীবের শরীররূপ সমস্ত ক্ষেত্রেই হৃদয়দেশে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত আছেন। তাই ঐ তাৎপর্য্যেই শ্রীভগবান্ পরে বলিয়াছেন—**ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।** এবং ঐ তাৎপর্য্যেই তিনি পূর্ব্বেও বলিয়াছেন—**অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়-স্থিতঃ।** (১০।২০)। শ্রীধর স্বামীও সেখানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন— "হে গুড়াকেশ! সর্ব্বেষাং ভূতানামাশয়েষন্তঃকরণেষু সর্ব্বজ্ঞত্বাদি-গুণৈর্নিয়ন্তৃত্বেনাবস্থিতঃ পরমাত্মাহং।"

বস্তুতঃ জীবাত্মা ও পরমাত্মা, এই উভয়ই "আত্মন্" শব্দের বাচ্য। "আত্মন্" শব্দের আরও অনেক অর্থ আছে। শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে পরমাত্মরূপ বিশেষ অর্থেও কেবল "আত্মন্" শব্দেরও প্রয়োগ হইয়াছে এবং সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরেরই বাস্তব একত্ব ও বহু উপাধি-ভেদে ঔপাধিক বহুত্বও কথিত হইয়াছে। তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা—এই অর্থে কোন কোন স্থলে তাঁহাকে 'ভূতাত্মা'ও বলা হইয়াছে এবং তাঁহার সম্বন্ধেই শ্রুতি বলিয়াছেন—"একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ।"

কিন্তু সর্ব্বজীবের দেহস্থ অন্তর্য্যামী সেই মহেশ্বর পরমাত্মা, সেই দেহস্থ জীবাত্মা হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন পুরুষ। তাই 'ভগবদ্গীতা'র উক্ত ত্রয়োদশ অধ্যায়েই পরে কথিত হইয়াছে—"উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ। পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥" উক্ত শ্লোকে শেষোক্ত "পর" শব্দের অর্থ—ভিন্ন।

শিষ্য। জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ যে, বাস্তব সত্য—ইহা কি ভগবদ্গীতার কোন শ্লোকের দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়?

গুরু। অবশ্যই বুঝা যায়। বুঝা না গেলে বহু সম্প্রদায় তাহা বুঝিয়াছেন কেন? এখন সেই কথাই বলিব। "ভগবদ্গীতা"র চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে দ্বিতীয় শ্লোক দেখ——**ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ**। সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥" উক্ত শ্লোকে "সাধর্ম্ম্য" শব্দের দ্বারা বুঝা যায় যে—তত্ত্বজ্ঞানী মুক্ত পুরুষগণ পরমেশ্বরের সাদৃশ্য লাভ করেন। এখানে বলা আবশ্যক যে—কবিগণ অভিন্ন পদার্থেও সাদৃশ্য-বর্ণন করিলেও ভেদবিশিষ্ট সাদৃশ্যই—"সাধর্ম্ম্য" শব্দের মুখ্য অর্থ। ভাষ্যকার আচার্য্য শঙ্করও ইহা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তাই তিনি উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন—"মম পরমেশ্বরস্য 'সাধর্ম্ম্যং' মৎস্বরূপতামাগতাঃ প্রাপ্তা ইত্যর্থো নতু সমানধর্ম্মতাং সাধর্ম্ম্যং, ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরয়োর্ভেদানভ্যুপগমাদ্ গীতাশাস্ত্রে।" টীকাকার আনন্দগিরি শঙ্করের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে সেখানে বলিয়াছেন—"সাধর্ম্ম্যস্য মুখ্যত্বে ভেদ-ধ্রৌব্যাদ্ গীতাশাস্ত্র-বিরোধঃ স্যাদিত্যাহ—ন ত্বিতি।" অর্থাৎ উক্ত শ্লোকে "সাধর্ম্ম্য" শব্দের মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিলে মুক্ত আত্মাতেও পরমাত্মার ভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য হয়। কিন্তু তাহা স্বীকার করিলে গীতাশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত-বিরোধ হয়। অতএব গীতাশাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুসারে ভাষ্যকার শঙ্কর ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"মম পরমেশ্বরস্য সাধর্ম্ম্যং মৎ-স্বরূপতা মাগতাঃ প্রাপ্তাঃ।"

কিন্তু গীতাশাস্ত্রের উক্তরূপই সিদ্ধান্ত হইলে উক্ত শ্লোকে "মৎ-স্বরূপত্বমাগতাঃ" এইরূপ উক্তি হয় নাই কেন? সাদৃশ্যবোধক "সাধর্ম্ম্য" শব্দ প্রয়োগের উদ্দেশ্য কি? পরন্তু মুক্ত পুরুষগণ পরব্রহ্ম-স্বরূপই হইলে তখন ত তাঁহাদিগের ঔপাধিক ভেদ বা বহুত্বও থাকিবে না। সুতরাং উক্ত শ্লোকে "মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ" এইরূপ বহুবচনান্ত প্রয়োগ কিরূপে উপপন্ন হইবে এবং বহুবচন প্রয়োগের উদ্দেশ্যই বা কি, ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক। পরন্তু মুক্ত পুরুষগণ পরব্রহ্ম-স্বরূপই হইলে তাঁহাদিগের যে, পুনর্জ্জন্মাদি হয় না—ইহা বলা অনাবশ্যক। সুতরাং উক্ত ব্যাখ্যায় উক্ত শ্লোকের পরার্দ্ধবাক্যের বিশেষ সার্থকতা হয় না। কিন্তু মুক্ত পুরুষগণ পরমেশ্বরের সাদৃশ্যপ্রাপ্ত হন, ইহা বলিলে সেই সাদৃশ্য কিরূপ? এইরূপ-প্রশ্ন হইতে পারে। তাই পরার্দ্ধ কথিত হইয়াছে—"সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ।" অবশ্য আরও অনেক সাদৃশ্য বলা যায়।

বস্তুতঃ ভাষ্যকার শঙ্কর উক্ত শ্লোকে "সাধর্ম্ম্য" শব্দের মুখ্য অর্থ গ্রাহ্য নহে, ইহা সিদ্ধ করিতে······"ভেদানভ্যুপগমাদ্ গীতাশাস্ত্রে" এই কথার দ্বারা যে হেতু বলিয়াছেন, তাহা অসিদ্ধ। কারণ,—দ্বৈতবাদী সকল সম্প্রদায়ের মতেই জীবাত্মা ও পরমাত্মার বাস্তব ভেদই গীতাশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ এবং দ্বৈতাদ্বৈতবাদী নিম্বার্ক প্রভৃতিকেও আমি এখানে দ্বৈতবাদী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। কারণ, তাঁহাদিগের মতেও জীবাত্মা ও পরমাত্মার দ্বৈত বা ভেদ সত্য। সুতরাং আচার্য্য শঙ্করের উক্ত ঐ হেতু প্রতিবাদিগণের মতে অসিদ্ধ হওয়ায় প্রকৃত হেতু হয় না। যে হেতু সন্দিগ্ধ, তাহাও 'অসিদ্ধ' হেত্বাভাসের অন্তর্গত—ইহা সর্ব্বসম্মত।

ফলকথা, দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ মুখ্য অর্থের প্রাধান্যবশতঃ ভগবদ্-গীতার উক্ত শ্লোকে "সাধর্ম্ম্য" শব্দের ভেদ-বিশিষ্ট সাদৃশ্যরূপ মুখ্য অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে উক্ত মুখ্য অর্থের কোন

বাধক নাই। মুণ্ডক উপনিষদে "পরমং সাম্য মুপৈতি" এবং কঠোপনিষদে "এবং ভবতি" এবং ভগবদ্গীতায় "মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ"—এই সমস্ত বাক্য দ্বারা মুক্ত পুরুষের পরব্রহ্মের সহিত সাদৃশ্যবিশেষ-প্রাপ্তিই বুঝা যায়। সুতরাং "মদ্ভাব" "ব্রহ্মভাব" ও "ব্রহ্মভূয়" প্রভৃতি শব্দের দ্বারাও সেই সাদৃশ্যবিশেষই বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে মুক্তিকালেও সেই মুক্ত আত্মাতে পরব্রহ্মের ভেদ থাকায় ঐ ভেদ যে নিত্য, সুতরাং বাস্তব সত্য—ইহা স্বীকার্য্য।

পরন্তু আচার্য্য শঙ্করের মতে মুক্ত পুরুষের ব্রহ্মভাব-প্রাপ্তি বা ব্রহ্ম প্রাপ্তি কি—ইহাও বুঝিতে হইবে। মুণ্ডক উপনিষদের ভাষ্যে তিনি নিজেই প্রথমে বলিয়াছেন,—"অবিদ্যায়া অপায এব হি পরপ্রাপ্তি র্নার্থান্তরং।" সুতরাং তাঁহার মতেও মুণ্ডক উপনিষদের "ব্রহ্মৈব ভবতি" এই বাক্যেরও যথাশ্রুতার্থ গৃহীত হয় নাই—ইহা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। পরন্তু 'ভগবদ্গীতা'র "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি" ইত্যাদি শ্লোকের ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করিতে দ্বৈতবাদীর যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, সেই সমস্ত কথাও প্রণিধান পূর্ব্বক বুঝিতে হইবে। সেই সমস্ত কথার গুরুত্ব না থাকিলে আচার্য্য শঙ্করও কেন তাহার উল্লেখ-পূর্ব্বক নিজ মত-স্থাপনের জন্য সেখানে ঐরূপ বিস্তৃত বিচার করিয়াছেন? শঙ্কর পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করিতে প্রথমে সেখানে দ্বৈতবাদীর কথা বলিয়াছেন—

"ননু সর্ব্বক্ষেত্রেষু এক এব ঈশ্বরো নান্যস্তদ্-ব্যতিরিক্তো ভোক্তা বিদ্যতে চেৎ? তত ঈশ্বরস্য সংসারিত্বং প্রাপ্তং, ঈশ্বরব্যতিরেকেণ বা সংসারিণোঽন্যস্যাভাবাৎ, সংসারাভাবপ্রসঙ্গঃ, তচ্চোভয়মনিষ্টং, বন্ধ-মোক্ষ-তদ্ধেতুশাস্ত্রানর্থক্য-প্রসঙ্গাৎ, প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণ-বিরোধাচ্চ।'

তাৎপর্য্য এই যে, সমস্ত জীব-দেহে এক ঈশ্বরই জীব হইলে বস্তুতঃ ঈশ্বরই সুখ-দুঃখ-ভোক্তা সংসারী—ইহাই স্বীকার করিতে হয়। অথবা

ঈশ্বর হইতে ভিন্ন কোন সংসারী আত্মা না থাকায় সংসারের অভাবই স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু উহার কোন পক্ষই স্বীকার করা যায় না। শঙ্কর পরে দ্বৈতবাদীর আরও অনেক কথা বলিয়া নিজমতানুসারে সমাধান করিয়াছেন যে, ঈশ্বরের জীবভাব অবিদ্যা-কল্পিত, সুতরাং তাঁহার সংসারিত্ব ও সুখদুঃখভোগাদি সমস্তই অবিদ্যা-কল্পিত। শঙ্কর বলিয়াছেন—"ক্ষেত্রজ্ঞস্য ঈশ্বরস্যৈব সতোঽবিদ্যাকৃতোপাধিভেদতঃ সংসারিত্বমিব ভবতি। যথা দেহাদ্যাত্মত্বমাত্মনঃ।" কিন্তু শঙ্করের সম্মত সেই অনির্ব্বচনীয় অবিদ্যা, বহুবিবাদ-গ্রস্ত,—ইহা পূর্ব্বেও বলিয়াছি।

শিষ্য। মহাভারতে যে, বহুপুরুষবাদের খণ্ডনপূর্ব্বক একপুরুষ-বাদই সিদ্ধান্তরূপে কথিত হইয়াছে,—ইহাও ত আচার্য্য শঙ্কর দেখাই য়াছেন!

গুরু। শারীরক ভাষ্যে (২।১।১) শঙ্কর মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের কএকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া একপুরুষবাদই সিদ্ধান্তরূপে সমর্থন করিয়াছেন বটে; কিন্তু দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ মহাভারতের ঐ স্থলে সমস্ত শ্লোকের পর্য্যালোচনা করিয়া তাহা বুঝেন নাই। মহাভারতের ঐস্থলে বর্ণিত হইয়াছে যে, বৈশম্পায়নের নিকটে জনমেজয় প্রশ্ন করিয়াছিলেন—আত্মা কি বহু অথবা এক? এবং কোন্ পুরুষ শ্রেষ্ঠ এবং পুরুষের যোনি অর্থাৎ জীবদেহাদির উৎপাদক কে? এতদুত্তরে বৈশম্পায়ন বলেন যে, সাংখ্যাদি সম্প্রদায়ের মতে পুরুষ বহু। তাঁহারা একমাত্র পুরুষ স্বীকার করেন না। পরে তিনি ঐ বহু পুরুষ স্বীকার করিয়াই বলেন যে, বহু পুরুষের একমাত্র যোনি সেই গুণাধিক পুরুষের ব্যাখ্যা করিব। কপিলাদি মহর্ষিগণ অধ্যাত্মচিন্তাকে আশ্রয় করিয়া সামান্যরূপে ও বিশেষরূপে নানা শাস্ত্র বলিয়াছেন। কিন্তু বেদব্যাস বিস্তরতঃ যে পুরুষের একত্ব বলিয়াছেন, তাহা আমি তোমাকে বলিব। পরে সেই এক পুরুষকে সমস্ত আত্মার সাক্ষিভূত অন্তর্য্যামী

মহাপুরুষ বলিয়াছেন। সুতরাং মহাভারতের ঐ স্থলে যে, দ্বৈতমত খণ্ডিতই হইয়াছে,—ইহা আমরাও বুঝিতে পারি না। পরন্তু বুঝিতে পারি যে, উক্ত স্থলে অধ্যাত্ম-চিন্তাশ্রিত কপিল, কণাদ ও গৌতম প্রভৃতি ঋষিগণের বিভিন্নরূপ দ্বৈতমত-প্রতিপাদক সকল শাস্ত্রেরই সম্মান রক্ষিত হইয়াছে। কারণ, সেখানে বৈশম্পায়ন বলিয়াছেন—

"উৎসর্গেণাঽপবাদেন ঋষিভিঃ কপিলাদিভিঃ।
অধ্যাত্ম-চিন্তামাশ্রিত্য শাস্ত্রাণ্যুক্তানি ভারত॥
সমাসতস্তু যদ্ ব্যাসঃ পুরুষৈকত্বমুক্তবান্।
তত্তেঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি প্রসাদাদমিতৌজসঃ॥
মমান্তরাত্মা তব চ যে চান্যে দেহি-সংজ্ঞিতাঃ।
সর্ব্বেষাং সাক্ষিভূতোঽসৌ ন গ্রাহ্যঃ কেনচিৎ কচিৎ॥
তস্যৈকত্বং মহত্বঞ্চ স চৈকঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ।
মহাপুরুষশব্দং স বিভর্ত্ত্যেকঃ সনাতনঃ॥
(শান্তিপর্ব্ব—৩৫০—৩৫১ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।)

বস্তুতঃ মহাভারতে নানা স্থানে নানা মতের বর্ণন এবং কোন কোন স্থানে অদ্বৈতমতেরও বর্ণন হইয়াছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সমর্থিত ও প্রচারিত অদ্বৈতমতও বেদ-মূলক সুপ্রাচীন মত। কিন্তু নানা-প্রকার দ্বৈতমতও যে, বেদ-মূলক সুপ্রাচীন মত—ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য। পরে তত্ত্ববাদী মধ্বাচার্য্য প্রাচীন দ্বৈতমত-বিশেষের সমর্থন ও প্রচার করিবার জন্য সেই মতানুসারে উপনিষদের এবং 'ভগবদ্গীতা'রও ভাষ্য করিয়া গিয়াছেন। সকল মতই কখনই সকলের রুচিকর হয় না। কারণ, মানবগণের প্রকৃতির বৈচিত্র্যবশতঃ চিরকাল হইতেই বুদ্ধি-ভেদ হইতেছে। তাই গুরু-পরম্পরাক্রমে প্রাচীন কাল হইতেই নানা মতভেদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই পরমেশ্বরের কৃপা-প্রাপ্ত বহু মহর্ষি ও আচার্য্য, তাঁহারই প্রেরণায় বিভিন্ন প্রাচীন মতানুসারেই বিভিন্ন

সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই ভারতের পরমগৌরব ও পরম পূজ্য। আবার কোন কোন সময়ে সেই মায়ী মহেশ্বরের মায়ায় মোহিতবুদ্ধি অনেক মানব নিজের কর্ম্ম ও রুচি অনুসারে নানারূপ বিরুদ্ধ মতেরও উপদেশ করিয়াছেন। উদ্ধবের প্রশ্নোত্তরে শ্রীভগবান্ নিজেই ইহা বলিয়াছেন—

"এবং প্রকৃতি-বৈচিত্র্যাদ্ ভিদ্যন্তে মতয়ো নৃণাং।
পারম্পর্য্যেণ কেষাঞ্চিৎ, পাষণ্ডমতয়োঽপরে ॥
মন্মায়া-মোহিত-ধিয়ঃ পুরুষাঃ পুরুষর্ষভ।
শ্রেয়ো বদন্ত্যনেকান্তং যথাকর্ম্ম যথারুচি ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৪।৮।৯

শিষ্য। নানা মতভেদের অন্ধকারে প্রকৃত সিদ্ধান্ত-নিশ্চয় করিতে না পারিয়া যাঁহারা সতত সংশয়াত্মা, তাঁহাদিগের শ্রেয়ঃ কি?

গুরু। যুধিষ্ঠিরের ঐরূপ প্রশ্নের উত্তরে পিতামহ ভীষ্মদেব বলিয়াছিলেন যে, * সতত গুরুপূজা এবং বৃদ্ধগণের সর্ব্বতোভাবে উপাসনা ও নানা শাস্ত্রের শ্রবণই তাহাদিগের শ্রেয়ঃ। বস্তুতঃ শাস্ত্রে নানা মত থাকিলেও সকল মতেরই সাধনার প্রাচীন পদ্ধতি আছে। মতভেদ-প্রযুক্ত প্রকৃত অধিকারী কখনই সংশয়াত্মা হইয়া সাধনা ত্যাগ করেন নাই ও করেন না। কারণ, তিনি জানেন—"সংশয়াত্মা বিনশ্যতি" (গীতা)। গুরু ও বৃদ্ধগণের উপাসনা ও নানাশাস্ত্র শ্রবণ করিয়া নিজের অধিকার ও রুচি অনুসারে শাস্ত্রোক্ত যে মতে যাঁহার নিষ্ঠা জন্মিয়াছে, তিনি গুরুর

---

* যুধিষ্ঠির উবাচ—অতত্ত্বজ্ঞস্য শাস্ত্রাণাং সততং সংশয়াত্মনঃ।
অকৃতব্যবসায়স্য শ্রেয়ো ব্রূহি পিতামহ।
ভীষ্ম উবাচ— গুরুপূজা চ সততং বৃদ্ধানাং পর্য্যুপাসনং।
শ্রবণঞ্চৈব শাস্ত্রাণাং কূটস্থং শ্রেয় উচ্যতে ॥
—মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব, মোক্ষধর্ম্ম, ২৮৭ অঃ।

উপদেশানুসারে সেই মত গ্রহণ করিয়াই সাধনা করিতেছেন। ভক্তির অনুকূল পরম সাধনার প্রভাবে কালে যখন সাধকের সেই পরমেশ্বরে পরা ভক্তি জন্মে, সাধক যখন তদ্‌গত-চিত্ত ও তদ্‌গত-প্রাণ হইয়া সতত প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহার ভজন করেন, তখন তিনিই তাদৃশ ভক্ত সাধককে "বুদ্ধিযোগ" প্রদান করেন। তাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"মচ্চিত্তা মদগতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরং।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপয়ান্তি তে॥" গীতা ১০।৯।১০

বস্তুতঃ সেই পরমেশ্বরে পরাভক্তি ও শরণাগতির ফলে তাঁহারই পরমকৃপায় সাধক তাঁহার দর্শনলাভ করিয়া আত্মজ্ঞানলাভ করেন, ইহা শ্রুতি-সিদ্ধ। পরমেশ্বরে পরা ভক্তি ও শরণাগতির কথা যে উপনিষদে নাই—ইহা সত্য কথা নহে। (পূর্ব্ব ২১শ ও ২২শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কঠোপনিষদের "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা, বিবৃণুতে তনূং স্বাং" (১।২।২২) এই কথাও সেই পরমেশ্বরের কৃপারই কথা এবং উহাই সার কথা। শ্রীধর স্বামিপাদ ভক্তিকেই মুক্তির কারণ বলিলেও তিনিও আত্ম-জ্ঞানকে ভক্তির ব্যাপার বলিয়াছেন। পরমেশ্বরে পরা-ভক্তির ফলে তাঁহারই প্রসাদে আত্ম-বোধ জন্মে। তাই 'ভগবদ্‌গীতা'র টীকার শেষে শ্রীধর স্বামিপাদ বলিয়াছেন—

ভগবদ্ভক্তি-যুক্তস্য তৎপ্রসাদাত্ম-বোধতঃ।
সুখং বন্ধ-বিমুক্তিঃ স্যাদিতি গীতার্থ-সংগ্রহঃ॥

দশম অধ্যায়

ন্যায়-দর্শনে ঈশ্বর-তত্ত্ব

মহর্ষি গোতমের মতের ব্যাখ্যা করিতে ঈশ্বর হইতে জীবাত্মা, বস্তুতঃ ভিন্ন এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত কাহারই মুক্তি হইতে পারে না— এই কথা অনেকবার বলিয়াছি। সুতরাং গোতম ন্যায়দর্শনে ঈশ্বর-সম্বন্ধে তাঁহার কিরূপ সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন, ইহাও অবশ্য বক্তব্য। গোতম ন্যায়দর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ে নিম্নলিখিত তিনটি সূত্র বলিয়াছেন—

ঈশ্বরঃ কারণং, পুরুষকর্ম্মাফল্যদর্শনাৎ ॥ ৪।১।১৯ ॥

ন, পুরুষকর্ম্মাভাবে ফলানিষ্পত্তেঃ ॥ ৪।১।২০ ॥

তৎকারিতত্বাদহেতুঃ ॥ ৪।১।২১ ॥

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রভৃতির মতে উক্ত প্রথম সূত্রটি পূর্ব্বপক্ষ সূত্র। গোতম প্রথমে উক্ত সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষরূপে এই মতান্তর প্রকাশ করিয়াছেন যে, জীবের কর্ম্ম-নিরপেক্ষ ঈশ্বরই কারণ। যেহেতু জীবের কর্ম্মের বৈফল্য দেখা যায়। অর্থাৎ জীব কর্ম্ম করিলেও যখন অনেক সময়ে তাহা বিফল হয়, তখন জীবের কর্ম্ম কারণ নহে। ঈশ্বরই স্বেচ্ছানুসারে জগতের সৃষ্ট্যাদি ও সর্ব্বজীবের সুখ দুঃখাদি বিধান করেন।

বস্তুতঃ জীবের কর্ম্মাদি-নিরপেক্ষ ঈশ্বরই জগৎসৃষ্ট্যাদির কারণ, ইহাও একটি সুপ্রাচীন মত। প্রাচীনকালে উহারই নাম ছিল— **ঈশ্বরবাদ**। বৌদ্ধ পালিগ্রন্থ "মহাবোধিজাতকে" উক্ত মতের বর্ণন আছে। (জাতক পঞ্চম খণ্ড—২৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। "বুদ্ধ-চরিতে" (৯।৫৩) অশ্বঘোষও উক্ত মতের উল্লেখ করিয়াছেন। "সুশ্রুত-সংহিতা"র শারীর স্থানেও (১।১১) "স্বভাববাদ", "কালবাদ", "যদৃচ্ছাবাদ" ও

"নিয়তিবাদে"র সহিত উক্ত প্রাচীন "ঈশ্বরবাদে"রও উল্লেখ হইয়াছে। চতুর্ব্বিধ মাহেশ্বর সম্প্রদায়ের অন্যতম নকুলীশ পাশুপত সম্প্রদায় উক্ত মতই সমর্থন পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন। "সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে" মাধবাচার্য্য উক্ত মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যও "ন্যায়-কুসুমাঞ্জলি"র প্রথমে উক্ত মতকে মহাপাশুপত সম্প্রদায়ের মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

গৌতম পরে কর্ম্মবাদীর মত প্রকাশ করিতে দ্বিতীয় সূত্র বলিয়াছেন—**ন, পুরুষকর্ম্মাভাবে ফলানিষ্পত্তেঃ**। অর্থাৎ ঈশ্বরই জগৎ সৃষ্ট্যাদির কারণ নহেন। যেহেতু জীবের কর্ম্ম ব্যতীত ফল-নিষ্পত্তি হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, জীবের নিজকৃত কর্ম্ম-জন্য ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্টানুসারেই জীব তাহার ফলভোগ করে, সেই কর্ম্ম না করিলে জীব তাহার ফলভোগ করে না, অতএব জীবের শুভাশুভ কর্ম্ম-জন্য ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্টই জগৎ-সৃষ্ট্যাদির কারণ, ঈশ্বর কারণ নহেন।

গৌতম পূর্ব্বোক্ত মতদ্বয়েরই খণ্ডন করিতে পরে তাঁহার সিদ্ধান্তসূত্র বলিয়াছেন—**তৎকারিতত্বাদহেতুঃ**। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত মতদ্বয়ের সাধক-রূপে যে হেতু কথিত হইয়াছে, তাহা অহেতু। (হেতু নহে, হেত্বাভাস)। কেন উহা অহেতু? তাই বলিয়াছেন—**তৎকারিতত্বাৎ**। (তেন ঈশ্বরেণ কারিতত্বাৎ। "তদ্" শব্দদ্বারা প্রথম সূত্রোক্ত ঈশ্বরই গৃহীত হইয়াছেন)। অর্থাৎ জীবের সমস্ত কর্ম্ম ও তাঁহার ফল যখন ঈশ্বরকারিত, তখন কেবল ঈশ্বরই কারণ, অথবা কেবল অদৃষ্টই কারণ—ইহা বলা যায় না। কিন্তু জীবের কর্ম্ম ও ঈশ্বর উভয়ই জগৎ-সৃষ্ট্যাদির নিমিত্ত কারণ—ইহাই বক্তব্য। তাৎপর্য্য এই যে, জীবের কর্ম্ম-জন্য ধর্ম্মাধর্ম্মকে অপেক্ষা না করিয়া ঈশ্বরই স্বেচ্ছানুসারে জগতের সৃষ্টি ও সংহার করিলে তাঁহার বৈষম্য (পক্ষপাত) এবং নৈর্ঘৃণ্য (নির্দ্দয়তা) দোষের অপরিহার্য্য আপত্তি হয়। সুতরাং ঈশ্বর জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মানুসারেই জগতের

সৃষ্ট্যাদি করেন অর্থাৎ তিনি জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম-সাপেক্ষ কর্ত্তা—ইহাই সিদ্ধান্ত। বেদান্তদর্শনে ভগবান্ বাদরায়ণও বলিয়াছেন—"বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে, ন, সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি" ॥২।১।৩৪॥ *

বস্তুতঃ শ্রুতি স্পষ্ট বলিয়াছেন—"এষ হ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে। এষ হ্যেবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি, তং যমধোনিনীষতে" (কৌষীতকী ব্রাহ্মণ ৩।৮)। "পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন" (বৃহদারণ্যক ৩।২।১৩)। "কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতা-ধিবাসঃ" (শ্বেতাশ্বতর ৬।১১)। "স বা এষ মহানজ আত্মান্নাদো বসুদানঃ" (বৃহদারণ্যক ৪।৪।২৪)।

ফল কথা, পরমেশ্বরই জীবকে সাধু ও অসাধু কর্ম্ম করাইতেছেন। জীব, কর্ম্মের কর্ত্তা, ঈশ্বর সেই সমস্ত কর্ম্মেরই কারয়িতা অর্থাৎ হেতুকর্ত্তা বা প্রযোজক কর্ত্তা। আর তিনিই জীবের সর্ব্বকর্ম্মাধ্যক্ষ অর্থাৎ সমস্ত অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতা এবং তিনিই জীবের "**বসুদান**" অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্মের ফল-দাতা। সুতরাং জীবের কর্ম্ম-জন্য ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট যে, নিজেই তাহার ফলদান করে, তাহাতে ঈশ্বর অনাবশ্যক—ইহা শ্রুতির সিদ্ধান্ত নহে। কিন্তু সেই ঈশ্বরের অনুগ্রহেই অর্থাৎ সর্ব্ব জীবের সমস্ত অদৃষ্টে তাঁহার অধিষ্ঠানবশতঃই সেই সমস্ত অদৃষ্ট ফলজনক হয়—ইহাই শ্রুতির সিদ্ধান্ত। মহর্ষি গোতম পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় সূত্রের দ্বারা উক্ত শ্রৌত সিদ্ধান্তই প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও গোতমের উক্তরূপই তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন।†

---

* ভাষ্যকার শঙ্কর ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে নেশ্বরস্য প্রসজ্যেতে। কস্মাৎ? সাপেক্ষত্বাৎ। যদি হি নিরপেক্ষঃ কেবল ঈশ্বরো বিষমাং সৃষ্টিং নির্ম্মিমীতে, স্যাতামেতৌ দোষৌ বৈষম্যং নৈর্ঘৃণ্যঞ্চ, নতু নিরপেক্ষস্য নির্ম্মাতৃত্বমস্তি। সাপেক্ষো হীশ্বরো বিষমাং সৃষ্টিং নির্ম্মিমীতে। কিমপেক্ষত ইতি চেৎ? ধর্ম্মাধর্ম্মাবপেক্ষত ইতি বদামঃ। অতঃ সৃজ্যমান-প্রাণি-ধর্ম্মাধর্ম্মাপেক্ষা বিষমা সৃষ্টিরিতি নায়মীশ্বরস্যা-পরাধঃ।"

† 'পুরুষকারমীশ্বরোঽনুগৃহ্লাতি ফলায় পুরুষস্য যতমানস্যেশ্বরঃ ফলং সম্পাদয়তীতি।

গৌতম-মতের ব্যাখ্যাতা মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি"র প্রথম স্তবকে বিচার পূর্ব্বক যুক্তির দ্বারাও ইহা সমর্থন করিয়াছেন যে, জীবের শুভাশুভ কর্ম্মজন্য ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট অবশ্য স্বীকার্য্য। সুতরাং জীবের সেই অদৃষ্ট-সমষ্টির অধিষ্ঠাতৃস্বরূপে নিত্য সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর অবশ্য স্বীকার্য্য। তাৎপর্য্য এই যে, যেমন কুঠার প্রভৃতি অচেতন পদার্থ কোন চেতন পুরুষের অধিষ্ঠানবশতঃই ছেদনাদি ক্রিয়ার কারণ হয়; তদ্রূপ, জীবের অদৃষ্টসমষ্টিরূপ অচেতন পদার্থও কোন চেতন পুরুষের অধিষ্ঠান-বশতঃই জগৎসৃষ্ট্যাদির কারণ হইতে পারে। চেতন পুরুষের অধিষ্ঠান ব্যতীত অচেতন পদার্থ কখনই কার্য্য-জনক হয় না। কিন্তু অসর্ব্বজ্ঞ জীব কখনই তাহার অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতা হইতে পারে না। সুতরাং যিনি অনাদিকাল হইতে অসংখ্য জীবের অসংখ্য প্রকার অসংখ্য অদৃষ্টের প্রত্যক্ষ করিতেছেন এবং কোন্ সময়ে কোন্ স্থানে কোন্ অদৃষ্টের কিরূপ ফল হইবে, ইহাও প্রত্যক্ষ করিতেছেন, এমন কোন সর্ব্বদর্শী পুরুষ অবশ্য স্বীকার্য্য। তিনিই জীবের সমস্ত অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতা। সুতরাং তিনিই জীবের সর্ব্বকর্ম্মের ফল-দাতা। তাই শ্রুতি তাঁহাকেই বলিয়াছেন—"কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ"।

পূর্ব্বোক্ত শ্রৌত সিদ্ধান্তে পরমেশ্বর সাধু কর্ম্মের ন্যায় অসাধু কর্ম্মেরও কারয়িতা। কারণ, পূর্ব্বজন্মের যে কর্ম্মের ফলে ইহ জন্মে যে জীব, যে অসাধু কর্ম্ম করিয়া যে কালে তাহার যে ফলভোগ করিবে, তাহা সর্ব্ব-জীবের সর্ব্বকর্ম্মাধ্যক্ষ সর্ব্বজ্ঞ সেই পরমেশ্বরই জানেন এবং তিনিই জীবের সেই কর্ম্মেরও ফল-দাতা। সুতরাং জীবের পূর্ব্বজন্মকৃত সেই কর্ম্মানুসারে জীবকে সেই কর্ম্মফল-দানের জন্য তিনি জীবকে সেই জন্মে সেই অসাধু কর্ম্মও করান এবং জীবের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সেই সমস্ত কর্ম্মও তিনি

যদা ন সম্পাদয়তি, তদা পুরুষকর্ম্মাফলং ভবতীতি। তস্মাদীশ্বর-কারিতত্বাদহেতুঃ পুরুষ-কর্ম্মাভাবে ফলানিষ্পত্তেরিতি।" উক্ত সূত্রের ভাষ্য।

তৎপূর্ব্ব-পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মানুসারেই করাইয়াছেন। সৃষ্টিপ্রবাহ বা জীবের সংসার অনাদি—ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সমস্ত জীবের সমস্ত জন্মেই বিচিত্র শরীরসৃষ্টি যে, তাহাদিগের পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফল-ধর্ম্মাধর্ম্মজন্য—এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে মহর্ষি গৌতমও পূর্ব্বে বলিয়াছেন—**পূর্ব্বকৃত-ফলানুবন্ধাত্তদুৎপত্তিঃ।** ৩।২।৬০।*

কিন্তু ঈশ্বর জীবের সর্ব্বকর্ম্মের কারয়িতা হইলেও জীব নিজে তাহার কর্ত্তা। সুতরাং যে অবস্থায় যে সমস্ত মানবের পক্ষে যে সমস্ত কর্ম্ম পাপজনক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহারা ঈশ্বর-প্রেরিত হইয়া সেই কর্ম্ম করিলেও তজ্জন্য তাহাদিগের অপরাধ বা পাপ অবশ্যই হইবে। নচেৎ ঈশ্বর-প্রেরিত হইয়া সাধু কর্ম্ম করিলে তজ্জন্য পুণ্যই বা হইবে কেন? সুতরাং যেমন পিতার আদেশে বাধ্য হইয়া পুত্র কোন কুকর্ম্ম করিলে তাহারও তজ্জন্য অপরাধ হয় এবং সে জন্য তাহার পক্ষেও রাজদণ্ডের

---

* কেহ কেহ বলেন যে, গৌতমের মতে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর জীবের অতীত শুভাশুভ কর্ম্মানুসারেই জগতের কর্ত্তা এবং জীবের সুখ-দুঃখ-বিধাতা, অর্থাৎ গৌতম শুভাশুভ কর্ম্মজন্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নামক আত্মগুণ স্বীকার করেন নাই। কিন্তু উক্ত সূত্রে গৌতম "পূর্ব্বকৃত" শব্দের পরে "ফল" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও উক্তসূত্রে "পূর্ব্বকৃত" শব্দ ও "ফল" শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"পূর্ব্বশরীরে যা প্রবৃত্তির্ব্বাগ্-বুদ্ধি-শরীরারম্ভলক্ষণা, তৎ পূর্ব্বকৃতং কর্ম্মোক্তং, তস্য ফলং তজ্জনিতৌ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ।" পরন্তু গৌতম ন্যায়দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ে প্রথমেও "শরীরদাহে পাতকাভাবাৎ' (১।৪) এই সূত্রে "পাতক" শব্দের দ্বারা অধর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন। পরে তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে ৪১শ সূত্রেও সংস্কারের উদ্বোধকসমূহের উল্লেখ করিতে সর্ব্বশেষে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মেরও উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং নৈয়ায়িক সম্প্রদায় গৌতমের সূত্রানুসারেই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে জীবাত্মার গুণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৈশেষিক দর্শনের পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে মহর্ষি কণাদও ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ অদৃষ্টের উল্লেখ করিয়াছেন। বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ প্রভৃতিও ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম জীবাত্মার গুণ বলিয়া গিয়াছেন।

ব্যবস্থা আছে ; তদ্রূপ, মানবগণ ঈশ্বর-প্রেরিত হইয়া অসাধু কর্ম্ম করিলেও তজ্জন্য তাহাদিগের অপরাধ অবশ্যই হইবে এবং ঈশ্বরও তাহাদিগের পূর্ব্ব-পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুসারেই তাহাদিগকে অনাদিকাল হইতেই যথাকালে সেই সমস্ত অসাধু কর্ম্মেও প্রেরিত করিতেছেন। কারণ, তিনিই জীবের সর্ব্বকর্ম্মের ফল-দাতা।

বেদান্তদর্শনে বাদরায়ণও সিদ্ধান্তসূত্রে বলিয়াছেন—**পরাৎ তু তচ্ছ্রুতেঃ** (২।৩।৪১)। ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য পূর্ব্বে সেখানে জীবের কর্ত্তৃত্বকে উপাধিনিমিত্তক অবাস্তব বলিয়া সমর্থন করিলেও পরে উক্ত সূত্রানুসারে সেই কর্ত্তৃত্বকেও তিনি ঈশ্বরের অধীন বলিয়াছেন। জীবের কোন কর্ম্মেই তাহার কর্ত্তৃত্ব স্বাধীন নহে। তাই উক্ত বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার শঙ্করও স্পষ্ট বলিয়াছেন—"সর্ব্বাস্বেব প্রবৃত্তিষু ঈশ্বরো-হেতুকর্ত্তেতি শ্রুতে রবসীয়তে। তথাহি শ্রুতির্ভবতি—"এষ হ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি"—ইত্যাদি। অর্থাৎ জীবের সমস্ত কর্ম্মেই অন্তর্যামী ঈশ্বর প্রযোজক কর্ত্তা—এ বিষয়ে শ্রুতিই প্রমাণ। সুতরাং উহাই প্রকৃত সিদ্ধান্ত। আচার্য্য শঙ্কর সেখানে উহার পরবর্ত্তী বেদান্ত সূত্রের ভাষ্যে আশঙ্কিত দোষ-খণ্ডনের জন্য স্পষ্ট বলিয়াছেন যে * জীবের কর্ত্তৃত্ব ঈশ্বরের অধীন হইলেও জীব সেই সমস্ত কর্ম্ম অবশ্যই করে, নচেৎ ঈশ্বর তাহার কারয়িতা বা প্রযোজক কর্ত্তা হইতে পারেন না। সুতরাং ঈশ্বর জীবের পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারেই অনাদিকাল হইতে জীবকে কর্ম্ম করাইতেছেন। জীবের সংসার অনাদি বলিয়া সমস্ত জীবের সমস্ত জন্মেই ঈশ্বর, জীবের পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মানুসারে অন্য কর্ম্মের প্রযোজক কর্ত্তা হইতে পারেন।

---

* "নৈষ দোষঃ, পরায়ত্তেঽপি হি কর্তৃত্বে করোত্যেব জীবঃ। কুর্ব্বন্তং হি তমীশ্বরঃ কারয়তি। অপিচ পূর্ব্বপ্রযত্নমপেক্ষ্যেদানীং কারয়তি, পূর্ব্বতরঞ্চ প্রযত্নমপেক্ষ্যপূর্ব্বমকারয়দিত্যনাদিত্বাৎ সংসারস্যেত্যনবদ্যং"—শারীরক-ভাষ্য ২।৩।৪২

পরন্তু পূর্ব্বোক্ত বেদান্ত সূত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার শঙ্কর ইহাও—বলিয়াছেন, "তদনুগ্রহহেতুকেনৈব চ বিজ্ঞানেন মোক্ষসিদ্ধির্ভবিতুমর্হতি"। অর্থাৎ ঈশ্বরের অনুগ্রহ-হেতুক তত্ত্ব-জ্ঞানের দ্বারাই মোক্ষ-সিদ্ধি সম্ভব হয়। কারণ উহাও শ্রুতিসিদ্ধ। তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বর যাহাকে মুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে তিনিই মুক্তিসম্পাদক সাধু কর্ম্ম করান,—ইহাও "এষ হ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যের দ্বারা কথিত হইয়াছে। সুতরাং জীবের সংসারের ন্যায় মুক্তিও সেই ঈশ্বরের অধীন, ইহাও উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা সিদ্ধ হয়। মহর্ষি গৌতমও "এষ হ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি"—ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যানুসারেই পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সূত্রে বলিয়াছেন—**তৎকারিতত্বাৎ**। সুতরাং উক্ত বেদান্ত সূত্রের দ্বারা আচার্য্য শঙ্কর শেষোক্ত যে সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও গৌতমের উক্ত সূত্রের দ্বারা সূচিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ গৌতমের মতেও যে, পরমেশ্বরের অনুগ্রহেই মুক্তির কারণ তত্ত্বজ্ঞানলাভ হয়—ইহা চিরপ্রসিদ্ধ। তাই মাধবাচার্য্য প্রভৃতিও ইহা বলিয়া গিয়াছেন। *

অনেকে বলেন যে, কণাদ তাঁহার কথিত দ্রব্যাদি ষট্ পদার্থের মধ্যে এবং গৌতম তাঁহার কথিত প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের মধ্যে ঈশ্বরের উল্লেখ করেন নাই। তাঁহারা যে আত্মার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা জীবাত্মা। কারণ পরে আত্ম-নিরূপণে তাঁহারা জীবাত্মারই তত্ত্ব পরীক্ষা করিয়াছেন। এতদুত্তরে প্রথম বক্তব্য এই যে, গৌতম প্রমেয়

---

* "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে" (অক্ষপাদ-দর্শনে) গৌতম-মতের ব্যাখ্যা করিতে মাধবাচার্য্যও লিখিয়াছেন—"তস্মাৎ পরিশেষাৎ পরমেশ্বরানুগ্রহবশাৎ শ্রবণাদিক্রমেণাত্মতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারবতঃ পুরুষধৌরেয়স্য দুঃখ-নিবৃত্তি রাত্যন্তিকী নিঃশ্রেয়সমিতি নিরবদ্যং।" শঙ্করাচার্য্য-বিরচিত "সর্ব্বসিদ্ধান্ত সংগ্রহ" নামক গ্রন্থে 'বৈশেষিক-পক্ষ' (২২২ পৃঃ) এবং 'নৈয়ায়িক পক্ষ'ও (২২৮ পৃঃ) দ্রষ্টব্য।

পদার্থের মধ্যে প্রথমে "আত্মন্" শব্দের দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েরই উল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনি আত্মার লক্ষণ-সূত্রের দ্বারা পরমাত্মা ঈশ্বরের লক্ষণও বলিয়াছেন। ন্যায়সূত্র বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি সেইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরে প্রমেয় পদার্থের ব্যাখ্যায় তাহা বলিব। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন উক্ত স্থলে কোন কারণে ঈশ্বরের স্বরূপ-ব্যাখ্যা না করিলেও তাঁহার মতেও ঈশ্বরও আত্মা, তিনি জীবাত্মা হইতে ভিন্ন পরমাত্মা। কারণ, বাৎস্যায়ন পরে গৌতমের "তৎকারিতত্বাদহেতুঃ"—এই সূত্রের ভাষ্যে গৌতম-সম্মত ঈশ্বরের স্বরূপ-ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন—**গুণবিশিষ্টমাত্মান্তরমীশ্বরঃ। তস্যাত্মকল্পাৎ কল্পান্তরানুপপত্তিঃ।** তাৎপর্য্য এই যে, আত্মা দুই প্রকার,—জীবাত্মা ও পরমাত্মা। যিনি ঈশ্বর, তিনি আত্মারই দ্বিতীয় প্রকার। তাঁহাতেও আত্মত্ব আছে। তাই শাস্ত্রে তাঁহাকে পরমাত্মা বলা হইয়াছে। বাৎস্যায়ন পরে সেখানে আত্মার অস্তিত্ব-সাধক জ্ঞান যে, ঈশ্বরেও আছে, অর্থাৎ ঈশ্বরও জ্ঞানরূপ-গুণ-বিশিষ্ট আত্মা—ইহা সমর্থন করিয়াছেন। ফলকথা, তাঁহার মতেও ঈশ্বরও "আত্মন্" শব্দের বাচ্য হওয়ায় প্রমেয় পদার্থের বিভাগসূত্রে গৌতমোক্ত "আত্মন্" শব্দের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ আত্মাই বোধ্য। বাৎস্যায়ন সেখানে ঈশ্বরের স্বরূপ-ব্যাখ্যায় নিজমতানুসারে আরও যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, তাহাও অবশ্য দ্রষ্টব্য।

এইরূপ বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদও নববিধ দ্রব্য-পদার্থের উল্লেখ করিতে "আত্মন্" শব্দের দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েরই উল্লেখ করিয়াছেন। নচেৎ তাঁহার পদার্থ-গণনার ন্যূনতা হয়। তাই সেখানে "উপস্কার" টীকাকার শঙ্করমিশ্রও তাহাই বলিয়াছেন এবং তিনি তাঁহার "কণাদরহস্য" গ্রন্থেও কণাদোক্ত আত্মার ব্যাখ্যা করিতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা—এই দ্বিবিধ আত্মা বলিয়া পরে প্রমাণ দ্বারা সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মার অর্থাৎ ঈশ্বরেরও অস্তিত্ব সমর্থন করিয়াছেন। প্রাচীন

বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদও কণাদোক্ত পৃথিব্যাদি নববিধ দ্রব্যপদার্থের উল্লেখ করিয়া পরে বলিয়াছেন—"তদ্ব্যতিরেকেণান্যস্য সংজ্ঞানভিধানাৎ"। অর্থাৎ সমস্ত পদার্থের উপদেশের নিমিত্ত প্রবৃত্ত মহর্ষি কণাদ পূর্ব্বোক্ত নববিধ দ্রব্য-পদার্থ হইতে ভিন্ন কোন দ্রব্যের নাম না বলায় তাঁহার মতে নববিধই দ্রব্য পদার্থ।

তাহা হইলে প্রশস্তপাদের মতেও কণাদ যে, দ্রব্য পদার্থের মধ্যে "আত্মন্" শব্দের দ্বারা পরমাত্মা ঈশ্বরকেও গ্রহণ করিয়াছেন—ইহা স্বীকার্য্য। নচেৎ প্রশস্তপাদ পরে যে সৃষ্টি-সংহার-কর্ত্তা মহেশ্বরের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার মতে কণাদোক্ত কোন্ পদার্থ—ইহা বলা আবশ্যক। তাই প্রশস্তপাদের পূর্ব্বোক্ত উক্তির সমর্থন করিতে "ন্যায়-কন্দলী" টীকাকার শ্রীধরভট্ট শেষে বলিয়াছেন—"ঈশ্বরোঽপি বুদ্ধি-গুণত্বাদাত্মৈব"। অর্থাৎ বুদ্ধি বা জ্ঞান যাহার গুণ, তাহা "আত্মন্" শব্দের বাচ্য। নিত্যজ্ঞানরূপ বুদ্ধি যখন ঈশ্বরের গুণ, তখন ঈশ্বরও আত্মাই; তিনি আত্মা হইতে অন্য জাতীয় কোন দ্রব্য নহেন। * সুতরাং কণাদোক্ত দ্রব্য পদার্থের মধ্যে "আত্মন্" শব্দের দ্বারা ঈশ্বরও গৃহীত হইয়াছেন। ফলকথা, বৈশেষিক সম্প্রদায়ও প্রাচীন কাল হইতেই কণাদের সূত্রানুসারেই জগতের নিমিত্ত কারণ নিত্য সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর

---

* কণাদোক্ত রূপাদি গুণপদার্থ যে দ্রব্যপদার্থেই থাকে, ইহা গুণের লক্ষণে কণাদ নিজেই বলিয়াছেন। তন্মধ্যে সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ ও বিভাগ এই পঞ্চ সামান্য গুণ দ্রব্যমাত্রেরই গুণ, সুতরাং ঈশ্বরেরও গুণ—ইহা বুঝা যায়। আর জগৎ-কর্ত্তা ঈশ্বরের—জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্ন এই তিনটি বিশেষ গুণ অবশ্যই আছে। তাহা হইলে রূপাদি চতুর্ব্বিংশতি গুণের মধ্যে ঈশ্বরে অষ্ট গুণ আছে, ইহা বুঝা যায়। তাই কথিত হইয়াছে—"মহেশ্বরেঽষ্টৌ"। প্রাচীন কোন সম্প্রদায় ঈশ্বরের জ্ঞানশক্তি ভিন্ন ইচ্ছা ও প্রযত্ন অস্বীকার করিয়া ষড়্গুণ বলিয়াছিলেন। উদ্দ্যোতকর ও শ্রীধর ভট্ট উক্ত মতের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র ও উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি উক্ত মত স্বীকার করেন নাই।

সমর্থন করিয়াছেন। তাই শারীরকভাষ্যে (২।২।৩৭) আচার্য্য শঙ্করও বলিয়াছেন—**তথা বৈশেষিকাদয়োঽপি কেচিৎ কথঞ্চিৎ স্বপ্রক্রিয়ানুসারেণ নিমিত্তকারণমীশ্বর ইতি বর্ণয়ন্তি।**

তাহা হইলে কণাদ ও গৌতম, আত্মার তত্ত্ব-পরীক্ষা করিতে পরমাত্মা ঈশ্বরেরও তত্ত্ব-পরীক্ষা করেন নাই কেন? এতদুত্তরে প্রথম বক্তব্য এই যে—কণাদ ও গৌতম, তাঁহাদিগের কথিত সমস্ত পদার্থেরই বিচার দ্বারা তত্ত্ব পরীক্ষা করেন নাই। কিন্তু যে সমস্ত পদার্থের তত্ত্ব-পরীক্ষা প্রয়োজন বুঝিয়াছেন, তাহারই তত্ত্ব-পরীক্ষা করিয়াছেন। দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, তাঁহাদিগের মতে মুমুক্ষুর নিজ আত্মার অর্থাৎ জীবাত্মার সাক্ষাৎকারই সংসার-নিদান মিথ্যা-জ্ঞানের নিবৃত্তি করিয়া মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ হয়। তাই তাঁহারা সেই আত্মসাক্ষাৎ-কারের উপায়রূপে শ্রুতিবিহিত জীবাত্মার মনন যেরূপে কর্ত্তব্য, তাহারই উপদেশের জন্য জীবাত্মা যে, দেহাদি ভিন্ন ও নিত্য—এই বিষয়েই বিশেষরূপে অনুমান প্রমাণরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং সেখানে পরমাত্মা ঈশ্বরের তত্ত্ব পরীক্ষা না করায় তাঁহারা যে, ঈশ্বর-তত্ত্বজ্ঞানের আবশ্যকতা স্বীকার করিতেন না—ইহা প্রতিপন্ন হয় না। তৃতীয় বক্তব্য এই যে—গৌতম ন্যায়-দর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ে পূর্ব্বোক্ত তিন সূত্রের দ্বারা সংক্ষেপে ঈশ্বরতত্ত্ব-পরীক্ষাও করিয়াছেন এবং কণাদও জীবাত্মার পরীক্ষার পূর্ব্বেই দ্বিতীয় অধ্যায়ে অন্য প্রসঙ্গে পরমাত্মা ঈশ্বর বিষয়ে অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন করায় তদ্দ্বারা সামান্যতঃ ঈশ্বরের তত্ত্বপরীক্ষাও করিয়াছেন। তাই পরে তৃতীয় অধ্যায়ে আত্মার তত্ত্ব-পরীক্ষা করিতে তিনি কেবল জীবাত্মারই তত্ত্ব-পরীক্ষা করিয়াছেন।

এখন কণাদ কি প্রসঙ্গে কিরূপে ঈশ্বরবিষয়ে অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও এখানে সংক্ষেপে বলিতেছি। কণাদ বায়ুর অস্তিত্ব-সাধক অনুমান প্রদর্শন করিয়া তাহার "বায়ু" এই সংজ্ঞা-

বিষয়ে প্রমাণ প্রকাশ করিতে সূত্র বলিয়াছেন—**তস্মাদাগমিকং** (২।১।১৭)। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ অনুমান প্রমাণের দ্বারা বায়ু পদার্থের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইলেও উহার নাম যে, 'বায়ু' ইহা সিদ্ধ হয় না। অতএব উহার 'বায়ু' এই নাম "আগমিক" অর্থাৎ আগমসিদ্ধ। অর্থাৎ বেদ ব্যতীত স্বতন্ত্র কোন অনুমান প্রমাণের দ্বারা 'বায়ু' এই নাম জানা যায় না। কণাদ ইহার পরেই দুইটি সূত্র বলিয়াছেন—

সংজ্ঞাকর্ম্ম ত্বস্মদ্‌বিশিষ্টানাং লিঙ্গং ॥ ২।১।১৮ ॥

প্রত্যক্ষ-প্রবৃত্তত্বাৎ সংজ্ঞা-কর্ম্মণঃ ॥ ২।১।১৯ ॥

প্রথম সূত্রের দ্বারা কণাদ বলিয়াছেন যে, 'বায়ু' প্রভৃতি পদার্থের যে—সংজ্ঞাকর্ম্ম অর্থাৎ নামকরণ, তাহা "অস্মদ্‌বিশিষ্ট" অর্থাৎ আমাদিগের হইতে বিশিষ্ট পুরুষের 'লিঙ্গ' অর্থাৎ অস্তিত্ব-সাধক। দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা ইহা বুঝাইতে কণাদ বলিয়াছেন যে, যেহেতু সংজ্ঞাকর্ম্ম অর্থাৎ পদার্থের নামকরণ কর্ত্তার প্রত্যক্ষ-জন্য। তাৎপর্য্য এই যে, ঐ সমস্ত পদার্থের প্রত্যক্ষ ব্যতীত প্রথমে উহার নাম-নির্দ্দেশ করা যায় না। অতএব বেদোক্ত 'বায়ু' প্রভৃতি বহু নাম দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, ঐ সমস্ত নামের প্রতিপাদ্য পদার্থের প্রত্যক্ষকারী পুরুষই সেই নাম বলিয়াছেন। তাহা হইলে যিনি সর্ব্ব প্রথমে বেদে ঐ সমস্ত নাম বলিয়াছেন, সেই বেদ-কর্ত্তা আদিগুরুর সর্ব্বজ্ঞতা নিত্য-সিদ্ধ—ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, বেদ-রচনার পূর্ব্বে অন্য কোন উপায়েই কেহ সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়া বেদোক্ত ঐ সমস্ত নাম বলিতে পারেন না।

কণাদের পূর্ব্বোক্ত প্রথম সূত্রে "অস্মদ্‌বিশিষ্টানাং" এই বহুবচনান্ত পদের দ্বারা মহেশ্বর ও ব্রহ্মাদি ঈশ্বর তাঁহার বুদ্ধিস্থ—ইহাও বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু কণাদ পূর্ব্বে বলিয়াছেন—**তদ্বচনাদাম্নায়-প্রামাণ্যং**। (১।১।৩) উদয়নাচার্য্য উক্ত সূত্রে "তদ্‌" শব্দের দ্বারা ঈশ্বরই গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন "তেন ঈশ্বরেণ প্রণয়নাৎ।"

কিন্তু "ন্যায়কন্দলী" টীকায় (২১৬ পৃঃ) শ্রীধর ভট্ট উক্ত সূত্রে "তদ্" শব্দের দ্বারা কণাদের বুদ্ধিস্থ কি—ইহা বুঝাইতে কণাদের শেষোক্ত সূত্র বলিয়া "অস্মদ্‌বিশিষ্টস্য লিঙ্গমৃষেঃ" এইরূপ একটি সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেখানে তাঁহার ব্যাখ্যার দ্বারা উক্ত সূত্রে "অস্মদ্‌বিশিষ্টস্য" এই পাঠই প্রকৃত বুঝা যায়। উক্ত সূত্রে একবচনান্ত "ঋষি" শব্দের উল্লেখ লক্ষ্য করা আবশ্যক। উক্ত 'ঋষি' শব্দের দ্বারা বেদ-কর্ত্তা পরমেশ্বরই কণাদের বুদ্ধিস্থ—ইহা বুঝিবার কোন বাধা নাই। কারণ, "ঋষি" শব্দের একটি অর্থ—বেদার্থের দ্রষ্টা। পরমেশ্বরই সকল বেদার্থের আদি দ্রষ্টা ও সকলের আদি গুরু।

অবশ্য প্রচলিত বৈশেষিক দর্শনে উক্ত রূপ সূত্র পাওয়া যায় না। কিন্তু কণাদের অনেক সূত্র যে, বিলুপ্ত হইয়াছে—ইহাও নানা কারণে বুঝা যায়। যাহা হউক, ফলকথা, কণাদ কোন সূত্রে জগৎ-কর্ত্তা ঈশ্বরের নাম বিশেষের উল্লেখ না করিলেও তদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হয় না যে, তিনি ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। কারণ, ঈশ্বর বিষয়ে অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন করিলে তাহাতে ঈশ্বরের নাম বলা যায় না। সর্ব্বজ্ঞত্ব বা বেদ-কর্ত্তৃত্বাদিরূপেই ঈশ্বরের অনুমান হইতে পারে। তাই কণাদ পূর্ব্বোক্তরূপেই অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। মহর্ষি পতঞ্জলিও যোগদর্শনে "তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজং" (১।২৫) এই সূত্রের দ্বারা নিজ মতানুসারে নিত্য-সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের অস্তিত্ব-সাধক অনুমান প্রমাণই প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তদ্দ্বারা সেই ঈশ্বরের নাম ও অন্যান্য সমস্ত তত্ত্বের বিশেষ জ্ঞান হয় না। তাই ভাষ্যকার ব্যাসদেব সেখানে বলিয়াছেন—"তস্য সংজ্ঞাদিবিশেষ-প্রতিপত্তিরাগমতঃ পর্য্যন্বেষ্যা"। অর্থাৎ সেই ঈশ্বরের নাম ও অন্যান্য তত্ত্ব বেদাদি শাস্ত্র হইতে জানিতে হইবে। বৈশেষিক দর্শনের পূর্ব্বোক্ত স্থলে কণাদেরও উক্তরূপ তাৎপর্য্য বুঝা যায়। পরন্তু সেখানে পরে কণাদের **তস্মাদাগমিকং**—

এই পূর্ব্বোক্ত সূত্রের অনুবৃত্তি বুঝিয়া কণাদ যে, বায়ুর ন্যায় ঈশ্বরের নামাদিও "আগমিক" বলিয়া বেদাদিশাস্ত্র হইতেই তাহা জানিতে বলিয়াছেন—ইহাও অবশ্য বুঝা যায়। * সূত্রগ্রন্থে কোন কোন স্থলে পূর্ব্বকথিত সূত্রেরও পরে অনুবৃত্তি, সূত্রকারের অভিমত থাকে এবং সূত্রকার ঋষিদিগের স্বল্পাক্ষর সূত্রের দ্বারা বহু অর্থ সূচিত হয়, এই জন্যই উহার নাম সূত্র।

পরন্তু ইহাও জানা আবশ্যক যে, কোন শাস্ত্রকার শাস্ত্রান্তরোক্ত যে সমস্ত মতের খণ্ডন করেন নাই, অথবা যে সমস্ত মত তাঁহার মতের অবিরুদ্ধ, তাহা তাঁহার নিজেরও সম্মত—ইহা "অনুমত" নামক 'তন্ত্রযুক্তি'র দ্বারা বুঝা যায়। "সুশ্রুতসংহিতার" উত্তরতন্ত্রে তন্ত্রযুক্তি অধ্যায়ে ৩২ প্রকার তন্ত্রযুক্তি ও তাহার উদাহরণ কথিত হইয়াছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের শেষেও সেই সমস্ত তন্ত্রযুক্তির উল্লেখ দেখা যায়। তন্মধ্যে একটির নাম "অনুমত"। ন্যায়দর্শনের চতুর্থ সূত্রের ভাষ্য-শেষে বাৎস্যায়নও বলিয়াছেন—"পরমতমপ্রতিষিদ্ধমনুমতমিতি হি তন্ত্রযুক্তিঃ।" তাহা হইলে জগৎকর্ত্তা নিত্য সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর যে, কণাদেরও সম্মত—ইহা পূর্ব্বোক্ত "তন্ত্রযুক্তি"র দ্বারাও বুঝা যায়।

কিন্তু কণাদ ও গৌতমের মতে সেই ঈশ্বর যে, নিত্য জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ এবং বস্তুতঃ নির্গুণ—ইহা বুঝা যায় না। কারণ, কণাদের মতে পরমাত্মা ঈশ্বর দ্রব্য পদার্থের অন্তর্গত, সুতরাং সগুণ। জ্ঞান যে, আত্মারই গুণ—ইহা গৌতমও বিচার পূর্ব্বক সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং বুঝা যায় যে, তাঁহার মতেও পরমাত্মাও নিত্যজ্ঞানস্বরূপ নহেন; কিন্তু

* শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন—সূত্রঞ্চ বহ্বর্থ-সূচনাদ্ ভবতি। যথাহুঃ—"লঘূনি সূচিতার্থানি স্বল্পাক্ষরপদানি চ। সর্ব্বতঃ সারভূতানি সূত্রাণ্যাহুর্মনীষিণঃ"॥ ইতি। —"ভামতী"॥ ১।১।১।

নিত্য জ্ঞান তাঁহার গুণ। সৃষ্টি-সংহার কর্ত্তা এক তিনিই সর্ব্বদা সর্ব্ব-বিষয়ক-প্রত্যক্ষরূপ নিত্যজ্ঞানের আশ্রয়—এই অর্থে তিনি নিত্য সর্ব্বজ্ঞ *।

গৌতম মতের ব্যাখ্যা করিতে ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও বলিয়াছেন যে, জ্ঞানাদি গুণ-শূন্য ঈশ্বর কোন প্রমাণেরই বিষয় না হওয়ায় তাদৃশ ঈশ্বরকে কেহই উপপাদন করিতে সমর্থ নহেন। অর্থাৎ প্রমাণাভাবে নিগুর্ণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সিদ্ধই হয় না। পরন্তু শাস্ত্র দ্বারাও ঈশ্বর যে, সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানের আশ্রয়, অর্থাৎ সর্ব্ববিষয়ক নিত্যজ্ঞান তাঁহার গুণ—ইহাই বুঝা যায়। বাৎস্যায়নের তাৎপর্য্য এই যে, "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ" (মুণ্ডক ১।১।৯)—এই শ্রুতি বাক্যের দ্বারা ঈশ্বর যে, সামান্যতঃ ও বিশেষতঃ সর্ব্ববিষয়ক নিত্য জ্ঞানের আশ্রয়—ইহাই বুঝা যায়। পরন্তু বায়ুপুরাণের দ্বাদশ অধ্যায়েও মহেশ্বরের ষড়ঙ্গের বর্ণনায় সর্ব্বজ্ঞতাকে তাঁহার প্রথম অঙ্গ বলা হইয়াছে এবং জ্ঞান প্রভৃতি দশটী অব্যয় পদার্থ যে, সতত তাঁহাতে বর্ত্তমান আছে, ইহাও পরে কথিত হইয়াছে। যোগ-দর্শন-ভাষ্যের (১।২৫) টীকায় শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্রও বায়ুপুরাণের সেই সমস্ত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঈশ্বরের সেই জ্ঞানরূপ গুণও অব্যয় বা নিত্য। তাই বায়ুপুরাণে কথিত হইয়াছে—"অব্যয়ানি দশৈতানি নিত্যং তিষ্ঠন্তি শঙ্করে"।

পরন্তু বিষ্ণু-পুরাণে কথিত হইয়াছে—"সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ।" (১৯।৪৩)। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই ত্রিগুণ এবং অন্য কোন প্রাকৃত গুণ পরমেশ্বরে নাই।

* "ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়" গ্রন্থে নৈয়ায়িক মত-ব্যাখ্যারম্ভে জৈন পণ্ডিত হরিভদ্র সূরিও বলিয়াছেন—"আক্ষপাদ-মতে দেবঃ সৃষ্টি-সংহারকৃচ্ছিবঃ। বিভুর্নিত্যৈকসর্ব্বজ্ঞো নিত্য-বুদ্ধিসমাশ্রয়ঃ॥" উক্ত শ্লোকে "আক্ষপাদ" শব্দের অর্থ—অক্ষপাদমতাবলম্বী নৈয়ায়িক। হেমচন্দ্রসূরি "অভিধান-চিন্তামণি" গ্রন্থে বলিয়াছেন—"নৈয়ায়িক-স্ত্বাক্ষপাদঃ।"

রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণও পরমেশ্বরের সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্ত নির্গুণবাদের উক্তরূপ অর্থই বলিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে "সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ" এই বাক্যে এবং শাস্ত্রে অন্যত্রও "নির্গুণ" প্রভৃতি শব্দের উক্তরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে।

বস্তুতঃ "গুণ" শব্দের নানা অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে। 'সত্ত্ব', 'রজঃ' ও 'তমঃ'—এই নামত্রয়ে শাস্ত্রোক্ত ত্রিগুণও "গুণ" শব্দের সুপ্রসিদ্ধ অর্থ। কোষকার অমর সিংহও বলিয়াছেন—"গুণাঃ সত্ত্বং রজস্তমঃ।" পরমেশ্বর উক্ত ত্রিগুণাতীত। কিন্তু তিনি উক্ত ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে অপেক্ষা করিয়া তদনুসারেই সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করেন। নব্য নৈয়ায়িকগুরু গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও "তত্ত্ব চিন্তামণি"র মঙ্গলাচরণ শ্লোকে প্রথমে বলিয়াছেন—"গুণাতীতোঽপীশ **স্ত্রিগুণ-সচিব** স্ত্র্যক্ষরময়ঃ।" সেখানে 'রহস্য' টীকাকার মথুরানাথ তর্কবাগীশ বলিয়াছেন—"সত্ত্বাদয়শ্চ ন্যায়-নয়ে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়োৎপাদকা অদৃষ্টভেদা এবেতি নাপ্রসিদ্ধিঃ।" অর্থাৎ নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের মতে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের জনক জীবগত অদৃষ্ট-বিশেষই শাস্ত্রে 'সত্ত্ব', 'রজঃ' ও 'তমঃ'—এই নাম ত্রয়ে কথিত হইয়াছে। পরমেশ্বরে উহা না থাকায় তিনি গুণাতীত বা নির্গুণ বলিয়া কথিত হইয়াছেন। গঙ্গেশের পূর্ব্ববর্ত্তী উদয়নাচার্য্যের কথার দ্বারাও বুঝা যায় যে, নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের মতে সর্ব্বজীবের অদৃষ্টসমষ্টিই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি এবং উহা 'মায়া' ও 'অবিদ্যা' নামে কথিত হইয়াছে।* সে যাহা হউক, মূলকথা; কণাদ ও গৌতমের মতে পরমেশ্বর নিত্যজ্ঞানস্বরূপ নহেন, কিন্তু তিনি নিত্যজ্ঞানের আশ্রয়।

* "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি"র প্রথম স্তবকের শেষ শ্লোকে মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন যে, জীবগণের বিচিত্র যে সমস্ত অদৃষ্ট, তাহা সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে পরমেশ্বরের সহকারি-কারণরূপ শক্তিবিশেষ। উহা অতি দুর্জ্ঞেয় বলিয়া শাস্ত্রে "মায়া" নামে এবং সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে মূল বা প্রধান কারণ বলিয়া "প্রকৃতি" নামে এবং উহা তত্ত্বজ্ঞানরূপ

সত্য বটে, শ্রুতি বলিয়াছেন—"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম"। কিন্তু কণাদ ও গৌতমের মতে জ্ঞান ও আনন্দ, বিরুদ্ধ-স্বভাব পদার্থ-বলিয়া, যাহা জ্ঞানস্বরূপ, তাহা আনন্দ-স্বরূপ হইতে পারে না। সাংখ্যসূত্রকার স্পষ্ট বলিয়াছেন—"নৈকস্যানন্দ-চিদ্রূপত্বে দ্বয়োর্ব্বিরোধাৎ"। "দুঃখনিবৃত্তের্গৌণঃ" (৫।৬৭)। অর্থাৎ আত্মা নিরবচ্ছিন্ন-দুঃখাভাব-বিশিষ্ট—এই অর্থেই তাহাতে "আনন্দ" শব্দের গৌণ প্রয়োগ হইয়াছে। কিন্তু আত্মা আনন্দস্বরূপও নহে, তাহাতে আনন্দরূপ গুণও নাই। আত্মার সগুণত্ব-বাদী ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের অনেক গ্রন্থকারও "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" এই শ্রুতি বাক্যে "আনন্দং" এই ক্লীবলিঙ্গ প্রয়োগের দ্বারা ব্রহ্ম আনন্দ-বিশিষ্ট (আনন্দস্বরূপ নহেন) এবং তাঁহার সেই আনন্দও নিরবচ্ছিন্ন নিত্য দুঃখাভাবরূপ—ইহা বলিয়াছেন। কিন্তু নৈয়ায়িক-গুরু উদয়নাচার্য্য "কুসুমাঞ্জলি"র শেষে—দ্বিতীয় শ্লোকে পরমেশ্বরকে **আনন্দনিধি** বলিয়াছেন। "ন্যায়মঞ্জরী"কার জয়ন্তভট্ট সমর্থন করিয়াছেন যে, পরমেশ্বর নিত্য-সুখ-বিশিষ্ট। পরে নব্যনৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণিও উহাই স্বীকার করিয়াছেন এবং তিনি তাঁহার "দীধিতি"র মঙ্গলাচরণ শ্লোকেও বলিয়াছেন—**অখণ্ডানন্দবোধায় পূর্ণায় পরমাত্মনে**।‡

বিদ্যা-নাশ্য বলিয়া "অবিদ্যা" নামেও কথিত হইয়াছে। বিষ্ণু পুরাণেও উক্ত হইয়াছে—"অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে" (৬।৭।৬১)। অর্থাৎ জীবের কর্ম্ম বা অদৃষ্টরূপ যে অবিদ্যা, তাহা পরমেশ্বরের তৃতীয় শক্তি। বস্তুতঃ শাস্ত্রে "মায়া", "প্রকৃতি" ও "অবিদ্যা" শব্দের অনেক অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে। পরমেশ্বরের যে অঘটনঘটন-পটীয়সী ইচ্ছা শক্তি, তাহাও "মায়া" নামে কথিত হইয়াছে। উদয়নাচার্য্য প্রভৃতির মতে উহারই নাম "আত্ম-মায়া"। আর পরমেশ্বর জীবের অদৃষ্টসমষ্টিরূপ "গুণমায়া"র অধিষ্ঠাতা—এই অর্থেও শ্রুতি তাঁহাকে "মায়ী" বলিয়াছেন। "তস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ"। "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরং"। (শ্বেতাশ্বতর উপ)

‡ রঘুনাথ শিরোমণির উক্ত উক্তি উদ্ধৃত করিয়া কেহ অনেকবার তাঁহাকে অদ্বৈত-মতানুরাগী বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। পরে তিনি আবার তাঁহার "অদ্বৈতসিদ্ধির"

উদয়নাচার্য্যের পূর্ব্বে সর্ব্ব-তন্ত্র-স্বতন্ত্র বাচস্পতি মিশ্র নৈয়ায়িক মতের সমর্থন করিতে "ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্যটীকা"য় (চতুর্থ অঃ ২য় আহ্নিকের প্রারম্ভে) লিখিয়াছেন—"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেতি শ্রুতিরানন্দ-চৈতন্য-শক্ত্যভিপ্রায়া"। অর্থাৎ এই মতে পরব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দ-স্বরূপ নহেন, কিন্তু তিনি নিত্য চৈতন্যশক্তি-বিশিষ্ট ও নিত্য আনন্দশক্তি-বিশিষ্ট—ইহাই উক্ত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য।* পরমেশ্বরের স্বাভাবিক অনন্ত শক্তির মধ্যে তাঁহার চৈতন্যশক্তি ও আনন্দশক্তিই প্রধান, ইহা প্রকাশ করিতেই শ্রুতি তাঁহার স্বরূপ বর্ণনে পূর্ব্বোক্ত তাৎপর্য্যে বলিয়াছেন—"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম"। এই মতে পরমেশ্বরের সেই স্বাভাবিক চৈতন্য-শক্তি ব্যতীত জীবের কখনই চৈতন্য জন্মিতে পারে না এবং তাঁহার সেই স্বাভাবিক আনন্দ শক্তি ব্যতীত জীবের কখনই কোন আনন্দ জন্মিতে পারে না। তাই এই তাৎপর্য্যে উক্ত তৈত্তিরীয় উপনিষদেই কথিত হইয়াছে—"কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আনন্দো ন স্যাৎ, এষ হ্যেবানন্দয়তি"। পরমেশ্বরের স্বাভাবিক পরিপূর্ণ চৈতন্যশক্তিই শাস্ত্রে 'চিচ্ছক্তি' নামে এবং তাঁহার সেই পরিপূর্ণ আনন্দ-শক্তিই শাস্ত্রে "হ্লাদিনী শক্তি" নামে কথিত হইয়াছেন। কিন্তু তিনিই সেই শক্তির একমাত্র আধার। তাই শাস্ত্রে ঐ তাৎপর্য্যে তিনি 'চিন্ময়', 'আনন্দময়' ও

ভূমিকায় (২৯৫ পৃষ্ঠায়) ইহাও লিখিয়াছেন যে, "জগদীশ অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক হইলেও, অদ্বৈত বেদান্তের অনুরাগী ছিলেন। কারণ, শিরোমণির "অখণ্ডানন্দবোধায়" পদের অদ্বৈতপর ব্যাখ্যাই করিয়াছেন"। কথাটা কিন্তু একেবারেই অসত্য। কারণ টীকাকার জগদীশ প্রথমেই শিরোমণির ঐ বাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"অখণ্ডৌ নিত্যৌ আনন্দ-বোধৌ যস্য তস্মৈ"। আর রঘুনাথ শিরোমণি নিজেই যে, "আত্মতত্ত্ব-বিবেকে"র টীকার শেষে "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম"—এই শ্রুতি বাক্যের দ্বারা সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরে নিত্য জ্ঞান ও নিত্য আনন্দই সমর্থন করিয়াছেন—ইহাও দেখা আবশ্যক। সুতরাং তাঁহার মঙ্গলাচরণ শ্লোকে "অখণ্ডানন্দবোধায়"—এই বিশেষণ পদে যাহাতে নিত্য আনন্দ ও নিত্য জ্ঞান আছে, এই অর্থে বহুব্রীহি সমাসই তাঁহার অভিপ্রেত, বুঝা যায়।

ঈশ্বর' প্রভৃতি নামেও কথিত হইয়াছেন। পরন্তু শাস্ত্রে অনেক স্থলে তাঁহার সেই শক্তির প্রাধান্য-বিবক্ষাবশতঃ এবং অনেক স্থলে সেই শক্তিমানের প্রাধান্য-বিবক্ষাবশতঃ এবং অনেক স্থলে সেই শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ-বিবক্ষাবশতঃ সেইরূপ বর্ণন হইয়াছে—ইহাও প্রণিধান পূর্ব্বক বুঝা আবশ্যক।

বস্তুতঃ পরমেশ্বরের স্বরূপ অতি দুর্জ্ঞেয়। বেদাদি শাস্ত্রে তাঁহাকে বাক্য ও মনের অগোচর বলিয়া এবং তাঁহাতে নানা বিরুদ্ধ ভাবের বর্ণন করিয়া তাঁহার সেই অতিদুর্জ্ঞেয়ত্বই ব্যক্ত করা হইয়াছে। কত সাধক যে, কত প্রকারে তাঁহার ধ্যানাদি করিয়া অবস্থা-বিশেষে কত প্রকারে তাঁহার দর্শন করিয়াছেন এবং অনেকে তখন সেই রূপেই তাঁহার স্তুতিও করিয়াছেন,—তাহা বর্ণন করা অসম্ভব। কত সাধক নিজের আচার্য্যের উপদেশানুসারে তাঁহাকে অদ্বিতীয় জ্ঞানস্বরূপ বলিয়াই ধ্যানাদি করায় সময়ে তাঁহাকে সেই জ্ঞানস্বরূপই দর্শন করিয়া সেই রূপেই তাঁহার স্তুতি করিয়াছেন। বিষ্ণু পুরাণে (১।৪) সনন্দনের সেইরূপ স্তুতি বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ নিজ আচার্য্যের উপদেশানুসারে কত সাধক তাঁহাকে নিত্য জ্ঞানের আশ্রয় বলিয়াও ধ্যানাদি করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। মাধবাচার্য্যও "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে"র প্রারম্ভে তাঁহাকে নমস্কার করিতে বলিয়াছেন—"নিত্যজ্ঞানাশ্রয়ং বন্দে নিঃশ্রেয়সনিধিং শিবং"।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা। অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্ম যোগেন চাপরে ।। (গীতা, ১৩।২৪)। কিন্তু অন্য অনেকে উক্ত ধ্যানযোগাদি না জানিয়া অন্যান্য গুরুর নিকটে নিজের অধিকারানুসারে ধ্যানাদির উপদেশ শ্রবণ করিয়া সেই রূপেই উপাস্য দেবের উপাসনা করেন। তাঁহারাও সেই গুরুর উপদেশে দৃঢ় শ্রদ্ধা ও সেই উপাস্যদেবে পরাভক্তির প্রভাবে কালে তাঁহার দর্শন পাইয়া জ্ঞানলাভ ও মুক্তিলাভ করেন। তাই শ্রীভগবান্ পরে বলিয়াছেন—

"অন্যে ত্বেব মজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥"

গীতা—১৩।২৫।

আর করুণাময় তিনিই বলিয়াছেন—**যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।** (গীতা—৪।১১) সুতরাং যে কোন প্রকারেই হউক, তাঁহার শরণাগত হইয়া তাঁহাকে আত্ম-নিবেদন করিলেই তিনি তখন তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করান। তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইবার জন্য নানা সাধক নানা পথে যাত্রা করিয়াছেন। কারণ, মানবগণের রুচির বৈচিত্র্যবশতঃ সকল পথেই সকলের রুচি ও অধিকার সম্ভব হয় না। কিন্তু যেমন বর্ষাকালে সরল ও বক্র নানা পথে ধাবমান সমস্ত জলই ভিন্ন ভিন্ন পথে যাইয়াও পরে সেই এক মহাসমুদ্রকেই প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ সাধকগণ নিজ নিজ বিচিত্র রুচি অনুসারে আচার্য্যের উপদেশে বেদাদি শাস্ত্রোক্ত ভিন্ন ভিন্ন মতকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অবলম্বন করিলেও কালে সেই পরমেশ্বরে পরাভক্তির প্রভাবে সকলেই এক তাঁহাকেই প্রাপ্ত হন। তাঁহার পরম ভক্ত গন্ধর্ব্বরাজ পুষ্পদন্ত তাঁহারই কৃপায় ঐ মহাসত্যের উপলব্ধি করিয়া তাঁহার **মহিম্নঃ স্তোত্রে** তাঁহাকে ঐ কথাও বলিয়াছেন। পরিশেষে আমরাও সেই পুষ্পদন্তের কথাই বলি, **হে মহেশ্বর**!

"ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্য মিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যা দৃজুকুটিল নানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব" ॥

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

একাদশ অধ্যায়

ন্যায়-দর্শনে প্রমাণ পদার্থের ব্যাখ্যা

এই গ্রন্থের দশম অধ্যায় পর্য্যন্ত প্রথম খণ্ডে প্রধানতঃ ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতানুসারে অনেক দার্শনিক সিদ্ধান্ত যথামতি বিচারপূর্ব্বক ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এখন দ্বিতীয় খণ্ডে 'ন্যায়দর্শনে'র প্রতিপাদ্য প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের পরিচয়-প্রকাশ কর্ত্তব্য। মহর্ষি গৌতম প্রথম সূত্র বলিয়াছেন—

"প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তা-
বয়ব-তর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভাস-ছল-
জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্ব-জ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ" ॥

অর্থাৎ (১) প্রমাণ, (২) প্রমেয়, (৩) সংশয়, (৪) প্রয়োজন, (৫) দৃষ্টান্ত, (৬) সিদ্ধান্ত, (৭) অবয়ব, (৮) তর্ক, (৯) নির্ণয়, (১০) বাদ, (১১) জল্প, (১২) বিতণ্ডা, (১৩) হেত্বাভাস, (১৪) ছল, (১৫) জাতি ও (১৬) নিগ্রহস্থানের (উক্ত ষোড়শ প্রকার পদার্থের) তত্ত্বজ্ঞান প্রযুক্ত নিঃশ্রেয়স-লাভ হয়।

এখানে প্রথমে বলা আবশ্যক যে, ন্যায়সূত্র-কার গৌতম প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থমাত্রবাদী অর্থাৎ তাঁহার মতে আর কোন পদার্থ নাই— এইরূপ সংস্কার অনেকের আছে। কিন্তু মহর্ষি গৌতম উক্ত প্রথম সূত্রে তাঁহার সম্মত পদার্থের কোন সংখ্যা-নিয়ম প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার মতে যাহা কোন প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয়, তাহাই সামান্যতঃ পদার্থরূপ প্রমেয়। তাই নৈয়ায়িক সম্প্রদায় **অনিয়তপদার্থবাদী** বলিয়া কথিত হইয়াছেন। **ন্যায়লীলাবতী** গ্রন্থে (৭২২ পৃঃ) বল্লভাচার্য্যও

বলিয়াছেন—"নৈয়ায়িকানামনিয়ত-পদার্থবাদিত্বেন বিরোধাভাবাৎ।" বস্তুতঃ কণাদোক্ত দ্রব্যাদি ষট্ পদার্থ এবং অভাব পদার্থও গৌতমের সম্মত। পরে প্রমেয় পদার্থের ব্যাখ্যায় ইহা ব্যক্ত হইবে। কিন্তু নিঃশ্রেয়স-লাভের উপযোগী প্রমাণাদি ষোড়শ প্রকার পদার্থই ন্যায়দর্শনের প্রতিপাদ্য। তাই ন্যায়দর্শনের বক্তা মহর্ষি গৌতম প্রথম সূত্রে উক্ত প্রমাণাদি পদার্থেরই উদ্দেশ করিয়াছেন। উক্ত সূত্রের দ্বারা আর কোন পদার্থ নাই—ইহা তাঁহার বিবক্ষিত নহে।

প্রথমে প্রতিপাদ্য পদার্থের নাম না বলিলে তাহার প্রতিপাদন বা নিরূপণ সম্ভবই হয় না। প্রতিপাদ্য পদার্থের সামান্য নাম ও বিশেষ নাম-কথনকে **উদ্দেশ** বলে। উদ্দেশের পরে সেই উদ্দিষ্ট পদার্থের **লক্ষণ** এবং পরে সেই লক্ষণানুসারে সন্দিগ্ধ বিষয়ে বিচাররূপ পরীক্ষার দ্বারা তত্ত্ব-নির্ণয় কর্ত্তব্য। তাই ন্যায়দর্শনের প্রবৃত্তি বা উপদেশ ব্যাপার ত্রিবিধ—(১) উদ্দেশ, (২) লক্ষণ ও (৩) পরীক্ষা। ন্যায়দর্শনের প্রতিপাদ্য পদার্থের মধ্যে দ্বিতীয় **প্রমেয়** পদার্থ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ হইলেও প্রমাণ পদার্থই সকল পদার্থের ব্যবস্থাপক। কারণ, প্রমাণ ব্যতীত কিছুই সিদ্ধ হয় না। তাই মহর্ষি গৌতম প্রথম সূত্রে প্রথমে **প্রমাণ** পদার্থেরই উদ্দেশ করিয়াছেন। পরে উক্ত প্রমাণ পদার্থের বিশেষ নিরূপণের জন্য উহার বিভাগ করিতে তৃতীয় সূত্র বলিয়াছেন—

প্রত্যক্ষানুমানোপমান-শব্দাঃ প্রমাণানি॥

(১) প্রত্যক্ষ, (২) অনুমান, (৩) উপমান ও (৪) শব্দ, প্রমাণ। অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি নামে প্রমাণ চতুর্ব্বিধ। কিন্তু প্রমাণ কাহাকে বলে অর্থাৎ প্রমাণের সামান্য লক্ষণ কি? ইহা প্রথমে না বুঝিলে প্রমাণের বিশেষ লক্ষণ বুঝা যায় না। সামান্য জ্ঞান ব্যতীত বিশেষ জ্ঞান সম্ভব হয় না। সুতরাং প্রশ্ন হয় যে, মহর্ষি গৌতম তাঁহার উদ্দিষ্ট "প্রমাণ" পদার্থের সামান্য লক্ষণ না বলিয়া

প্রথমেই উহার বিভাগ করিয়াছেন কেন ? ভাষ্যকার প্রভৃতির ব্যাখ্যার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উত্তর বুঝা যায় যে, উক্ত তৃতীয় সূত্রে শেষোক্ত **প্রমাণ** শব্দের দ্বারাই প্রমাণের সামান্য লক্ষণ সূচিত হওয়ায় সূত্রকার এখানে পৃথক্ করিয়া প্রমাণের সামান্য-লক্ষণ-সূত্র বলেন নাই। উক্ত একই সূত্রের দ্বারা প্রমাণের সামান্য লক্ষণ ও চতুর্ব্বিধত্ব তাঁহার বিবক্ষিত। "ন্যায়মঞ্জরী"কার জয়ন্ত ভট্ট ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন—"একেনানেন সূত্রেণ দ্বয়ঞ্চাহ মহামুনিঃ। প্রমাণেষু চতুঃসংখ্যং তথা সামান্যলক্ষণং॥"

বস্তুতঃ উক্ত **প্রমাণ** শব্দটি প্র-পূর্ব্বক মা-ধাতুর উত্তর করণ বাচ্য ল্যুট্ প্রত্যয় সিদ্ধ। প্রপূর্ব্বক 'মা' ধাতুর অর্থ—প্রকৃষ্ট জ্ঞান। সেই প্রকৃষ্ট জ্ঞান দ্বিবিধ,—অনুভূতি ও স্মৃতি। কিন্তু স্মৃতির করণ অনুভূতিকে স্মৃত বিষয়ে পৃথক্ প্রমাণ বলা অনাবশ্যক। কারণ, সেই স্মৃত বিষয়ে তাহার পূর্ব্বানুভূতির করণই প্রমাণ। কোন বিষয়ে কোন প্রমাণজন্য পূর্ব্বানুভূতি ব্যতীত পরে তাহার স্মৃতি হইতে পারে না। সুতরাং উক্ত স্থলে প্র-পূর্ব্বক 'মা' ধাতুর দ্বারা প্রকৃষ্ট অনুভূতিই গ্রাহ্য। তাহা হইলে "প্রমাণ" শব্দের ব্যুৎপত্তির দ্বারা বুঝা যায়, প্রকৃষ্ট অনুভূতির করণ অর্থাৎ যদ্দ্বারা যে বিষয়ে যথার্থ অনুমিতি জন্মে, তাহাই সে বিষয়ে প্রমাণ পদার্থ। সুতরাং যথার্থ অনুভূতির করণত্বই প্রমাণের সামান্য লক্ষণ, ইহা উক্ত সূত্রে "প্রমাণ" শব্দের দ্বারা সূচিত হইয়াছে। গৌতমের মতে সেই অনুভূতি চতুর্ব্বিধ—(১) প্রত্যক্ষ, (২) অনুমিতি, (৩) উপমিতি ও (৪) শাব্দ বোধ। সুতরাং তাহার মতে প্রত্যক্ষাদি নামে প্রমাণ চতুর্ব্বিধ। তাই তিনি বলিয়াছেন—**প্রত্যক্ষানুমানোপমান-শব্দাঃ প্রমাণানি॥**

প্রত্যক্ষ প্রমাণের সত্তা ব্যতীত কোন প্রমাণেরই সত্তা সিদ্ধ হয় না। তাই মহর্ষি গৌতম প্রমাণ-বিভাগে প্রথমে প্রত্যক্ষ প্রমাণেরই উদ্দেশ করিয়া পরে উহার লক্ষণার্থ বলিয়াছেন—

ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞান মব্যপদেশ্য-
মব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্ ॥ ১।১।৪ ॥

উক্ত সূত্রে "ইন্দ্রিয়" শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে, ঘ্রাণ, রসনা, চক্ষুঃ, ত্বক্, শ্রোত্র এবং মন, এই ষড়িন্দ্রিয়। "অর্থ" শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে—সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত তাহার গ্রাহক ইন্দ্রিয়-বিশেষের যে সন্নিকর্ষ অর্থাৎ সম্বন্ধ-বিশেষ, তাহাই **ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ**। সেই ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষজন্য যে অব্যভিচারি জ্ঞান অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান জন্মে, তাহারই নাম **প্রত্যক্ষ প্রমা**। সেই প্রত্যক্ষ প্রমার যাহা করণ, তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। গৌতম প্রত্যক্ষ প্রমার লক্ষণই বলিয়াছেন। কারণ, যাহা প্রমা জ্ঞানের করণ, তাহাই প্রমাণ—ইহা পূর্ব্বে "প্রমাণ" শব্দের দ্বারাই সূচিত হওয়ায় প্রত্যক্ষ প্রমার লক্ষণ বলিলেই প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ বুঝা যায়।

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রভৃতি প্রাচীন আচার্য্যগণের মতে কার্য্যের যাহা চরম কারণ, তাহাই মুখ্য করণ। সুতরাং ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষই পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষ প্রমার চরম কারণ বলিয়া উহাই মুখ্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এবং সেই প্রত্যক্ষ প্রমাও হান-বুদ্ধি, উপাদান-বুদ্ধি ও উপেক্ষা-বুদ্ধির চরম কারণ হওয়ায় উহাও প্রমাণ। কারণ, কোন বিষয়ের যথার্থ প্রত্যক্ষের পরে সেই বিষয় ত্যাজ্য বলিয়া বুঝিলে ত্যাগ করে এবং উপাদেয় অর্থাৎ গ্রাহ্য বলিয়া বুঝিলে গ্রহণ করে এবং উপেক্ষ্য বলিয়া বুঝিলে উপেক্ষা করে। যে বুদ্ধির দ্বারা ত্যাগ করে, তাহার নাম হান-বুদ্ধি এবং যে বুদ্ধির দ্বারা উপাদান বা গ্রহণ করে, তাহার নাম উপাদান-বুদ্ধি এবং যে বুদ্ধির দ্বারা উপেক্ষা করে—তাহার নাম উপেক্ষা-বুদ্ধি। পূর্ব্বোক্ত হানাদি বুদ্ধিই প্রমাণের চরম ফল। সুতরাং উহার করণ যে প্রমা জ্ঞান, তাহাও প্রমাণ বলিয়া স্বীকার্য্য। অনেকের মতে মহর্ষি গৌতম ঐ তাৎপর্য্যেই উক্ত সূত্রে প্রত্যক্ষ প্রমাকেই চরম প্রত্যক্ষ

প্রমাণরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। অবশ্য প্রাচীন নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ও প্রত্যক্ষ প্রমার প্রযোজক ইন্দ্রিয়কেও প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের মতে সেই প্রত্যক্ষ প্রমার চরম কারণ যে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ এবং তজ্জন্য যে প্রত্যক্ষ প্রমা, তাহাই মুখ্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

কিন্তু গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক নব্য নৈয়ায়িক পরে বিচার-পূর্ব্বক ইহাই বলিয়াছেন যে, যাহা কোন ব্যাপারের দ্বারা কার্য্য উৎপন্ন করে, তাহাই কারণের মধ্যে "করণ" নামক কারণ। কিন্তু যে কারণ কোন ব্যাপারকে অপেক্ষা না করিয়াই কার্য্য উৎপন্ন করে, সেই নির্ব্যাপার চরম কারণ "করণ" নহে। সুতরাং বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ-বিশেষ-রূপ যে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ, তাহা প্রত্যক্ষ প্রমার করণ না হওয়ায় প্রত্যক্ষ প্রমাণ নহে। কিন্তু সেই ইন্দ্রিয়ই সেখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কারণ, পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ সেই ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার। তদ্দ্বারা সেই ইন্দ্রিয়ই সেই প্রত্যক্ষের করণ হইয়া থাকে। তাই "চক্ষুষা পশ্যতি"—"ঘ্রাণেন জিঘ্রতি" ইত্যাদি প্রয়োগে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ই দর্শনাদি প্রত্যক্ষের করণরূপে কথিত হয়। কারণ, যাহার ব্যাপারের অনন্তর ক্রিয়ার নিষ্পত্তি বিবক্ষিত হয়, তাহাই করণ। "বাক্যপদীয়" গ্রন্থে শাব্দিক-শিরোমণি ভর্তৃহরিও বলিয়াছেন—"ক্রিয়ায়াঃ পরিনিষ্পত্তি-যদ্ব্যাপারাদনন্তরং। বিবক্ষ্যতে তদা তত্র করণং তৎ প্রকীর্ত্তিতং"।

মনের সহিত আত্মার বিলক্ষণ সংযোগ এবং সেই ইন্দ্রিয়-বিশেষের সহিত মনের সংযোগ এবং সেই গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত সেই ইন্দ্রিয়ের সংযোগাদি সম্বন্ধরূপ কোন সন্নিকর্ষ, জন্য-প্রত্যক্ষের কারণ। আরও অনেক সামান্য কারণ আছে। কিন্তু তন্মধ্যে গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষকেই বিশেষ কারণরূপে গ্রহণ করিয়া গৌতম পূর্ব্বোক্ত সূত্রে জন্য-প্রত্যক্ষের লক্ষণ প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন—**ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানং**। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য—গুণ, ক্রিয়া ও জাতি প্রভৃতি

পদার্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ সম্বন্ধ সম্ভব নহে। * তাই গৌতম উক্ত সূত্রে "সংযোগ" শব্দের প্রয়োগ না করিয়া "সন্নিকর্ষ" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। উহার দ্বারা সংযোগ সম্বন্ধের ন্যায় অন্যান্য সম্বন্ধ-বিশেষও গৃহীত হইয়াছে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত সেই ইন্দ্রিয়ের যেস্থলে যেরূপ সম্বন্ধ সেই প্রত্যক্ষের জনক হয়, তাহাই সেই স্থলে "ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ" শব্দের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। প্রাচীন ন্যায়াচার্য্য উদ্দ্যোতকর—লৌকিক প্রত্যক্ষের জনক উক্ত লৌকিক সন্নিকর্ষকে ষট্ প্রকার বলিয়াছেন। যথা—

(১) সংযোগ, (২) সংযুক্ত সমবায়, (৩) সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়, (৪) সমবায়, (৫) সমবেত-সমবায়, (৬) বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাব।

বহিরিন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষুরিন্দ্রিয় ও ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারাই দ্রব্যবিশেষের প্রত্যক্ষ জন্মে। সেই প্রত্যক্ষে সেই দ্রব্যবিশেষের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয় ও ত্বগিন্দ্রিয়ের সংযোগ সম্বন্ধই যথাক্রমে সেই দ্রব্যের চাক্ষুষ ও ত্বাচ প্রত্যক্ষের কারণ ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ। কণাদ ও গৌতমের মতে চক্ষুরিন্দ্রিয় তৈজস পদার্থ। প্রদীপের ন্যায় উহার প্রভা বা রশ্মি আছে। সেই রশ্মি বহির্গত হইয়া সেই গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হওয়ায় তদ্দ্বারা তাহার সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের (১) সংযোগরূপ সন্নিকর্ষ জন্মে। অন্যান্য বহিরিন্দ্রিয় স্বস্থানে অবস্থিত থাকিয়াই তাহার গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট হয়। পরে "প্রমেয়" পদার্থের ব্যাখ্যায় এ বিষয়ে গৌতমের কথা বলিব।

চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা যেমন ঘটের প্রত্যক্ষ জন্মে; তদ্রূপ, সেই ঘটস্থ রূপ এবং সেই রূপস্থ রূপত্বাদি জাতিরও প্রত্যক্ষ জন্মে। কিন্তু সেই রূপাদির

---

* মহর্ষি কণাদ গুণ পদার্থের মধ্যে সংযোগের উল্লেখ করিয়াছেন এবং দ্রব্য পদার্থকেই গুণের আশ্রয় বলিয়াছেন এবং তৎপরে গুণ ও ক্রিয়াকে নির্গুণ বলিয়াছেন। সুতরাং উক্ত মতে গুণাদিপদার্থে সংযোগরূপ গুণ জন্মে না, দ্রব্য পদার্থেই অপর দ্রব্যের সংযোগরূপ গুণ জন্মে। (বৈশেষিক দর্শন ১ম অঃ ১ম আঃ ৬ষ্ঠ, ১৫শ ১৬শ ১৭শ সূত্র দ্রষ্টব্য।)

সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগ সম্বন্ধ সম্ভব না হওয়ায় "সংযুক্ত-সমবায়" নামক দ্বিতীয় প্রকার এবং "সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়" নামক তৃতীয় প্রকার সন্নিকর্ষ স্বীকৃত হইয়াছে। কণাদোক্ত "সমবায়" নামক সম্বন্ধ গৌতমেরও সম্মত। ঘটের রূপ সেই ঘটে সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে এবং সেই রূপে রূপত্ব জাতি এবং নীলত্ব পীতত্ব প্রভৃতি জাতি-বিশেষও সমবায় সম্বন্ধেই বিদ্যমান থাকে। এই মতে ঘটের রূপ সেই ঘট হইতে ভিন্ন পদার্থ এবং রূপত্বাদি জাতিও সেই রূপ হইতে ভিন্ন পদার্থ। সুতরাং চক্ষুঃ-সংযুক্ত ঘটের সহিত তাহার রূপের এবং সেই রূপের সহিত রূপত্বাদি জাতির তাদাত্ম্য সম্বন্ধ সম্ভব না হওয়ায় রূপের প্রত্যক্ষে চক্ষুঃ-সংযুক্ত-তাদাত্ম্য এবং রূপত্বাদি জাতির প্রত্যক্ষে চক্ষুঃ-সংযুক্ত-তাদাত্ম্য-বিশিষ্টের তাদাত্ম্যকে সন্নিকর্ষ বলা যায় না। তাই ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের সম্মত উক্ত উভয় সন্নিকর্ষ স্বীকার না করিয়া ঘটের রূপের প্রত্যক্ষে (২) "চক্ষুঃ-সংযুক্ত-সমবায়"কে ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষ বলিয়াছেন এবং রূপত্বাদি জাতির প্রত্যক্ষে (৩) "চক্ষুঃ-সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়"কে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ বলিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে চক্ষুঃসংযুক্ত ঘটের সহিত তাহার রূপের সমবায় নামক সম্বন্ধ থাকায় সেই রূপের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের (২) "সংযুক্ত-সমবায়" নামক সন্নিকর্ষ সম্ভব হয় এবং সেই রূপের সহিত রূপত্বাদি জাতির সমবায় সম্বন্ধ থাকায় সেই রূপত্বাদির সহিত চক্ষু-রিন্দ্রিয়ের (৩) "সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়" নামক সন্নিকর্ষ সম্ভব হয়।

যে পদার্থে যাহা সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে, সেই পদার্থে তাহাকে "সমবেত" বলা হয়। চক্ষুঃ-সন্নিকৃষ্ট ঘটে সমবেত অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান যে রূপ, তাহাতে রূপত্বাদি জাতি সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকায় সেই রূপত্বাদি জাতিতে—চক্ষুঃ-সংযুক্ত ঘটে সমবেত সেই রূপের যে সমবায় সম্বন্ধ আছে, তাহাই ঐ স্থলে "সংযুক্ত-সমবেত-

সমবায়" শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে। সংযুক্তে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযোগি-বিশিষ্ট দ্রব্যে যাহা সমবেত অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান, তাহার সমবায় নামক সম্বন্ধই উক্ত "সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়" শব্দের অর্থ। এইরূপ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গন্ধ এবং তদ্গত গন্ধত্বাদি জাতির প্রত্যক্ষে এবং রসনেন্দ্রিয়ের দ্বারা রস ও তদ্গত রসত্বাদি জাতির প্রত্যক্ষে এবং ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা স্পর্শ ও তদ্গত স্পর্শত্বাদি জাতির প্রত্যক্ষে যথাক্রমে ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের (২) "সংযুক্ত-সমবায়" এবং (৩) "সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়" সন্নিকর্ষ বুঝিতে হইবে। গন্ধাদি গুণ-বিশিষ্ট দ্রব্যই উক্ত-স্থলে যথাক্রমে ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত।

এইরূপ অন্তরিন্দ্রিয় মনের দ্বারা—আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি জানিতেছি, আমি ইচ্ছা করিতেছি, ইত্যাদি প্রকারে জীবগণ নিজ নিজ আত্মাতে উৎপন্ন সুখ, দুঃখ, জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রযত্ন ও দ্বেষ নামক বিশেষ গুণের যে মানস প্রত্যক্ষ করে—তাহাতে মনঃ-সংযুক্ত-সমবায়ই সন্নিকর্ষ এবং তখন জীবের নিজ আত্মারও যে মানস প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহাতে সেই আত্মার সহিত তাহার সেই মনের বিলক্ষণ সংযোগই সন্নিকর্ষ এবং সুখাদিগত সুখত্ব দুঃখত্ব প্রভৃতি জাতির যে মানস প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহাতে মনঃ-সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়ই তৃতীয় প্রকার সন্নিকর্ষ। মনঃ-সংযুক্ত সেই আত্মাতে সমবায় সম্বন্ধে তাহার সুখ দুঃখাদি গুণ বিদ্যমান হওয়ায় উহা মনঃ-সংযুক্ত-সমবেত। তাহাতে সুখত্বাদি জাতি সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকায় সেই সমস্ত জাতির সহিত মনের উক্তরূপ সন্নিকর্ষ (সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়) সম্ভব হয়।

শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দের প্রত্যক্ষে সেই শব্দের সহিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের (৪) **সমবায়** সম্বন্ধই চতুর্থ প্রকার সন্নিকর্ষ এবং সেই শব্দগত শব্দত্ব ও তীব্রত্ব, মন্দত্ব প্রভৃতি জাতির প্রত্যক্ষে তাহার সহিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের (৫) **সমবেত-সমবায়ই** পঞ্চম প্রকার সন্নিকর্ষ স্বীকৃত হইয়াছে।

কণাদ ও গৌতমের মতে শ্রবণেন্দ্রিয়-রূপ আকাশে উৎপন্ন ও তাহাতে সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান সেই শব্দেরই তখন শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং সেই শব্দের সহিত তখন শ্রবণেন্দ্রিয়ের **সমবায়** সম্বন্ধ রূপ সন্নিকর্ষ এবং সেই শব্দস্থ শব্দত্ব এবং তীব্রত্ব ও মন্দত্ব প্রভৃতি জাতির সহিত **সমবেত-সমবায়**-রূপ সন্নিকর্ষ ঘটে। শ্রবণেন্দ্রিয়ে সমবেত অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান যে শব্দ, তাহার সমবায় সম্বন্ধই উক্ত স্থলে "সমবেত-সমবায়" শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে।

এইরূপ প্রত্যক্ষবিষয় পদার্থের সমবায় নামক সম্বন্ধেরও প্রত্যক্ষ হয় এবং অনেক অভাব পদার্থেরও প্রত্যক্ষ হয়। তাই সমবায় সম্বন্ধ ও অভাব পদার্থের প্রত্যক্ষে (৬) 'বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাব' অর্থাৎ **বিশেষণতা** নামক ষষ্ঠ প্রকার সন্নিকর্ষ স্বীকৃত হইয়াছে।* ঐ 'বিশেষণতা' অতিরিক্ত কোন সম্বন্ধ নহে, উহা বিশেষণ ও বিশেষ্য-স্বরূপ। যে 'বিশেষণতা' সম্বন্ধে কোন পদার্থে সমবায় সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে, সেই 'বিশেষণতা' সেই বিশেষণ-ভূত সমবায় সম্বন্ধ-স্বরূপ অর্থাৎ উহা হইতে কোন অতিরিক্ত পদার্থ নহে। সুতরাং স্বাত্মক স্বরূপ সম্বন্ধেই সমবায় সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকায় সমবায় সম্বন্ধের সম্বন্ধ ও তাহার সম্বন্ধ প্রভৃতির আপত্তিরূপ অনবস্থা দোষের সম্ভাবনা নাই। এইরূপ কোন অভাব

---

* উক্ত সন্নিকর্ষের ব্যাখ্যায় "ন্যায়বার্ত্তিকে" উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন—"সমবায়ে চাভাবে চ বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাবাদিতি"। সুতরাং সমবায় সম্বন্ধ এবং অভাব পদার্থ ও তাহার প্রত্যক্ষতা, প্রাচীন নৈয়ায়িক সম্প্রদায়েরও সম্মত বুঝা যায়। কিন্তু বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতে সমবায় সম্বন্ধ অনুমেয়। বৈশেষিক দর্শনের "উপস্কারে" (৭।২।২৮) শঙ্কর মিশ্র বলিয়াছেন—"প্রত্যক্ষঃ সমবায় ইতি নৈয়ায়িকাঃ, তদপ্যনুপপন্নং, সমবায়োঽতীন্দ্রিয়ঃ"—ইত্যাদি। বৈশেষিক দর্শনের নবম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে কণাদ অভাব পদার্থ ও তাহার প্রত্যক্ষতা সমর্থন করিয়াছেন। ন্যায় দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে (৮।৯।১০।১১।১২) মহর্ষি গৌতমও তাহা সমর্থন করিয়াছেন।

পদার্থ, যে কালে যে আধারে বিদ্যমান থাকে, তৎকালীন সেই আধাররূপ বিশেষ্যই সেই অভাবের সম্বন্ধ। সেই আধার হইতে সেই অভাব ভিন্ন পদার্থ। কিন্তু তৎকালীন সেই আধারস্বরূপ সম্বন্ধেই তাহাতে সেই অভাব থাকে এবং প্রত্যক্ষের সমস্ত কারণ থাকিলে পূর্ব্বোক্ত "বিশেষণতা" বা **স্বরূপসম্বন্ধ**-বিশেষরূপ সন্নিকর্ষ জন্য তাহার প্রত্যক্ষ হয়। এই সমস্ত বিষয় ভালরূপ বুঝিতে হইলে "সিদ্ধান্তমুক্তাবলী" প্রভৃতি মূলগ্রন্থ গুরুর নিকট পাঠ করা আবশ্যক।

এখন বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বিবিধ—(১) লৌকিক ও (২) অলৌকিক। লৌকিক সন্নিকর্ষ-জন্য যে প্রত্যক্ষ, তাহা লৌকিক প্রত্যক্ষ। পূর্ব্বোক্ত ষট্ প্রকার সন্নিকর্ষই লৌকিক সন্নিকর্ষ। আর অলৌকিক সন্নিকর্ষ জন্য যে প্রত্যক্ষ, তাহার নাম অলৌকিক প্রত্যক্ষ। সেই অলৌকিক সন্নিকর্ষ তিন প্রকার যথা—(১) **সামান্য লক্ষণ** সন্নিকর্ষ (২) **জ্ঞান লক্ষণ** সন্নিকর্ষ (৩) **যোগজ** সন্নিকর্ষ। পূর্ব্বোক্ত সূত্রে "সন্নিকর্ষ" শব্দদ্বারা উক্ত ত্রিবিধ সন্নিকর্ষও গৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে কোন পদার্থের সামান্য ধর্ম্ম-বিষয়ক প্রত্যক্ষই "সামান্য-লক্ষণ" সন্নিকর্ষ। যেমন গোমাত্রের সামান্য ধর্ম্ম গোত্ব। ধূম মাত্রের সামান্য ধর্ম্ম ধূমত্ব ইত্যাদি। প্রথমে কোন গোদর্শন করিলে তাহাতে গোমাত্রের সামান্য ধর্ম্ম গোত্বের প্রত্যক্ষ হওয়ায় সেই সামান্যধর্ম্ম-প্রত্যক্ষরূপ সন্নিকর্ষ-জন্য অন্যান্য সমস্ত গোর অলৌকিক প্রত্যক্ষ জন্মে। কেন উহা স্বীকার্য্য, তাহাও এখানে সংক্ষেপে বক্তব্য।

উক্ত "সামান্য-লক্ষণ" সন্নিকর্ষবাদী নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের প্রথম কথা এই যে—উক্ত 'সন্নিকর্ষ' ও তজ্জন্য ঐরূপ প্রত্যক্ষ স্বীকার না করিলে কোন গো দর্শনের পরে কাহারও সামান্যতঃ গোমাত্রে শৃঙ্গবত্তার সংশয় অথবা ঐরূপ অন্য কোন ধর্ম্মের সংশয় জন্মিতে পারে না। এইরূপ পাকশালায় ধূম ও বহ্নি এই উভয় দেখিলেও ধূম, বহ্নির ব্যাপ্য কিনা অর্থাৎ ধূমযুক্ত

সমস্ত স্থানেই বহ্নি থাকে কিনা? এইরূপ সংশয়ও অনেকের জন্মে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত স্থলে চক্ষুঃ-সংযুক্ত যে গোর শৃঙ্গ দর্শন হইয়াছে, তাহাতে শৃঙ্গবত্তার সংশয় জন্মিতে পারে না এবং পাকশালায় দৃষ্ট সেই ধূমে বহ্নি-সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ হওয়ায় তাহাতে পূর্ব্বোক্তরূপ সংশয় জন্মিতে পারে না। সুতরাং ইহা স্বীকার্য্য যে, পূর্ব্বোক্ত স্থলে যে সমস্ত গো, চক্ষুঃ-সংযুক্ত নহে অর্থাৎ সেখানে যে সমস্ত গোর লৌকিক প্রত্যক্ষ হয় নাই, সেই সমস্ত গো বিষয়েই শৃঙ্গবত্তার সংশয় জন্মে এবং যে সমস্ত ধূম, চক্ষুঃ-সংযুক্ত নহে, সেই সমস্ত ধূম বিষয়েই 'ধূমো বহ্নি-ব্যাপ্যো নবা' এইরূপ সংশয় জন্মে।

কিন্তু সেই সমস্ত গো এবং সেই সমস্ত ধূমের কোনরূপ প্রত্যক্ষ না হইলে সেই অপ্রত্যক্ষ ধর্ম্মীতে কোন ধর্ম্মের সংশয়াত্মক প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে না। অতএব ইহা স্বীকার্য্য যে, উক্ত স্থলে গোত্বরূপ সামান্যধর্ম্মের প্রত্যক্ষ জন্য গোমাত্রেরই প্রত্যক্ষ জন্মে এবং সেই প্রত্যক্ষ, অন্যান্য সমস্ত গো বিষয়ে অলৌকিক প্রত্যক্ষ। এইরূপ ধূমত্বাদি সামান্যধর্ম্মের প্রত্যক্ষ জন্য সমস্ত ধূমাদির প্রত্যক্ষও বুঝিতে হইবে। পরন্তু পাকশালায় ধূমত্বরূপে সমস্ত ধূমের প্রত্যক্ষ না হইলে সেখানে ধূমত্বরূপে ধূমমাত্রেই বহ্নির ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ অপ্রত্যক্ষ ধর্ম্মীতে কোন ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ সম্ভব নহে। সুতরাং প্রথমেই ধূমত্বরূপে সকলধূমে বহ্নিত্বরূপে বহ্নিমাত্রের ব্যাপ্তি-নিশ্চয় সমর্থন করিতেও পূর্ব্বোক্ত "সামান্য-লক্ষণ" সন্নিকর্ষ স্বীকার্য্য। কারণ, উক্তরূপ সামান্য-ব্যাপ্তি নিশ্চয় ব্যতীত ধূমত্বরূপে ধূম হেতুর দ্বারা বহ্নিত্বরূপে বহ্নির অনুমান হইতে পারে না।

পরন্তু সিদ্ধ পদার্থে ইচ্ছা জন্মে না এবং সর্ব্বথা অজ্ঞাত বিষয়েও ইচ্ছা জন্মে না। সুতরাং জীবের—যে ভাবী সুখ বিষয়ে ইচ্ছা জন্মে, তৎপূর্ব্বে সেই সুখের কোন প্রকার জ্ঞান আবশ্যক। কিন্তু কিরূপে তাহা সম্ভব হইতে পারে? সুখত্বরূপে অন্যান্য সুখ পূর্ব্বে জ্ঞাত হইলেও ইচ্ছার

বিষয় ভাবী সুখবিশেষ, পূর্ব্বে কিরূপে জ্ঞাত হইবে? সুতরাং ইহাই স্বীকার্য্য যে, পূর্ব্বে সুখবিশেষের মানস প্রত্যক্ষ হওয়ায় তাহাতে সুখমাত্রের সামান্য ধর্ম্ম যে সুখত্ব, তাহারও মানস প্রত্যক্ষ হয়। পরে সেই সামান্যধর্ম্মের প্রত্যক্ষরূপ অলৌকিক সন্নিকর্ষজন্য অতীত ও ভবিষ্যৎ সমস্ত সুখেরই অলৌকিক মানস প্রত্যক্ষ জন্মে। সুতরাং উক্তরূপে ভাবী সুখও পূর্ব্বে জ্ঞাত হওয়ায় তদ্‌বিষয়ে ইচ্ছা জন্মিতে পারে।

অবশ্য পরে নব্যনৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি "তত্ত্বচিন্তামণি"র প্রত্যক্ষ খণ্ডে "সামান্যলক্ষণা" গ্রন্থের "দীধিতি" টীকায় উক্ত 'সামান্য-লক্ষণ' সন্নিকর্ষের খণ্ডন করিতে ভাবী সুখবিষয়ে অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তিনি নবীনভাবে বহু সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছেন। "অদ্বৈতসিদ্ধি" গ্রন্থে মহামনীষী মধুসূদন সরস্বতীও নৈয়ায়িক সম্মত উক্ত সন্নিকর্ষের খণ্ডন করিতে বহু বিচার করিয়াছেন। বিশেষ জিজ্ঞাসু তাহা অবশ্য পাঠ করিবেন। সংক্ষেপে সে সমস্ত বিচারের কিছুই ব্যক্ত করা যায় না। কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে, উক্ত 'সামান্য-লক্ষণ' সন্নিকর্ষের সমর্থনেও বহু বিচার হইয়াছে। আর উক্ত সন্নিকর্ষ যে, সর্ব্ব প্রথমে নব্যনৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায়ই সমর্থন করেন—ইহা সত্য নহে।*

---

*গঙ্গেশের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী টীকাকার শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্রও ন্যায়মতের ব্যাখ্যায় উহা সমর্থন করিয়াছেন। উহা অস্বীকার করিলে ধূমাদি হেতুতে সামান্যতঃ ব্যাপ্তি-নিশ্চয়ের আশা নপুংসককে বিবাহ করাইয়া মুগ্ধা রমণীর পুত্র-প্রার্থনার ন্যায় নিষ্ফল—এইরূপ কথাও তিনি "তাৎপর্য্যটীকা"য় (২৯পৃঃ) বলিয়াছেন। তাই "খণ্ডনখণ্ড খাদ্য" গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে ব্যাপ্তিপ্রভৃতি পদার্থ খণ্ডন করিতে গঙ্গেশের পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রীহর্ষও বাচস্পতি মিশ্রের ঐ কথার উল্লেখ করিতে বলিয়াছেন—"ইন্দ্রিয়েণ সামান্যলক্ষণয়া প্রত্যাসত্ত্যা ব্যাপ্তি-গ্রহণকালে সর্ব্বাস্তজ্জাতীয়ব্যক্তয়ো গৃহ্যন্তে, যদনভ্যুপগমে ষণ্ডক মুদ্বাহ্য মুগ্ধায়াঃ পুত্র-প্রার্থনমিবেতি বাচস্পতি রূপালম্ভ মবাদীদিতি চেৎ?" শ্রীহর্ষ সেখানে বলিয়াছেন যে, "সামান্যলক্ষণা" প্রত্যাসত্তি স্বীকার করিলে কোন পদার্থে সমস্ত পদার্থের সামান্য ধর্ম্ম প্রমেয়ত্ব প্রভৃতির প্রত্যক্ষ-জন্য সমস্ত পদার্থেরই প্রত্যক্ষ স্বীকার্য্য হওয়ায় প্রমেয়ত্বরূপে

দ্বিতীয় প্রকার অলৌকিক সন্নিকর্ষের নাম **জ্ঞানলক্ষণ** সন্নিকর্ষ। উহা 'জ্ঞান-লক্ষণা প্রত্যাসত্তি' নামেও কথিত হইয়াছে। নব্য নৈয়ায়িক-গণ অনেক স্থলে উহাকে **উপনয়** নামে উল্লেখ করিয়াছেন এবং সেই 'উপনয়' সন্নিকর্ষ জন্য অলৌকিক প্রত্যক্ষকে **উপনীত ভান** বলিয়াছেন। নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের মতে ভ্রমাত্মক প্রত্যক্ষ অর্থাৎ রজ্জুতে সর্প ভ্রম, শুক্তিতে রজত ভ্রম, মরীচিকায় জল ভ্রম প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত 'জ্ঞানলক্ষণ' সন্নিকর্ষ জন্য অলৌকিক প্রত্যক্ষ বিশেষ। কারণ, ঐ সমস্ত ভ্রমস্থলে সেখানে বস্তুতঃ সর্পাদি বিষয় না থাকায় বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের কোন লৌকিক সন্নিকর্ষ সম্ভবই নহে। পরন্তু যাহা অসৎ বা অলীক, তাহা ভ্রম জ্ঞানেরও বিষয় হয় না। কারণ যে বিষয়ে প্রমাজ্ঞান অসম্ভব, সে বিষয়ে ভ্রম জ্ঞান হইতে পারে না। অতএব কোন সৎ পদার্থেরই অপর সৎপদার্থে ভ্রম হয়,—ইহাই স্বীকার্য্য। তাহা হইলে রজ্জু প্রভৃতিতে স্থানান্তরে বিদ্যমান সর্পাদি বিষয়েরই ভ্রম হয় এবং পূর্ব্বোক্ত 'জ্ঞানলক্ষণ' সন্নিকর্ষই সেই প্রত্যক্ষের চরম কারণ—ইহাও স্বীকার্য্য।

পূর্ব্বোক্তরূপ ভ্রম প্রত্যক্ষের যাহা করণ, তাহা কোন মতেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ নহে। অব্যভিচারী অর্থাৎ যথার্থ প্রত্যক্ষের করণই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তাই মহর্ষি গৌতম পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষলক্ষণ-সূত্রে পরে বলিয়াছেন—**অব্যভিচারি**। † কিন্তু ভ্রম প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ জন্য

সকল পদার্থের প্রত্যক্ষকারী মানবগণকেও সর্ব্বজ্ঞ বলা যায়। কিন্তু 'সর্ব্বজ্ঞ' শব্দের অর্থ কি? সমস্ত পদার্থের প্রত্যেকের সমস্ত ধর্ম্মরূপে প্রত্যক্ষ ব্যতীত কাহাকেও সর্ব্বজ্ঞ বলা যায় না। উক্তরূপ বিশেষজ্ঞানই সর্ব্বজ্ঞতা। তাই "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে উক্ত বিশেষ জ্ঞান বোধের জন্যই আবার বলা হইয়াছে—"সর্ব্ববিৎ"। "সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলীতে" বিশ্বনাথও উক্ত আপত্তির উল্লেখ পূর্ব্বক খণ্ডন করিতে লিখিয়াছেন—"প্রমেয়ত্বেন সকলপ্রমেয়ে জ্ঞাতেঽপি বিশিষ্য সকলপদার্থানা মজ্ঞাতত্বেন সার্ব্বজ্ঞাভাবাৎ"।

† ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন গৌতমোক্ত ঐ "অব্যভিচারি" পদের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে লিখিয়াছেন—"যদতস্মিংস্তদিতি তদ্ ব্যভিচারি। যৎ তু তস্মিংস্তদিতি তদব্যভিচারি

না হইলে "ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপন্নং" এই প্রথম পদের দ্বারাই ভ্রম প্রত্যক্ষের বারণ হওয়ায় পরে "অব্যভিচারি" এই পদের প্রয়োগ ব্যর্থ হয়। সুতরাং মহর্ষি গৌতমের উক্ত পদের দ্বারাও বুঝা যায় যে, ভ্রম প্রত্যক্ষের জনক কোন সন্নিকর্ষও তাঁহার সম্মত এবং প্রথম পদে "সন্নিকর্ষ" শব্দের দ্বারা তাহাও গৃহীত হইয়াছে।

পরন্তু এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, মহর্ষি গৌতম উক্ত সূত্রে প্রথম পদে......'সন্নিকর্ষ-জন্যং' এইরূপ না বলিয়া "সন্নিকর্ষ" শব্দের পরে "উৎপন্ন" শব্দ-প্রয়োগের দ্বারা সূচনা করিয়াছেন যে, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যেরূপ সম্বন্ধ বস্তুতঃ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উৎপাদক হয়, তাহাই 'ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ।' যে কোনরূপ সম্বন্ধ অর্থাৎ কালিকাদি সম্বন্ধ অথবা সংযুক্ত-সংযোগ প্রভৃতি পরম্পরা সম্বন্ধ 'ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ' নহে। কারণ, ঐরূপ সম্বন্ধজন্য প্রত্যক্ষ জন্মে না। প্রত্যক্ষ-রূপ ফলের দ্বারাই তাহার কারণ ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ সিদ্ধ হয়। অতএব অনুমানাদি জ্ঞানের পূর্ব্বে আবশ্যক যে বিশেষণ-জ্ঞান, তাহাকে 'জ্ঞান-লক্ষণ' সন্নিকর্ষ বলা

প্রত্যক্ষমিতি"। যে পদার্থ যাহা নহে, সেই পদার্থকে তাহা বলিয়া যে জ্ঞান অর্থাৎ অন্য পদার্থের অন্য প্রকারে যে খ্যাতি বা জ্ঞান, তাহাই ভ্রম জ্ঞান—ইহা বাৎস্যায়নের উক্ত ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝা যায়। যেমন রজ্জুকে "অয়ং সর্পঃ"—এইরূপে প্রত্যক্ষ করিলে অন্য পদার্থের অন্য প্রকারেই খ্যাতি বা জ্ঞান হয়। তাই ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায় ভ্রম জ্ঞানকে "অন্যথা-খ্যাতি" নামে এবং অনেকে "বিপরীত-খ্যাতি" নামেও উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা ভ্রম স্থলে মিথ্যা বা অনির্ব্বচনীয় বিষয়ের উৎপত্তি স্বীকার করিয়া "অনির্ব্বচনীয়-খ্যাতি" স্বীকার করেন নাই। কিন্তু বিচারপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত অন্যথা-খ্যাতিবাদেরই সমর্থন করিয়াছেন। যোগদর্শনোক্ত "বিপর্য্যয়" নামক চিত্তবৃত্তিও অন্যথা-খ্যাতি—ইহা যোগবার্ত্তিকে (১।৮) বিজ্ঞান ভিক্ষুও স্পষ্ট বলিয়াছেন। মীমাংসাচার্য্য ভট্ট কুমারিলও অন্যথা-খ্যাতি-বাদী। সুপ্রাচীনকাল হইতে ইহা নানারূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শারীরক ভাষ্যারম্ভে অধ্যাসের ব্যাখ্যায় আচার্য্য শঙ্কর প্রথমে উক্ত মতের উল্লেখ করিতে উক্ত মতে অন্য পদার্থে অন্য ধর্ম্মেরই অধ্যাস হয়,—ইহা বলিয়াছেন।

যায় না।• যেমন 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্' এইরূপ অনুমিতির পূর্ব্বে বহ্নিত্ব-রূপে বহ্নিজ্ঞান আবশ্যক। কারণ, বিশেষণ-জ্ঞান ব্যতীত বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মিতে পারে না। কিন্তু ঐ বিশেষণ-জ্ঞান, উক্ত স্থলে পরে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উৎপাদক না হওয়ায় উহাকে 'জ্ঞান-লক্ষণ' সন্নিকর্ষ বলা যায় না। অতএব 'জ্ঞান-লক্ষণ' সন্নিকর্ষ স্বীকার করিলে অনুমানাদি স্থলেও 'জ্ঞান-লক্ষণ' সন্নিকর্ষ জন্য অলৌকিক প্রত্যক্ষই বলা যায় অর্থাৎ অনুমানাদি প্রমাণের উচ্ছেদ হয়—এই প্রতিবাদ অমূলক। অবশ্য **অনির্ব্বচনীয়-খ্যাতি**-বাদী (বিবর্ত্তবাদী) বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের আরও অনেক প্রতিবাদ আছে। পূর্ব্বোক্ত 'সামান্য-লক্ষণ' সন্নিকর্ষের খণ্ডন করিতে **অদ্বৈত-সিদ্ধি** গ্রন্থে নব্য নৈয়ায়িক বৈদান্তিক মধুসূদন সরস্বতী এই বিষয়েও সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছেন। সংক্ষেপে সে সমস্ত কথার সমালোচনা করা যায় না।

অন্যথাখ্যাতি-বাদী নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের বিশেষ কথা এই যে, যে ব্যক্তি কখনও কুত্রাপি প্রকৃত সর্প দর্শন করে নাই অর্থাৎ সর্পত্বরূপে সর্প বিষয়ে যাহার কোন সংস্কার নাই, তাহার কখনই রজ্জুতে 'অয়ং সর্পঃ' এইরূপ ভ্রম প্রত্যক্ষ জন্মে না—ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। যে ব্যক্তি কোন স্থানে সর্পবৎ অবস্থিত রজ্জুকে রজ্জুত্বরূপে প্রত্যক্ষ করিতে না পারিয়া 'অয়ং' এইরূপে অর্থাৎ 'ইদন্ত্ব'রূপে প্রত্যক্ষ করে, সেই ব্যক্তির তখন তাহাতে তাহার অন্যত্র পূর্ব্ব-দৃষ্ট সর্পের সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ জন্য পূর্ব্ব সংস্কার উদ্বুদ্ধ হওয়ায় পরে সর্পত্বরূপে সর্পের স্মরণ হয় এবং ঐ স্মরণাত্মক জ্ঞানের পরেই 'অয়ং সর্পঃ' এইরূপ প্রত্যক্ষ জন্মে, নচেৎ তাহা জন্মে না—ইহাও সকলেরই স্বীকার্য্য। অতএব উক্তরূপ ভ্রম প্রত্যক্ষ স্থলে পূর্ব্বোৎপন্ন ঐরূপ স্মরণাত্মক জ্ঞানকেই সন্নিকর্ষ বলিয়া তজ্জন্য ভ্রম প্রত্যক্ষের উপপাদন করিলে কল্পনা গৌরব হয় না। কিন্তু রজ্জু প্রভৃতিতে তৎকালে মিথ্যা সর্পাদি বিষয়ের উৎপত্তি স্বীকার করিলে সেই মিথ্যা বিষয়ের

উপাদান কারণ ও তাহার উৎপত্তি বিনাশ প্রভৃতি-স্বীকারে কল্পনা গৌরব হয়। মিথ্যা বিষয়ের উৎপাদক—উপাদান কারণও বহু বিবাদ-গ্রস্ত।

পরন্তু উক্ত "জ্ঞান-লক্ষণ" সন্নিকর্ষ স্বীকার না করিলে বাহ্য পদার্থ বিষয়ক সবিকল্পক জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষরূপ **অনুব্যবসায়** সম্ভব হয় না। এখানে বলা আবশ্যক যে, পূর্ব্বোক্ত গৌতম সূত্রে লক্ষিত প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বিবিধ—(১) নির্ব্বিকল্পক ও (২) সবিকল্পক। 'তাৎপর্য্য টীকা'কার বাচস্পতি মিশ্র ইহা সমর্থন করিতে ত্রিলোচন গুরুর মতানুসারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, গৌতমের পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-সূত্রে **অব্যপদেশ্যং** এই পদের অর্থ—'নির্ব্বিকল্পক' এবং **ব্যবসায়াত্মকং** এই পদের অর্থ—সবিকল্পক। অর্থাৎ উক্ত নামদ্বয়ে প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ—ইহাই উক্ত পদদ্বয়ের দ্বারা গৌতমের বিবক্ষিত। তন্মধ্যে যে প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত পদার্থে 'বিকল্প' অর্থাৎ বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাব নাই, তাহা 'নির্ব্বিকল্পক'। আর যে প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত পদার্থে বিকল্প অর্থাৎ বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাব থাকে, তাহা 'সবিকল্পক'।

যেমন 'অয়ং ঘটঃ' এইরূপে ঘটের যে প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহা ঘটত্ব-বিশিষ্ট ঘট বিষয়ক প্রত্যক্ষ। সুতরাং উহাতে ঘটের ধর্ম্ম ঘটত্ব, বিশেষণ এবং ঘট বিশেষ্য। (তাদাত্ম্য সম্বন্ধে ঘটও বিশেষণ হইতে পারে)। কিন্তু ঘটত্বরূপ বিশেষণের জ্ঞান ব্যতীত ঐরূপ বিশিষ্ট প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে না। সুতরাং ঘটের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলে প্রথমে ঘট ও ঘটত্ব ধর্ম্ম বিষয়ে অবিশিষ্ট প্রত্যক্ষ জন্মে—ইহা স্বীকার্য্য। উহাই ঘট ও ঘটত্ব বিষয়ে নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ। উহা ঘটত্ব-বিশিষ্ট ঘট বিষয়ক না হওয়ায়, সবিকল্পক প্রত্যক্ষ নহে এবং মনের দ্বারা উহার বোধ (মানস প্রত্যক্ষ) সম্ভব না হওয়ায় উহা অতীন্দ্রিয়। কিন্তু উহা সবিকল্পক প্রত্যক্ষের কারণরূপে অনুমান প্রমাণ-সিদ্ধ। কারণ, পূর্ব্বে বিশেষণ-জ্ঞান ব্যতীত কোন বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মিতে পারে না।

পূর্ব্বোক্ত বিশেষণ-জ্ঞানজন্য ঘটত্ব-বিশিষ্টঘট বিষয়ক সবিকল্পক প্রত্যক্ষের পরে 'ঘটমহং জানামি' অর্থাৎ আমি ঘটত্বরূপে ঘট জানিলাম, এইরূপে সেই জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ জন্মে। ঐরূপ মানস প্রত্যক্ষের নাম **অনুব্যবসায়**। পূর্ব্বোক্তরূপ অনুব্যবসায়ে মনঃ-সংযুক্ত আত্মাতে সেই ঘটবিষয়ক জ্ঞান, সমবায় সম্বন্ধে বিশেষণরূপে বিষয় হয় এবং সেই জ্ঞানে বিষয়িতা সম্বন্ধে ঘটত্বরূপে ঘট, বিশেষণরূপে বিষয় হয়। কারণ, 'ঘট মহং জানামি' অর্থাৎ ঘটত্ব-বিশিষ্ট ঘট-বিষয়ক যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানবিশিষ্ট আমি—এইরূপে সেই জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ (অনুব্যবসায়) জন্মে।

কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপ ঘট-জ্ঞান, বাহ্যপদার্থবিষয়ক হওয়ায় মনের দ্বারা কিরূপে তাহার প্রত্যক্ষ হইবে? বাহ্য পদার্থ বিষয়ে স্বতন্ত্রভাবে মনের প্রবৃত্তি হয় না। তাই কথিত হইয়াছে—"পরতন্ত্রং বহির্মনঃ।" সুতরাং ইহাই স্বীকার্য্য যে, 'আমি ঘটত্ব-বিশিষ্ট ঘট বিষয়ক জ্ঞানবান্—এইরূপে যে মানস প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহা জ্ঞানাংশে লৌকিক হইলেও ঘটাংশে অলৌকিক প্রত্যক্ষ। অর্থাৎ উক্তরূপে বাহ্য ঘটাদি পদার্থের মনের দ্বারা অলৌকিক প্রত্যক্ষই স্বীকার্য্য। সুতরাং পূর্ব্বোৎপন্ন ঘট জ্ঞানই সেই অলৌকিক প্রত্যক্ষের কারণ অলৌকিক সন্নিকর্ষ—ইহাও স্বীকার্য্য। অবশ্য জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষরূপ অনুব্যবসায় সর্ব্বসম্মত নহে। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে সে বিষয়ে আলোচনা করিব। নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের মতে আরও অনেক স্থলে 'জ্ঞানলক্ষণ' সন্নিকর্ষজন্য অলৌকিক প্রত্যক্ষবিশেষ (উপনীত ভান) স্বীকার্য্য। নচেৎ অনেক প্রত্যক্ষের উপপত্তি হয় না। সংক্ষেপে এই সমস্ত দুর্ব্বোধ বিষয় ব্যক্ত করা যায় না। বাহুল্যভয়ে এখানে আর অধিক লেখাও সম্ভব নহে।

তৃতীয় প্রকার অলৌকিক সন্নিকর্ষের নাম **যোগজ**। 'মহাযোগীর সমাধি-বিশেষরূপ যোগজন্য সন্নিকর্ষই যোগজ সন্নিকর্ষ। ঐ সন্নিকর্ষ-

জন্য সেই যোগীর ভূত, ভবিষ্যৎ ও দূরস্থ প্রভৃতি বিষয়ের অলৌকিক প্রত্যক্ষ জন্মে। জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে যথার্থ প্রত্যক্ষ, তাহা যোগজ সন্নিকর্ষ-বিশেষ জন্য অলৌকিক মানসপ্রত্যক্ষ। মহর্ষি গৌতমও পরে বলিয়াছেন—**সমাধিবিশেষাভ্যাসাৎ** ॥ ৪।২।৩৮ ॥ মহর্ষি কণাদ বৈশেষিক দর্শনের নবম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে যোগি-প্রত্যক্ষের সবিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। কণাদোক্ত **যুক্ত** ও **বিযুক্ত** এই দ্বিবিধ যোগীর কিরূপে জ্ঞেয় বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ জন্মে—ইহা প্রশস্তপাদ বর্ণন করিয়াছেন। 'যুক্ত' যোগীর যোগজ সন্নিকর্ষ-বিশেষ জন্য সর্ব্ববিষয়ক প্রত্যক্ষই জন্মে।

নিত্য সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের সর্ব্ববিষয়ক নিত্য প্রত্যক্ষ, কোন কারণ-জন্য নহে। তাই মহর্ষি গৌতম পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষ সূত্রে ঈশ্বর-প্রত্যক্ষকে লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু পরমেশ্বর সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ক প্রত্যক্ষরূপ প্রমা জ্ঞানের আশ্রয়—এই অর্থেই শাস্ত্রে "প্রমাণ" নামে কথিত হইয়াছেন। বেদের প্রামাণ্য-পরীক্ষায় সিদ্ধান্ত সূত্রের শেষে "আপ্ত-প্রামাণ্যাৎ" এই বাক্যে গৌতমও আপ্ত পুরুষের প্রমাতৃত্ব-রূপ প্রামাণ্যই বলিয়াছেন। পরে তাহা বলিব। এখন অনুমান প্রমাণের লক্ষণাদি বলিতে হইবে।

অনুমান প্রমাণ

প্রত্যক্ষ প্রমাণের নিরূপণের অনন্তরই প্রত্যক্ষ মূলক অনুমান প্রমাণের নিরূপণ সংগত। মহর্ষি গৌতম "অথ" শব্দের দ্বারা সেই সংগতি সূচনা করিয়া অনুমান প্রমাণের স্বরূপ ও প্রকারভেদ বলিতে পঞ্চম সূত্র বলিয়াছেন—

অথ তৎপূর্ব্বকং ত্রিবিধমনুমানং—
পূর্ব্ববচ্ছেষবৎ সামান্যতোদৃষ্টঞ্চ। ১।১।৫ ॥

উক্ত সূত্রে **তৎপূর্ব্বকং** এই পদে 'তদ' শব্দের দ্বারা পূর্ব্বসূত্রোক্ত প্রত্যক্ষই বুঝা যায় এবং পূর্ব্বসূত্রোক্ত **জ্ঞানং** এই পদের অনুবৃত্তিও বুঝা-যায়। তাহা হইলে "তৎপূর্ব্বকং জ্ঞান মনুমানং" এই বাক্যের দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রত্যক্ষপূর্ব্বক যথার্থ জ্ঞানই অনুমান প্রমাণ। কিন্তু যে কোনরূপ প্রত্যক্ষ জনিত জ্ঞানকে অনুমান প্রমাণ বলা যায় না। সুতরাং উক্ত সূত্রে "তদ্" শব্দের দ্বারা প্রত্যক্ষ-বিশেষই বুঝিতে হইবে। * তাই ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, উক্ত সূত্রে "তৎপূর্ব্বকং" এই পদে "তদ্" শব্দের দ্বারা লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ এবং লিঙ্গের প্রত্যক্ষ অভিপ্রেত এবং সেই সম্বন্ধ বিশিষ্ট লিঙ্গের প্রত্যক্ষজন্য তাদৃশ লিঙ্গের স্মরণরূপ জ্ঞানও সূত্রকারের অভিপ্রেত। অর্থাৎ "তৎপূর্ব্বকং" এই পদের দ্বারা বুঝিতে হইবে-লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধ-প্রত্যক্ষ এবং লিঙ্গ-প্রত্যক্ষও সেই সম্বন্ধবিশিষ্ট লিঙ্গের স্মরণ-পূর্ব্বক।

অনুমানের হেতু পদার্থকে **লিঙ্গ** বলে এবং তদ্দ্বারা অনুমেয় পদার্থকে **লিঙ্গী** বলে। যে পদার্থের সমস্ত আধারে অন্য যে পদার্থ অবশ্যই থাকে, সেই পদার্থকে সেই অন্য পদার্থের ব্যাপ্য পদার্থ বলে, এবং সেই অন্য পদার্থটিকে তাহার ব্যাপক পদার্থ বলে। ব্যাপ্য পদার্থ

---

* অনুমানাদি প্রমাণের দ্বারা কোন হেতুতে কোন ধর্ম্মের ব্যাপ্তি নিশ্চয় হইলেও সেই হেতুর দ্বারা সেই ধর্ম্মের অনুমিতি হইয়া থাকে। সুতরাং অনুমান প্রমাণমাত্রই যে, প্রত্যক্ষপূর্ব্বক—ইহা বলা যায় না। তাই "ন্যায়বার্ত্তিকে" উদ্দ্যোতকর—গৌতমের উক্ত সূত্রে "তদ" শব্দের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সমস্ত প্রমাণকেই গ্রহণ করিয়া "তানি পূর্ব্বাণি যস্য" এইরূপ বিগ্রহবাক্যানুসারে প্রথমে "তৎপূর্ব্বক" শব্দের অর্থ বলিয়াছেন—প্রত্যক্ষাদি যে কোন প্রমাণপূর্ব্বক। কিন্তু পরে তিনিও বলিয়াছেন যে, পরম্পরায় সমস্ত অনুমানই প্রত্যক্ষ-পূর্ব্বক হওয়ায় গৌতম তাহাই বলিয়াছেন। ঐ "তদ" শব্দের দ্বারা লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ এবং লিঙ্গীর প্রত্যক্ষ—এই প্রত্যক্ষদ্বয় গ্রহণ করিলে "তে দ্বে প্রত্যক্ষে পূর্ব্বে যস্য" এইরূপ বিগ্রহবাক্যানুসারে "তৎপূর্ব্বক" শব্দের দ্বারা বুঝা যায়—উক্ত প্রত্যক্ষদ্বয় পূর্ব্বক। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার দ্বারাও উহাই বুঝা যায়।

থাকিলেই সেখানে তাহার ব্যাপক পদার্থ অবশ্যই থাকে। সুতরাং ব্যাপ্য পদার্থের দ্বারা তাহার ব্যাপক পদার্থের অনুমিতি হওয়ায় ব্যাপ্য পদার্থই সেখানে 'লিঙ্গ' বা হেতু হয় এবং তাহার ব্যাপক সেই পদার্থই সেখানে 'লিঙ্গী' হয়। যে ধর্ম্মীতে সেই 'লিঙ্গী'র অনুমিতি হয়, সেই ধর্ম্মী **পক্ষ** নামেও কথিত হইয়াছে।

যেমন বহ্নি শূন্য স্থানে ধূমের উৎপত্তি সম্ভব না হওয়ায় যে যে স্থানে ধূম থাকে, সেই সমস্ত স্থানেই তাহার কারণ বহ্নি অবশ্যই থাকে। সুতরাং ধূম বহ্নির ব্যাপ্য পদার্থ এবং বহ্নি তাহার ব্যাপক পদার্থ। তাই পর্ব্বতাদি পক্ষে ধূমের দ্বারা বহ্নির অনুমিতি হয় এবং তাহাতে ধূম লিঙ্গ ও বহ্নি লিঙ্গী হয়। ভাষ্যকার লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধ বলিয়া ঐ উভয়ের সেই ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাব-সম্বন্ধই বলিয়াছেন, সন্দেহ নাই। কারণ ঐ সম্বন্ধ জ্ঞান ব্যতীত অনুমিতি জন্মে না। যেমন পূর্ব্বোক্ত স্থলে ধূমে বহ্নির ব্যাপ্যত্ব সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষ ব্যতীত ধূমের দ্বারা বহ্নির অনুমিতি হইতে পারে না। প্রথমে পাকশালাদি কোন স্থানে ধূম ও বহ্নির দর্শন এবং বহ্নি-শূন্য স্থানে ধূমের অদর্শন জন্য ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ জন্মে। পরে পর্ব্বতাদি কোন স্থলে ধূম দেখিলে তখন তাহার সেই পূর্ব্বজাত ব্যাপ্তি-প্রত্যক্ষজন্য সংস্কার উদ্‌বুদ্ধ হইয়া ধূম, বহ্নির ব্যাপ্য—এইরূপ স্মৃতি উৎপন্ন করে। সেই ব্যাপ্তি-স্মরণের পরেই বহ্নির ব্যাপ্য ধূমবিশিষ্ট পর্ব্বত—এইরূপে পর্ব্বতে পুনর্ব্বার সেই ধূমের প্রত্যক্ষ জন্মে। প্রথমে পাকশালাদি কোন স্থানে ধূম দর্শনের পরে পর্ব্বতে যে, প্রথম ধূম দর্শন, তাহা দ্বিতীয় ধূম দর্শন এবং তজ্জন্য ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তির-স্মরণের অনন্তর সেখানে বহ্নির ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধূমের যে পুনর্দর্শন, উহা তৃতীয় লিঙ্গ-দর্শন। তাই উহা **তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শ** নামে কথিত হইয়াছে। উহা **লিঙ্গপরামর্শ** ও কেবল **পরামর্শ** নামেও কথিত হইয়াছে।

ফলকথা, সাধ্যধর্ম্মের অর্থাৎ অনুমেয় পদার্থের ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট হেতু পদার্থ অনুমানের আশ্রয় 'পক্ষ' পদার্থে আছে—এইরূপ নিশ্চয়ই "লিঙ্গপরামর্শ" নামক জ্ঞান। উহাই অনুমিতির চরম কারণ। যেমন পূর্ব্বোক্ত স্থলে 'বহ্নিব্যাপ্য-ধূমবান্ পর্ব্বত'—এইরূপ জ্ঞান লিঙ্গপরামর্শ। ঐ জ্ঞানের পরক্ষণেই 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্'—এইরূপে পর্ব্বতে বহ্নিব অনুমিতি জন্মে। ভাষ্যকার পরে আবার লিঙ্গ-দর্শন ও লিঙ্গ-স্মরণের উল্লেখ করিয়া উক্ত 'লিঙ্গপরামর্শ'ই ব্যক্ত করিয়াছেন এবং হেতু পদার্থে সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষ-স্থল গ্রহণ করিয়াই উক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু যে কোন প্রমাণের দ্বারা কোন পদার্থে কোন পদার্থের ব্যাপ্তি নিশ্চয় হইলেও তাহাব ফলে সেই ব্যাপ্য পদার্থের দ্বারা তাহার ব্যাপক পদার্থের অনুমিতি জন্মে। সুতরাং "লিঙ্গ-পবামর্শ"রূপ জ্ঞান-জন্য যে পরোক্ষ অনুভূতি, তাহাই অনুমিতি এবং যথার্থ অনুমিতির করণই অনুমান প্রমাণ—ইহাই উক্ত সূত্রেব তাৎপয্যার্থ বুঝিতে হইবে।

"তত্ত্ব-চিন্তামণি"কার গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও উক্তরূপেই অনুমিতি ও অনুমান প্রমাণের লক্ষণ বলিযা প্রথমে প্রাচীন মতানুসারে 'লিঙ্গ-পরামর্শকে'ই ঐ অনুমিতির করণ বলিলেও পরে **পরামর্শ** গ্রন্থে নিজ সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন যে, উক্ত লিঙ্গ-পরামর্শের জনক পূর্ব্বোৎপন্ন ব্যাপ্তি-জ্ঞানই অনুমিতির করণ, সুতরাং উহাই অনুমান প্রমাণ। কারণ, যাহা কোন ব্যাপাব দ্বারা কায্যেব জনক হয়, তাহাই করণ। সুতরাং উক্ত 'লিঙ্গ-পরামর্শ'ই উহার পূর্ব্বোৎপন্ন ব্যাপ্তি জ্ঞানের ব্যাপার হওয়ায় তদ্দ্বারা সেই ব্যাপ্তি-জ্ঞানই অনুমিতির করণ হইতে পারে। কিন্তু উক্ত 'লিঙ্গ-পরামর্শ'রূপ চরম কারণ অনুমিতির করণ হইতে পারে না।

অবশ্য প্রাচীন ন্যায়াচার্য্য উদ্দ্যোতকরও উক্ত মতান্তরের উল্লেখ করায় উহাও প্রাচীন মতবিশেষ। কিন্তু তাঁহার মতে অনুমিতির চরম কারণ উক্ত 'লিঙ্গ-পরামর্শ'ই অনুমিতির মুখ্য করণ বলিয়া উহাই মুখ্য অনুমান

প্রমাণ। প্রাচীন মতে যে চরম কারণই মুখ্য করণ এবং প্রমাণের চরম ফল "হান বুদ্ধি" "উপাদান বুদ্ধি" এবং "উপেক্ষা বুদ্ধির" পক্ষে প্রমাণজন্ত প্রমিতিও যে প্রমাণ হয়—ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাই উদ্দ্যোতকর অনুমান প্রমাণজন্য অনুমিতিকেও অনুমান প্রমাণ বলিয়াছেন। অনুমিতির করণ বিষয়ে আরও অনেক মতভেদ আছে। অনুমান প্রমাণের প্রমেয় অর্থাৎ অনুমেয় কি, এই বিষয়েও প্রাচীন কাল হইতেই বহু বিচার ও নানা মতভেদ হইয়াছে। সংক্ষেপে তাহা ব্যক্ত করা যায় না।

গৌতম পূর্ব্বোক্ত সূত্রে—অনুমান প্রমাণকে (১) পূর্ব্ববৎ (২) শেষবৎ (৩) সামান্যতোদৃষ্ট—এই নামত্রয়ে ত্রিবিধ বলিয়াছেন। "পূর্ব্ব" শব্দের উত্তর তুল্যার্থে "বতি" প্রত্যয়নিষ্পন্ন "পূর্ব্ববৎ" শব্দের দ্বারা বুঝা যায়—পূর্ব্বতুল্য। অর্থাৎ পূর্ব্বে কোন স্থানে যে পদার্থকে ব্যাপ্য এবং যে পদার্থকে তাহার ব্যাপক বলিয়া প্রত্যক্ষ করা হয় অর্থাৎ যে পদার্থে যাহার ব্যাপ্তি সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ হয়, তজ্জাতীয় সেই ব্যাপ্য পদার্থ অন্যত্র প্রত্যক্ষ করিয়া সেখানে তজ্জাতীয় সেই ব্যাপক পদার্থের অনুমিতি হইলে সেখানে সেই অনুমান প্রমাণের নাম "পূর্ব্ববৎ"। যেমন পূর্ব্বে পাক-শালায় যে ধূম ও বহ্নির দর্শন করিয়া ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি-সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ হয়, পরে পর্ব্বতে তজ্জাতীয় ধূম দর্শন করিয়াই তজ্জাতীয় বহ্নিরই অনুমিতি জন্মে। সুতরাং ঐরূপ স্থলীয় অনুমান প্রমাণ "পূর্ব্ববৎ"। ইহার অন্যরূপ ব্যাখ্যাও আছে।

---

* উক্ত বিষয়ে বৌদ্ধাচার্য্য দিঙ্‌নাগের কথা ও উদ্দ্যোতকর এবং কুমারিল ভট্ট প্রভৃতির কথা ও মতভেদের আলোচনা মৎসম্পাদিত ন্যায় দর্শনের প্রথম খণ্ডে—(দ্বিতীয় সং) ১৩৭-৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

† কারণ ও কার্য্যের মধ্যে কারণটি পূর্ব্ব এবং কার্য্যটি শেষ বা উত্তর। তাই কারণ অর্থে "পূর্ব্ব" শব্দ এবং কার্য্য অর্থে "শেষ" শব্দেরও প্রয়োগ হইয়াছে। তাহা হইলে যে অনুমানে "পূর্ব্ব" অর্থাৎ কারণ—হেতুরূপে বিদ্যমান থাকে, এই অর্থে "পূর্ব্ববৎ" শব্দের

যে পদার্থ অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে বলে "শেষ" পদার্থ। যে অনুমান প্রমাণের দ্বারা সেই শেষ পদার্থবিষয়ক অনুমিতি জন্মে, তাহার নাম **শেষবৎ** অনুমান। ভাষ্যকার কণাদের সূত্রানুসারে ইহার উদাহরণ বলিয়াছেন যে,—কণাদোক্ত দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় নামক ষট্ পদার্থের মধ্যে শব্দ যে সামান্য, বিশেষ ও সমবায় নহে—ইহা নিশ্চিতই আছে। কারণ,—কণাদের মতে ঐ পদার্থত্রয় নিত্য, কিন্তু শব্দ অনিত্য। সুতরাং শব্দ কি দ্রব্য? অথবা গুণ? অথবা কর্ম্ম? এইরূপ সংশয় জন্মে।

কিন্তু পরে "শব্দো ন দ্রব্যম্, একদ্রব্য-সমবেতত্বাৎ"—এইরূপে অনুমান প্রমাণ দ্বারা শব্দ যে দ্রব্য পদার্থ নহে—ইহা নিশ্চিত হয়। কারণ, অনিত্য দ্রব্যগুলি সাবয়ব এবং তাহা একাধিক অবয়বরূপ দ্রব্যেই সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু শব্দ একমাত্র আকাশ নামক দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে—ইহাই কণাদের সিদ্ধান্ত। সুতরাং শব্দ, দ্রব্য পদার্থ নহে এবং পরে "শব্দো ন কর্ম্ম, সজাতীয়োৎপাদকত্বাৎ"—এইরূপে অনুমান প্রমাণের দ্বারা শব্দ কর্ম্ম পদার্থ নহে—ইহাও নিশ্চিত হয়। কারণ, কণাদের মতে শব্দ উৎপন্ন হইলে উহা পরক্ষণে তাহার সজাতীয় অন্য শব্দ উৎপন্ন করে। কিন্তু কর্ম্ম অর্থাৎ কোন ক্রিয়া উৎপন্ন হইলে সেই ক্রিয়া উহার সজাতীয় অপর ক্রিয়া উৎপন্ন করে না। সেখানে ক্রিয়ার অন্য কারণই অপর ক্রিয়া উৎপন্ন করে। সুতরাং শব্দ তাহার সজাতীয় অপর শব্দের

দ্বারা বুঝা যায়—কারণহেতুক কার্য্যের অনুমান এবং উক্তরূপ অর্থে "শেষবৎ" শব্দের দ্বারা বুঝা যায়—কার্য্যহেতুক কারণের অনুমান। অর্থাৎ কারণের দ্বারা কার্য্যের অনুমিতি হইলে সেই অনুমিতির করণ "পূর্ব্ববৎ" এবং কার্য্যের দ্বারা কারণের অনুমিতি হইলে সেই অনুমিতির করণ "শেষবৎ" নামে কথিত হইয়াছে। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও প্রথমে উক্তরূপ ব্যাখ্যা ও উদাহরণ প্রকাশ করায় উহাও প্রাচীন ব্যাখ্যা সন্দেহ নাই।

উৎপাদক হওয়ায় কর্ম্ম বা ক্রিয়া-বিশেষ নহে। এইরূপে শব্দে সংশয় বিষয়ীভূত দ্রব্যত্ব, গুণত্ব ও কর্ম্মত্বের মধ্যে দ্রব্যত্ব ও কর্ম্মত্বের প্রতিষেধ বা অভাব নিশ্চয় হওয়ায় গুণত্বই শেষ থাকে। অতএব পরিশেষে শব্দ গুণ পদার্থ—ইহাই অনুমানপ্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয়। ঐ অনুমিতির করণ যে অনুমান প্রমাণ, তাহাতে সাধকত্ব সম্বন্ধে গুণত্বরূপ 'শেষ' পদার্থ বিদ্যমান থাকায় ঐ অর্থে উহাকে "শেষবৎ" অনুমান বলা যায়।

তৃতীয় প্রকার অনুমানের নাম **সামান্যতো দৃষ্ট**। ইহা "পূর্ব্ববৎ" অনুমানের বিপরীত। কারণ, "পূর্ব্ববৎ" অনুমানস্থলে পূর্ব্বে কোন স্থানে হেতু ও সাধ্য ধর্ম্মের ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাব সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। "সামান্যতোদৃষ্ট" অনুমানস্থলে তাহা হয় না। কিন্তু অন্য কোন পদার্থে কোন ধর্ম্মের ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষ হওয়ায় তত্তুল্য কোন পদার্থে সেই ধর্ম্মের ব্যাপ্তি নিশ্চয় জন্য সেই ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর দ্বারা সেখানে অপ্রত্যক্ষ পদার্থের অনুমিতি জন্মে। ভাষ্যকার ইচ্ছা প্রভৃতি গুণের দ্বারা আত্মার অনুমানকে ইহার উদাহরণরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, যাহাতে ইচ্ছাদি গুণ আছে, তাহা আত্মা—এইরূপে পূর্ব্বে কোন স্থানে ব্যাপ্তিনিশ্চয় সম্ভবই নহে। কিন্তু যাহা যাহা গুণ পদার্থ, সেই সমস্তই কোন দ্রব্যাশ্রিত; যেমন রূপাদি গুণ,—এইরূপে সামান্যতঃ ব্যাপ্তি-নিশ্চয় জন্য ইচ্ছাদি গুণের আশ্রয় দেহাদি ভিন্ন আত্মা সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ যেহেতু ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ পদার্থ,

---

* বাচস্পতি মিশ্র—"সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী"তে "শেষবৎ" অনুমানের ব্যাখ্যা করিতে ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের সন্দর্ভও উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি সেখানে অনুমান প্রমাণকে প্রথমে "বীত" ও "অবীত" নামে দ্বিবিধ বলিয়া গৌতমোক্ত "শেষবৎ" অনুমানকেই বলিয়াছেন—"অবীত"। ব্যতিরেক মুখে প্রবর্ত্তমান নিষেধক অনুমানই "অবীত" এবং উহারই প্রসিদ্ধ নাম "ব্যতিরেকী" অনুমান। গৌতমোক্ত "পূর্ব্ববৎ" ও "সামান্যতো-দৃষ্ট" অনুমানই—"বীত" অনুমান।

অতএব উহা কোন দ্রব্যাশ্রিত—এইরূপে ঐ ইচ্ছাদিগুণে ঐ গুণত্ব হেতুর দ্বারা দ্রব্যাশ্রিতত্ব অনুমান সিদ্ধ হয়। পরে ইচ্ছাপ্রভৃতি গুণ দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতির আশ্রিত নহে অর্থাৎ দেহাদির গুণ নহে—ইহা সিদ্ধ হইলে পরিশেষে উহা দেহাদি ভিন্ন কোন দ্রব্যাশ্রিত—ইহাই সিদ্ধ হয়। সেই দ্রব্যই আত্মা।

কিন্তু "বার্ত্তিক"কার উদ্দ্যোতকর ও "তাৎপর্য্যটীকা"কার বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে—ইচ্ছাদিগুণ পরতন্ত্র, ইহাই "সামান্যতোদৃষ্ট" অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ যাহা গুণ পদার্থ, তাহা পরাশ্রিত, যেমন রূপাদি, এইরূপে সামান্যতঃ গুণ পদার্থে, পরাশ্রিতত্বের ব্যাপ্তি-নিশ্চয় জন্য ইচ্ছাদিগুণে পরাশ্রিতত্বই উক্ত "সামান্যতোদৃষ্ট" অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয়। পরে ঐ ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ দেহাশ্রিত নহে, ইন্দ্রিয়াশ্রিত নহে, ইত্যাদিরূপে উহা দেহাদির গুণ নহে—ইহা অনুমান প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হইলে পরিশেষে উহা দেহাদি ভিন্ন কোন দ্রব্যাশ্রিত, অর্থাৎ সেই অতিরিক্ত দ্রব্যেরই গুণ—ইহাই "শেষবৎ" অনুমান প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয়। ফল কথা, উক্ত মতে পূর্ব্বোক্ত স্থলে ইচ্ছাদি গুণের পরাশ্রিতত্ব-সাধক অনুমান প্রমাণই "সামান্যতোদৃষ্ট" এবং পরিশেষে উহার আত্মাশ্রিতত্ব-সাধক অনুমান প্রমাণই "শেষবৎ" বা "পরিশেষ" অনুমান।

বস্তুতঃ মহর্ষি গোতমও পরে জ্ঞান যে, তাঁহার মতে আত্মাশ্রিত অর্থাৎ আত্মার বাস্তব গুণ—এই সিদ্ধান্ত বহু হেতুর দ্বারা সমর্থন করিয়া পরে বলিয়াছেন—"**পরিশেষাদ্ যথোক্ত-হেতুপপত্তেশ্চ**" (৩।২।৪১)। উক্ত সূত্রে তিনি "পরিশেষ" শব্দের দ্বারা তাঁহার পূর্ব্বোক্ত "শেষবৎ" অনুমানকেই গ্রহণ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। পরবর্ত্তী কালে ঐ "শেষবৎ" অনুমানই "**ব্যতিরেকী**" ও "**কেবল-ব্যতিরেকী**" নামে কথিত হইয়াছে এবং উহার নানারূপ ব্যাখ্যা ও উদাহরণও কথিত হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীন ন্যায়াচার্য্য উদ্দ্যোতকরও

কল্পান্তরে গৌতমোক্ত ঐ ত্রিবিধ অনুমানকে যথাক্রমে "অন্বয়ী" "ব্যতিরেকী" ও "অন্বয়-ব্যতিরেকী" এই নামত্রয়ে উল্লেখ করিয়া উহার ব্যাখ্যা করায় উহাও প্রাচীন মতবিশেষ। পরে "তত্ত্বচিন্তামণি"কার গঙ্গেশ উপাধ্যায় নিজমতে উহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং উহার ব্যাখ্যায় অনেক মতভেদ হইয়াছে। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে।

উপমান প্রমাণ

তৃতীয় উপমান প্রমাণের লক্ষণ বলিতে গৌতম বলিয়াছেন—

প্রসিদ্ধসাধর্ম্ম্যাৎ সাধ্য-সাধনমুপমানং ॥ ১।১।৬ ॥

যে পদার্থ পূর্ব্বেই যথার্থরূপে জ্ঞাত, তাহাকে বলে প্রসিদ্ধ পদার্থ। যে পদার্থ পূর্ব্বে অজ্ঞাত, তাহা সাধ্য পদার্থ। কোন পদার্থে কোন প্রসিদ্ধ পদার্থের সাদৃশ্য প্রত্যক্ষজন্য কোন সাধ্য-সিদ্ধির যাহা করণ, অর্থাৎ যদ্দ্বারা সেই অতীন্দ্রিয় সাধ্য পদার্থের যথার্থ অনুভূতি জন্মে, তাহা **উপমান প্রমাণ**। উপমান প্রমাণ জন্য যে অনুভূতি, তাহার নাম **উপমিতি**। যেমন গবয় নামক পশুতে গবয়-শব্দ-বাচ্যত্বের নিশ্চয় 'উপমিতি'। গবয় পশুতে গোর লক্ষণ গলকম্বল নাই। কিন্তু গোর বহু সাদৃশ্য আছে। নগরবাসী গবয় পশু দেখেন নাই, কিন্তু কোন অরণ্যবাসী তাঁহাকে বলিলেন—'গবয় পশু গোর সদৃশ।' পরে কোন সময়ে সেই নগরবাসী গবয় পশু দেখিয়া তাহাতে গোর সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করিলে, পরেই তাঁহার পূর্ব্বশ্রুত সেই অরণ্যবাসীর বাক্যের অর্থ স্মরণ হওয়ায় তজ্জন্য পরক্ষণে গবয়ত্ব-বিশিষ্ট পশুমাত্রে গবয়-শব্দের বাচ্যত্ব-রূপ শক্তির নিশ্চয় জন্মে।* গৌতমের মতে অন্য কোন প্রমাণ দ্বারা ঐরূপে গবয়-শব্দের বাচ্যত্ব নিশ্চয় হইতে পারে না। সুতরাং 'উপমান' নামে পৃথক্ প্রমাণ স্বীকার্য্য। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে।

---

* মীমাংসক ও বৈদান্তিক সম্প্রদায় 'উপমান' প্রমাণ স্বীকার করিলেও তাঁহারা গবয়ত্ব-বিশিষ্ট পশুতে "গবয়" শব্দের বাচ্যত্ব বোধকে উপমান প্রমাণের ফল উপমিতি বলেন নাই।

"ন্যায়মঞ্জরী"কার জয়ন্তভট্ট বলিয়াছেন যে—বৃদ্ধ নৈয়ায়িকগণের মতে উক্ত স্থলে "যথা গৌ স্তথা গবয়ঃ"—এইরূপ পূর্ব্বশ্রুত বাক্যই উপমিতির করণ। কিন্তু উক্ত বাক্য শ্রবণ করিলেও বনে যাইয়া গবয় দেখিয়া তাহাতে পূর্ব্বদৃষ্ট গোর সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ না করিলে তাহাতে "গবয়" শব্দের বাচ্যত্ব-বোধ জন্মে না। সুতরাং উক্তরূপ বাক্য আপ্তবাক্য হইলেও উক্ত বিষয়ে উহা শব্দ প্রমাণ নহে, কিন্তু উহা উপমান নামক প্রমাণান্তর। বস্তুতঃ ভাষ্যকারের কথার দ্বারাও সরলভাবে তাঁহার উক্তরূপ মত বুঝা যায়। কিন্তু "বার্ত্তিক"কার উদ্দ্যোতকর পূর্ব্বোক্ত বাক্যার্থের স্মরণ সহ-কৃত সাদৃশ্য-প্রত্যক্ষকেই উপমিতির করণ বলিয়া উপমান প্রমাণ বলিয়াছেন। উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ উক্ত স্থলে গবয়ে গোর সাদৃশ্য-প্রত্যক্ষকেই উপমিতির করণ বলিয়া পূর্ব্বশ্রুত সেই বাক্যার্থের স্মরণকে উহার ব্যাপার বলিয়াছেন। প্রাচীন মতে ঐ ব্যাপাররূপ চরম কারণই মুখ্যকরণ হওয়ায় উহাই মুখ্য উপমান প্রমাণ এবং তজ্জন্য যে উপমিতি-রূপ প্রমা, তাহাও উপমান প্রমাণ হয়। সেই প্রমাণের ফল 'হান বুদ্ধি' অথবা 'উপাদান বুদ্ধি' অথবা 'উপেক্ষা বুদ্ধি' ঐ হানাদি-বুদ্ধি কিরূপ, তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণের ব্যাখ্যায় বলিয়াছি।

পূর্ব্বমীমাংসা ভাষ্যকার শবর স্বামী ও বার্ত্তিককার কুমারিলভট্ট প্রভৃতির মতে উক্ত স্থলে গবয় পশুতে গোর সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ হইলে পরে—সেই পূর্ব্বদৃষ্ট গো এই গবয়ের সদৃশ—এইরূপে সেই গো পদার্থে প্রত্যক্ষদৃষ্ট গবয়ের যে সাদৃশ্য বোধ জন্মে, তাহাই উপমান প্রমাণের ফল উপমিতি। ঐ স্থলে সেই পূর্ব্বদৃষ্ট গোর প্রত্যক্ষ না হওয়ায় তাহাতে সেই গবয়ের সাদৃশ্যের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কিন্তু নৈয়ায়িক প্রভৃতি অনেক সম্প্রদায়ের মতে পূর্ব্বদৃষ্ট গো পশুতে গবয়ের যে সাদৃশ্য বোধ, তাহা স্মরণাত্মকজ্ঞান। সেই গো এই গবয়ের সদৃশ'—এইরূপে সেই পূব্বদৃষ্ট গোর স্মরণই হয়। সুতরাং উহা উপমান প্রমাণের ফল নহে।

এইরূপ যে ব্যক্তি "মুদ্গপর্ণী" ও "মাষপর্ণী" শব্দের বাচ্য অর্থ জানেন না, তিনি দ্রব্য-তত্ত্বজ্ঞ চিকিৎসকের নিকটে শ্রবণ করিলেন—"মুদ্গপর্ণী" নামে ওষধি-বিশেষ—দেখিতে মুদ্গের সদৃশ এবং "মাষপর্ণী" নামে ওষধি-বিশেষ—দেখিতে মাষের সদৃশ। মুদ্গ ও মাষ—তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্ট প্রসিদ্ধ পদার্থ। সুতরাং পরে কোন সময়ে সেই ব্যক্তি পর্ব্বতাদি কোন স্থানে যাইয়া 'মুদ্গপর্ণী' দেখিয়া তাহাতে মুদ্গের সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করিলে এবং মাষপর্ণী দেখিয়া তাহাতে মাষের সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করিলে, পরেই তাঁহার সেই পূর্ব্বশ্রুত চিকিৎসক-বাক্যের অর্থ স্মরণ হওয়ায় সেই ওষধিবিশেষে যথাক্রমে "মুদ্গপর্ণী" ও "মাষপর্ণী" শব্দের বাচ্যত্ব সম্বন্ধরূপ শক্তির নির্ণয় হয়। উহাও উপমান প্রমাণ জন্য "উপমিতি" নামক জ্ঞান।

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন উক্তরূপ উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, উপমান প্রমাণের আরও বিষয় আছে। 'তাৎপর্য্যটীকা'-কার বাচস্পতি মিশ্র ভাষ্যকারের ঐকথার দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন যে, যেমন প্রসিদ্ধ পদার্থের সাদৃশ্য-প্রত্যক্ষ জন্য উপমিতি জন্মে; তদ্রূপ, বৈধর্ম্ম্যপ্রত্যক্ষজন্যও উপমিতি জন্মে। তাহাকে বলে "বৈধর্ম্ম্যোপমিতি"; যে. ন কোন ব্যক্তি উষ্ট্র পশু "করভ" শব্দের বাচ্য—ইহা জানেন না, সেই ব্যক্তি কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিলেন যে, "করভ অতি কুশ্রী, তাহার গ্রীবাদেশ অতি দীর্ঘ এবং সে অতি কঠোর কণ্টক ভক্ষণ করে"। পরে সেই ব্যক্তি কোন স্থানে উষ্ট্র দেখিলে তাহাতে তাঁহার পূর্ব্বজ্ঞাত গবাদি পশুর বৈধর্ম্ম্য দেখিয়া এবং উহার পরেই তাঁহার সেই পূর্ব্বশ্রুত বাক্যার্থ স্মরণ করিয়া,—উষ্ট্র "করভ" শব্দের বাচ্য,—এইরূপে তাহাতে "করভ" শব্দের বাচ্যত্বরূপ শক্তির নিশ্চয় করেন। উক্ত স্থলে ঐরূপ শক্তি-নির্ণয় তাঁহার **বৈধর্ম্ম্যোপমিতি**।

অবশ্য তুল্যভাবে উক্তরূপ বৈধর্ম্ম্যোপমিতিও গৌতমের সম্মত বলা যায়। কিন্তু ভাষ্যকারের শেষোক্ত ঐ কথার দ্বারা অর্থ-বিশেষে শব্দ-

বিশেষের বাচ্যত্বরূপ শক্তিভিন্ন উপমান প্রমাণের যে আরও বিষয় আছে, অর্থাৎ—উপমান প্রমাণের দ্বারা যে, অন্যরূপ তত্ত্বও সিদ্ধ হয়—ইহাই ভাষ্যকারের বিবক্ষিত বুঝা যায়। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও তাহাই বুঝিয়া উহার উদাহরণ বলিয়াছেন যে—কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি "মুদগপর্ণীর" সদৃশ ওষধিবিশেষ বিষনাশ করে" এইরূপ বাক্য বলিলে, পরে কোন স্থানে কেহ যদি সেই ওষধিবিশেষ দেখিয়া তাহাতে মুদগপর্ণীর সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন, তাহা হইলে পরেই তাঁহার সেই পূর্ব্বশ্রুত বাক্যার্থের স্মরণ হওয়ায় তজ্জন্য তাঁহার "এই ওষধিবিশেষ বিষনাশ করে"—এইরূপ নিশ্চয় জন্মে। উক্ত স্থলে তাঁহার সেই ওষধিবিশেষে যে বিষনাশকত্ব-রূপ ধর্ম্মের নিশ্চয়, তাহাও সাদৃশ্য প্রত্যক্ষজন্য উপমিতি। সুতরাং উহাও উপমান প্রমাণের ফল। উপমান প্রমাণের দ্বারা অন্যরূপ তত্ত্ব-নিশ্চয়ের আরও অনেক উদাহরণ আছে।

শব্দ প্রমাণ

উপমান প্রমাণের পরে চতুর্থ শব্দপ্রমাণের লক্ষণ ও প্রকার ভেদ বলিতে গৌতম বলিয়াছেন—

আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ ॥১।১।৭॥

স দ্বিবিধো দৃষ্টাঽদৃষ্টার্থত্বাৎ ॥ ১।১।৮ ॥

অর্থাৎ আপ্ত ব্যক্তির যে উপদেশ বা বাক্য, তাহা শব্দ প্রমাণ। যে ব্যক্তি যে বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞ এবং সেই তত্ত্ব-প্রকাশের উদ্দেশ্যেই যথার্থ বাক্য প্রয়োগ করেন, সেই ব্যক্তিকেই সেই বিষয়ে **আপ্ত** বলে। সেই বিষয়ে তাঁহার সেই উপদেশ অর্থাৎ তত্ত্বোধক বাক্যই শব্দ প্রমাণ। মহর্ষি গৌতমের উক্ত সূত্রের দ্বারাও সরলভাবে উহাই বুঝা যায়। কিন্তু পরবর্ত্তী অনেক নব্য নৈয়ায়িক বাক্যের অন্তর্গত পদ-সমূহের স্মরণাত্মক জ্ঞানকেই বাক্যার্থ-বোধের করণ বলিয়া শব্দ প্রমাণ বলিয়াছেন।

বস্তুতঃ শাব্দবোধের পূর্ব্বে, প্রথমে পদের জ্ঞান এবং তাহার অর্থ-স্মরণ আবশ্যক। উক্ত মতে প্রথমে এক একটি পদের জ্ঞান হইলেও পরে সেই সমস্ত পদবিষয়ক সমূহালম্বন স্মরণ জন্মে। পরে সেই সমস্ত পদার্থের ঐরূপ স্মরণ জন্মে। সেই পদার্থ-স্মরণরূপ ব্যাপার দ্বারা পূর্ব্বোৎপন্ন সেই পদ-স্মরণ, শাব্দ বোধের অর্থাৎ বাক্যার্থ-বোধের করণ হওয়ায় উহাই শব্দ প্রমাণ। শাব্দ বোধের অব্যবহিত পূর্ব্বে সেই বাক্য বিদ্যমান না থাকায় উহা শব্দ প্রমাণ হইতে পারে না। কিন্তু প্রাচীন মতে স্মরণরূপ-জ্ঞানবত্তা সম্বন্ধে সেই বাক্যও আত্মাতে বিদ্যমান হওয়ায় উহা শব্দ প্রমাণ হইতে পারে। তবে শাব্দ বোধের চরম কারণই মুখ্যকরণ। এই মতে পদার্থ-স্মরণ, মুখ্য শব্দপ্রমাণ—ইহা বলিতে হইবে।

অদৃষ্টার্থ বেদাদি শাস্ত্রও যে শব্দ প্রমাণ—ইহা ব্যক্ত করিতে মহর্ষি গৌতম এখানেই দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে—সেই আপ্তবাক্যরূপ প্রমাণ-শব্দ দ্বিবিধ; যেহেতু উহা দৃষ্টার্থ ও অদৃষ্টার্থ। অর্থাৎ দৃষ্টার্থ ও অদৃষ্টার্থ নামে শব্দপ্রমাণ দ্বিবিধ। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে—যে আপ্তবাক্যের প্রতিপাদ্য অর্থ ইহলোকেও প্রত্যক্ষাদি কোন প্রমাণের দ্বারা বুঝা যায়, তাহা **দৃষ্টার্থ** শব্দপ্রমাণ। আর যে আপ্তবাক্যের প্রতিপাদ্য অর্থ ইহলোকে অন্য কোন প্রমাণের দ্বারা বুঝা যায় না, তাহা **অদৃষ্টার্থ** শব্দপ্রমাণ। যেমন "স্বর্গকামো ঽশ্বমেধেন যজেত"—ইত্যাদি বেদবাক্য। উক্ত বাক্যের অর্থ এই যে, স্বর্গার্থী অধিকারী অশ্বমেধ যাগ করিবেন। অর্থাৎ অশ্বমেধ যাগ তাঁহার স্বর্গের সাধন। কিন্তু ইহলোকে অন্য কোন প্রমাণের দ্বারাই অশ্বমেধ যাগের স্বর্গসাধনত্ব বুঝা যায় না। স্বর্গ নামক সুখবিশেষও ইহলোকে অনুভব করা যায় না। এইরূপ আরও বহু বহু তত্ত্ব আছে, যাহা বেদাদি শাস্ত্র ভিন্ন কোন প্রমাণের দ্বারাই বুঝা যায় না। সুতরাং সেই সমস্ত বিষয়ে বেদাদি শাস্ত্ররূপ আপ্তবাক্যই অদৃষ্টার্থ শব্দ প্রমাণ।

সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণও বলিয়াছেন—"তস্মাদপি চাসিদ্ধং পরোক্ষমাপ্তাগমাৎ সিদ্ধম্" ॥৬॥

কিন্তু বেদাদি শাস্ত্রে দৃষ্টার্থ বাক্যও বহু আছে এবং সত্যার্থ বহু বহু লৌকিক বাক্যও দৃষ্টার্থ শব্দপ্রমাণ। তাই সর্ব্বত্রই সত্যবাদী বিজ্ঞ ব্যক্তির লৌকিক বাক্য শ্রবণ করিয়া তদনুসারে লোক ব্যবহার চলিতেছে। কারণ, যিনি যে বিষয়ে "আপ্ত", সে বিষয়ে তাঁহার বাক্যই আপ্ত-বাক্য। তাই ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও আপ্তের লক্ষণ বলিয়া পরে বলিয়াছেন যে, এই আপ্ত-লক্ষণ—ঋষি, আর্য্য ও ম্লেচ্ছগণের পক্ষে সমান। অর্থাৎ ঋষিগণের বাক্যের ন্যায় অন্যান্য আর্য্যগণ এবং ম্লেচ্ছগণের সত্যার্থ বহু বহু লৌকিক বাক্যের দ্বারাও যখন সেই বিষয়ের যথার্থ শাব্দ বোধ হইতেছে এবং তদনুসারে তাঁহাদিগের যথার্থ ব্যবহারও চলিতেছে, তখন তাঁহারাও সেই সমস্ত বিষয়ে আপ্ত। কিন্তু অলৌকিক বিষয়ে সকলে 'আপ্ত' হইতে পারেন না। এ বিষয়ে অন্যান্য কথা পরে ব্যক্ত হইবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

ন্যায়-দর্শনে প্রমাণ-পরীক্ষা।

ন্যায় দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে মহর্ষি গৌতম সামান্যতঃ প্রমাণ পদার্থের পরীক্ষা করিতে প্রথমে **প্রত্যক্ষাদীনামপ্রামাণ্যং ত্রৈকাল্যাসিদ্ধেঃ** (২।১।৮) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই—এই পূর্ব্বপক্ষের সমর্থন করিয়া উহার খণ্ডন করিতে প্রথমে যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে—প্রমাণ ব্যতীত কিছুই সিদ্ধ হইতে পারে না। যিনি নিজ মতের সাধক কোন প্রমাণ বলিতে পারেন না—তিনি অপরের মতেরও প্রমাণ-প্রশ্ন করিতে পারেন না। সুতরাং প্রমাণ ব্যতীতও তাঁহার মত সিদ্ধ হইলে তুল্য-ভাবে অপরের মতও সিদ্ধ হইতে পারে। সুতরাং সকলেরই নিজ মতের সাধক প্রমাণ বক্তব্য। কিন্তু যাঁহার মতে প্রমাণ বলিয়া কিছুই নাই, তিনি তাঁহার উক্তরূপ নিজ মতও সিদ্ধ করিতে পারেন না। আর তিনি যদি বাধ্য হইয়া তাঁহার ঐ নিজ মতের সাধক প্রমাণের বাস্তব প্রামাণ্য স্বীকার করেন, তাহা হইলে যে হেতুর দ্বারা তিনি সর্ব্ব প্রমাণের অপ্রামাণ্য সিদ্ধ করিতেছেন, সেই হেতু যে—সর্ব্ব প্রমাণে নাই, ইহা তাঁহারও স্বীকার্য্য। তাহা হইলে তিনি আর সর্ব্বপ্রমাণের অপ্রামাণ্য সিদ্ধ করিতে পারেন না।

তবে কি প্রমাণেরও প্রমাণ আছে? প্রমাণ ব্যতীত যদি কিছুই সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে ত প্রমাণ পদার্থও সিদ্ধ হইতে পারে না। আর প্রমাণও যদি প্রমাণের বিষয় হয়, তাহা হইলে ত উহাও

'প্রমেয়-পদার্থ'ই হয়। তাহা হইলে উহাকে প্রমাণ বলা যায় কিরূপে? এতদুত্তরে গৌতম বলিয়াছেন—

প্রমেয়া চ তুল্য-প্রামাণ্যবৎ ॥ ২।১।১৬ ॥

তাৎপর্য্য এই যে,—যাহা প্রমাণ, তাহাও অন্য প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হওয়ায় তখন প্রমেয়ও হয়। সামান্যতঃ প্রমেয়ত্ব সকল পদার্থেই আছে। যেমন সুবর্ণাদির গুরুত্ব-বিশেষের নির্দ্ধারক 'তুলা'র দ্বারা যে সময়ে সুবর্ণাদির গুরুত্ব-বিশেষের নিশ্চয় করা হয়, তখন সেই তুলা, সেই নিশ্চয়ের সাধন হওয়ায় 'প্রমাণ' নামে কথিত হয়। কিন্তু কখনও ঐ "তুলা"র প্রামাণ্য-বিষয়ে কাহারও সন্দেহ হইলে অন্য পরীক্ষিত তুলার দ্বারা উহার প্রামাণ্য-পরীক্ষা করা হয়। তখন সেই তুলাই 'প্রমেয়' হয়। এইরূপ কোন প্রমাণের দ্বারা যখন কোন পদার্থের নির্ণয় হয়, তখন উহা প্রমাণই। কিন্তু সেই প্রমাণের প্রামাণ্য বিষয়ে যদি কাহারও সংশয় হয়, অথবা কেহ তাহার প্রামাণ্য অস্বীকার করে, তাহা হইলে তখন প্রমাণের দ্বারা তাহার প্রামাণ্য নির্ণয় আবশ্যক হয় এবং তখন সেই প্রমাণই অন্য প্রমাণের বিষয় হইয়া প্রমেয় হয়। সুতরাং প্রমাণেও প্রমেয়ত্ব থাকে। প্রমাণত্ব ও প্রমেয়ত্ব কালভেদে বিরুদ্ধ হয় না।

পূর্ব্বপক্ষবাদীর চরম কথা এই যে,—প্রমাণেরও প্রমাণ স্বীকার করিতে হইলে সেই প্রমাণের সাধক অপর প্রমাণ ও তাহার সাধক অপর প্রমাণ—এইরূপে অনন্ত প্রমাণ স্বীকার করিতে হয়। পরন্তু তাহা স্বীকার করিলে কোন কালেই কাহারও কোন প্রমাণ দ্বারা কোন তত্ত্ব-নিশ্চয় হইতে পারে না। অতএব বস্তুতঃ প্রমাণও নাই, প্রমেয়ও নাই, প্রমাণ-প্রমেয়-ব্যবহার কাল্পনিক—ইহাই স্বীকার্য্য। মহর্ষি গৌতম উক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করিতে শেষে বলিয়াছেন—

ন, প্রদীপ-প্রকাশ-সিদ্ধিবৎ তৎসিদ্ধেঃ ॥ ২।১।১৯ ॥

অর্থাৎ যেমন প্রদীপালোক চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা সিদ্ধ হয়; তদ্রূপ, প্রমাণসমূহও অন্য প্রমাণের দ্বারাই সিদ্ধ হয়। তাৎপর্য্য এই যে, প্রদীপ দেখিতে অন্য প্রদীপ আবশ্যক না হইলেও চক্ষুরিন্দ্রিয় আবশ্যক হয়। কারণ, অন্ধ ব্যক্তি প্রদীপও দেখিতে পায় না। সুতরাং প্রদীপ যে স্বতঃ প্রকাশ—ইহাও বলা যায় না। কিন্তু সেই প্রদীপবিষয়ে দ্রষ্টার চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রভৃতি প্রমাণ এবং সেই প্রমাণ বিষয়েও অনুমান প্রমাণ আছে এবং সেই অনুমান যে প্রমাণ, সে বিষয়েও অন্য অনুমান প্রমাণ আছে। কিন্তু যেমন প্রদীপ দেখিতে চক্ষুরিন্দ্রিয় আবশ্যক হইলেও তখন তাহার জ্ঞান আবশ্যক হয় না, এইরূপ সমস্ত প্রমাণেরই সাধক প্রমাণ থাকিলেও তাহার জ্ঞান আবশ্যক হয় না। কারণ, সর্ব্বত্র প্রমাণ পদার্থে প্রামাণ্য সংশয় জন্মে না। কিন্তু কোন কোন স্থলে প্রমাণ দ্বারা যথার্থ জ্ঞান জন্মিলেও সেই জ্ঞান যথার্থ কিনা—এইরূপ সংশয় জন্মে। সুতরাং সেই স্থলে সেই প্রমাণ পদার্থেও প্রামাণ্য-সংশয় জন্মে। অতএব জ্ঞানের প্রমাত্ব বা যথার্থত্ব যে, 'স্বতোগ্রাহ্য' অর্থাৎ তাহার নিশ্চায়ক অন্য প্রমাণ অনাবশ্যক—ইহাও স্বীকার করা যায় না। সুতরাং জ্ঞানের প্রমাত্ব ও প্রমাণের প্রামাণ্য,—'পরতোগ্রাহ্য' অর্থাৎ অন্য ...ণর দ্বারাই উহা নিশ্চিত হয়—ইহাই স্বীকার্য্য।

কিন্তু প্রমাণের প্রামাণ্য-সিদ্ধির জন্য অতিরিক্ত কোন প্রমাণ স্বীকার করা অনাবশ্যক। কারণ, দ্বিতীয় প্রমাণ অনুমানের দ্বারাই সকল প্রমাণের প্রামাণ্য-সিদ্ধ হয়। প্রমাণের দ্বারা কোন বিষয়ের জ্ঞান জন্মিলে তাহা সেই বিষয়ে সফল প্রবৃত্তির কারণ হয় এবং সেই প্রমা-জ্ঞানের দ্বারা সেই প্রমাণও সফল প্রবৃত্তির কারণ হয়। যেমন মরীচিকায় জলভ্রম হইলে তজ্জন্য জলপানে প্রবৃত্তি সফল হয় না। কিন্তু প্রমাণ দ্বারা প্রকৃত জলকে জল বুঝিয়া পান করিলে পিপাসার নিবৃত্তি হওয়ায় জলপানে প্রবৃত্তি সফল হয়। সুতরাং পরে 'ইদং জ্ঞানং যথার্থং,

সুফল-প্রবৃত্তি-জনকত্বাৎ, যন্নৈবং তন্নৈবং' এইরূপে অনুমানের দ্বারা পূর্ব্বোৎপন্ন সেই জল-জ্ঞানের যথার্থত্ব সিদ্ধ হয় এবং সেই যথার্থ জ্ঞানের করণ প্রমাণ পদার্থের প্রামাণ্যও উক্তরূপ হেতুর দ্বারা অনুমানসিদ্ধ হয়। এইরূপ বেদাদি শাস্ত্ররূপ অদৃষ্টার্থ শব্দ প্রমাণের প্রামাণ্যও অন্য অনুমান প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয়। কিন্তু প্রমাণের প্রামাণ্য-সাধক সেই অনুমান প্রমাণে প্রামাণ্য সংশয় না হওয়ায় তাহার প্রামাণ্য-সিদ্ধির জন্য আবার অন্য অনুমান আবশ্যক হয় না। সর্ব্বত্র সমস্ত প্রমাণেই প্রামাণ্য সংশয় জন্মে,—ইহা কখনই বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে জীবের প্রমাণ-মূলক নিশ্চয় জন্য যে সমস্ত প্রবৃত্তি ও ব্যবহার হইতেছে, তাহা উপপন্ন হয় না। কোন বিষয়েই কখনই যথার্থ নিশ্চয় জন্মে না- ইহা সংশয়বাদীও বলিতে পারেন না।

পরন্তু ন্যায় দর্শনের পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের শেষে মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন—**জ্ঞান-বিকল্পানাং ভাবাভাব-সংবেদনাদধ্যাত্মম্**॥ উক্ত সূত্রে "জ্ঞানবিকল্প" শব্দের দ্বারা বিশিষ্টবিষয়ক জ্ঞানমাত্রকে গ্রহণ করিয়া "ভাবাভাব-সংবেদনাৎ" এই পদের দ্বারা গৌতম নিজ সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, বিশিষ্টবিষয়ক জ্ঞানমাত্রের ভাব ও অভাবের মানস প্রত্যক্ষরূপ সংবেদন হয়। গৌতমের উক্ত সূত্রানুসারে নৈয়ায়িক সম্প্রদায় জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষকে **অনু-ব্যবসায়** নামে উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন ঘটত্বরূপে ঘটবিষয়ক জ্ঞান জন্মিলে পরক্ষণে 'ঘটমহং জানামি' অর্থাৎ আমি ঘটত্বরূপে ঘট জানিলাম,— এইরূপে মনের দ্বারাই সেই জ্ঞানের বোধ জন্মে। সেই যে বোধ, উহ সেই জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষরূপ বোধ এবং উহার নাম **অনু-ব্যবসায়** কিন্তু সেই অনুব্যবসায়ের মানস প্রত্যক্ষরূপ 'অনু-ব্যবসায়' এব তাহার 'অনু-ব্যবসায়' প্রভৃতি সেই জ্ঞানের প্রকাশে আবশ্যক ন হওয়ায় অনন্ত 'অনু-ব্যবসায়' স্বীকারের আপত্তি হয় না। কো

প্রতিবন্ধকবশতঃ অনু-ব্যবসায়ের মানস প্রত্যক্ষ না হইলেও উহা পরে অনুমান প্রমাণ সিদ্ধ হওয়ায় উহাকে নিষ্প্রমাণও বলা যায় না। ফলকথা, গৌতমের মতে প্রথমোৎপন্ন বিশিষ্ট জ্ঞান মনোগ্রাহ্য; উহা স্বতঃ প্রকাশ নহে এবং সেই জ্ঞানাশ্রয় আত্মাও স্বতঃ প্রকাশ নহে।

কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপে প্রথমোৎপন্ন বিশিষ্ট-জ্ঞানের মানস-প্রত্যক্ষরূপ অনু-ব্যবসায় জন্মিলেও, সেই অনু-ব্যবসায়ে সেই জ্ঞানের ভ্রমত্ব বা প্রমাত্ব বিষয় হয় না। সুতরাং পরে অনুমান প্রমাণরূপ অন্য প্রমাণের দ্বারাই সেই জ্ঞানের ভ্রমত্ব বা প্রমাত্বের নিশ্চয় জন্মে। অর্থাৎ ভ্রম জ্ঞানের ভ্রমত্ব যেমন পরতোগ্রাহ্য; তদ্রূপ, প্রমাজ্ঞানের প্রমাত্বও পরতোগ্রাহ্য, উহা স্বতোগ্রাহ্য নহে এবং ভ্রম জ্ঞানের উৎপত্তি যেমন কোন দোষ জন্য বলিয়া তাহার ভ্রমত্বও সেই দোষজন্য; তদ্রূপ, প্রমাজ্ঞানের উৎপত্তিও তুল্যন্যায়ে কোন গুণজন্য বলিয়া স্বীকার্য্য হওয়ায় উহার প্রমাত্বও সেই গুণজন্য—ইহা স্বীকার্য্য। এই মতের নাম **পরতঃ প্রামাণ্যবাদ**।

ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায় উক্ত মতকে আশ্রয় করিয়াই বেদের পৌরুষেয়ত্ব সমর্থন করিয়াছেন। কারণ, উক্ত মতে বেদবাক্যজন্য বোধের যে প্রমাত্ব, তাহা সেই বেদ-বক্তা পুরুষের বেদার্থবিষয়ক যথার্থ জ্ঞানরূপ গুণ-জন্য। সুতরাং বেদ সেই পুরুষকৃত বলিয়া পৌরুষেয় এবং তাঁহার প্রামাণ্যপ্রযুক্তই বেদের প্রামাণ্য। সুতরাং সেই বেদকর্ত্তা নিত্যসর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরও স্বীকার্য্য। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ইহা ব্যক্ত হইবে।

কিন্তু কর্ম্ম-মীমাংসক সম্প্রদায়ের মতে বেদ নিত্য। বেদ—কোন পুরুষকৃত নহে, এই অর্থে অপৌরুষেয়। তাই তাঁহারা স্বতঃপ্রামাণ্যবাদই সমর্থন করিয়াছেন। বৈদান্তিক প্রভৃতি আরও অনেক সম্প্রদায় বিভিন্নরূপে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ও স্বতঃপ্রামাণ্যবাদই স্বীকার করিয়া-

ছেন। স্বতঃ-প্রামাণ্য-বাদী মীমাংসকের মতে ভ্রমজ্ঞানের উৎপত্তি এবং ভ্রমত্ব, কোন দোষপ্রযুক্তই হয় এবং তাহার ভ্রমত্ব-নিশ্চয়ও পরে অনুমানাদি প্রমাণের দ্বারাই হয়। কিন্তু প্রমাজ্ঞানের প্রমাত্ব স্বতঃ অর্থাৎ তাহাতে অতিরিক্ত কোন বিশেষ কারণের অপেক্ষা নাই এবং সেই জ্ঞানের প্রমাত্ব-নিশ্চয়েও অন্য প্রমাণের অপেক্ষা নাই। কারণ প্রমাজ্ঞান জন্মিলেই সেই জ্ঞানের বোধক যে সমস্ত কারণ, তদ্দ্বারাই সেই জ্ঞানের প্রমাত্ব-নিশ্চয় জন্মে। এই মতের নাম **স্বতঃ প্রামাণ্যবাদ**।

কিরূপে তাহা সম্ভব হয়, সে বিষয়ে মীমাংসক সম্প্রদায়ের মধ্যে গুরুপ্রভাকর, কুমারিলভট্ট এবং মুরারি মিশ্রের বিভিন্ন মত আছে। প্রভাকরের মতে জ্ঞান স্বপ্রকাশ। কারণ—জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই ত্রিতয়-বিষয়ক হইয়াই জ্ঞান জন্মে। যেমন 'অয়ং ঘটঃ, ঘটমহং জানামি' এইরূপেই ঘট-জ্ঞান জন্মে। তাহাতে সেই জ্ঞানের প্রমাত্বও বিষয় হওয়ায় তাহার অন্য কোন প্রকাশক আবশ্যক হয় না। প্রভাকরের মতে ভ্রমজ্ঞান নাই।

কুমারিলভট্টের মতে জ্ঞান অতীন্দ্রিয়। কিন্তু জ্ঞান উৎপন্ন হইলে তজ্জন্য সেই জ্ঞানের বিষয়ে "জ্ঞাততা" নামক একটি পদার্থ জন্মে এবং পরে তাহারই মানস প্রত্যক্ষ জন্মে। যেমন ঘট-জ্ঞান উৎপন্ন হইলে 'ঘটো ময়া জ্ঞাতঃ' এইরূপে সেই ঘটগত "জ্ঞাততা"র প্রত্যক্ষ জন্মে, পরে 'অহং ঘটবিষয়ক-জ্ঞানবান্, তথাবিধ জ্ঞাততাবত্ত্বাৎ' এইরূপে সেই জ্ঞাততা হেতুর দ্বারা তাহার কারণ ঘটজ্ঞানের অনুমান হয়। গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের "প্রামাণ্যবাদে"র "রহস্য" টীকায় মথুরানাথ তর্কবাগীশ, ভট্ট-মতের ব্যাখ্যায় পরে আত্মাতেও "জ্ঞাততা"র স্বরূপ সম্বন্ধ-বিশেষ বলিয়া জ্ঞাততা-হেতুক অনুমানই প্রদর্শন করিয়াছেন।

যাহা হউক, ফলকথা, কুমারিল ভট্টের প্রসিদ্ধ মতে অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের বোধক অনুমান প্রমাণের দ্বারাই জ্ঞানের সহিত তাহার প্রমাত্বও সিদ্ধ

হয়—এই অর্থে জ্ঞানের প্রমাত্ব স্বতোগ্রাহ্য। কিন্তু মুরারি মিশ্র পরে জ্ঞানের অনু-ব্যবসায়ই স্বীকার করিয়া তদ্দ্বারাই জ্ঞানের ন্যায় তাহার প্রমাত্বও সিদ্ধ হয়—ইহা সমর্থন করিয়াছেন। এই সমস্ত মত-ভেদের যুক্তি সুবোধ নহে।

কিন্তু পরতঃ প্রামাণ্যবাদী ন্যায় বৈশেষিক সম্প্রদায়ের প্রথম কথা এই যে, কোন বিষয়ে কাহারও বস্তুতঃ প্রমাজ্ঞান জন্মিলেও, কোন স্থলে যখন পরে এই জ্ঞান প্রমা কিনা? এইরূপ সংশয়ও জন্মে, তখন সেই প্রমা-জ্ঞানের বোধক কারণ দ্বারাই যে, তাহার প্রমাত্ব-নিশ্চয় জন্মে, ইহা কখনই বলা যায় না। কারণ, পূর্ব্বেই প্রমাত্বের নিশ্চয় হইলে তদ্বিষয়ে সংশয় হইতে পারে না। সেইরূপ স্থলে জ্ঞাতা পুরুষের কোন দোষ প্রতিবন্ধক থাকায় পূর্ব্বে তাহার সেই জ্ঞানে প্রমাত্ব-নিশ্চয় জন্মে না—ইহা বলিলে, কিরূপ দোষ সেই প্রমাত্ব-নিশ্চয়ের প্রতিবন্ধক হয়, ইহা বলা আবশ্যক এবং দোষ থাকিলে সেই দোষজন্য সেখানে তাহার সেই জ্ঞান ভ্রমই কেন হয় না? ইহাও বলা আবশ্যক। পরন্তু জ্ঞানের প্রমাত্ব-নিশ্চয়ে কোন দোষকে প্রতিবন্ধক বলিয়া স্বীকার করিলে তাহাতে সেই দোষের অভাবকেও অতিরিক্ত কারণ বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ, কার্য্যমাত্রেই তাহার প্রতিবন্ধক পদার্থের অভাবও কারণ বলিয়া স্বীকার্য্য। তাহা হইলে প্রমাজ্ঞানের প্রমাত্ব-নিশ্চয়ে অতিরিক্ত আর কোন কারণের অপেক্ষা নাই অর্থাৎ প্রমাত্ব **স্বতো গ্রাহ্য**, এই সিদ্ধান্ত-রক্ষা হয় না।

এইরূপ প্রমা-জ্ঞানের উৎপত্তিতে "গুণ" বলিয়া কোন অতিরিক্ত কারণ স্বীকার না করিলেও দোষের অভাব কারণ—ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ, ভ্রমের উৎপাদক কোন দোষ থাকিলে সেখানে ভ্রমজ্ঞানই জন্মে, প্রমা-জ্ঞান জন্মে না—ইহা সর্ব্ব-স্বীকৃত সত্য। সুতরাং প্রমাজ্ঞানের উৎপত্তি বা তাহার প্রমাত্ব যদি সর্ব্বত্রই দোষাভাব-

রূপ অতিরিক্ত কারণ জন্য হয়, তাহা হইলে ত উৎপত্তি-পক্ষেও স্বতঃ-প্রামাণ্য সিদ্ধান্তের রক্ষা হয় না। অভাব পদার্থরূপ কোন অতিরিক্ত কারণ জন্য হইলে 'স্বতঃ প্রামাণ্যে'র হানি হয় না—এবিষয়ে কোন যুক্তি নাই। আর তাহা বলিলে অভাবরূপ দোষ জন্য যে ভ্রম জ্ঞান, তাহাতেও কেন "স্বতস্ত্ব" স্বীকার করা হয় না?

"ন্যায়-কুসুমাঞ্জলি"র দ্বিতীয় স্তবকের প্রারম্ভে উক্ত মত-খণ্ডন করিতে মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন যে, ভ্রমের উৎপাদক দোষমাত্রই সর্ব্বত্র ভাব পদার্থই নহে। কারণ, বিশেষধর্ম্ম-দর্শনের অভাব প্রভৃতিও দোষ। তাই তৎপ্রযুক্ত সংশয়াদি ভ্রমজ্ঞান জন্মে। যাহা ভ্রমোৎপাদনে বিশেষ কারণ, তাহাকেই দোষ বলে। সুতরাং কোন অভাবরূপ দোষের যে অভাব, তাহা যখন বস্তুতঃ ভাব পদার্থই, তখন সেই দোষাভাবজন্য যে প্রমাজ্ঞানের উৎপত্তি, তাহা বস্তুতঃ ভাব পদার্থ-জন্য হইলেও তাহাকে পরতঃ উৎপত্তি কেন বলিব না? উদয়নাচার্য্য পরে মীমাংসক সম্প্রদায়ের অন্যান্য কথারও উল্লেখপূর্ব্বক সূক্ষ্মবিচারের দ্বারা তাহারও খণ্ডন করিয়াছেন। পরে নব্যনৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায় "তত্ত্ব-চিন্তামণি"র প্রামাণ্যবাদ গ্রন্থে নবীনভাবে বিস্তৃত সূক্ষ্মবিচার করিয়াছেন। বিশেষ জিজ্ঞাসুর ঐ গ্রন্থ অবশ্য পাঠ্য।

মহর্ষি গৌতম পরে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষ-লক্ষণের পরীক্ষা করিয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণের পরীক্ষা করিতে পূর্ব্বপক্ষ সূত্র বলিয়াছেন—**প্রত্যক্ষ মনুমান মেকদেশ গ্রহণাদুপলব্ধেঃ** (২।১।৩১) অর্থাৎ যেহেতু বৃক্ষাদি দ্রব্যের শাখাদি অবয়বরূপ কোন একদেশ-দর্শন জন্য সেই বৃক্ষাদির জ্ঞান জন্মে, অতএব বৃক্ষাদি জ্ঞান অনুমিতি। এতদুত্তরে গৌতম বলিয়াছেন যে, বৃক্ষাদির শাখাদি কোন এক দেশের প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বীকার করাই হয়। নচেৎ ঐ অনুমিতিও হইতে পারে না। গৌতম পরে অবয়ব-সমষ্টি হইতে ভিন্ন

অবয়বী দ্রব্যের সমর্থন করিয়া প্রত্যক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। বৃক্ষাদি দ্রব্য যে, পরমাণুপুঞ্জ নহে—ইহা সমর্থন করিতে গৌতম বলিয়াছেন যে, অবয়বী না থাকিলে কিছুরই প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ, প্রত্যেক পরমাণুই অতীন্দ্রিয়। অতএব পরস্পর সংযুক্ত পরমাণুপুঞ্জেরও প্রত্যক্ষ হইতে পারে না।

গৌতম পরে অনুমানের প্রামাণ্য পরীক্ষা করিতে সংক্ষেপে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম এই যে,—যাহা যে অনুমানে প্রকৃত হেতু নহে, তাহাকে হেতু বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাহাতে অনুমেয় ধর্ম্মের ব্যভিচার প্রদর্শন করিলে তদ্দারা প্রকৃত অনুমানের অপ্রামাণ্য সিদ্ধ হয় না। অনুমানের যাহা প্রকৃত হেতু, তাহা কখনই অনুমেয় ধর্ম্মের ব্যভিচারী হয় না। ফলকথা, প্রকৃত হেতুর দ্বারা যে অনুমিতিরূপ জ্ঞান জন্মে, তাহা যথার্থ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান। সুতরাং সেই জ্ঞানের করণভূত যে অনুমান প্রমাণ,—তাহার প্রামাণ্য অবশ্য স্বীকার্য্য।

প্রত্যক্ষমাত্র-প্রমাণবাদী চার্ব্বাক, সর্ব্বত্রই অনুমানের হেতুতে অনুমেয় ধর্ম্মের ব্যভিচার সংশয়ের সমর্থন করিয়া অনুমানের অপ্রামাণ্য সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু অনুমান প্রমাণকে আশ্রয় না করিলে সেই ব্যভিচার-সংশয়ও সমর্থন করা যায় না। কারণ, সর্ব্বত্রই অনুমানের হেতুতে ব্যভিচার সংশয় জন্মে,—ইহা সমর্থন করিতে যে দেশ-কালাদি গ্রহণ করিতে হয়, তাহা অপ্রত্যক্ষ। আর অনুমান প্রমাণ অসিদ্ধ হইলে প্রত্যক্ষ প্রমাণও সিদ্ধ হয় না। কারণ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে। অনুমান প্রমাণের দ্বারাই উহা সিদ্ধ হয়।

পরন্তু অনুমান প্রমাণ অস্বীকার করিলে চার্ব্বাকও অপরকে অজ্ঞ ও ভ্রান্ত বলিতে পারেন না। কারণ, অপরের আত্মগত অজ্ঞতা ও ভ্রম, অপর ব্যক্তি মনের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারে না; কিন্তু তাহার বাক্য শ্রবণাদি করিয়া অনুমান করে—ইহা চার্ব্বাকেরও স্বীকার্য্য। সর্ব্বত্রই

অপরের অজ্ঞতা ও ভ্রম বিষয়ে সম্ভাবনারূপ জ্ঞানই হইলে নিশ্চয় করিয়া তাহা কখনই বলা যায় না। পরন্তু সর্ব্বত্রই যে, অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে সম্ভাবনারূপ সংশয়াত্মক জ্ঞান জন্যই জীবের প্রবৃত্তি ও ব্যবহার হইতেছে—ইহাও কখনই বলা যায় না। স্ত্রী পুত্রাদির মৃত্যু হইলে সেই মৃত্যুর অনুমাপক অনেক অব্যভিচারী হেতুর নিশ্চয়পূর্ব্বক অনুমান প্রমাণের দ্বারা সেই মৃত্যুর নিশ্চয় হইলেই সেই দেহের দাহাদি কার্য্যে প্রবৃত্তি হইতেছে। অনেক স্থলে ভ্রমাত্মক নিশ্চয় হইতে পারে; কিন্তু মৃত্যু বিষয়ে কোনরূপ সংশয় থাকিলে সর্ব্বত্র ঐরূপ প্রবৃত্তি হইতে পারে না।

পরন্তু অনুমানের প্রামাণ্যকে সন্দিগ্ধ বলিলে উহার অপ্রামাণ্যও সন্দিগ্ধই হইবে। কিন্তু যাহা সন্দিগ্ধ, তাহা কোন সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। সুতরাং অনুমানের অপ্রামাণ্যকে সিদ্ধান্ত বলিতে হইলে তাহার সাধক প্রমাণও বলিতে হইবে। কিন্তু চার্ব্বাকের মতে প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ নাই। অবশ্য তীক্ষ্ণবুদ্ধি চার্ব্বাক অনুমানের প্রামাণ্য-খণ্ডনে বাধকরূপে অনেক কথা বলিয়াছেন। কিন্তু উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ বিচারপূর্ব্বক তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। * জৈন এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও চার্ব্বাক মতের খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু উপমানাদি প্রমাণ বিষয়ে মত ভেদ আছে।

প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন—**শব্দাদীনামপ্যনুমানেঽন্তর্ভাবঃ**। বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতে উপমান ও শব্দ প্রমাণ প্রভৃতি অনুমান প্রমাণের অন্তর্গত—ইহাই প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু ব্যোমশিবাচার্য্য বহু বিচার করিয়া সমর্থন করিয়াছেন যে, কণাদের মতে শব্দ প্রমাণ অনুমান হইতে পৃথক্ প্রমাণ; কণাদ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ—এই প্রমাণত্রয়-বাদী। সুতরাং প্রশস্ত পাদের উক্ত বাক্যে

---

* অনুমানের প্রামাণ্য-খণ্ডনে চার্ব্বাকের সমস্ত কথা ও তাহার খণ্ডনে বিস্তৃত আলোচনা মৎসম্পাদিত "ন্যায় দর্শনে"র দ্বিতীয় খণ্ডে ২১৬ পৃষ্ঠা হইতে দ্রষ্টব্য।

"শব্দাদীনাং" এই পদে 'অতদ্‌গুণসংবিজ্ঞান' বহুব্রীহি সমাস বুঝিয়া উক্ত পদের দ্বারা শব্দ প্রমাণকে ত্যাগ করিয়া উপমানাদি প্রমাণই বুঝিতে হইবে।

কিন্তু আচার্য্য শঙ্করের শিষ্য সুরেশ্বরাচার্য্য "মানসোল্লাস" গ্রন্থে প্রমাণের সংখ্যা-বিষয়ে প্রসিদ্ধ মত-ভেদ প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন যে * চার্ব্বাক একমাত্র প্রত্যক্ষপ্রমাণবাদী। কণাদ ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়বিশেষ, প্রত্যক্ষ ও অনুমান—এই প্রমাণদ্বয়বাদী। সাংখ্য সম্প্রদায় এবং "ন্যায়ৈকদেশী" সম্প্রদায় প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ—এই প্রমাণত্রয়বাদী। নৈয়ায়িক সম্প্রদায় প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ—এই প্রমাণচতুষ্টয়-বাদী। গুরু প্রভাকর পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ চতুষ্টয় ও অর্থাপত্তি—এই পঞ্চ প্রমাণবাদী। কুমারিল ভট্টের সম্প্রদায় ও বৈদান্তিক সম্প্রদায় উক্ত পঞ্চ প্রমাণ এবং "অভাব" অর্থাৎ অনুপলব্ধি—এই ষট্ প্রমাণ-বাদী।

---

* "সর্ব্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ" নামক গ্রন্থেও বৈশেষিক পক্ষে প্রমাণত্রয়ই কথিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ গ্রন্থ আচার্য্য শঙ্করের রচিত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। আচার্য্য শঙ্করের শিষ্য সুরেশ্বরও কণাদের মতে প্রত্যক্ষ ও অনুমান—এই প্রমাণদ্বয়ই বলিয়াছেন। পরন্তু [illegible]র্ষি কণাদ অনুমানের নিরূপণ করিয়া পরেই বলিয়াছেন—"এতেন শাব্দং ব্যাখ্যাতম্" ([illegible]।৩)। কণাদের উক্ত সূত্রের দ্বারা এবং প্রশস্তপাদের অন্যান্য উক্তির দ্বারা স্পষ্টই [illegible] যায় যে, কণাদের মতে শাব্দজ্ঞানও অনুমিতি-বিশেষ। সুতরাং উক্ত মতে অনুমান-ই শব্দের প্রামাণ্য। উহা পৃথক্ প্রমাণ নহে। কিন্তু ব্যোমশিবাচার্য্য কণাদের উক্ত সূত্রের কোন ব্যাখ্যা করেন নাই।—"ব্যোমবতী বৃত্তি" কাশী চৌখাম্বা—সিরীজ ৫৭৭-৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

"প্রত্যক্ষ মেকং চার্ব্বাকাঃ, কণাদ-সুগতৌ পুনঃ।
অনুমানঞ্চ তচ্চাপি, সাংখ্যাঃ শব্দঞ্চ তে অপি॥
ন্যায়ৈকদেশিনোঽপ্যেব মুপমানঞ্চ কেচন।
অর্থাপত্ত্যা সহৈতানি চত্বার্য্যাহ প্রভাকরঃ॥
অভাবষষ্ঠান্যেতানি ভাট্টা বেদান্তিন স্তথা।
সম্ভবৈতিহ্যযুক্তানি তানি পৌরাণিকা জগুঃ॥"
"মানসোল্লাস"—দ্বিতীয় ১৭।১৮।১৯।২০।

পৌরাণিক সম্প্রদায় উক্ত ষট্ প্রমাণ এবং "সম্ভব" ও "ঐতিহ্য"—এই অষ্ট প্রমাণ-বাদী। "তার্কিকরক্ষা" গ্রন্থে বরদরাজও সুরেশ্বরের ঐ সমস্ত প্রসিদ্ধ শ্লোকই উদ্ধৃত করিয়াছেন—ইহাই বুঝাই যায়।

যাহা হউক, এখন মহর্ষি গৌতম "উপমান" নামে পৃথক্ প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন কেন, ইহাই প্রথমে বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বপক্ষ এই যে, উপমানও অনুমানের অন্তর্গত।

মহর্ষি গৌতম পরে নিজেই উক্ত পূর্ব্বপক্ষের সমর্থন করিয়া উহার খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন—

তথেত্যুপসংহারাদুপমান-সিদ্ধের্নাবিশেষঃ ॥ ২।১।৪৮ ॥

তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বে "যথা গৌ স্তথা গবয়ঃ" এইরূপ বাক্য শ্রবণ ব্যতীত পরে গবয় দেখিলেও তাহাতে নগরবাসীর গবয়শব্দবাচ্যত্ব-নির্ণয় হয় না। কিন্তু উক্তরূপ বাক্য-শ্রবণের পরে গবয় দেখিলে তাহাতে 'তথা' অর্থাৎ ইহা আমার পূর্ব্বদৃষ্ট গোর সদৃশ—এইরূপে সেই গবয় পশুতে গোর সাদৃশ্য প্রত্যক্ষজন্য পূর্ব্বশ্রুত বাক্যার্থের স্মরণ পূর্ব্বক গবয়ত্ব-বিশিষ্ট পশুমাত্র, গবয়শব্দের বাচ্য—এইরূপ বোধ জন্মে। উক্ত স্থলে উক্তরূপ বোধই উপমিতি। অনুমিতি হইতে উহার বি[illegible] আছে। কারণ, উক্তরূপ সাদৃশ্য-প্রত্যক্ষ কোন অনুমিতির করণ ন[illegible] পরন্তু কোন হেতুতে পূর্ব্বে অনুমেয় ধর্ম্মের ব্যাপ্তি-নিশ্চয় ব্য[illegible] অনুমিতি জন্মে না। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত স্থলে গবয়শব্দ-বাচ্যত্বানুমা[illegible] কোন হেতু নাই।

অবশ্য বৈশেষিক সম্প্রদায়ের পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ "গবয়" শব্দের শক্তি-নির্ণয়ের জন্য নানারূপ অনুমান-প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের কথা এই যে, "গবয়" শব্দের কোন অর্থ-বিশেষে শক্তি আছে, এইমাত্রই অনুমান-প্রমাণের দ্বারা বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু গবয়ত্বরূপে গবয় পশুতে, যে শক্তি অর্থাৎ গবয়ত্বাবচ্ছিন্নে

যে শক্তি, তাহা অনুমান প্রমাণ দ্বারা বুঝা যায় না। কারণ, পূর্ব্বে কোন দৃষ্টান্তে কোন হেতুতে গবয়ত্ব-বিশিষ্টে "গবয়" শব্দের শক্তির ব্যাপ্তি-নিশ্চয় ব্যতীত তাহা বুঝা যায় না। কিন্তু দৃষ্টান্তের অভাবে ঐরূপ ব্যাপ্তি-নিশ্চয় সম্ভব হয় না। অতএব উক্তরূপ শক্তি-নির্ণয়ের সাধন "উপমান" নামে পৃথক্ প্রমাণ স্বীকার্য্য। অবশ্য বৈশেষিক সম্প্রদায়ের উক্ত মতের সমর্থনেও বহু কথা আছে। নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের শেষ কথা এই যে, সাদৃশ্য-প্রত্যক্ষাদিজন্য উক্তরূপে গবয়-শব্দ-বাচ্যত্ব-জ্ঞানের পরে সেই বোদ্ধার 'আমি গবয়ত্ব-বিশিষ্ট পশুতে গবয়শব্দ-বাচ্যত্বের অনুমিতি করিলাম'—এই রূপে সেই জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ জন্মে না। কিন্তু······উপমিতি করিলাম,—এইরূপেই সেই জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ জন্মে। তাই উপমিতি-কর্ত্তা, ইহা বলেন না যে—আমি অনুমান দ্বারা ইহা বুঝিয়াছি। সুতরাং তাঁহার ঐরূপ জ্ঞান, অনুমিতি হইতে ভিন্ন 'উপমিতি'।

মহর্ষি গৌতম চতুর্থ শব্দ প্রমাণের পরীক্ষা করিতেও অনেক কথা বলিয়াছেন। শব্দ প্রমাণও অনুমানের অন্তর্গত অর্থাৎ শাব্দ জ্ঞানও শব্দমূলক অনুমিতিবিশেষ—এই পূর্ব্বপক্ষের সমর্থন করিয়া উহার নিরাসে গৌতম বলিয়াছেন—

আপ্তোপদেশ-সামর্থ্যাচ্ছব্দাদর্থ-সম্প্রত্যয়ঃ ২।১।৫২

অর্থাৎ বাক্য-বিশেষরূপ শব্দ-বিশেষ হইতে অর্থ-বিশেষের যে সম্প্রত্যয় জন্মে, অর্থাৎ বাক্যার্থ-বোধরূপ যে শাব্দবোধ, তাহা আপ্ত-বাক্যের সামর্থ্য প্রযুক্ত। তাৎপর্য্য এই যে, কোন আপ্তবাক্যের দ্বারা যে যথার্থ বোধ জন্মে, তাহা কোন হেতুতে সেই বাক্যার্থের ব্যাপ্তিজ্ঞান-প্রযুক্ত নহে। সুতরাং ধূম হেতুর দ্বারা যেমন বহ্নির অনুমিতি জন্মে, তদ্রূপ, কোন হেতুর দ্বারা বাক্যার্থের অনুমিতি জন্মে না। তাই বাক্যার্থ-বোধের পরে বোদ্ধা ব্যক্তির 'আমি এই বাক্যার্থের অনুমিতি করিলাম'—

এই রূপে সেই বোধের মানস প্রত্যক্ষ জন্মে না, কিন্তু 'আমি শাব্দবোধ করিলাম'—এই রূপেই সেই বোধের মানস প্রত্যক্ষ (অনু-ব্যবসায়) জন্মে। মহর্ষি গৌতম পরে বলিয়াছেন যে, শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ নাই। সুতরাং শব্দের দ্বারা তাহার অর্থের অনুমিতি হইতেও পারে না। কারণ, স্বাভাবিকসম্বন্ধরূপ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর দ্বারাই অনুমিতি জন্মে।

শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধের খণ্ডন করিয়া গৌতম তাহার সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন যে, অর্থ-বিশেষে শব্দ-বিশেষের সংকেত-প্রযুক্তই সেই শব্দ হইতে সেই অর্থ-বিশেষের বোধ হয়। ঐ বোধ, শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিকসম্বন্ধ-প্রযুক্ত নহে। মহর্ষি কণাদেরও উহাই সিদ্ধান্ত। কিন্তু কিরূপ হেতুর দ্বারা কিরূপে অনুমান দ্বারা বাক্যার্থ-বোধরূপ শাব্দ বোধ হয়—ইহা কণাদ এবং প্রশস্তপাদও বলেন নাই। পরবর্ত্তী অনেক বৈশেষিকাচার্য্য শাব্দবোধ স্থলে নানারূপে অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু "ন্যায়-কুসুমাঞ্জলি"র তৃতীয় স্তবকে উদয়নাচার্য্য সূক্ষ্ম বিচার করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, উপমানপ্রমাণ ও শব্দ-প্রমাণ, অনুমান হইতে ভিন্ন প্রমাণ। পরে গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রভৃতি নব্য-নৈয়ায়িকগণ বিশেষ বিচার করিয়া বৈশেষিকমত খণ্ডন করিয়াছেন। সংক্ষেপে সে সমস্ত কথার কিছুই ব্যক্ত করা যায় না।

ন্যায়-দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের প্রারম্ভে মহর্ষি গৌতম **ন চতুষ্ট্বং** ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা পূর্ব্ব পক্ষ প্রকাশ করিয়াছেন যে, "ঐতিহ্য," "অর্থাপত্তি," "সম্ভব" এবং "অভাব" নামে আরও চারিটি প্রমাণ থাকায় প্রমাণ, চতুর্ব্বিধ নহে। এই পূর্ব্ব পক্ষের খণ্ডন করিতে গৌতম পরে (২।২।২) বলিয়াছেন যে, "ঐতিহ্য" শব্দ প্রমাণে

অন্তর্ভূত এবং "অর্থাপত্তি", "সম্ভব" ও "অভাব"—অনুমানে অন্তর্ভূত। অতএব প্রমাণ চতুর্ব্বিধই।

যে বাক্যের বক্তার নির্দ্দেশ নাই—এমন পরম্পরাগত প্রবাদবাক্যই "ঐতিহ্য" নামে কথিত হইয়াছে। গৌতমের মতে প্রবাদমাত্রই প্রমাণ হইতে পারে না। যেরূপ প্রবাদ, প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা শব্দপ্রমাণ বলিয়াই গ্রাহ্য। আচার্য্য শঙ্কর-শিষ্য সুরেশ্বরাচার্য্য বলিয়াছেন—"সম্ভবৈতিহ্য-যুক্তানি তানি পৌরাণিকা জগুঃ।" (পূর্ব্ব ২১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

পৌরাণিকগণের মতে সম্ভব নামক প্রমাণ অনুমান হইতে ভিন্ন। যেমন কাহারও সহস্র টাকা আছে, ইহা জানিলে তাহার শত টাকা আছে—ইহা বুঝা যায়। কিন্তু সেই বোধে কোন হেতু এবং তাহাতে ব্যাপ্তি জ্ঞানাদির অপেক্ষা হয় না। সুতরাং ঐরূপ নিশ্চয়াত্মক বোধ, অনুমান প্রমাণ জন্য নহে, কিন্তু পৃথক্ কোন প্রমাণ জন্য। সেই প্রমাণের নাম সম্ভব।

কিন্তু মহর্ষি গৌতম উহাকেও অনুমান প্রমাণই বলিয়াছেন। অন্যান্য মতেও উহা অনুমানে অন্তর্ভূত। কারণ, শত না থাকিলে

গৌতম প্রথমেই বলিয়াছেন,—"প্রত্যক্ষানুমানোপমান-শব্দাঃ প্রমাণানি। (১।১।৩) পরে উক্তরূপ পূর্ব্বপক্ষের প্রকাশপূর্ব্বক উহার খণ্ডন করিয়াও তাঁহার মতে প্রমাণের চতুর্ব্বিধত্ব সুব্যক্ত করিয়াছেন। তথাপি প্রমাণত্রয়বাদী—ভাসর্ব্বজ্ঞ "ন্যায়-সার" গ্রন্থে নিজমত-সমর্থনের জন্য গৌতমেরও তাৎপর্য্য কল্পনা করিয়াছেন যে, গৌতমের মতেও উপমান প্রমাণ, শব্দ-প্রমাণে অন্তর্ভূত। তাই তিনি উপমান প্রমাণ যে, অনুমানের অন্তর্গত, এই মতেরই খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু উহা যে, শব্দ প্রমাণ নহে—ইহা তিনি বলেন নাই। ভাসর্ব্বজ্ঞের এইরূপ কল্পনা অন্য কোন সম্প্রদায়ই গ্রহণ করেন নাই। তাই ভাসর্ব্বজ্ঞের সম্মত প্রমাণ-ত্রয়বাদ, নৈয়ায়িকমত বলিয়া কথিত হয় নাই। কিন্তু উহা "ন্যায়ৈকদেশি-মত" বলিয়াই কথিত হইয়াছে। "মানসোল্লাস" গ্রন্থে সুরেশ্বরাচার্য্যও বলিয়াছেন—"ন্যায়ৈকদেশিনোঽপ্যেবম্।"

শতাধিক থাকা অসম্ভব। সুতরাং সহস্র টাকা থাকিলে শত টাকা অবশ্য থাকে—এইরূপ ব্যাপ্তি-নিশ্চয়জন্য সংস্কারবশতঃই তখন ঐরূপ ব্যাপ্তির স্মরণ হওয়ায় তজ্জন্য উক্তরূপ বোধ জন্মে। কিন্তু যাহার ঐরূপ ব্যাপ্তি বিষয়ে কোন সংস্কার নাই, তাহার কখনই ঐরূপ বোধ হয় না। সুতরাং ঐরূপ নিশ্চয়াত্মক যথার্থ বোধ অনুমান প্রমাণ-জন্য, ইহাই স্বীকার্য্য।

মীমাংসক সম্প্রদায় "অর্থাপত্তি" নামে পঞ্চম প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন। "অর্থস্য আপত্তিঃ কল্পনা" এই অর্থে "অর্থাপত্তি" শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে—"অর্থাপত্তি" নামক কল্পনারূপ প্রমা। আর "অর্থস্য আপত্তিঃ কল্পনা যস্মাৎ" এই অর্থে বহুব্রীহি সমাসে "অর্থাপত্তি" শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে—সেই কল্পনার সাধন "অর্থাপত্তি" নামক প্রমাণ। "দৃষ্টার্থাপত্তি" ও "শ্রুতার্থাপত্তি" নামে সামান্যতঃ অর্থাপত্তি দ্বিবিধ। "শ্রুতার্থাপত্তি"ও দ্বিবিধ। "বেদান্তপরিভাষা"কার ধর্ম্মরাজও ইহার ব্যাখ্যা ও উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। "শ্রুতার্থাপত্তি"র প্রসিদ্ধ উদাহরণ প্রকাশ করিতে তিনি পরে বলিয়াছেন—"যথা বা জীবো দেবদত্তো গৃহে নেতি বাক্য-শ্রবণানন্তরং জীবিনো গৃহাসত্বং বহিঃ স... কল্পয়তীতি।"

তাৎপর্য্য এই যে, দেবদত্ত' নামক কোন ব্যক্তি জীবিত আ... ইহা যাহার নিশ্চিত, তিনি কোন আপ্ত-ব্যক্তির নিকটে "দে... গৃহে নাস্তি" এই বাক্য শ্রবণ করিলে পরে সেই দেবদত্তের বহিঃ সত্তার কল্পনা করেন। কারণ, জীবিত ব্যক্তির যে, গৃহে অসত্তা, তাহা তাহার বহিঃ সত্তা ব্যতীত উপপন্ন হয় না। সুতরাং তাহার বহিঃ সত্তাই গৃহে অসত্তার উপপাদক এবং গৃহে অসত্তা উপপাদ্য। সেই উপপাদ্য-জ্ঞানই উপপাদক-কল্পনার করণ। অনেকের মতে অনুপপত্তি-জ্ঞানই সেই কল্পনার করণ। যাহা হউক, ফলকথা, উক্ত মতে পূর্ব্বোক্ত স্থলে কোন

হেতুতে বহিঃ সত্তার ব্যাপ্তি-নিশ্চয় সম্ভব নহে। ব্যতিরেক ব্যাপ্তি-নিশ্চয় অনুমানের কারণ নহে। অনুমানমাত্রই "অন্বয়ী। সুতরাং অর্থাপত্তি-স্থলে অনুমান সম্ভব না হওয়ায় "অর্থাপত্তি" নামে পৃথক প্রমাণই স্বীকার্য্য। মীমাংসক সম্প্রদায়ের পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ ইহা সমর্থন করিতে বহু সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছেন। পরে নব্য-নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণিও নিজ মতানুসারে বিচার পূর্ব্বক অনুমানমাত্রকেই "অন্বয়ী" বলিয়া "অর্থাপত্তি"র পৃথক্ প্রামাণ্যই সমর্থন করিয়াছেন।

কিন্তু মহর্ষি গৌতম "অর্থাপত্তি" প্রমাণকেও অনুমানে অন্তর্ভূত বলিয়াছেন। তদনুসারে উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ বিশেষ বিচার পূর্ব্বক "অর্থাপত্তি"র পৃথক্ প্রামাণ্য খণ্ডন করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে তাঁহাদিগের সকল কথা প্রকাশ করা সম্ভব নহে। সংক্ষেপে বক্তব্য এই যে,—পূর্ব্বোক্ত স্থলে জীবিত ব্যক্তির যে গৃহে অসত্তা, তাহাতে বহিঃ সত্তার ব্যাপ্তি-নিশ্চয়প্রযুক্তই সেই দেবদত্তে বহিঃ সত্তার কল্পনা-রূপ অনুমিতিই জন্মে। জীবিত যে সমস্ত ব্যক্তিতে গৃহে অসত্তা নাই অর্থাৎ গৃহে সত্তা আছে, সেই সমস্ত ব্যক্তিতে গৃহে অসত্তা—নাই এইরূপে ব্যতিরেকব্যাপ্তি-নিশ্চয়, নিজদেহরূপ দৃষ্টান্তেই সম্ভব হয়। পরন্তু "অন্বয়ব্যাপ্তি"র নিশ্চয়জন্যও সেই দেবদত্তে বহিঃ সত্তার অনুমিতি হইতে পারে। কারণ, জীবিত যে সমস্ত ব্যক্তিতে গৃহে অসত্তা থাকে, সেই সমস্ত ব্যক্তিতে বহিঃ সত্তাই থাকে, যেমন বিদেশস্থ আমার এই শরীর,—এইরূপে নিজ শরীর-রূপ দৃষ্টান্তেই উক্ত রূপ 'অন্বয়ব্যাপ্তির'-নিশ্চয়ও সম্ভব হয়।

বৈশেষিক দর্শনের "উপস্কারে" (৯।২।৫) শঙ্কর মিশ্রও প্রথমে উক্ত রূপ 'অন্বয়-ব্যাপ্তি'"ই প্রদর্শন করিয়াছেন। ফলকথা, এই মতে পূর্ব্বোক্ত রূপ কোন ব্যাপ্তি-নিশ্চয় জন্য সংস্কার যাহার নাই, তাহার সেই দেবদত্তে বহিঃ সত্তার জ্ঞান জন্মে না এবং তাহার পূর্ব্বোক্তরূপ

অনুপপত্তির জ্ঞানও হইতে পারে না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত স্থলে "দেবদত্তো বহিরস্তি, জীবিত্বে সতি গৃহেঽসত্ত্বাৎ"—এইরূপে অনুমান প্রমাণ দ্বারাই সেই দেবদত্তে বহিঃসত্তা সিদ্ধ হয়।

মহর্ষি গৌতম পরে যে, **অভাব** নামক প্রমাণকেও অনুমানে অন্তর্ভূত বলিয়াছেন, উহা ষট্ প্রমাণ-বাদী কুমারিল ভট্টের সমর্থিত "অভাব" নামক ষষ্ঠ প্রমাণ নহে। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন উহার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, মেঘ হইতে জল-বর্ষণ না হইলে বুঝা যায়—সেই মেঘের সহিত বায়ুর বিলক্ষণ সংযোগ হইয়াছে। অর্থাৎ সেই জল-বর্ষণের অভাব জ্ঞায়মান হইলে সেই "অভাব"রূপ প্রমাণ দ্বারাই বায়ু ও মেঘের বিলক্ষণ সংযোগ সিদ্ধ হয়। "তাৎপর্য্যটীকা"কার বাচস্পতি মিশ্র উক্ত স্থলে সেই জল-বর্ষণের অভাবের জ্ঞানকেই "অভাব" নামক প্রমাণ বলিয়াছেন। কিন্তু উহা কোন্ সম্প্রদায়ের মত—ইহা তিনিও সেখানে বলেন নাই। যাহা হউক, উক্ত "অভাব" প্রমাণ-বাদীর অভিপ্রায় বুঝা যায় যে—অভাব পদার্থস্থ ব্যাপ্তি অনুমানের অঙ্গ হয় না। সুতরাং কোন অভাব পদার্থ অনুমানের হেতু হয় না। অতএব উক্ত স্থলে জল-বর্ষণের অভাবের দ্বারা অনুমিতি সম্ভব না হওয়ায় "অভাব" নামক অতিরিক্ত প্রমাণই স্বীকার্য্য।

কিন্তু মহর্ষি গৌতমের মতে অভাব পদার্থও অনুমানের হেতু হয়। অভাব পদার্থস্থ ব্যাপ্তি,—অনুমানের অঙ্গ নহে, এবিষয়ে কোন যুক্তি নাই। পরন্তু কোন কার্য্যের অভাবরূপ হেতুর দ্বারা তাহার কারণের অভাবের যথার্থ অনুমানই হয়। সুতরাং তুল্য যুক্তিতে মেঘ-জন্য জল-বর্ষণ-রূপ কার্য্যের অভাবরূপ হেতুর দ্বারা সেই জল-বর্ষণের প্রতিবন্ধক বায়ু-মেঘ-সংযোগও অনুমান প্রমাণসিদ্ধ হওয়ায় "অভাব" নামক পৃথক প্রমাণ স্বীকার করা অনাবশ্যক। বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি

কণাদও বিরোধ্যভূতং ভূতস্য (৩।১।১১) এই সূত্রের দ্বারা উক্তরূপ স্থলে চতুর্থ প্রকার অনুমানই বলিয়াছেন।

পরন্তু মহর্ষি কণাদ প্রথমে কোন কারণে দ্রব্যাদি ষট্ প্রকার ভাব 'পদার্থেরই 'উদ্দেশ' করিলেও পরে নবম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে ভাব পদার্থ হইতে ভিন্ন অভাব পদার্থও যে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয়—ইহা বলিয়াছেন। ন্যায়-দর্শনে পরে (২।২।৮) মহর্ষি গৌতমও অভাব পদার্থের প্রত্যক্ষ-সিদ্ধতার সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং তদ্দ্বারা অভাব পদার্থের বোধক অতিরিক্ত কোন প্রমাণ স্বীকার করা অনাবশ্যক—ইহাও সূচিত হইয়াছে।

কিন্তু কুমারিল ভট্টের যুক্তি গ্রহণ করিয়া অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক সম্প্রদায়ও অভাব পদার্থের বোধক **অনুপলব্ধি** নামে ষষ্ঠ প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন। এই মতে—যে আধারে কোন অভাব থাকে, সেই আধারের সহিত ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ জন্য সেই আধারেরই প্রত্যক্ষ হইতে পারে। কিন্তু সেই অভাবের সহিত সেই ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ না হওয়ায় তাহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। যেমন গো-শূন্য গৃহে চক্ষুঃ-সন্নিকর্ষের পরে সেই গৃহের প্রত্যক্ষ হইলেও তজ্জন্য সেই গৃহে গোর অভাবের প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু তাহাতে গোর অনুপলব্ধিজন্য গোর অভাবের পৃথক্ অনুভূতি জন্মে। উক্ত স্থলে গোর অনুপলব্ধিই সেই অভাব-বোধের করণ। সুতরাং সেই অনুপলব্ধিই তদ্বিষয়ে প্রমাণ।

কিন্তু ন্যায় বৈশেষিক সম্প্রদায়ের প্রথম কথা এই যে,—উক্তস্থলে গোর অভাববিষয়ক বোধও যে, প্রত্যক্ষাত্মক—ইহা অনুভবসিদ্ধ। কারণ, সেই বোধের পরে আমি এখানে গোর অভাব দেখিলাম—এইরূপেই সেই বোধের মানস প্রত্যক্ষ (অনু-ব্যবসায়) জন্মে। এইরূপ সুখাদির অভাবের প্রত্যক্ষও মনোগ্রাহ্য। তাই কেহ ব্যক্তি-বিশেষের আহ্বানে নিযুক্ত হইয়া স্থান-বিশেষে তাঁহাকে দেখিতে না পাইলে তিনি

সেখানে তাঁহার অভাব সমর্থন করিতে বলেন যে,—আমি চোখে দেখিয়া আসিলাম,—তিনি সেখানে নাই। সুতরাং অভাব-বিশেষের প্রত্যক্ষের জন্য সেই অভাবের সহিতও ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ-বিশেষ স্বীকার্য্য। অভাবের আধারের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলেই সেই অভাবের সহিতও সন্নিকর্ষ বলা যায়। উহার বাধক কোন যুক্তি নাই। (পূর্ব্ব ১৮২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

"বেদান্তপরিভাষা"কার ধর্ম্মরাজও পরে নিজ মতানুসারে অভাব-জ্ঞানের প্রত্যক্ষত্ব স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন,—"সত্যং, অভাব-প্রতীতেঃ প্রত্যক্ষত্বেঽপি তৎকরণস্য অনুপলব্ধে র্মানান্তরত্বাৎ।" কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমার করণ হইলেও তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ নহে, পৃথক্ প্রমাণ,—এই সিদ্ধান্ত বহুবিবাদ-গ্রস্ত। পরন্তু প্রত্যক্ষের অযোগ্য পদার্থের অনুপলব্ধি জন্য তাহার অভাবের প্রত্যক্ষ জন্মে না। সুতরাং যে পদার্থের প্রত্যক্ষাত্মক উপলব্ধি সম্ভব, সেই পদার্থের যে অনুপলব্ধি, তাহাই তাহার অভাবের প্রত্যক্ষের কারণ—ইহাই স্বীকার্য্য। অর্থাৎ যে অনুপলব্ধির প্রতিযোগী উপলব্ধির আপত্তি হয়, সেই **যোগ্যানুপলব্ধিই** অভাব-প্রত্যক্ষের বিশেষ কারণ। কিন্তু সেই অনুপলব্ধির কোন ব্যাপার না থাকায় তাহা প্রত্যক্ষ বা তজ্জন্য পৃথক্ বোধের করণ হইতে পারে না। অর্থাৎ "ব্যাপারবৎ কারণং করণং" এই মতে অনুপলব্ধির করণত্ব সম্ভব হয় না। আরও অনেক যুক্তির দ্বারা ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায় অনুপলব্ধির প্রমাণত্ব খণ্ডন করিয়াছেন। "কুসুমাঞ্জলির" তৃতীয় স্তবকের শেষে উদয়নাচার্য্যও বিশেষ বিচার দ্বারা নৈয়ায়িক-মত সমর্থন করিয়াছেন। বিশেষ জিজ্ঞাসু, তাহা পাঠ করিবেন। বাহুল্য-ভয়ে এবিষয়ে অধিক লেখা সম্ভব নহে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ন্যায়দর্শনে বেদের প্রামাণ্য-পরীক্ষা

বেদের প্রামাণ্য-পরীক্ষা করিতে মহর্ষি গৌতম প্রথমে নাস্তিক-মতানুসারে পূর্ব্বপক্ষসূত্র বলিয়াছেন—

তদপ্রামাণ্যমনৃত-ব্যাঘাত-পুনরুক্তদোষেভ্যঃ ॥ ২।১।৫৭ ॥

উক্ত সূত্রের প্রথমে "তদ্" শব্দের দ্বারা বেদই গৃহীত হইয়াছে। "তস্য বেদস্য অপ্রামাণ্যং'—"তদপ্রামাণ্যং"। অর্থাৎ বেদ-বিরোধী নাস্তিকের মত এই যে—বেদের প্রামাণ্য নাই, বেদ প্রমাণ হইতে পারে না,—যে হেতু বেদে "অনৃত" অর্থাৎ মিথ্যাত্ব, "ব্যাঘাত" ও "পুনরুক্ত" দোষ আছে। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন নাস্তিকের কথানুসারে প্রথমে অনৃত দোষের উদাহরণ বলিয়াছেন যে, বেদে আছে—"পুত্রকামঃ পুত্রেষ্ট্যা যজেত"। অর্থাৎ পুত্রার্থী পুত্রেষ্টি যাগ করিবেন। পুত্রেষ্টি যাগ করিলে পুত্র জন্মে। কিন্তু কত স্থানে কত ব্যক্তি পুত্রেষ্টি যাগ করিয়াও পুত্র লাভ করেন নাই। এইরূপ বেদে আছে—"কারীরী" যাগ করিলে বৃষ্টি হয়। কিন্তু বহু স্থানে "কারীরী" যাগ করিলেও বৃষ্টি হয় নাই। তাৎপর্য্য এই যে, বেদোক্ত "পুত্রেষ্টি" ও "কারীরী" প্রভৃতি যাগের ফল হইলে ইহকালেই তাহা প্রত্যক্ষ হইবে,—এজন্য ঐ সমস্ত বেদবাক্য 'দৃষ্টার্থ।' কিন্তু ঐ সমস্ত দৃষ্টার্থ বেদবাক্যও যখন মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, তখন তদ্দৃষ্টান্তে অন্যান্য সমস্ত বেদবাক্যও মিথ্যা—ইহা প্রতিপন্ন হয়। কারণ, যাহার বহু দৃষ্টার্থ বাক্যও মিথ্যা; তিনি যে, সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় ভ্রান্ত বা প্রতারক, সুতরাং অনাপ্ত—এবিষয়ে সংশয় নাই। অতএব ঐরূপ ব্যক্তির কোন বাক্যই প্রমাণ হইতে পারে না।

পূর্ব্বপক্ষবাদীর দ্বিতীয় হেতু—"ব্যাঘাতদোষ"। "ব্যাঘাত" বলিতে পরস্পর-বিরোধ। ভাষ্যকার ইহার উদাহরণ বলিয়াছেন যে, বেদে আছে—"উদিতে হোতব্যম্" "অনুদিতে হোতব্যং" "সময়াধ্যুষিতে হোতব্যং।" সূর্য্যোদয়ের পরবর্ত্তী কালের নাম "উদিত"কাল। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অরুণ-কিরণ ও অল্প নক্ষত্র-বিশিষ্ট কালেব নাম "অনুদিত" কাল। সূর্য্য ও নক্ষত্রশূন্য-কালের নাম "সময়াধ্যুষিত" কাল। কিন্তু বেদে উক্ত কাল-ত্রয়ে হোমের বিধান করিয়া পরেই আবার অন্য বাক্যের দ্বারা উক্ত কালত্রয়েই ঐ হোমেব নিন্দা করা হইয়াছে। সুতরাং সেই নিন্দার দ্বারা উক্ত কালত্রয়েই হোম যে, অকর্ত্তব্য—ইহাই বুঝা যায়। অতএব উক্ত স্থলে প্রথমোক্ত বিধিবাক্য এবং শেষোক্ত নিন্দার্থবাদ-বাক্য পরস্পব-বিরুদ্ধ। সুতরাং উক্তরূপ 'ব্যাঘাত' বা বিরোধ-বশতঃ পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বেদবাক্যই অপ্রমাণ এবং ঐ দৃষ্টান্তে অন্যান্য সমস্ত বেদবাক্যও অপ্রমাণ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

তৃতীয় হেতু—"পুনরুক্ত" দোষ। ভাষ্যকার ইহাব উদাহরণ প্রকাশ করিয়াছেন যে, বেদে আছে—"ত্রিঃ প্রথমা মন্বাহ ত্রিরুত্তমাং" (শতপথব্রাহ্মণ ১৷৩৷৫)। উক্ত বাক্যের দ্বারা একাদশ "সামিধেনী"র মধ্যে প্রথমা ঋক্ এবং উত্তমা ঋক্‌কে তিনবার পাঠ করিবে—ইহা কথিত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে—যে মন্ত্রের দ্বারা অগ্নি প্রজ্বালন করিতে হইবে, তাহার নাম "সামিধেনী" ঋক্। বেদে (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে ৩৷৫) একাদশটি "সামিধেনী" কথিত হইয়াছে এবং উহার পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞাও আছে। তন্মধ্যে "প্রবোবাজা" ইত্যাদি ঋক্‌টি প্রথমা এবং উহার নাম "প্রবতী" এবং সর্ব্বশেষোক্ত "আজুহোতা দুবস্যত"—ইত্যাদি ঋক্‌টির নাম "উত্তমা"। বেদের "শতপথ-ব্রাহ্মণ" প্রভৃতিতে উক্ত একাদশটি ঋকের মধ্যে প্রথমাকে তিনবার এবং শেষোক্ত "উত্তমা"কে তিনবার পাঠ করিবে—ইহা বলা হইয়াছে। কিন্তু যে অর্থ প্রকাশ

করিতে যে বাক্য বক্তব্য, তাহা একবার বলিলেই তাহার ফল-সিদ্ধি হওয়ায় পুনর্ব্বার তাহা বলিলে পুনরুক্ত দোষ হয়। অতএব পূর্ব্বোক্ত একই মন্ত্রের তিনবার পাঠ করিলে পুনরুক্ত দোষ অবশ্যই হইবে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত স্থলে উক্তরূপ পুনরুক্ত-দোষ-প্রযুক্ত বেদ অপ্রমাণ। যদিও বেদের সর্ব্বত্রই ঐরূপ পুনরুক্তদোষ নাই, কিন্তু যে অংশে ঐ দোষ আছে, তদ্দৃষ্টান্তে বেদের অন্যান্য সমস্ত অংশও অপ্রমাণ—ইহা প্রতিপন্ন হয়। কারণ, যে বক্তা ঐরূপ পুনরুক্ত দোষও বুঝেন না, তিনি অজ্ঞ বা ভ্রান্ত। সুতরাং তাঁহার কোন বাক্যই আপ্তবাক্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

মহর্ষি গৌতম পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করিতে পরে নিম্নলিখিত তিনটি সূত্র বলিয়াছেন—

ন, কর্ম্ম-কর্ত্তৃ-সাধন-বৈগুণ্যাৎ ॥ ২।১।৫৮ ॥

অভ্যুপেত্য কালভেদে দোষ-বচনাৎ ॥ ২।১।৫৯ ॥

অনুবাদোপপত্তেশ্চ ॥ ২।১।৬০

প্রথম সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, "পুত্রেষ্টি" প্রভৃতি যাগের বিধায়ক বেদবাক্যে 'অনৃত-দোষ' নাই। কারণ—কর্ম্ম, কর্ত্তা ও ঐ কর্ম্মের সাধন বা উপকরণের বৈগুণ্যবশতঃও ফলাভাব হইয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, বেদবিহিত পুত্রেষ্টিপ্রভৃতি যাগ, যথাবিধি অনুষ্ঠিত না হইলে উহা তাহার ফল-জনক অদৃষ্টবিশেষ উৎপন্ন করে না। পুত্রেষ্টি প্রভৃতি যাগে অবশ্য-কর্ত্তব্য অঙ্গযাগাদির অনুষ্ঠানের অভাব—'কর্ম্মবৈগুণ্য' এবং ঐ সমস্ত যাগকর্ত্তা, অবিদ্বান্ অথবা পাতিত্যাদি কোন দোষে ঐ কর্ম্মের অনধিকারী হইলে কর্ত্তার দোষ—'কর্ত্তৃ-বৈগুণ্য' এবং ঐ সমস্ত যাগের সাধন দ্রব্যাদি অথবা মন্ত্র ও দক্ষিণার কোন দোষ হইলে উহা "সাধন-বৈগুণ্য"। পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম-বৈগুণ্য, কর্ত্তৃ-বৈগুণ্য এবং সাধন-বৈগুণ্য অথবা উহার মধ্যে যে কোন প্রকার বৈগুণ্যবশতঃ সমস্ত যাগই নিষ্ফল হইয়া থাকে।

সুতরাং কোন স্থলে পুত্রেষ্টি যাগের ফল না হওয়ায় তদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত বেদবাক্যের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না।

পরন্তু বহুস্থানে যথাবিধি পুত্রেষ্টিযাগের অনুষ্ঠান করিয়া বহু ব্যক্তি পুত্রলাভ করিয়াছেন এবং কারীরী যাগের পরেই অনেক স্থানে বৃষ্টি হইয়াছে—ইহা মিথ্যা বলিবার কোন প্রমাণ নাই।*

বেদে পূর্ব্বোক্ত "ব্যাঘাত" দোষও নাই—ইহা বুঝাইতে গৌতম দ্বিতীয় সূত্র বলিয়াছেন,—**অভ্যুপেত্য কালভেদে দোষ-বচনাৎ।** অর্থাৎ বেদে "উদিত", "অনুদিত" ও "সময়াধ্যুষিত" নামক কালত্রয়ে হোমের বিধি বাক্যের শেষোক্ত ঐ সমস্ত নিন্দার্থবাদের তাৎপর্য্য এই যে,—যিনি উদিতকালেই হোমের সংকল্প করিয়াছেন, সেই অগ্নিহোত্রী সেই পূর্ব্বস্বীকৃত কালকে ত্যাগ করিয়া "অনুদিত" অথবা "সময়াধ্যুষিত নামক কালে হোম করিলে উহা নিন্দিত। এইরূপ "অনুদিত" অথবা "সময়াধ্যুষিত" নামক কালে হোমের সংকল্প করিয়া কালান্তরে হোম করিলে সেই হোমও নিন্দিত। অর্থাৎ অগ্নিহোত্রী প্রথমে তাঁহার

* বেদ-বিরোধী বৌদ্ধসম্প্রদায় পরে গৌতমের উক্ত উত্তরের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন যে, পুত্রেষ্টি যাগের নিষ্ফলত্ব যে, কর্ম্মাদির বৈগুণ্যপ্রযুক্তই—এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। উক্ত বেদবাক্যের মিথ্যাত্ব-প্রযুক্তও উহা নিষ্ফল হয়, ইহাও বলিতে পারি। কদাচিৎ কাহারও পুত্রেষ্টি যাগের পরে পুত্র জন্মিলেও তাহা যে, ঐ পুত্রেষ্টি যাগের ফল-[illegible] ইহা নিশ্চয় করা যায় না। এতদুত্তরে তৎকালে বৌদ্ধসম্প্রদায়ের প্রবল প্রতিব[illegible] মহানৈয়ায়িক উদ্দ্যোতকর—"ন্যায়বার্ত্তিক" গ্রন্থে বহু বিচার করিয়াছেন। তিনি শেষ কথা বলিয়াছেন যে, কর্ম্মাদির বৈগুণ্য-প্রযুক্তও যখন পুত্রেষ্টি যাগের নিষ্ফলত্ব সম্ভব হয়, তখন উহার দ্বারা উক্ত বেদবাক্যের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না—ইহাই আমাদিগের এখানে বক্তব্য। সুতরাং তোমরা পূর্ব্বে উহার মিথ্যাত্বকে সিদ্ধ বলিয়াও পরে আমার বাধ্য হইয়া যদি বল, উহা সন্দিগ্ধ, তাহা হইলে উহার দ্বারা উক্ত বেদবাক্যের অপ্রামাণ্য সিদ্ধ করিতে পার না। কারণ, যাহা সন্দিগ্ধ, তাহাও প্র[illegible] হেতুই নহে—কিন্তু হেত্বাভাস; ইহা তোমাদিগেরও স্বীকৃত।

গৃহীত কালবিশেষেই যাবজ্জীবন হোম করিবেন। কখনও কালান্তরে হোম করিলে উহা সিদ্ধ হইবে না।

বস্তুতঃ বেদে "উদিতে হোতব্যং" "অনুদিতে হোতব্যং" এবং "সময়াধ্যুষিতে হোতব্যং"—এই তিনটি বিধিবাক্যের দ্বারা কল্প-ত্রয়ে "অগ্নিহোত্র" হোমে উক্ত কাল-ত্রয়ের বিধান হইয়াছে। সমস্ত অগ্নিহোত্রীই যে, উক্ত কালত্রয়েই হোম করিবেন,—ইহা ঐ সমস্ত বিধিবাক্যের অর্থ নহে। কিন্তু উহার দ্বারা "বিকল্প"ই অভিপ্রেত। অর্থাৎ উক্ত কাল-ত্রয়ের মধ্যে আত্ম-তুষ্টি অনুসারে যাঁহার যে কালে হোম করিতে ইচ্ছা, তিনি সেই কালেই হোম করিবেন। যে স্থলে দ্বিবিধ শ্রুতি আছে, অর্থাৎ শ্রুতির দ্বারা দ্বিবিধ ধর্ম্মই বিহিত হইয়াছে, সেখানে সেই উভয়ই ধর্ম্ম, ইহা বলিয়া ভগবান্ মনুও পূর্ব্বোক্ত উদিতাদি কালত্রয়ে হোমকে ইহার উদাহরণরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। * "সংহিতা"কার মহর্ষি গোতম স্পষ্ট বলিয়াছেন—**তুল্যবল-বিরোধে বিকল্পঃ**। অর্থাৎ তুল্যবল অনেক বিধিবাক্যের বিরোধ উপস্থিত হইলে সেখানে বিকল্পই অভিপ্রেত বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে বিরোধ না থাকায় সেই সমস্ত বিধিবাক্যের অপ্রামাণ্য হইতে পারে না। যেমন বেদে বিধিবাক্য আছে—"ব্রীহিভির্বা যজেত, যবৈর্ব্বা যজেত"। অর্থাৎ ব্রীহির দ্বারা যাগ করিবে, অথবা যবের দ্বারা যাগ করিবে। ব্রীহির দ্বারা যাগ ও যবের দ্বারা যাগ উভয়ই তুল্যফল। সুতরাং আত্মতুষ্টি অনুসারে যাহার যে কল্পে ইচ্ছা, তিনি সেই কল্পই গ্রহণ করিবেন। কিন্তু সর্ব্বত্রই আত্মতুষ্টি অনুসারে ধর্ম্ম-নির্ণয় কর্ত্তব্য নহে। যে স্থলে শ্রুতি, স্মৃতি

শ্রুতিদ্বৈধন্তু যত্র স্যাৎ তত্র ধর্ম্মাবুভৌ স্মৃতৌ।
উভাবপি হি তৌ ধর্ম্মৌ সম্যগুক্তৌ মনীষিভিঃ॥
উদিতেঽনুদিতে চৈব সময়াধ্যুষিতে তথা।
সর্ব্বথা বর্ত্ততে যজ্ঞ ইতীয়ং বৈদিকী শ্রুতিঃ॥ মনুসংহিতা ২।১৪।১৫

অথবা সদাচারের দ্বারা দ্বিবিধ বা বহুবিধ ধর্ম্ম বুঝা যায়, সেইরূপ স্থলেই মনু বলিয়াছেন—"আত্মনস্তুষ্টিরেব চ"। (মনুসংহিতা ২।৬।)

বেদে পূর্ব্বোক্ত 'পুনরুক্ত' দোষও নাই—ইহা বুঝাইতে গৌতম পরে তৃতীয় সূত্র বলিয়াছেন—**অনুবাদোপপত্তেশ্চ**। অর্থাৎ বেদে "ত্রিঃ প্রথমা মন্বাহ ত্রিরুত্তমাং"—এইরূপ উক্তি থাকিলেও তাহাতে পুনরুক্ত দোষ হয় না। কারণ, উহা "অনুবাদ"। অনর্থক পুনরুক্তিই পুনরুক্ত দোষ। কিন্তু সার্থক পুনরুক্তির নাম **অনুবাদ**। ভাষ্যকার ইহা ব্যক্ত করিয়া বুঝাইয়া বেদের "ইদমহং ভ্রাতৃব্যং পঞ্চদশাবরেণ-বাগ্বজ্রেণ" ইত্যাদি মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, উক্ত মন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত একাদশ "সামিধেনী"র পঞ্চদশত্ব শ্রুত হয়। কিন্তু কিরূপে তাহা সম্ভব হইবে? তাই বেদে কথিত হইয়াছে—ত্রিঃ প্রথমা মন্বাহ ত্রিরুত্তমাং।" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত একাদশটি 'সামিধেনী'র মধ্যে 'প্রথমা'কে তিনবার এবং "উত্তমা" অর্থাৎ শেষটিকে তিনবার পাঠ করিবে। তাহা হইলে প্রথমটির দুইবার ও শেষটির দুইবার অধিক পাঠ হওয়ায় ঐ একাদশ সামিধেনীর উক্তরূপে পাঠ দ্বারা পঞ্চদশ মন্ত্র সম্ভব হয়। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত একাদশ মন্ত্রের মধ্যে প্রথমটির তিনবার ও শেষটির তিনবার পাঠ হইলেই সেই পাঠ-ভেদে মন্ত্র-ভেদবশতঃ ছয় মন্ত্র এবং মধ্যবর্ত্তী নয় মন্ত্র গ্রহণ করিয়া পঞ্চদশ মন্ত্র হইবে। * উক্তরূপে পূর্ব্বোক্ত একাদশ মন্ত্রের পঞ্চদশত্ব-সম্পাদনের জন্য বেদে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রদ্বয়ের পুনরাবৃত্তি বিহিত হইয়াছে। সুতরাং পুনরুক্ত দোষ নহে। ফলকথা, পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রদ্বয়ের ঐরূপ পুনরাবৃত্তি ব্যতীত শেষোক্ত পঞ্চদশত্ব-বোধক মন্ত্রের অর্থ-সঙ্গতি হয় না। সুতরাং

* এখানে ইহাও প্রণিধান করা আবশ্যক যে, উচ্চারণভেদে উক্ত মন্ত্রের ভেদ ব্যতীত একাদশ মন্ত্রের পঞ্চদশত্ব সম্ভব হয় না। কণাদ ও গৌতমের মতে একই শব্দের পুনরাবৃত্তি হয় না। কিন্তু তজ্জাতীয় অপর শব্দের উচ্চারণই শব্দের পুনরাবৃত্তি। সেই সমস্ত শব্দ উচ্চারণ ভেদে ভিন্ন ও অনিত্য। উক্ত সিদ্ধান্তে পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিও মূল বলিয়া গ্রহণ করা

সেই মন্ত্র পাঠ করা যায় না। কিন্তু সেই যাগ-বিশেষে উহা অবশ্য পাঠ্য, নচেৎ তাহার ফল-সিদ্ধি হয় না। অতএব সেই যাগের ফল-সিদ্ধির জন্য উক্ত মন্ত্রদ্বয়ের পুনরাবৃত্তি অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহাতে পুনরুক্ত দোষ হয় না। কারণ, উহা সপ্রয়োজন বলিয়া উহাকে বলে—**অনুবাদ**।

মহর্ষি গৌতম পরে বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে যে, (১) "বিধি", (২) "অর্থবাদ" ও (৩) "অনুবাদ" নামে ত্রিবিধ বাক্যবিভাগ আছে—ইহা বলিয়া উক্ত বিধি প্রভৃতির লক্ষণ এবং "অর্থবাদ" ও "অনুবাদে"র প্রকারভেদও বলিয়াছেন এবং পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডন করিয়া "অনুবাদ" ও "পুনরুক্তে"র যে বিশেষ আছে—ইহাও পরে সমর্থন করিয়াছেন। লৌকিক বাক্যের ন্যায় বেদেও পূর্ব্বোক্ত 'বিধিবাক্য', 'অর্থবাদবাক্য' ও 'অনুবাদবাক্য'রূপ বাক্যবিভাগ থাকায় লৌকিক বাক্যের ন্যায় বেদের প্রামাণ্য যে সম্ভাবিত এবং উহার বাধক কিছুই নাই—ইহা প্রতিপন্ন করিয়া গৌতম পরে উহার সাধক প্রমাণ প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন—

মন্ত্রায়ুর্ব্বেদ-প্রামাণ্যবচ্চ তৎপ্রামাণ্যমাপ্ত-প্রামাণ্যাৎ ॥২।১।৬৮

তাৎপর্য্য এই যে—শাস্ত্রে বিষ, ভূত ও বজ্রের নিবর্ত্তক অনেক মন্ত্র উক্ত হইয়াছে। উহার যথাবিধি প্রয়োগ করিলে তদ্দ্বারা বিষাদির নিবৃত্তি হইয়া থাকে—ইহা পরীক্ষিত সত্য। এইরূপ সুপ্রাচীনকাল হইতেই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের সত্যার্থতা পরীক্ষিত। মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদের যথোক্ত সত্যার্থতাই তাহার প্রামাণ্য। কিন্তু ঐ প্রামাণ্যের হেতু কি? ইহা বিচার করিতে গেলে ইহাই স্বীকার করিতে হইবে যে—ঐ সমস্ত মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের বক্তা সেই সমস্তত্ত্ব-দর্শী আপ্ত পুরুষ। অর্থাৎ সেই আপ্ত পুরুষের প্রামাণ্যই মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের প্রামাণ্যের হেতু। এইরূপ ঋগ্বেদ প্রভৃতি চতুর্ব্বেদেও যে সমস্ত অলৌকিক তত্ত্বের বর্ণন হইয়াছে, তাহাও সেই সমস্ততত্ত্ব-দর্শী ব্যতীত আর কাহারও জ্ঞানের গোচরই হইতে পারে না। সুতরাং ঐ সমস্ত অলৌকিকতত্ত্ব-দর্শী পুরুষ যে সর্ব্বজ্ঞ, ইহা

স্বীকার্য্য এবং তিনি যে জীবের মঙ্গলবিধান ও দুঃখ-বিমোচনে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহার যথাদৃষ্ট তত্ত্বের উপদেশ করিয়াছেন—ইহাও স্বীকার্য্য। পূর্ব্বোক্ত তত্ত্ব-দর্শিতা এবং জীবে দয়া প্রভৃতিই তাঁহার আপ্তত্ব, তাই তিনি প্রমাণ পুরুষ। সুতরাং তাঁহার প্রামাণ্য-প্রযুক্ত বেদ প্রমাণ। যেমন মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ প্রমাণ।

অবশ্য বেদেও বহুরোগ-নিবারক অনেক অব্যর্থ মন্ত্র এবং ঔষধের উল্লেখ আছে। কিন্তু উক্ত সূত্রে গৌতম যে, মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদের প্রামাণ্যকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা মূল বেদ হইতে ভিন্ন। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের ব্যাখ্যার দ্বারাও তাহাই বুঝা যায়। "ন্যায়মঞ্জরী"-কার জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতিও বিচার পূর্ব্বক সমর্থন করিয়াছেন যে, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র মূল বেদ নহে। বস্তুতঃ বিষ্ণু পুরাণেও অষ্টাদশবিদ্যার উল্লেখ করিতে পরে আয়ুর্ব্বেদের পৃথক্ উল্লেখই হইয়াছে। *

সুশ্রুতও আয়ুর্ব্বেদকে অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গ বলিয়াছেন † এবং পরে "আয়ুর্ব্বেদ" শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়া তদ্দ্বারা উহার অন্তর্গত "বেদ" শব্দের অর্থ যে শ্রুতি নহে—ইহাও ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু স্বয়ম্ভুই যে প্রথমে অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র প্রণয়ন করেন, ইহাও তিনি প্রথমেই বলিয়াছেন। গরুড় পুরাণেও (পূর্ব্বখণ্ড ১৪৯ অঃ) কথিত হইয়াছে যে, স্বয়ং পরমেশ্বরই ধন্বন্তরিরূপে অবতীর্ণ হই-

---

* "অঙ্গানি চতুরো বেদা মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
পুরাণং ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ ॥
আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চেতি তে ত্রয়ঃ।
অর্থশাস্ত্রং চতুর্থন্তু বিদ্যা হ্যষ্টাদশৈব তু ॥"—তৃতীয় অংশ ৬

† "ইহ খল্বায়ুর্ব্বেদো নাম যদুপাঙ্গমথর্ব্ববেদস্যাহনুৎপাদ্যৈব প্রজাঃ শ্লোকশতসহস্রমধ্যায়-সহস্রঞ্চ কৃতবান্ স্বয়ম্ভুঃ। ততোহল্পায়ুষ্ট্বমল্পমেধস্ত্বঞ্চাবলোক্য নরাণাং ভূয়োহষ্টধা প্রণীতবান্।" সুশ্রুত সংহিতা—১ম অঃ

সুশ্রুতকে আয়ুর্ব্বেদ বলিয়াছিলেন। গৌতমের উক্ত সূত্রের দ্বারাও বুঝা যায় যে, আয়ুর্ব্বেদ সর্ব্বজ্ঞ আপ্ত পুরুষের বাক্য।

কিন্তু বাৎস্যায়ন পরে মূল বেদের অন্তর্গত "গ্রামকামো যজেত"—ইত্যাদি দৃষ্টার্থক বিধিবাক্যকেও দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ গ্রামার্থী অধিকারীর পক্ষে বেদে "সাংগ্রহণী" নামক যাগ বিহিত হইয়াছে এবং উহার ইতিকর্ত্তব্যতাও কথিত হইয়াছে। যথাবিধি ঐ যাগের অনুষ্ঠান করিলে ইহ লোকেই গ্রাম-লাভ হয় অর্থাৎ কোন গ্রামের অধিপতি হওয়া যায়। অনেক ব্যক্তিই ঐ যাগ করিয়া গ্রাম লাভ করায় উক্ত দৃষ্টার্থ বেদবাক্যের প্রামাণ্য পরীক্ষিত। "ন্যায়মঞ্জরী"-কার জয়ন্তভট্ট ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, 'আমার পিতামহই (কল্যাণ স্বামী) "সাংগ্রহণী" যাগ করিয়া—"গৌরমূলক" গ্রামলাভ করিয়াছিলেন।' ফলকথা, বাৎস্যায়ন পরে মূলবেদের অন্তর্গত ঐ সমস্ত দৃষ্টার্থ বেদবাক্যকেও দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া সমস্ত বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার মতে গৌতমও পূর্ব্বোক্ত সূত্রে "চ" শব্দের দ্বারা সেই সমস্ত দৃষ্টার্থ বেদবাক্য এবং অন্যান্য লৌকিক সত্যার্থ বাক্যকেও দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন,—ইহা বুঝা যায়। কারণ, গৌতমের মতে আপ্ত পুরুষের প্রামাণ্য-প্রযুক্তই তাঁহার বাক্যের প্রামাণ্য। তাই তিনি বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ করিতেও সামান্যতঃ হেতু বলিয়াছেন—**আপ্ত-প্রামাণ্যাৎ**।

কিন্তু গৌতমের মতে বেদ-কর্ত্তা সেই আপ্ত পুরুষ কে, তাহা তিনি বলেন নাই। কিন্তু সেই নিত্য সর্ব্বজ্ঞ পরম পুরুষই যে, বেদের আদি বক্তা বা কর্ত্তা—ইহা শাস্ত্র-সিদ্ধ ও যুক্তি-সিদ্ধ বলিয়া গৌতমেরও উক্তরূপ মত অবশ্যই বুঝা যায়। শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্রও "তাৎপর্য্যটীকা"য় গৌতমের তাৎপর্য্য সুব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে—জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বর নিত্য সর্ব্বজ্ঞ ও পরম কারুণিক। সুতরাং তিনি সৃষ্টির পরে মানবগণের

হিতার্থ নানা উপদেশ অবশ্যই করিয়াছেন। তাঁহার সেই সমস্ত উপদেশ বা বাক্যই বেদ। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের ব্যবস্থাপক সেই বেদই সকল শাস্ত্রের আদি ও মূল এবং উহাই ঋষি মহর্ষি মহাজনদিগের পরিগৃহীত। এইরূপ বিষাদি-নাশক অন্যান্য অনেক মন্ত্র এবং আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রও সেই নিত্য-সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর কর্ত্তৃক উপদিষ্ট এবং তাহার প্রামাণ্য ইহলোকেই পরীক্ষিত। সুতরাং ঐ মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের ন্যায় বেদও নিত্যসর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর কর্ত্তৃক উক্ত বলিয়া উহার প্রামাণ্য স্বীকার্য্য। পরন্তু আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও বেদোক্ত "শান্তিক" ও "পৌষ্টিক" কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং রাসায়নাদি ক্রিয়ারম্ভে বেদবিহিত চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তের কর্ত্তব্যতা স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং যাহার প্রামাণ্য পরীক্ষিত ও সর্ব্বসম্মত, সেই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হওয়ায় তদ্দ্বারাও উহার প্রামাণ্য ও মহাজন-পরিগ্রহ নিশ্চয় করা যায়।

বাচস্পতি মিশ্র যোগদর্শন-ভাষ্যের টীকাতেও (১।২৪) গৌতমের উক্ত সূত্র উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে—মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ নিত্যসর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর-প্রণীত। তিনি ভিন্ন আর কেহই প্রথমে ঐ সমস্ত অব্যর্থফল মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র বলিতে পারেন না। এইরূপ আর কেহই প্রথমে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের উপদেশক অসংখ্য অলৌকিক অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের প্রতিপাদক বেদবাক্যসমূহ বলিতে পারেন না। তাঁহার নিত্য সর্ব্বজ্ঞতাই শাস্ত্রের মূল। সুতরাং তাঁহার নিত্যসর্ব্বজ্ঞতারূপ প্রামাণ্য-বশতঃ যেমন মন্ত্র এবং আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র প্রমাণ, তদ্রূপ বেদও প্রমাণ—ইহা স্বীকার্য্য। * বাচস্পতি মিশ্রের পরে উদয়নাচার্য্য, জয়ন্ত ভট্ট এবং গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রভৃতি মহানৈয়ায়িকগণও বিশেষ বিচার করিয়া উক্ত সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

* পরমেশ্বর কোন প্রমাজ্ঞানের করণরূপ প্রমাণ না হওয়ায় গৌতম প্রথমোক্ত প্রমাণ পদার্থের মধ্যে পঞ্চম প্রমাণরূপে তাঁহার উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু প্রমাতা অর্থে পরমেশ্বরও প্রমাণ বলিয়া কথিত হইয়াছেন। তাঁহার সহস্র নামের মধ্যেও উক্ত অর্থে—

বৈশেষিকদর্শনে মহর্ষি কণাদও বলিয়াছেন—**তদ্বচনাদাম্নায়-প্রামাণ্যং** (১।১।৩)। "কিরণাবলী" টীকায় উদয়নাচার্য্য কণাদের উক্ত সূত্রে "তদ্" শব্দের দ্বারা পরমেশ্বরকেই গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"তদ্বচনাৎ তেনেশ্বরেণ প্রণয়নাৎ"।* কিন্তু ঐ "তদ্" শব্দের দ্বারা অব্যবহিতপূর্ব্ব-সূত্রোক্ত ধর্ম্মকে গ্রহণ করিয়া "তদ্বচনাৎ," ধর্ম্মবচনাৎ ধর্ম্মপ্রতিপাদকত্বাৎ—এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেও কণাদের মতেও বেদ যে, সেই নিত্যসর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর-প্রণীত—ইহা বুঝা যায়। কারণ, কণাদ পরে বলিয়াছেন—**বুদ্ধিপূর্ব্বা বাক্য-কৃতির্ব্বেদে** (৬।১।১)। অর্থাৎ লৌকিক বাক্য-রচনার ন্যায় বেদবাক্যের রচনা, বুদ্ধি পূর্ব্বক অর্থাৎ বেদার্থবিষয়ক জ্ঞানজন্য। উক্ত সূত্রের দ্বারা কণাদের সিদ্ধান্ত

"প্রমাণ"ও তাঁহার একটি নাম বলা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত সূত্রে গোতম যে, "আপ্ত-প্রামাণ্য" বলিয়াছেন, তাহার অর্থ আপ্তপুরুষের প্রমাতৃত্ব। পরমেশ্বরে সর্ব্বদাই সর্ব্ববিষয়ক প্রমা আছে, কোন কালেই তাহার অভাব নাই। গৌতমের মতে উক্তরূপ প্রমাতৃত্ব অর্থাৎ সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ক প্রমাবত্তাই পরমেশ্বরের প্রামাণ্য। মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যও বিচারপূর্ব্বক ইহাই বলিয়াছেন—"মিতিঃ সম্যক্ পরিচ্ছিত্তি স্তদ্বত্তা চ প্রমাতৃতা। তদযোগব্যবচ্ছেদঃ প্রামাণ্যং গৌতমে মতে"।।—কুসুমাঞ্জলি ৪।৫

* উদয়নাচার্য্য পরে নিরাকার পরমেশ্বর কিরূপে বেদের উচ্চারণ করিবেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন যে, তিনি দেহ ধারণ করিয়াই প্রথমে বেদের উচ্চারণ করেন। তাঁহার সেই প্রথম বেদোচ্চারণই বেদের রচনা। কিন্তু "কুসুমাঞ্জলি"র পঞ্চম স্তবকে উদয়নাচার্য্য ইহাও বলিয়াছেন যে, বেদের "কাঠক" ও "কালাপক" প্রভৃতি শাখা বিশেষের নামের দ্বারাও প্রতিপন্ন হয় যে, "কঠ" ও "কলাপ" প্রভৃতি নামক ঋষি সেই সমস্ত শাখাবিশেষের আদি বক্তা। নচেৎ ঐ সমস্ত শাখার ঐ সমস্ত নাম হইতে পারে না। এখানে উদয়নাচার্য্যের মত ইহাই বুঝা যায় যে, পরমেশ্বরই "কঠ" প্রভৃতি নামক শরীর ধারণ করিয়া অথবা সেই সমস্ত ঋষি শরীরে আবিষ্ট হইয়া বেদের ঐ সমস্ত শাখা বলিয়াছেন। "তত্ত্বচিন্তামণি"কার গঙ্গেশ উপাধ্যায় "ঈশ্বরানুমানচিন্তামণি" গ্রন্থে পরমেশ্বরের স্বীয়দেহে বেদোচ্চার প্রভৃতি বলিলেও তাঁহার অনেক শরীরবিশেষে আবেশের কথাও বলিয়াছেন এবং উহার দৃষ্টান্ত-প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন,—"ভূতাবেশবৎ।"

স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বেদও পুরুষ-কৃত, সুতরাং পৌরুষেয়। বেদ-কর্ত্তা পুরুষ সেই সমস্ত অলৌকিক বেদার্থ বিষয়ে নিত্য জ্ঞান-সম্পন্ন। সুতরাং "শাশ্বত-ধর্ম্মগোপ্তা" সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরই ধর্ম্মপ্রতিপাদক বেদের আদি বক্তা এবং তাঁহার প্রামাণ্য-প্রযুক্তই বেদ প্রমাণ। * সর্ব্বপ্রথমে আর কেহ বেদ-বক্তা হইতে পারেন না।

অবশ্য বেদের কেহ কর্ত্তা নাই, বেদ নিত্য—ইহাও শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। কিন্তু সেই সমস্ত শাস্ত্র-বাক্যকে বেদের স্তুতিরূপ অর্থবাদও বলা যায়। বেদের নিত্যত্ব-বাদী কর্ম্মমীমাংসক সম্প্রদায়ও বহু বেদ বাক্যকে অর্থবাদ বলিয়াই অন্যরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বস্তুতঃ বেদ, সেই পরমেশ্বরের পরম বিভূতি-বিশেষ। তাই শাস্ত্রে তিনি "বেদমূর্ত্তি" বলিয়াও বর্ণিত হইয়াছেন। মহিষাসুর-বধের পরে শক্রাদি সুরগণও সেই বেদমাতা বেদাধিষ্ঠাত্রী মহামায়ার স্তুতি করিতে বলিয়াছেন—"শব্দাত্মিকা সুবিমলর্গ্‌যজুষাং নিধানমুদ্‌গীতরম্যপদপাঠবতাঞ্চ সাম্নাং।" (চণ্ডী)। কিন্তু মহর্ষি জৈমিনি পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে প্রথমে বর্ণাত্মক শব্দের নিত্যত্ব স্থাপন করিতে চরম সূত্র বলিয়াছেন—"লিঙ্গ-দর্শনাচ্চ" (১।১।২৩)। ভাষ্যকার শবরস্বামী সেখানে **বাচা বিরূপনিত্যয়া**—এই শ্রুতিবাক্যকে জৈমিনির উক্ত মতের সাধক চরম লিঙ্গ বা হেতু বলিয়াছেন। কারণ, উক্ত শ্রুতিবাক্যে "নিত্য" শব্দের দ্বারা বর্ণাত্মক শব্দের নিত্যত্ব বুঝা যায়।

* স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, কণাদের মতে অনুমানরূপেই শব্দের প্রামাণ্য—এই প্রসিদ্ধ মতেও বেদের প্রামাণ্য আছে। কণাদও প্রথমে তৃতীয় সূত্রের দ্বারাই তাহা বলিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গে হইতে প্রকাশিত কোন বেদান্তদর্শন পুস্তকের ভূমিকায় দাক্ষিণাত্য কোন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতও অসঙ্কোচে লিখিয়াছেন যে, 'বৈশেষিক সম্প্রদায় বেদের প্রামাণ্য অস্বীকার করায় তাঁহারা নাস্তিকই।' এ বিষয়ে আর কি বলিব। তবে ঐরূপ অপসিদ্ধান্তের প্রচার বড় দুঃখের কারণ, ইহা অবশ্য বক্তব্য।

কিন্তু কণাদ ও গৌতম উভয়েই বিচার পূর্ব্বক শব্দের নিত্যত্ব-বাদের খণ্ডন করিয়া অনিত্যত্ব পক্ষেরই সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে কোন শব্দই উৎপত্তি-বিনাশ-শূন্য নিত্য হইতে পারে না। পরন্তু বর্ণাত্মক শব্দের নিত্যত্বমতেও, পদ ও বাক্যের নিত্যত্ব সম্ভব হইতে পারে না। কারণ, অনেক বর্ণের যোজনার দ্বারাই একটি পদের নিষ্পত্তি হয় এবং অনেক পদের যোজনার দ্বারাই বাক্যের নিষ্পত্তি হয়। ভামতী টীকায় (১।১।৩) শ্রীমদ্ বাচস্পতি মিশ্রও ইহা বিশদরূপে সমর্থন করিয়াছেন। পরন্তু বর্ণের নিত্যত্বপ্রযুক্ত বর্ণময় বেদবাক্য নিত্য হইলে সমস্ত লৌকিক বাক্যও নিত্য কেন হইবে না? তাহা হইলে কোন বাক্যই ত অপ্রমাণ হইতে পারে না। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন উক্ত বিষয়ে মীমাংসকের যুক্তি খণ্ডন করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, অতীত ও ভবিষ্যৎ যুগান্তর ও মন্বন্তরে সম্প্রদায়ের অবিচ্ছেদই বেদের নিত্যত্ব। অর্থাৎ এক দিব্য যুগের পরে অপর দিব্য যুগের প্রারম্ভে এবং এক মন্বন্তরের পরে অপর মন্বন্তরের প্রারম্ভেও বেদের অধ্যাপক, অধ্যেতা ও বেদাধ্যয়নাদি অব্যাহত থাকে এবং চিরদিনই ঐরূপ সময়েও উহা অব্যাহত থাকিবে—এই তাৎপর্য্যেই শাস্ত্রে বেদ নিত্য—ইহা বলা হইয়াছে। *

---

* এখানে বলা আবশ্যক যে, নিত্যসর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের সকল বেদার্থ-বিষয়ে যে প্রজ্ঞা [illegible]ত্য জ্ঞান, তাহা "বেদ" শব্দের বাচ্য নহে। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ নামে বর্ণাত্মক শব্দরাশিই [illegible] বাচ্য। মহর্ষি আপস্তম্বও স্পষ্ট বলিয়াছেন—"মন্ত্র ব্রাহ্মণয়োর্ব্বেদনামধেয়ম্"। মুণ্ডক উপনিষদের প্রথমে যে ঋগ্‌বেদ প্রভৃতিকে অপরা বিদ্যা বলা হইয়াছে, [illegible] সেই সমস্ত শব্দরাশি।" ভাষ্যকার শঙ্করও সেখানে উহা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন—"বেদশব্দেন তু সর্ব্বত্র শব্দরাশির্বিবক্ষিতঃ।" সুতরাং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে "যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ" (৬।১৮) এই শ্রুতিবাক্যেও বহুবচনান্ত "বেদ" শব্দ দ্বারা সেই সমস্ত শব্দরাশিই বুঝিতে হইবে। সুতরাং উহা নিত্য কি অনিত্য—ইহাই বিচার্য্য এবং তদ্বিষয়েই মতভেদ।

কিন্তু মহাপ্রলয়ে অর্থাৎ যে সময়ে সত্যলোকেরও বিনাশ হওয়ায় সত্যলোকস্থ ব্রহ্মারও দেহ-নাশ হয়, তখন বৈদিক সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং মহাপ্রলয়ের পরে সৃষ্টির প্রারম্ভে আবার কিরূপে বৈদিক সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন হয়—ইহা অবশ্য বক্তব্য। "তাৎপর্য্যটীকা"-কার বাচস্পতি মিশ্র উক্তস্থলে শেষে ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের বক্তব্য ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন—"মহাপ্রলয়ে তু ঈশ্বরেণ বেদান্ প্রণীয় সৃষ্ট্যাদৌ স্বয়মেব সম্প্রদায়ঃ প্রবর্ত্ত্যত এবেতি ভাবঃ"। অর্থাৎ মহাপ্রলয়ে নিত্য সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর সমস্ত বেদ প্রণয়ন করিয়া সৃষ্টির প্রথমে স্বয়ংই সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করেন। তিনি বদ্ধ জীবের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাহাদের উদ্ধারের উদ্দেশ্যেই আবার জ্ঞান ও ধর্ম্মের উপদেশ করেন। যোগদর্শন-ভাষ্যে (১।২৫) ব্যাসদেবও বলিয়াছেন—"তস্য আত্মানুগ্রহাভাবেঽপি ভূতানুগ্রহঃ প্রয়োজনং, জ্ঞানধর্ম্মোপদেশেন কল্প-প্রলয়-মহাপ্রলয়েষু সংসারিণঃ পুরুষানুদ্ধরিষ্যামীতি"। কর্ম্মমীমাংসক সম্প্রদায় উক্তরূপ প্রলয় অস্বীকার করিয়াই বেদের সম্প্রদায়ের অনুচ্ছেদ ও নিত্যত্ব সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু প্রলয় এবং পরে পুনঃ সৃষ্টি—শাস্ত্র-সিদ্ধ ও যুক্তি-সিদ্ধ।

বস্তুতঃ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে পুরুষ-সূক্ত মন্ত্রের মধ্যে "তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে। ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়ত" (৯০ সূ—৯) এই মন্ত্রে বেদের উৎপত্তি স্পষ্ট কথিত হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও কথিত হইয়াছে—"অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিত মেতদ্ যদৃগ্বেদঃ" ইত্যাদি (২।৪।১০)। ঋগ্বেদ প্রভৃতি সেই পরমেশ্বরের নিঃশ্বসিত অর্থাৎ তাঁহা হইতে অপ্রযত্নে লীলাবৎ পুরুষ নিঃশ্বাসের ন্যায় উদ্ভূত। বেদান্তদর্শনের তৃতীয়সূত্র-ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্করও ঐরূপ কথাই বলিয়া পরে প্রমাণ-প্রদর্শনের জন্য বলিয়াছেন—"অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিত মেতদ্ যদৃগ্বেদ ইত্যাদি শ্রুতেঃ।" "ভামতী" টীকায় বাচস্পতি মিশ্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"অপ্রযত্নেনাস্য বেদ-কর্তৃত্বে শ্রুতিরুক্তা অস্য মহতো ভূতস্য ইতি।"
সুতরাং আচার্য্য শঙ্করের মতেও নিত্য সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরই বেদ-কর্ত্তা। কিন্তু তথাপি বেদ পৌরুষেয় নহে। কারণ, যাহা স্বতন্ত্র পুরুষ-কৃত, তাহাই পৌরুষেয়। কিন্তু পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ হইলেও তিনি বেদ-রচনায় কখনও স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করেন না।

তাৎপর্য্য এই যে, পরমেশ্বর প্রত্যেক সৃষ্টির প্রারম্ভে পূর্ব্বকল্পে উক্ত সেই সমস্ত স্বরবর্ণ-বিশিষ্ট তজ্জাতীয় বেদবাক্য-সমূহই বলেন। কখনও কোন অংশে তাহার পরিবর্ত্তন করেন না। তাই চিরকালই বেদ-বিহিত স্বর্গ-জনক যাগাদিকর্ম্মজন্য স্বর্গই হইতেছে ও হইবে এবং চিরকালই বেদ-নিষিদ্ধ ব্রহ্মহত্যাদি কর্ম্মজন্য নরকই হইতেছে ও হইবে। কখনই ইহার বৈপরীত্য হয় নাই ও হইবে না। "ভামতী" টীকায় শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র ইহা বিশদভাবে ব্যক্ত করিয়া বেদের অপৌরুষেয়ত্ব বুঝাইয়াছেন।

কিন্তু ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায় "পৌরুষেয়" শব্দের উক্তরূপ বিশেষ অর্থ গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে যাহা কোন পুরুষ-কৃত, তাহাই পৌরুষেয়। যাহা হউক, মূলকথা, পূর্ব্বোক্ত অর্থে বেদ অপৌরুষেয় হইলেও পরমেশ্বরই যে বেদের আদিকর্ত্তা—ইহা পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি ও যুক্তির দ্বারা অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক সম্প্রদায়ও সমর্থন করিয়াছেন। আর অদ্বৈতমতে যখন পরব্রহ্ম ভিন্ন সমস্তই অনিত্য, তখন বেদান্তদর্শনে "... অত এব চ নিত্যত্বং" (১।৩।২৯) এই সূত্রের দ্বারা বাদরায়ণও বেদকে উৎপত্তি-বিনাশশূন্য নিত্য বলেন নাই, ইহা অদ্বৈতবাদি-সম্প্রদায়েরও স্বীকার্য্য।

"বেদান্ত-পরিভাষা" গ্রন্থে অদ্বৈতবাদী ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্রও কর্ম্মমীমাংসক সম্প্রদায়ের মতে বেদকে নিত্য বলিয়া পরেই বলিয়াছেন—"অস্মাকন্তু মতে বেদো ন নিত্য উৎপত্তিমত্ত্বাৎ। উৎপত্তিমত্ত্বঞ্চ "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিত মেতদ্ যদৃগ্‌বেদো যজুর্ব্বেদঃ

কিন্তু কিরূপে পরমেশ্বর হইতে প্রথমে বেদের উৎপত্তি হয়, ইহাও বিচার্য্য। এবিষয়ে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে কথিত হইয়াছে—'যো বৈ ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ" (৬।১৮)। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, সেই মহেশ্বর প্রথমে কোন ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে সমস্ত বেদের উপদেশ করেন। মুণ্ডক উপনিষদের প্রারম্ভেও প্রথমে ব্রহ্মা হইতেই ব্রহ্ম-বিদ্যার প্রবর্ত্তক সম্প্রদায়ের ক্রম বর্ণিত হইয়াছে। আর চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা তাঁহার মানস পুত্রগণকে চতুর্ম্মুখে সমস্ত বেদের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা তাঁহাদিগের পুত্রগণকে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন এবং সেই সমস্ত ব্রহ্মর্ষি, পরমেশ্বর-প্রেরিত হইয়া পূর্ব্বে একবার বেদের বিভাগও করিয়াছিলেন এবং পরে ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য ভগবান্ নারায়ণ কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন-রূপে অবতীর্ণ হইয়া সমস্ত বেদকে চতুর্ভাগে বিভক্ত করিয়া তাঁহার পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও সুমন্তু, এই চারি শিষ্যকে যথাক্রমে ঋগ্‌বেদ-সংহিতা প্রভৃতি চারি সংহিতা দান করেন এবং সেই শিষ্য-চতুষ্টয় অন্যান্য শিষ্যগণকে ঐ সমস্ত সংহিতার অধ্যাপনা করেন, এইরূপে তাঁহাদিগের শিষ্য-প্রশিষ্যাদিপরম্পরা বেদের প্রচার ও সম্প্রদায়-রক্ষা করিয়াছেন—

সামবেদোঽথর্ব্ববেদ ইত্যাদিশ্রুতেঃ"। পরে তিনি বেদবাক্যের ত্রিক্ষণাবস্থায়িত্বরূপ অনিত্যত্বের প্রতিবাদ করিয়া বেদের অপৌরুষেয়ত্ব সমর্থন করিতে বলিয়াছেন—"সর্গাদ্য-কালে পরমেশ্বরঃ পূর্ব্বসর্গসিদ্ধবেদানুপূর্ব্বীসমানানুপূর্ব্বীকং বেদং বিরচিতবান্, ন তু তদ্-জাতীয়মিতি, ন তস্য সজাতীয়োচ্চারণানপেক্ষোচ্চারণবিষয়ত্বং পৌরুষেয়ত্বং"। সুতরাং অদ্বৈত মতেও পরমেশ্বর যে সৃষ্টির প্রথমে পূর্ব্ব সৃষ্টির ন্যায় সজাতীয় সেই সমস্ত বেদবাক্যের উচ্চারণ করেন, সেই উচ্চারণই তাঁহার বেদ-রচনা—ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। "ভামতী" টীকায় (১।১।৩) বাচস্পতি মিশ্রও বেদের অপৌরুষেয়ত্ব বুঝাইতে লিখিয়াছেন—"সর্ব্বজ্ঞোঽপি সর্ব্বশক্তিরপি পূর্ব্বসর্গানুসারেণ বেদান্ বিরচয়ন্ ন স্বতন্ত্রঃ" ইত্যাদি। সুতরাং বেদান্ত-মতে বেদ যে সর্ব্বজ্ঞ-রচিত নহে—ইহা আমরা লিখিতে পারি না।

ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাশস্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। বিষ্ণু-পুরাণেও ঐ সমস্ত বার্ত্তার বিশদ বর্ণন আছে।

বেদান্ত দর্শনে বাদরায়ণ বলিয়াছেন—"যাবদধিকারমবস্থিতিরাধি-কারিকাণাং" (৩।৩।৩২)। ভাষ্যকার আচার্য্য শঙ্কর সেখানে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বকল্প-সিদ্ধ মহর্ষিগণের মধ্যে যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান-লাভ করিয়াও প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগ সমাপ্ত না হওয়ায় বিদেহকৈবল্য লাভ করেন নাই, তাঁহারা পরকল্পে সৃষ্টির প্রারম্ভে পরমেশ্বর কর্ত্তৃক বেদপ্রবর্ত্তনাদি সেই অধিকারে নিযুক্ত হইয়া সেই অধিকার পর্য্যন্ত অবস্থিত থাকেন। তাই তাঁহারা **অধিকারিক** পুরুষ বলিয়া কথিত হইয়াছেন। শঙ্করের মতে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসও সেই 'অধিকারিক' পুরুষ। পূর্ব্বকল্প-সিদ্ধ অপান্তরতমা নামে বেদাচার্য্য পুরাণ ঋষিই কলি ও দ্বাপরের সন্ধিতে মহাবিষ্ণুর আদেশে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হইয়াছিলেন। শঙ্কর সেখানে ইহার কোন প্রমাণ বলেন নাই। কিন্তু কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যে, নারায়ণের অবতার-বিশেষ—ইহাও পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। আর পবমেশ্বরই যে, বেদব্যাসাদি-রূপে বেদান্তার্থ-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক—ইহা ভগবদ্গীতার টীকায় অদ্বৈতবাদী মধুসূদন সরস্বতীও বলিয়াছেন।

পরন্তু স্বয়ং পরমেশ্বরই যে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব, এই ত্রিমূর্ত্তি হন, ইহাও শাস্ত্র-সিদ্ধ ও প্রসিদ্ধ আছে। সেই ব্রহ্মার স্তব-রচনায় 'কুমারসম্ভবে'র দ্বিতীয় সর্গে কালিদাসও বলিয়াছেন—"নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যং প্রাক্‌সৃষ্টেঃ কেবলাত্মনে"। "লঘুভাগবতামৃত" গ্রন্থে শ্রীরূপ গোস্বামী পদ্ম-পুরাণের বচন * উদ্ধৃত করিয়া সমাধান করিয়াছেন যে, কোন মহাকল্পে উপাসনা-সিদ্ধ জীবন্মুক্ত পুরুষও ব্রহ্মার পদ লাভ-করেন এবং কোন মহাকল্পে স্বয়ং মহাবিষ্ণুই ব্রহ্মা হন। শ্রীরূপ গোস্বামী ইহাও বলিয়াছেন যে,

---

তথাচ—"ভবেৎ ক্বচিন্ মহাকল্পে ব্রহ্মা জীবোঽপ্যুপাসনৈঃ।
ক্বচিদত্র মহাবিষ্ণু ব্রহ্মত্বং প্রতিপদ্যতে॥"

"হিরণ্যগর্ভ" ও "বৈরাজ" নামে ব্রহ্মা দ্বিবিধ। তন্মধ্যে, হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকের স্থিতিপর্য্যন্ত সেখানে থাকিয়াই ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন। "বৈরাজ" ব্রহ্মাই প্রায়শঃ পরমেশ্বরের আদেশে প্রজা-সৃষ্টি ও বেদ-প্রচার করেন। কিন্তু শারীরক-ভাষ্যে (১।৩।৩০) আচার্য্য শঙ্কর, সৃষ্ট্যাদি-কার্য্যে পরমেশ্বরের অনুগ্রহে পূর্ব্বকল্প-সিদ্ধ হিরণ্যগর্ভাদি ঈশ্বরগণের পূর্ব্বকল্পীয় ব্যবহার-স্মরণ হয়—ইহা সমর্থন করিয়াছেন। পরে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার সৃষ্ট্যাদি-কর্তৃত্ব বিষয়ে অন্য প্রমাণও আছে।

সে যাহা হউক, এখন প্রকৃত বিষয়ে বক্তব্য এই যে, পরমেশ্বর প্রথমে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার দেহাদি সৃষ্টি করিয়া তাঁহার দ্বারা অন্যান্য অনেক সৃষ্টি ও বেদ-প্রবর্ত্তনাদি করাইবার জন্য তাঁহাকে প্রথমে সংকল্প-মাত্রে সমস্ত বেদের উপদেশ করিলেও তিনি নিজে যে ত্রিমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার দেহ-সৃষ্টি করেন, সেই দেহে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি নিজেই প্রথমে ক্রমশঃ চতুর্ম্মুখে তাঁহার পূর্ব্বকল্পে উচ্চারিত সেই সমস্ত বেদবাক্যের সজাতীয় বেদবাক্য-সমূহের উচ্চারণ করেন—ইহা বলিলেও তাঁহার পক্ষে উহা অসম্ভব বলা হয় না।

ফলকথা, যে ভাবেই হউক, পরমেশ্বরই যে, সমস্ত বেদের আদি বক্তা বা কর্ত্তা—ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা হইতে মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষি পর্য্যন্ত তপোবলে পরমেশ্বরের অনুগ্রহে বেদ-লাভ করিয়াছেন এবং সময়ে তাহা স্মরণ করিয়া যথাযথ উচ্চারণ করিয়াছেন। তাই বাৎস্যায়ন প্রভৃতি কোন কোন পূর্ব্বাচার্য্য ঐ তাৎপর্য্যে বেদকে ঋষি-বাক্য বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারাও ঋষিগণকেই বেদের আদিকর্ত্তা বলেন নাই। কারণ, পরমেশ্বর ভিন্ন আর কেহই বেদের আদিকর্ত্তা হইতেই পারেন না। তাঁহার উপদেশ ব্যতীত আর কাহারই প্রথমে বেদ ও বেদার্থ বিষয়ে কোন জ্ঞানই সম্ভব হইতে পারে না। বেদ-রচনার পূর্ব্বে কাহারও বেদার্থ-জ্ঞান বা ঋষিত্ব লাভের আর কোন উপায় ছিল না।

যোগদর্শনে মহর্ষি পতঞ্জলিও স্পষ্ট বলিয়াছেন—"পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনাঽনবচ্ছেদাৎ" (১।২৬)। অর্থাৎ সেই নিত্য সর্ব্বজ্ঞ মহেশ্বরই হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতিরও গুরু। কারণ, তিনি কোন কালবিশেষাবচ্ছিন্ন পুরুষ নহেন। তিনি ব্রহ্মাদিরও পূর্ব্বকাল হইতে চির বিদ্যমান। তিনি অনাদি অনন্ত। সুতরাং তিনিই যে, প্রথমে সকল বেদের উপদেষ্টা ও তিনিই যে, প্রথমে সকল বেদার্থের ব্যাখ্যাতা—এ বিষয়ে সন্দেহ কি আছে? মনে রাখিতে হইবে, শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"অহমাদি হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ।" (গীতা—১০।২) পূর্ব্বে বলিয়াছেন—

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষর-সমুদ্ভবং। (৩।১৫)

(উক্ত শ্লোকে ব্রহ্মন্ শব্দের অর্থ—বেদ)। **বেদ্যং পবিত্র মোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ**॥ (৯।১৭)। পরে বলিয়াছেন—

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞান মপোহনঞ্চ।

বেদৈশ্চ সর্ব্বৈ রহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্ বেদ-বিদেব চাহম্ ॥ ১৫।১৫ ॥*

---

* "বেদান্তকৃৎ" বেদান্তার্থ-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকো বেদব্যাসাদিরূপেণ। ন কেবল [illegible] "বেদবিদেব চাহং,"—কর্ম্মকাণ্ডোপাসনাকাণ্ড-জ্ঞানকাণ্ডাত্মক-মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক-সর্ব্ববেদার্থবিচ্চাহমেব। অতঃ সাধূক্তং,—"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমি"ত্যাদি।—মধুসূদন-সরস্বতী-কৃত ভগবদ্গীতা—'গূঢ়ার্থ-দীপিকা'

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

ন্যায়-দর্শনে প্রমেয় পদার্থের ব্যাখ্যা

মহর্ষি গৌতম সর্ব্বপ্রথম সূত্রে প্রমাণের পরেই "প্রমেয়"পদার্থের উদ্দেশ করিয়াছেন। কারণ, প্রমাণদ্বারা সেই প্রমেয় পদার্থই মুমুক্ষুর প্রধান জ্ঞাতব্য। উহাই প্রকৃষ্ট মেয় অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞেয়। সেই "প্রমেয়" পদার্থের বিশেষ-নাম-নির্দ্দেশরূপ বিভাগ করিতে গৌতম পরে বলিয়াছেন—

আত্ম-শরীরেন্দ্রিয়ার্থ-বুদ্ধি-মনঃ-প্রবৃত্তি-দোষ—
প্রেত্যভাব-ফল-দুঃখাপবর্গাস্তু প্রমেয়ং॥ ১।১।৯ ॥

(১) আত্মা, (২) শরীর, (৩) ইন্দ্রিয়, (৪) অর্থ, (৫) বুদ্ধি, (৬) মন, (৭) প্রবৃত্তি, (৮) দোষ, (৯) প্রেত্যভাব, (১০) ফল, (১১) দুঃখ এবং (১২) অপবর্গই 'প্রমেয়'। অর্থাৎ উক্ত আত্মা প্রভৃতি অপবর্গ পর্য্যন্ত দ্বাদশ পদার্থই প্রথম সূত্রোক্ত প্রমেয় পদার্থ।

এখানে বলা আবশ্যক যে, বস্তুমাত্রকেই "প্রমেয়" বলে। যাহা প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয়, তাহাই প্রমেয়। সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণও বলিয়াছেন—"প্রমেয়-সিদ্ধিঃ প্রমাণাদ্ধি"। সুতরাং গৌতমের মতেও যাহা প্রমাণ-সিদ্ধ,—সেই সমস্তই প্রমেয়। আর তিনি যে "প্রমেয়া চ তুলা-প্রামাণ্যবৎ"—এই সূত্রের দ্বারা প্রমাণকেও প্রমেয় বলিয়াছেন—ইহাও পূর্ব্বে (২০৫পৃঃ) বলিয়াছি। গৌতমের মতের ব্যাখ্যা করিতে ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, * "দ্রব্য," "গুণ", "কর্ম্ম", "সামান্য",

---

* "অস্ত্যন্যদপি দ্রব্য-গুণ-কর্ম্ম-সামান্য-বিশেষ-সমবায়াঃ প্রমেয়ং তদ্ভেদেন চাহপরিসংখ্যেয়ং। অস্য তু তত্ত্ব-জ্ঞানাদপবর্গো মিথ্যাজ্ঞানাৎ সংসার ইত্যত এতদুপদিষ্টং

"বিশেষ" ও "সমবায়",—এই সমস্তও প্রমেয় আছে এবং সেই দ্রব্যাদি প্রমেয়ের অসংখ্য ভেদ থাকায় প্রমেয় অসংখ্য। কিন্তু তন্মধ্যে আত্মা প্রভৃতি অপবর্গ পর্য্যন্ত দ্বাদশ পদার্থের তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারই ঐ সমস্ত পদার্থ বিষয়ে নানাপ্রকার মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তির দ্বারা মুক্তির সাক্ষাৎকারণ হয়। সুতরাং মুমুক্ষুর পক্ষে ঐ সমস্ত পদার্থই প্রকৃষ্ট মেয় (জ্ঞেয়)। তাই মহর্ষি গৌতম উক্তরূপ অর্থে আত্মাদি দ্বাদশ পদার্থকেই "প্রমেয়" বলিয়াছেন। ফলকথা, প্রথম সূত্রে গৌতমোক্ত **প্রমেয়** শব্দটি পূর্ব্বোক্ত অর্থে পারিভাষিক।

পূর্ব্ব সূত্রোক্ত প্রমেয়বর্গের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম প্রমেয় **আত্মা**। সুতরাং প্রথমেই ঐ আত্মার অস্তিত্ব-সাধক লিঙ্গ প্রকাশ দ্বারা আত্মার লক্ষণ সূচনা করিতে গৌতম বলিয়াছেন—

ইচ্ছা-দ্বেষ-প্রযত্ন-সুখ-দুঃখ-জ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গং ॥ ১।১।১০

অর্থাৎ ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ ও জ্ঞান—আত্মার লিঙ্গ (অনুমাপক) এবং লক্ষণ। তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত ইচ্ছা প্রভৃতি গুণের দ্বারা অনুমান প্রমাণ-সিদ্ধ হয়—ঐ সমস্ত গুণের আশ্রয় আছে। পরে ঐ ইচ্ছাদি যে, দেহাদির গুণ নহে—ইহা অনুমান প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হওয়ায় দেহাদি ভিন্ন আত্মা অনুমান প্রমাণ-সিদ্ধ হয়। (চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। অবশ্য আমি সুখী, আমি দুঃখী, ইত্যাদি প্রকারে মনোগ্রাহ্য

"বিশেষেণেতি"। বাৎস্যায়ন ভাষ্য (১।১।১৯)। বস্তুতঃ ন্যায় দর্শনে গৌতমের অনেক সূ[illegible] এবং পরমাণুর নিত্যত্ব ও অবয়বীর সমর্থন প্রভৃতির দ্বারা কণাদোক্ত দ্রব্যাদি ষট্ পদার্থ যে, গৌতমেরও সম্মত—ইহা বুঝিতে পারা যায় এবং তিনিও কণাদের ন্যায় পরে অভাবরূপ প্রমেয়ও সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ গৌতম মতের ব্যাখ্যা করিতেও দ্রব্যাদি সপ্তপদার্থকে গ্রহণ করিয়া উহা সমর্থন করিয়াছেন। "সিদ্ধান্তমুক্তাবলী" গ্রন্থে বিশ্বনাথও ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের উক্ত কথানুসারেই লিখিয়াছেন— "এতে চ পদার্থা বৈশেষিক-প্রসিদ্ধা নৈয়ায়িকানামপ্যবিরুদ্ধাঃ, প্রতিপাদিতঞ্চৈব মেব ভাষ্যে।"

সুখ দুঃখাদি গুণের মানস প্রত্যক্ষ-কালে সমস্ত জীবই নিজ নিজ আত্মারও মানস প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু তখন অতত্ত্বজ্ঞ কোন জীবই নিজের আত্মাকে দেহাদিভিন্নরূপে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। তাই ঐ তাৎপর্য্যেই মহর্ষি কণাদও জীবাত্মাকে অপ্রত্যক্ষ বলিয়া তদ্‌বিষয়ে অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন * এবং যোগীর যোগজ সন্নিকর্ষজন্য আত্মার অলৌকিক প্রত্যক্ষই বলিয়াছেন।

পরন্তু মহর্ষি গৌতম পূর্ব্ব সূত্রের দ্বারা 'প্রমেয়' পদার্থের বিভাগরূপ "উদ্দেশ" করায় পরে প্রথম 'প্রমেয়' আত্মার লক্ষণ তাঁহার অবশ্য বক্তব্য। অতএব তিনি "ইচ্ছা-দ্বেষ" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা ইচ্ছাদি বিশেষ গুণকে আত্মার লক্ষণরূপেও সূচনা করিয়াছেন—ইহা বুঝা যায়। তাহা হইলে তাঁহার মতে ঐ ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ যে, আত্মার অসাধারণ ধর্ম্ম, ইহাও তাঁহার উক্ত সূত্রের দ্বারা বুঝা যায়। নচেৎ ঐ ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ, আত্মার লক্ষণ হইতে পারে না। উক্ত বিষয়ে অন্যান্য বক্তব্য পূর্ব্বে (ষষ্ঠ অধ্যায়ে) বলিয়াছি।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ গৌতমের পূর্ব্বোক্ত সূত্রে "লিঙ্গ" শব্দের দ্বারা লক্ষণ অর্থই গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, ইচ্ছা প্রভৃতি ঐ সমস্ত

---

* বৈশেষিক দর্শনে (৩।২।৪) মহর্ষি কণাদও প্রাণাদির ন্যায় সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্নকে এবং তৎপূর্ব্বে (৩।১।১৮) জ্ঞানকে জীবাত্মার সাধক লিঙ্গ বলিয়াছেন। কণাদের সূত্রানুসারে প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন—"সুখ-দুঃখেচ্ছা-দ্বেষ-প্রযত্নৈশ্চ গুণৈ গুণ্যনুমীয়তে।" কিরূপে ইচ্ছাদি গুণের দ্বারা গুণী আত্মার অনুমিতি হয়, এ বিষয়ে মতভেদ পূর্ব্বে "সামান্যতোদৃষ্ট" অনুমানের ব্যাখ্যায় বলিয়াছি। প্রশস্তপাদ-ভাষ্যের "সূক্তি" টীকায় নব্যনৈয়ায়িক জগদীশ সেই অনুমানপ্রণালী প্রদর্শন করিতে লিখিয়াছেন—"সুখাদিকং দ্রব্য-সমবেতং গুণত্বাৎ"। "জ্ঞানং কচিদাশ্রিতং কার্য্যত্বাদ্ গন্ধবৎ"। কণাদের মতে জ্ঞানাদি যে, আত্মার গুণ, ইহা বুঝাইতে তিনিও পরে লিখিয়াছেন—"বুদ্ধ্যাদীনাং তদ্-গুণত্বাভাবে তল্লিঙ্গবচনানুপপত্তে রিতি ভাবঃ।"

গুণ আত্মার লক্ষণ। তন্মধ্যে ইচ্ছা, প্রযত্ন ও জ্ঞান—জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই উভয়েরই লক্ষণ এবং দ্বেষ, সুখ ও দুঃখ কেবল জীবাত্মার লক্ষণ। বস্তুতঃ উক্ত ইচ্ছা প্রভৃতি সমস্ত গুণকেই আত্মার একটি লক্ষণ বলিলে বৈয়র্থ্য দোষ হয়। সুতরাং গৌতম যে, ঐ ইচ্ছাদি গুণকে আত্মার পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণই বলিয়াছেন—ইহাই বুঝা যায়। তাহা হইলে ইচ্ছাবত্ত্ব, প্রযত্নবত্ত্ব ও জ্ঞানবত্ত্ব—এই লক্ষণত্রয়, কেবল জীবাত্মার লক্ষণ বলা যায় না। কারণ পরমাত্মাতেও নিত্য ইচ্ছা, নিত্য প্রযত্ন ও নিত্য জ্ঞান আছে। (অনেকের মতে নিত্য সুখও আছে)। সুতরাং গৌতম জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই দ্বিবিধ আত্মার সম্বন্ধেই যে, উক্ত লক্ষণ-ত্রয় বলিয়াছেন—ইহা বুঝা যায়। তাহা হইলে গৌতম পূর্ব্বোক্ত প্রমেয়-বিভাগ-সূত্রেও প্রথমে "আত্মন্" শব্দের দ্বারা আত্মত্বরূপে জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই দ্বিবিধ আত্মারই উল্লেখ করিয়াছেন—ইহাও স্বীকার্য্য। এবিষয়ে অন্য কথা পূর্ব্বে (দশম অধ্যায়ে) বলিয়াছি।

আত্মার পরে দ্বিতীয় প্রমেয় **শরীর**। গৌতম উহার লক্ষণ প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন—

চেষ্টেন্দ্রিয়ার্থাশ্রয়ঃ শরীরং ॥ ১।১।১১ ॥

আত্মার প্রযত্ন জন্য তাহার শারীরিক ক্রিয়ার নাম—চেষ্টা। শরীরই উহার আশ্রয় বা আধার। সুতরাং চেষ্টাশ্রয়ত্ব, শরীরের একটি লক্ষণ। এইরূপ ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়গুলিও শরীরাশ্রিত। শরীরাবচ্ছেদেই ঐ সমস্ত ...য় থাকায় অবচ্ছেদকতা সম্বন্ধে শরীরই উহার আশ্রয়। সুতরাং ইন্দ্রিয়াশ্রয়ত্বও শরীরের একটি লক্ষণ। উক্ত সূত্রে গৌতম পরে শরীরের অপর লক্ষণ বলিয়াছেন—অর্থাশ্রয়ত্ব। ভাষ্যকার প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণ ঐ "অর্থ" শব্দের দ্বারা সুখ ও দুঃখরূপ অর্থকে গ্রহণ করিয়া সুখাশ্রয়ত্ব এবং দুঃখাশ্রয়ত্বকেও শরীরের লক্ষণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যদিও গৌতমের মতে জীবাত্মাই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সুখ ও দুঃখের আশ্রয়, কিন্তু

প্রত্যেক জীবাত্মার নিজ নিজ শরীরাবচ্ছেদেই সুখ ও দুঃখ জন্মে। শরীরের বাহিরে জীবাত্মাতে সুখ-দুঃখাদি জন্মে না। সমস্ত জীবাত্মার নিজ নিজ শরীরই তাহার সমস্ত সুখ-দুঃখভোগের আয়তন বা অধিষ্ঠান। তাই ঐ তাৎপর্য্যেই গৌতম শরীরকে সুখাশ্রয় ও দুঃখাশ্রয় বলিয়া শরীরের উক্তরূপ লক্ষণ বলিয়াছেন।

মহর্ষি গৌতম পরে শরীরের তত্ত্ব-পরীক্ষা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন— **পার্থিবং, গুণান্তরোপলব্ধেঃ** (৩।১।২৮)। তাৎপর্য্য এই যে, মনুষ্য শরীরের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই তাহাতে গন্ধ নামক গুণবিশেষের উপলব্ধি হওয়ায় সিদ্ধ হয় যে, মনুষ্য শরীরমাত্রই পার্থিব, অর্থাৎ পঞ্চভূতের মধ্যে পৃথিবীই উহার উপাদান কারণ। এখানে বলা আবশ্যক যে, কণাদ ও গৌতমের মতে গন্ধ কেবল পৃথিবীরই বিশেষগুণ। জলাদি দ্রব্যে গন্ধ থাকে না। কিন্তু তাহার অন্তর্গত পার্থিব অংশের গন্ধই জলাদির গন্ধ বলিয়া অনুভূত ও কথিত হয়। সুতরাং মনুষ্যশরীরে জলাদিভূতের যে সমস্ত গুণের উপলব্ধি হয়, তদ্দ্বারা সেই শরীরের জলীয়ত্বাদি সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, সেই সমস্ত গুণ শরীরের অন্তর্গত জলাদির গুণ। পরন্তু সেই একই শরীর পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয়,—ইহাও বলা যায় না। কারণ একই পদার্থে পৃথিবীত্বাদি নানা বিরুদ্ধ জাতি থাকিতে পারে না। সুতরাং কেবল মনুষ্য-শরীরই নহে, মনুষ্যলোকস্থ সমস্ত শরীর এবং সমস্ত পার্থিব দ্রব্যেরই পৃথিবীই উপাদান কারণ। কারণ, নানা বিরুদ্ধ জাতীয় দ্রব্য কোন দ্রব্যের উপাদান কারণ হয় না। কিন্তু সজাতীয় দ্রব্যই সজাতীয় দ্রব্যান্তরের উপাদান কারণ হইতে পারে। পরন্তু মনুষ্য শরীরাদি সমস্ত পার্থিব দ্রব্যে পার্থিব অংশই যে অধিক—ইহা সকলেরই স্বীকৃত। নচেৎ অন্য মতেও তাহার "পার্থিব" এই সংজ্ঞার উপপত্তি হয় না। কিন্তু কণাদ ও গৌতমের মতে কেবল পৃথিবীই যাহার উপাদান কারণ—এই অর্থেই উহাকে

"পার্থিব" বলা হয়। তবে জলাদিভূত-চতুষ্টয়ও উহার নিমিত্ত-কারণ। তাই পঞ্চভূতের দ্বারা নিষ্পন্ন এই অর্থে উহাকে "পাঞ্চভৌতিক" এবং "পঞ্চাত্মক"ও বলা হইয়াছে।

গৌতম তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে পরে বলিয়াছেন—**শ্রুতি-প্রামাণ্যাচ্চ** (৩।১।৩১)। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন গৌতমের তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, শ্রুতিতে "সূর্য্যন্তে চক্ষুর্গচ্ছতাৎ" এই মন্ত্রের শেষে কথিত হইয়াছে—"পৃথিবীং তে শরীরং"। অর্থাৎ অগ্নি-হোত্রীর দাহ-কালে পাঠ্য উক্ত মন্ত্রের শেষে উক্ত বাক্যের দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তোমার শরীর পৃথিবীতে গমন করুক, অর্থাৎ পৃথিবীতে লয়-প্রাপ্ত হউক। কিন্তু উপাদান কারণেই তাহার কার্য্য দ্রব্যের লয় হইয়া থাকে। সুতরাং উক্ত শ্রুতিমন্ত্রে বিশেষ করিয়া কেবল পৃথিবীতেই শরীরের লয়-প্রাপ্তি কথিত হওয়ায় উহার দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, কেবল পৃথিবীই সেই শরীরের উপাদান কারণ।* অতএব মনুষ্য-শরীরের উক্তরূপ পার্থিবত্বই শ্রুতি-সিদ্ধ হওয়ায় কোন অনুমান দ্বারা অন্যরূপ সিদ্ধান্ত সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, শ্রুতি-বিরুদ্ধ অনুমানের প্রামাণ্য নাই। মহর্ষি গৌতম উক্ত সূত্রের দ্বারা ইহাও ব্যক্ত করিয়াছেন।

বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদও পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে বলিয়াছেন—**প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষাণাং সংযোগস্যাহ-প্রত্যক্ষত্বাৎ পঞ্চা-**

---

* ছান্দোগ্য উপনিষদের "তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকামকরোৎ" (৬।৩।৪) এই বাক্যের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত তেজ, জল ও পৃথিবী এই ভূতত্রয়ের "ত্রিবৃৎকরণ" কথিত তদ্দ্বারা অনেকে উক্ত ভূতত্রয়েরই উপাদানত্ব এবং অনেকে উহার দ্বারা পঞ্চীকরণ বর্ণন করিয়া পঞ্চভূতেরই উপাদানত্ব সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু কণাদ ও গৌতমের মতে অন্যান্য ভূত নিমিত্ত কারণ হইলেও উক্ত শ্রুতিবাক্যের উপপত্তি হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত ভূতত্রয়ের পরস্পর বিলক্ষণ সংযোগ বিশেষের উৎপাদনই উক্তশ্রুতি বাক্যে "ত্রিবৃৎকরণ" বলিয়া কথিত হইয়াছে। তাহাতে উপাদান কারণ ভূতবিশেষের আধিক্য-প্রকাশও ঐরূপ উক্তির উদ্দেশ্য।

ত্মকং ন বিদ্যতে (৪।২।২)। উক্ত সূত্রে অন্য সম্প্রদায়ের মতানুসারে পঞ্চভূতই যাহার উপাদান কারণ—এই অর্থেই "পঞ্চাত্মক" শব্দের প্রয়োগ করিয়া কণাদ বলিয়াছেন যে, পঞ্চাত্মক কোন দ্রব্য নাই। কারণ, প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ পদার্থের যে সংযোগ, তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, পঞ্চভূতই জন্য দ্রব্যের উপাদান কারণ হইলে সেই দ্রব্য পৃথিব্যাদি প্রত্যক্ষ ভূত-ত্রয় এবং বায়ু ও আকাশ, এই অপ্রত্যক্ষ ভূতদ্বয়ে সমবায় সম্বন্ধে বর্ত্তমান হওয়ায় উহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ, প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ পদার্থে যাহা সমবায় সম্বন্ধে বর্ত্তমান থাকে, তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। পৃথিবী ও বায়ু প্রভৃতির সংযোগ ইহার দৃষ্টান্ত।* পৃথিব্যাদি প্রত্যক্ষ ভূত-ত্রয়ও যে, শরীরের উপাদান কারণ নহে—ইহাও কণাদ পরে অন্য যুক্তির দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। ফল কথা, কণাদের মতেও পার্থিব শরীরে পৃথিবীই উপাদান কারণ এবং জলাদি ভূত-চতুষ্টয় নিমিত্ত কারণ। এইরূপ বরুণলোক, সূর্য্যলোক ও বায়ুলোকে দেবগণের যে অযোনিজ জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় শরীর আছে, তাহাতে যথাক্রমে জল, তেজ ও বায়ুই উপাদান কারণ। অন্য ভূত-চতুষ্টয় নিমিত্ত কারণ। কণাদ পরে সেই সমস্ত অযোনিজ শরীরের কথাও বলিয়াছেন।

---

* মহামহোপাধ্যায় ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যাত "পঞ্চীকরণ" যে, কণাদেরও সম্মত—ইহা বলিবার অভিপ্রায়ে "ফেলোসিপের লেকচরে" (পঞ্চমবর্ষ ৪৫ পৃষ্ঠায়) কণাদের "দ্রব্যেষু পঞ্চাত্মকত্বং"—এইরূপ সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু কণাদ পূর্ব্বে "প্রত্যক্ষাহপ্রত্যক্ষাণাং" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত সূত্রের দ্বারা পঞ্চাত্মকত্ব খণ্ডন করিয়া পরে অষ্টম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে উহাই স্মরণ করাইবার উদ্দেশ্যে সূত্রের বলিয়াছেন—"দ্রব্যেষু পঞ্চাত্মকত্বং প্রতিষিদ্ধং"। শারীরক ভাষ্যে—(২।২।১১) আচার্য্য শঙ্করও কণাদের পূর্ব্বোক্ত "প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষাণাং" ইত্যাদি সূত্রের উল্লেখ করিয়া কণাদের উক্ত মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ফলকথা, পঞ্চীকরণ যে, কণাদের সম্মত নহে—ইহা তাঁহার সূত্রের দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায়।

শরীরের পরে তৃতীয় প্রমেয় **ইন্দ্রিয়**। ষষ্ঠ প্রমেয় মনও ইন্দ্রিয়। কিন্তু মনের বিশেষ জ্ঞানের জন্য গৌতম প্রমেয়বর্গের মধ্যে মনের পৃথক উল্লেখ করিয়াছেন। তাই ঘ্রাণাদি পঞ্চ বহিরিন্দ্রিয়কেই গ্রহণ করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

ঘ্রাণ-রসন-চক্ষুস্ত্বক্-শ্রোত্রাণীন্দ্রিয়াণি ভূতেভ্যঃ ॥ ১।১।১২ ॥

সাংখ্যাদি শাস্ত্রে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়ও কথিত হইয়াছে এবং "অহঙ্কার" নামক এক পদার্থ হইতেই সর্ব্বেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। কিন্তু কণাদ ও গৌতম, বাক্য এবং হস্তাদি অঙ্গ-বিশেষকে ইন্দ্রিয় বলেন নাই। তাঁহাদিগের মতে প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞানের সাধন বলিয়া ঘ্রাণাদিই "ইন্দ্রিয়" শব্দের বাচ্য। পূর্ব্বোক্ত বাক্যাদি ইন্দ্রিয় নহে; কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সদৃশ বলিয়া তাহাতে "ইন্দ্রিয়" শব্দের গৌণ প্রয়োগ হইয়াছে। "তাৎপর্য্যটীকা"কার বাচস্পতি মিশ্রও গৌতমের উক্ত মত সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে—যদি অসাধারণ কার্য্য-বিশেষের সাধন বলিয়া বাক্য ও হস্তাদি অঙ্গ-বিশেষকে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলা যায়, তাহা হইলে জীবের কণ্ঠ, হৃদয়, আমাশয় ও পক্বাশয় প্রভৃতিকেও কর্ম্মেন্দ্রিয় বলিতে হয়। কিন্তু তাহা কেহই বলেন নাই। পরন্তু কণাদ এবং গৌতমের মতে "অহঙ্কার" সর্ব্বেন্দ্রিয়ের উপাদান কারণ নহে। কিন্তু পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূতই যথাক্রমে ঘ্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের মূল। সুতরাং ঘ্রাণাদি পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ বহিরিন্দ্রিয় ভৌতিক পদার্থ। তাই গৌতম তাঁহার উক্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশের জন্যই পূর্ব্বোক্ত সূত্রের শেষে বলিয়াছেন—"ভূতেভ্যঃ"।*

---

* কণাদ ও গৌতমের মতে আকাশের উৎপাদক কোন সূক্ষ্মভূত নাই। তাঁহাদিগের মতে আকাশ বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী। কণাদ স্পষ্ট বলিয়াছেন—"বিভবান্মহানাকাশস্তথাচাত্মা" (৭।১।২২) গৌতমও স্পষ্ট বলিয়াছেন—"অব্যূহাবিষ্টম্ভ-বিভুত্বানি চাকাশধর্ম্মাঃ" (৪।২।২২)। সুতরাং বিভু দ্রব্যের উৎপত্তি সম্ভব না হওয়ায় কণাদ ও গৌতমের মতে

গৌতম পরে (তৃতীয় অধ্যায়ে) তাঁহার উক্ত সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাঁহার মূল যুক্তি এই যে—গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দের মধ্যে ঘ্রাণেন্দ্রিয় যখন কেবল গন্ধেরই প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করে এবং রসনেন্দ্রিয় কেবল রসের এবং চক্ষুরিন্দ্রিয় কেবল রূপের এবং ত্বগিন্দ্রিয় কেবল স্পর্শের প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করে, তখন ঐ সমস্ত হেতুর দ্বারা যথাক্রমে ঘ্রাণাদি ঐ চারিটি ইন্দ্রিয়ের পার্থিবত্ব, জলীয়ত্ব, তৈজসত্ব ও বায়বীয়ত্ব অনুমানপ্রমাণ-সিদ্ধ হয়। গৌতম পরে উহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন—**তদ্ব্যবস্থানন্তু ভূয়স্ত্বাৎ** (৩।১।৬৯) অর্থাৎ ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের উৎপাদক ভূতবর্গের মধ্যে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের উৎপাদক পৃথিবীরই ভূয়স্ত্ব বা প্রকর্ষবশতঃ পৃথিবীই উহার উপাদান কারণ। এইরূপ রসনাদি ইন্দ্রিয়ত্রয়ের নিষ্পাদক পৃথিব্যাদি ভূতের মধ্যে যথাক্রমে জল, তেজ ও বায়ুরই ভূয়স্ত্ব বা প্রকর্ষবশতঃ যথাক্রমে জলাদি ভূতত্রয়ই ঐ ইন্দ্রিয়ের উপাদান কারণ। জীবগণের ইন্দ্রিয়-নিষ্পাদক অদৃষ্টবিশেষের ফলেই তাদৃশ প্রকৃষ্ট পৃথিব্যাদি ভূত-জন্য ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হইয়া থাকে। কিন্তু এই মতে শ্রবণেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয় না। কারণ, জীবগণেব কর্ণ-গোলকাবচ্ছিন্ন নিত্য আকাশই বস্তুতঃ শ্রবণেন্দ্রিয়। সেই কর্ণ-গোলকের উৎপত্তি গ্রহণ করিয়াই শাস্ত্রে শ্রবণেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে এবং সেই সমস্ত কর্ণ-গোলকরূপ উপাধির ভেদ গ্রহণ করিয়াই শ্রবণেন্দ্রিয়রূপ আকাশের ভেদ কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু সেই নিত্য আকাশের সত্তা ব্যতীত শ্রবণেন্দ্রিয়ের সত্তা সম্ভব হয় না—এই তাৎপর্য্যেই গৌতম পরে আকাশকে শ্রবণেন্দ্রিয়

আকাশ নিত্য। তাঁহাদিগের অন্য সূত্রের দ্বারাও ইহা বুঝা যায়। সুতরাং আকাশরূপ শ্রবণেন্দ্রিয় বস্তুতঃ নিত্য। অতএব শ্রবণেন্দ্রিয়ের পক্ষে উক্ত সূত্রে "ভূতেভ্যঃ"—এই পদে পঞ্চমী বিভক্তির অর্থ—জন্যত্ব নহে। কিন্তু প্রযোজ্যত্ব—ইহাই বুঝিতে হইবে। যাহার সত্তা ব্যতীত যাহার সত্তা সিদ্ধ হয় না, তাহাকে তৎ-প্রযোজ্য বলে। আকাশের সত্তা ব্যতীত শ্রবণেন্দ্রিয়-সমূহের সত্তা সিদ্ধ না হওয়ায়—উহা আকাশ-প্রযোজ্য।

যোনি বা মূল বলিয়াছেন। শ্রবণেন্দ্রিয়ও যে, অভৌতিক পদার্থ নহে, কিন্তু আকাশ নামক পঞ্চম ভূতাত্মক—ইহা প্রকাশ করাও তাঁহার ঐরূপ উক্তির উদ্দেশ্য।

গৌতম পরে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের তৈজসত্ব সমর্থন করিয়াও উহার ভৌতিকত্ব সমর্থন করিয়াছেন এবং তজ্জন্য প্রথমে সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই "প্রাপ্যকারিত্ব" সমর্থন করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়বর্গ তাহার বিষয়কে প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ প্রাপ্ত বিষয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট হইয়াই তাহার প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করে—এই অর্থে ইন্দ্রিয়বর্গকে বলা হইয়াছে—**প্রাপ্যকারী**। কিন্তু চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা যখন দূরস্থ বিষয়ের প্রত্যক্ষ জন্মে, তখন তাহার সেই সমস্ত বিষয়ের সহিত সন্নিকর্ষ কিরূপে সম্ভব হইবে? চক্ষুরিন্দ্রিয় অভৌতিক পদার্থ হইলে তাহা সম্ভব হইতে পারে না। আর তাহা হইলে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা পৃষ্ঠবর্ত্তী, ব্যবহিত এবং অতি দূরস্থ বিষয়েরও প্রত্যক্ষ কেন হয় না? সুতরাং ইহাই স্বীকার্য্য যে, চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রদীপের ন্যায় তৈজস পদার্থ। প্রদীপের রশ্মির ন্যায় চক্ষুরিন্দ্রিয়েরও রশ্মি আছে এবং প্রদীপের রশ্মি যেমন কোন ব্যবধায়ক দ্রব্য-বিশেষের দ্বারা প্রতিহত হয়; তদ্রূপ, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের রশ্মিও প্রতিহত হয়। সুতরাং ব্যবহিত বিষয়ের সহিত তাহার সন্নিকর্ষ সম্ভব না হওয়ায় সেই সমস্ত বিষয়ের প্রত্যক্ষ জন্মে না। কিন্তু চক্ষুরিন্দ্রিয় "অহঙ্কার" হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ—অভৌতিক পদার্থ হইলে ভিত্তি-প্রভৃতি ব্যবধায়ক দ্রব্যবিশেষের দ্বারা তাহার প্রতিঘাত হইতে পারে না। কারণ, প্রতিঘাত ভৌতিক দ্রব্যেরই ধর্ম্ম। কাচাদি কোন কোন স্বচ্ছ দ্রব্যের দ্বারা তৈজস পদার্থ প্রতিহত না হইলেও ভিত্তি প্রভৃতি দ্রব্যের দ্বারা তাহা প্রতিহত হইয়া থাকে। সুতরাং তদ্দ্বারাও প্রতিপন্ন হয় যে—চক্ষুরিন্দ্রিয় তৈজস পদার্থ।

গৌতম ইহা সমর্থন করিতে সর্ব্বশেষে আবার বলিয়াছেন—**নক্তঞ্চর-নয়ন-রশ্মি-দর্শনাচ্চ** (৩।১।৪৪)। অর্থাৎ রাত্রিকালে

বিড়াল ও ব্যাঘ্রাদি কোন কোন নক্তঞ্চর জীবের চক্ষুর রশ্মি দেখাও যায়। সুতরাং তদ্দৃষ্টান্তে অন্যান্য সমস্ত চক্ষুষ্মান্ জীবেরও চক্ষুর রশ্মি অনুমান প্রমাণ-সিদ্ধ হয়। সেই সমস্ত বিড়ালাদির চক্ষুর রশ্মিও ভিত্তি প্রভৃতি ব্যবধায়ক দ্রব্যের দ্বারা প্রতিহত হওয়ায় তাহারাও ব্যবহিত বিষয়ের প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। সুতরাং তাহাদিগের চক্ষুরিন্দ্রিয় যে অন্যজাতীয় বিলক্ষণ—ইহাও বলা যায় না। কিন্তু মনুষ্যাদির চক্ষুর রশ্মি, যাহা অনুমান প্রমাণ-সিদ্ধ, তাহাতে যে রূপ থাকে, তাহা উদ্ভূত রূপ নহে। সুতরাং সেই রশ্মি নির্গত হইয়া দূরে গমন করিলেও তখন তাহা দেখা যায় না। কারণ, উদ্ভূত রূপ এবং সেই রূপ-বিশিষ্ট মহৎ-দ্রব্যেরই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। রূপমাত্রেরই এবং রূপ-বিশিষ্ট দ্রব্যমাত্রেরই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না। যেমন অগ্নি-তপ্ত জলের মধ্যে তখন তেজঃ পদার্থ থাকিলেও তাহাতে উদ্ভূত রূপ না থাকায় তাহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না। এইরূপ মনুষ্যাদি জীবের চক্ষুর রশ্মিরও প্রত্যক্ষ হয় না। "উদ্ভূত" ও "অনুদ্ভূত" নামে যে দ্বিবিধ রূপ আছে, তন্মধ্যে উদ্ভূত রূপই প্রত্যক্ষ-যোগ্য। কিন্তু যেখানে তাহাও অভিভূত থাকে, সেখানে তাহারও প্রত্যক্ষ হয় না। যেমন উল্কায় উদ্ভূত রূপ থাকিলেও মধ্যাহ্নকালে সূর্য্য কিরণ দ্বারা তাহা অভিভূত হওয়ায় তখন উহার প্রত্যক্ষ হয় না

প্রাচীন কোন সাংখ্যসম্প্রদায়ের মতে একমাত্র ত্বগিন্দ্রিয়ই বাহ্য জ্ঞানেন্দ্রিয়। অর্থাৎ ঘ্রাণ, রসনা, চক্ষু ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের স্থানে যে ত্বগিন্দ্রিয় আছে, তাহাই যথাক্রমে গন্ধ, রস, স্পর্শ ও শব্দের প্রত্যক্ষ জন্মায়। শারীরক ভাষ্যে (২।২।১০) আচার্য্য শঙ্করও উক্ত সাংখ্য মতের উল্লেখ করিয়াছেন। গৌতম-ইন্দ্রিয়-পরীক্ষায় পরে বিশেষ বিচারপূর্ব্বক উক্ত মতেরও খণ্ডন করিয়াছেন। ইন্দ্রিয় পরীক্ষায় গৌতমের আরও অনেক কথা আছে। বাহুল্য ভয়ে এখানে তাঁহার সমস্ত কথা বলা সম্ভব নহে।

ইন্দ্রিয়ের পরে চতুর্থ প্রমেয় **অর্থ**। উহা ইন্দ্রিয়ার্থ।' যথাক্রমে পূর্ব্বোক্ত ঘ্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য পঞ্চ বিশেষগুণই "ইন্দ্রিয়ার্থ" বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাই কণাদও বলিয়াছেন—**প্রসিদ্ধা ইন্দ্রিয়ার্থাঃ** (৩।১।১)। গৌতম উহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—

গন্ধ-রস-রূপ-স্পর্শ-শব্দাঃ পৃথিব্যাদিগুণাস্তদর্থাঃ ॥ ১।১।১৪।

উক্ত সূত্রে "তদ্" শব্দের দ্বারা পূর্ব্ব-সূত্রোক্ত ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়কে গ্রহণ করিয়া গৌতম বলিয়াছেন—**তদর্থাঃ**। 'তেষামিন্দ্রিয়াণামর্থা বিষয়া স্তদর্থাঃ।' গৌতম পরে (৩।১।৬২।৬৩) তাঁহার পূর্ব্বোক্ত "অর্থ" নামক প্রমেয়ের পরীক্ষা করিতে প্রথমে উক্ত বিষয়ে তাঁহার নিজ মত বলিয়াছেন যে—গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শ, পৃথিবীর গুণ। রস, রূপ ও স্পর্শ জলের গুণ। রূপ ও স্পর্শ তেজের গুণ। স্পর্শমাত্র বায়ুর গুণ এবং শব্দমাত্র আকাশের গুণ। বৈশেষিক দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে যথাক্রমে পাঁচ সূত্রের দ্বারা মহর্ষি কণাদও তাঁহার উক্ত সিদ্ধান্ত স্পষ্ট বলিয়াছেন।

গৌতম পরে পূর্ব্বপক্ষরূপে কোন প্রাচীন মতান্তর সমর্থন করিয়াছেন যে, গন্ধই কেবল পৃথিবীর স্বাভাবিক গুণ এবং রসই জলের স্বাভাবিক গুণ এবং রূপই তেজের স্বাভাবিক গুণ এবং স্পর্শই বায়ুর স্বাভাবিক গুণ। তাহা হইলে পৃথিবীতে রস, রূপ এবং স্পর্শেরও প্রত্যক্ষ হয় কেন? এবং জলেও রূপ ও স্পর্শের প্রত্যক্ষ হয় কেন? এবং তেজেও স্পর্শের প্রত্যক্ষ হয় কেন? এতদুত্তরে পূর্ব্বোক্ত মতানুসারে গৌতম পরে বলিয়াছেন—**বিষ্টং হ্যপরং পরেণ** (৩।১।৬৬)। তাৎপর্য্য এই যে—স্থূল ভূতের সৃষ্টিতে পৃথিব্যাদি ভূত, অপরভূত জলাদি কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত হওয়ায় অর্থাৎ পূর্ব্বভূতে পরভূতের বিলক্ষণ সংযোগ-রূপ সংসর্গ হওয়ায় তাহাতে সেই পরভূতের গুণ-বিশেষেরও প্রত্যক্ষ জন্মে। কিন্তু জলাদিতে পূর্ব্বভূত পৃথিবীর ঐরূপ সংসর্গ না হওয়ায় তাহাতে

পৃথিবীর গুণ গন্ধের প্রত্যক্ষ হয় না এবং তেজে জলের ঐরূপ সংসর্গ না হওয়ায় তাহাতে জলের গুণ রসের প্রত্যক্ষ হয় না এবং বায়ুতে তেজের ঐরূপ সংসর্গ না হওয়ায় তাহাতে তেজের গুণ রূপের প্রত্যক্ষ হয় না। ফলকথা, উক্তমতে পূর্ব্বভূতেই পরভূতের অনুপ্রবেশ স্বীকৃত হইয়াছে। পরভূতে তাহার পূর্ব্বভূতের অনুপ্রবেশ স্বীকৃত হয় নাই।

গৌতম পরে এই মতের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন—**ন, পার্থিবাপ্যয়োঃ প্রত্যক্ষত্বাৎ** (৩।১।৬৭)। তাৎপর্য্য এই যে, পার্থিব দ্রব্য এবং জলীয় দ্রব্যেরও যখন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ জন্মে, তখন তাহাতেও রূপ আছে—ইহা স্বীকার্য্য। কারণ যে দ্রব্যে উদ্ভূত রূপ নাই, তাহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না। পার্থিব ও জলীয় দ্রব্যে উদ্ভূত-রূপ-বিশিষ্ট তেজের বিলক্ষণ সংযোগরূপ সংসর্গ-প্রযুক্তই তাহাতে সেই তেজের রূপেরই প্রত্যক্ষ হয়—ইহা বলিলে বায়ুতেও তেজের রূপের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতে পারে। বায়ুতে তেজের ঐরূপ সংসর্গ নাই, কিন্তু তেজেই বায়ুর ঐরূপ সংসর্গ আছে,—ইহা স্বীকার করা যায় না। ভাষ্যকার উক্ত সূত্রের আরও অনেকরূপ ব্যাখ্যা করিয়া নানা যুক্তির দ্বারা উক্ত মতের খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে,—পার্থিব দ্রব্যবিশেষে যে তিক্তাদি রসের প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহা উহার অন্তর্গত জলেই রস, ইহা বলা যায় না। কারণ জলে যে, তিক্তাদি রস আছে; এবিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। এবং তেজেও যে, শুক্লপীতাদি সমস্তরূপই আছে—এ বিষয়েও কোন প্রমাণ নাই। ভাষ্যকার আরও বলিয়াছেন যে, যখন কোন পার্থিব দ্রব্যে সেই জলাদি ভূত-ত্রয়ের পূর্ব্বতন সংসর্গ বিধ্বস্ত হয়, তখনও তাহাতে রস রূপ ও স্পর্শের প্রত্যক্ষ হওয়ায় পৃথিবীতে পূর্ব্বোক্ত গন্ধাদি চতুর্গুণই স্বীকার্য্য। এইরূপ কোন জলীয় দ্রব্যে যখন তেজ ও বায়ুর পূর্ব্বতন সংসর্গ বিধ্বস্ত হয়, তখনও তাহাতে রস, রূপ ও স্পর্শের প্রত্যক্ষ হওয়ায় জলে পূর্ব্বোক্ত রসাদি গুণত্রয়ই স্বীকার্য্য এবং কোন তৈজস পদার্থে বায়ুর

পূর্ব্বতন সংসর্গ বিধ্বস্ত হইলে তখনও তাহাতে স্পর্শের প্রত্যক্ষ হওয়ায় তেজে রূপের ন্যায় স্পর্শও স্বীকার্য্য।

অবশ্যই প্রশ্ন হইবে যে—পৃথিবীতে গন্ধাদি চতুর্গুণই বিদ্যমান থাকিলে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহাতে ঐ সমস্ত গুণেরই প্রত্যক্ষ হয় না কেন? এতদুত্তরে গৌতম পরে (৩।১।৬৮) বলিয়াছেন যে—যে ইন্দ্রিয়ে যে গুণের উৎকর্ষ আছে, তদ্দ্বারা সেই গুণবিশেষেরই প্রত্যক্ষ জন্মে। ঘ্রাণেন্দ্রিয় পার্থিব দ্রব্য বলিয়া তাহাতেও গন্ধাদি চারিটি গুণ থাকিলেও তন্মধ্যে গন্ধেরই উৎকর্ষ থাকায় তদ্দ্বারা গন্ধেরই প্রত্যক্ষ জন্মে। এইরূপ রসনেন্দ্রিয় জলীয় দ্রব্য বলিয়া তাহাতে রস, রূপ ও স্পর্শ থাকিলেও তন্মধ্যে রসেরই উৎকর্ষ থাকায় তদ্দ্বারা রসেরই প্রত্যক্ষ জন্মে। এইরূপ চক্ষুরিন্দ্রিয় তৈজস পদার্থ বলিয়া তাহাতে রূপ ও স্পর্শ থাকিলেও তন্মধ্যে রূপেরই উৎকর্ষবশতঃ তদ্দ্বারা রূপেরই প্রত্যক্ষ জন্মে। ত্বগিন্দ্রিয়ে কেবল স্পর্শই থাকায় উহার দ্বারা স্পর্শেরই প্রত্যক্ষ জন্মে। কিন্তু ইন্দ্রিয়মাত্রই অতীন্দ্রিয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা তদ্‌গত শব্দ-রূপ গুণের প্রত্যক্ষ হইলেও ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তদ্‌গত গন্ধাদিগুণের প্রত্যক্ষ হয় না। গৌতম ইহার কারণ বলিয়াছেন যে—ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ে যে গন্ধাদি গুণ থাকে, সেই গুণবিশিষ্ট ঘ্রাণাদিই ইন্দ্রিয়। সুতরাং নিজেই নিজের গ্রাহক হইতে পারে না।

বস্তুতঃ সমস্ত দ্রব্য ও সমস্ত গুণের প্রত্যক্ষ হয় না। চক্ষুরিন্দ্রিয় ও তাহার রূপের প্রত্যক্ষ কেন হয় না? এতদুত্তরে মহর্ষি গৌতমও পূর্ব্বে বলিয়াছেন—**দ্রব্য-গুণ-ধর্ম্ম-ভেদাচ্চোপলব্ধি-নিয়মঃ** । (৩।১।৩৭)। তাৎপর্য্য এই যে—যে সমস্ত দ্রব্য ও গুণে প্রত্যক্ষ-প্রযোজক ধর্ম্ম থাকে, তাহারই প্রত্যক্ষ হয়। উদ্ভূতত্ব ধর্ম্মবিশিষ্ট রূপ-বিশেষ এবং সেই রূপ-বিশিষ্ট দ্রব্যেরই কারণ-সত্ত্বে প্রত্যক্ষ জন্মে। কিন্তু চক্ষুরিন্দ্রিয়ে রূপ থাকিলেও তাহা উদ্ভূত রূপ

নহে। এইরূপ ঘ্রাণ, রসনা ও ত্বগিন্দ্রিয়ে যে গুণ থাকে, তাহাতে প্রত্যক্ষ-প্রয়োজক উদ্ভূতত্ব না থাকায় তাহার প্রত্যক্ষ হয় না—ইহাই গৌতমের চরম উত্তর বুঝা যায়। অর্থাৎ যেমন পাষাণাদি অনেক দ্রব্যে গন্ধ থাকিলেও সেই গন্ধে উৎকটত্ব ধর্ম্ম না থাকায় তাহার প্রত্যক্ষ হয় না; তদ্রূপ ঘ্রাণেন্দ্রিয়স্থ গন্ধেরও প্রত্যক্ষ হয় না। এইরূপ রসাদি গুণবিশেষের সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে।

অর্থের পরে পঞ্চম প্রমেয় **বুদ্ধি**। যদ্দ্বারা বুঝা যায়, এই অর্থে নিষ্পন্ন "বুদ্ধি" শব্দের দ্বারা জীবের অন্তঃকরণ বা মনও বুঝা যায়। মহর্ষি গৌতমও পরে ঐ অর্থেও "বুদ্ধি" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি প্রমেয় পদার্থের মধ্যে যে "বুদ্ধি" বলিয়াছেন, তাহা জীবের প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান। জ্ঞানার্থক "বুধ" ধাতুর উত্তর ভাবার্থে ক্তিন্ প্রত্যয়-নিষ্পন্ন "বুদ্ধি" শব্দের দ্বারা জ্ঞানই বুঝা যায়। গৌতমের মতে সেই জ্ঞানকেই "উপলব্ধি" বলে। তাই তিনি তাঁহার কথিত "বুদ্ধি" নামক পঞ্চম প্রমেয়ের স্বরূপ প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন—

বুদ্ধিরুপলব্ধি র্জ্ঞানমিত্যনর্থান্তরং ॥ ১।১।১৫ ॥

অর্থাৎ বুদ্ধি, উপলব্ধি ও জ্ঞান, অর্থান্তর (ভিন্ন পদার্থ) নহে, একই পদার্থ। যাহাকে জ্ঞান এবং উপলব্ধি বলে, তাহাই বুদ্ধি। সাংখ্য মতে মূল প্রকৃতির প্রথম পরিণাম বুদ্ধি, উহার নাম অন্তঃকরণ। জ্ঞান সেই বুদ্ধি বা অন্তঃকরণেরই বৃত্তি বা পরিণাম-বিশেষ। উহা অন্তঃকরণেরই বাস্তব ধর্ম্ম। গৌতম পরে বিচারপূর্ব্বক উক্ত মতের খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার মতে জড় অন্তঃকরণই জানে, কিন্তু চেতন আত্মা উপলব্ধি করে, ইহাও অনুভব-বিরুদ্ধ। কারণ, কোন বিষয়ে জীবের বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মিলে "আমি ইহা জানিতেছি," আমি ইহা উপলব্ধি করিতেছি—এইরূপে সেই জীবাত্মাই সেই জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ করে। সুতরাং জ্ঞান ও উপলব্ধি যে, অভিন্ন পদার্থ এবং

জীবাত্মাই তাহার আধার, ইহাই অনুভব-সিদ্ধ। পরন্তু অন্তঃকরণের বৃত্তি জ্ঞানের সহিত আত্মার যে অবাস্তব সম্বন্ধ, তাহাকেই উপলব্ধি বলিলে উহা বাস্তব পদার্থ হয় না। কিন্তু উপলব্ধি যে অবাস্তব, ইহাও অনুভব-বিরুদ্ধ। পরন্তু চন্দ্র-মণ্ডলে সূর্য্য-মণ্ডলের ন্যায়, অন্তঃকরণে পুরুষ বা আত্মার প্রতিবিম্ব-পাতও হইতে পারে না। কারণ, রূপ-শূন্য নির্ব্বিকার পদার্থের প্রতিবিম্ব অসম্ভব। সাংখ্যাদি সম্প্রদায় তাহা স্বীকার করিলেও কণাদ ও গৌতম তাহা স্বীকার করেন নাই।

পরন্তু কণাদ ও গৌতম জীবের অন্তঃকরণেরই অবস্থাভেদে বা পরিণামভেদে মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, এই নাম-ত্রয় স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে মন অন্তরিন্দ্রিয় বলিয়া মনেরই অন্য নাম 'অন্তঃকরণ'। এবং জীবের ভ্রমজ্ঞান-বিশেষই অহঙ্কার ও অভিমান নামে কথিত হইয়াছে। কিন্তু কর্ত্তব্য-নিশ্চয়রূপ যে বিশেষ বুদ্ধি, তাহাও শাস্ত্রে অনেক স্থলে "বুদ্ধি" শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে। উপনিষদেও সেই বুদ্ধিকেই সারথি বলা হইয়াছে। এইরূপ শাস্ত্রে আরও অনেক বিশেষ অর্থে অনেক পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। মূলকথা, কণাদ ও গৌতমের মতে জ্ঞান, বুদ্ধি ও উপলব্ধি, একই পদার্থ এবং উহা জীবাত্মাতেই উৎপন্ন হয়। পরন্তু জীবাত্মা, অন্তঃকরণস্থ কর্ত্তৃত্ব ও সুখদুঃখাদির অভিমান করেন, ইহা বলিলেও আত্মাতে জ্ঞানোৎপত্তি স্বীকার্য্য। কারণ, কর্ত্তৃত্ব ও সুখ দুঃখাদি, অন্তঃকরণেরই স্বকীয় বাস্তব-ধর্ম্ম হইলে অন্তঃকরণেরই তদ্বিষয়ে ভ্রম জ্ঞান জন্মে, ইহা বলা যায় না। অন্তঃকরণস্থ সেই জ্ঞানের সহিত আত্মার অবাস্তব সম্বন্ধই তাহার অভিমান, ইহাও বলা যায় না। ভ্রমাত্মক জ্ঞানবিশেষ ভিন্ন "অভিমান" শব্দের অন্য কোন অর্থে সর্ব্বসম্মত কোন প্রমাণও নাই।

"বুদ্ধির" পরে ষষ্ঠ প্রমেয় **মন**। জীবের সুখ-দুঃখাদির মানস প্রত্যক্ষের করণরূপে মন নামে অন্তরিন্দ্রিয় অবশ্য স্বীকার্য্য,—ইহা পূর্ব্বে

বলিয়াছি। এইরূপ মনের অস্তিত্ব-সাধক আরও অনেক হেতু থাকিলেও গৌতম তাঁহার নিজ-সম্মত একটি বিশেষ হেতুর প্রকাশের উদ্দেশ্যেই বলিয়াছেন—

যুগপজ্‌জ্ঞানানুৎপত্তির্মনসো লিঙ্গং ॥ ১।১।১৬ ॥

অর্থাৎ একই ক্ষণে অনেক ইন্দ্রিয় জন্য অনেক প্রত্যক্ষের যে অনুৎপত্তি, তাহা মনের লিঙ্গ অর্থাৎ অনুমাপক। তাৎপর্য্য এই যে, যে কালে কোন বিষয়ের সহিত কোন ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইয়াছে, তখন অন্য বিষয়েব সহিত অন্য ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলেও যুগপৎ অর্থাৎ একই ক্ষণে অনেক প্রত্যক্ষ জন্মে না, কিন্তু ক্ষণ-বিলম্বেই অপর বিষয়ের প্রত্যক্ষ জন্মে। সুতরাং অনুমান-প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, জীব-দেহে এমন কোন একটি পদার্থ আছে, যাহা ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত না হইলে সেই ইন্দ্রিয়-জন্য প্রত্যক্ষ জন্মে না এবং তাহা পরমাণুর ন্যায় অতি সূক্ষ্ম বলিয়া যুগপৎ অনেক ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার সংযোগ সম্ভব হয় না। সুতরাং যুগপৎ অনেক ইন্দ্রিয় জন্য অনেক প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে না। অতএব মনের এইরূপ লক্ষণও বলা যায় যে, ইন্দ্রিয়ের সহিত যাহার সংযোগ-জন্য, সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহার গ্রাহ্য বিষয়ের প্রত্যক্ষ জন্মে, কিন্তু যাহার সংযোগ না হইলে অন্যান্য কারণ-সত্ত্বেও সেই প্রত্যক্ষ জন্মে না— এমন অতি সূক্ষ্ম দ্রব্যই মন। গৌতম উক্ত সূত্রের দ্বারা মনের উক্তরূপ লক্ষণও সূচনা করিয়াছেন। পরন্তু উক্ত হেতুর দ্বারা জীব-দেহে মন যে, একটি এবং উহা অণু অর্থাৎ পরমাণুর ন্যায় অতি সূক্ষ্ম, ইহাও সূচনা করিয়াছেন। কারণ, জীব-দেহে একাধিক মন থাকিলে যুগপৎ বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সহিত বিভিন্ন মনের সংযোগ সম্ভব হওয়ায় বিভিন্ন ইন্দ্রিয়-জন্য অনেক প্রত্যক্ষ হইতে পারে এবং সেই এক মনও শরীরব্যাপী হইলে যুগপৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার সংযোগ থাকায় অনেক প্রত্যক্ষ হইতে পারে। কিন্তু গৌতম জ্ঞানের যৌগপদ্য অস্বীকার করায়

প্রতিদেহে মনের একত্ব ও অণুত্বই স্বীকার করিয়াছেন। তাই তিনি পরে মনের পরীক্ষায় স্পষ্ট বলিয়াছেন—"জ্ঞানাযৌগপদ্যাদেকং মনঃ।" "যথোক্তহেতুত্বাচ্চাণু" ॥ ৩।২।৫৬।৫৯ ॥

অবশ্য অন্যান্য অনেক সম্প্রদায়ই অনেক স্থলে জ্ঞানের যৌগপদ্য অনুভব সিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করায় গৌতমের উক্ত মত গ্রহণ করেন নাই। কোন সম্প্রদায় আবার জীবদেহে পঞ্চ বহিরিন্দ্রিয়ের সহকারী পাঁচটি মনও স্বীকার করিয়াছিলেন। বৈশেষিক দর্শনের "উপস্কারে" (৩।২।৩) শঙ্কর মিশ্রও ঐ মতের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কণাদও জ্ঞানের যৌগপদ্য স্বীকার করেন নাই। তাই মনের একত্ব ও অণুত্ব সমর্থন করিতে বৈশেষিক দর্শনে তিনিও বলিয়াছেন—"প্রযত্নাযৌগপদ্যাজ্‌জ্ঞানাযৌগপদ্যাচ্চৈকং" ॥ ৩।২।৩ ॥ "তদ্‌ভাবাদণু মনঃ" ॥ ৭।১।২৩ ॥

মহর্ষি গৌতম পরে মনের তত্ত্ব-পরীক্ষা করিতে মনের বিভুত্ব-খণ্ডনের জন্য বলিয়াছেন—**ন, গত্যভাবাৎ।** (৩।২।৮) অর্থাৎ মন বিভু (সর্ব্বব্যাপী) নহে। যেহেতু বিভু দ্রব্যের গতিক্রিয়া নাই। কিন্তু মন চঞ্চল। শরীর-মধ্যে মনের দ্রুতগতি হয় এবং মৃত্যুকালে শরীর হইতে মনের বহির্গমনও হয়। অতএব মন বিভু নহে।

বস্তুতঃ মন যে, গতিশীল চঞ্চল, ইহা স্বীকার্য্য। "ভগবদ-গীতা"তেও কথিত হইয়াছে—"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ! প্রমাথি বলবদ্ দৃঢ়ং"। (৬।৩৪)। পরন্তু শ্রুতি বলিয়াছেন—"অন্যত্রমনা অভূবং নাদর্শ মন্যত্রমনা অভূবং নাশ্রৌষ মিতি, মনসা হ্যেব পশ্যতি, মনসা শৃণোতি। (বৃহদারণ্যক—১।৫।৩)। উক্ত শ্রুতিবাক্যে "অন্যত্রমনাঃ" এইরূপ উক্তির দ্বারা বুঝা যায়, অন্যমনস্ক। বস্তুতঃ অনেক সময়ে কেহ কাহারও কথা-শ্রবণ কালে—পার্শ্ববর্ত্তী অপর ব্যক্তিকেও দেখিতে পান না এবং অপরের কথাও শুনিতে পান না; তাই পরে তিনি বলেন—অন্যমনস্ক ছিলাম, দেখি নাই, শুনি নাই। কিন্তু তাঁহার সেই অন্ত-

মনস্কতা কিরূপে সম্ভব হয়, ইহা বুঝিতে হইবে। কণাদ ও গৌতমের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে যে সময়ে কাহারও মন, তাহার কোন এক ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া স্থির থাকে, তখন তাহাকে **অন্যমনস্ক** বলে। সেই সময়ে তাহার অন্য ইন্দ্রিয়ের সহিত সেই মনের সংযোগ না থাকায় অন্য ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু মনের অতি দ্রুতগতিপ্রযুক্ত পরে সেই মনের দূরবর্ত্তী অন্য ইন্দ্রিয়ের সহিতও অতি শীঘ্র সংযোগ হওয়ায় পরেই সেই ইন্দ্রিয়জন্য অপর প্রত্যক্ষ জন্মে। কিন্তু কোন কোন স্থলে ক্ষণ-বিলম্বেই অবিচ্ছেদে অনেক ইন্দ্রিয়জন্য অনেক প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হওয়ায় তাহাতে যৌগপদ্য-ভ্রম জন্মে।

মহর্ষি গৌতম পরে দৃষ্টান্ত দ্বারা উহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন—**অলাতচক্রদর্শনবৎ তদুপলব্ধিরাশুসঞ্চারাৎ** (৩।২।৫৮)। বর্ত্তমান কালে আতস্ বাজীর ন্যায় প্রাচীন কালে **অলাতচক্র** নামে যন্ত্র-বিশেষ নির্ম্মিত হইত। ঐ যন্ত্র নিঃক্ষিপ্ত হইলেই তাহাতে যে সমস্ত ঘূর্ণন ক্রিয়া দেখা যায়,—তাহা একই ক্ষণে জন্মিতে পারে না। সুতরাং একই ক্ষণে উহার প্রত্যক্ষও হইতে পারে না। সুতরাং সেই সমস্ত বিভিন্ন ক্রিয়া এবং তাহার প্রত্যক্ষে যে যৌগপদ্য-বোধ, তাহা ভ্রমাত্মক, ইহা স্বীকার্য্য। অলাত-চক্রের 'আশু সঞ্চার' অর্থাৎ অতিদ্রুত ক্রিয়াই সেই ভ্রমের কারণ 'দোষ'। এইরূপ অনেক স্থলে অনেক ইন্দ্রিয়জন্য ক্রমিক বিভিন্ন প্রত্যক্ষে যে, যৌগপদ্য-বোধ, তাহাও ভ্রম। শরীর-মধ্যে মনের অতিদ্রুত গতাগতিই সেই ভ্রমের কারণ 'দোষ'।

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন উক্তমত সমর্থন করিতে শেষে বলিয়াছেন যে, কোন স্থলে গন্ধাদি নানা বিষয়ের যে যুগপৎ প্রত্যক্ষ জন্মে, ইহা নিঃসংশয় নহে, অর্থাৎ উহার সর্ব্বসম্মত দৃষ্টান্ত নাই। কিন্তু অনেক স্থলে ক্রমিক উৎপন্ন নানা ক্রিয়ায় যে যৌগপদ্য-ভ্রম জন্মে, এ বিষয়ে গৌতমোক্ত দৃষ্টান্ত এবং আরও অনেক দৃষ্টান্ত সর্ব্বসম্মত আছে। সুতরাং ঐ দৃষ্টান্তে

অবিচ্ছেদে বিভিন্ন ক্ষণে উৎপন্ন গন্ধাদি নানা বিষয়ের নানা প্রত্যক্ষেও যৌগপদ্য-বুদ্ধিকে ভ্রম বলা যায়। বাৎস্যায়ন আরও অনেক কথা বলিয়াছেন। সে যাহা হউক, কণাদ ও গৌতমের পূর্ব্বোক্ত মতে বহু বিবাদ থাকিলেও মনের অণুত্ব ও একত্ব বিষয়ে ঐরূপ বিবাদ নাই। "চরক সংহিতা"র শারীর স্থানেও কথিত হইয়াছে "অণুত্বমথ চৈকত্বং দ্বৌ গুণৌ মনসঃ স্মৃতৌ। (১ম অঃ)। সাংখ্য সূত্রকারও বলিয়াছেন— "অণুপরিমাণং তৎকৃতি-শ্রুতেঃ ॥" (৩।১৪ *)

কিন্তু পরিণামবাদী সাংখ্যসম্প্রদায়ের মতে মনের পরিণাম আছে। তাঁহাদিগের মতে জড় পদার্থমাত্রই প্রতিক্ষণ-পরিণামী। অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক বিদ্যারণ্যমুনিও "জীবন্মুক্তিবিবেক" গ্রন্থে বলিয়াছেন— "সাবয়ব মনিত্যং সর্ব্বদা জতু-সুবর্ণাদিবদ্ বহুবিধপরিণামার্হং দ্রব্যং মনঃ"। কিন্তু আরম্ভবাদী কণাদ ও গৌতমের মতে মন সাবয়ব হইতে পারে না। কারণ, তাঁহাদিগের মতে জন্য-ভূতেরই মূল অবয়ব পরমাণু আছে। কিন্তু মন ভৌতিক দ্রব্য নহে। শাস্ত্রেও পঞ্চভূত হইতে মনের পৃথক্ উল্লেখই হইয়াছে। সুতরাং মনের মূল কোন সূক্ষ্মভূত (পরমাণু) না থাকায় মন নিরবয়ব এবং নিরবয়বত্ববশতঃ পরমাণুর ন্যায় অতি সূক্ষ্ম নিত্য—ইহাই স্বীকার্য্য। সুতরাং উক্ত মতে মনের সংকোচ, বিকাস এবং কোন পরিণাম নাই। কারণ, সাবয়ব দ্রব্যেরই সংকোচ-বিকাসাদি হইতে পারে।

---

* সাংখ্যসূত্রের বৃত্তিকার অনিরুদ্ধ ভট্ট উক্ত সূত্রানুসারে মনের অণুত্বই সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন। কিন্তু যোগদর্শন-ভাষ্যে (৪।১০) ব্যাসদেবের উক্তির ব্যাখ্যায় "যোগবার্ত্তিকে" বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যমতে মন দেহসমপরিমাণ, ইহা বলিয়া পতঞ্জলির মতে মন বিভু, ইহা বলিয়াছেন। উক্ত মতে বিভু মনের সঙ্কোচ ও বিকাস হয় না, কিন্তু উহার বৃত্তিরই সংকোচ ও বিকাস হয়। "ন্যায়-কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থে (৩।১) মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য বহু বিচার করিয়া মনের বিভুত্ব-বাদের খণ্ডন করিয়াছেন।

উক্ত মতে প্রত্যেক জীবাত্মারই এক একটি নিত্য মন আছে এবং অনাদিকাল হইতে সেই জীবাত্মার প্রাক্তন অদৃষ্ট-বিশেষ জন্যই তাহার সেই মনই তাহার অভিনব স্থূল শরীরে প্রবেশ করিতেছে। * স্থূল শরীরে সেই মনের প্রবেশ এবং জীবাত্মার সহিত উহার বিলক্ষণ সংযোগের উৎপত্তিই মনের সৃষ্টি বলিয়া কথিত হইয়াছে। মনের সহিত জীবাত্মার সেই বিলক্ষণ সংযোগব্যতীত তাহাতে কোন জ্ঞানাদিই জন্মে না। তাই জীবাত্মার উপাধি মনের অণুত্ব বা অতিসূক্ষ্মত্ব গ্রহণ করিয়াই শ্রুতি বলিয়াছেন—"বালাগ্রশত-ভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ" (শ্বেতাশ্বতর)। উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা জীব কেশাগ্রের শতাংশের অংশ-পরিমিত অর্থাৎ পরমাণুর ন্যায় অতি সূক্ষ্ম, ইহা কথিত হওয়ায় "জীব" শব্দ-বাচ্য যে মনোরূপ উপাধি বিশিষ্ট জীবাত্মা, তাহার উপাধিভূত মন যে, পরমাণুর ন্যায় অতি সূক্ষ্ম—ইহাই বুঝা যায়। নচেৎ বিশ্বব্যাপী জীবাত্মার উক্তরূপ অণুত্ব উপপন্ন হয় না। ফলকথা, জীবাত্মার বিভুত্বই স্বাভাবিক, অণুত্ব ঔপাধিক।†

---

* যোগদর্শনে (৪।৪) কায়ব্যূহকারী যোগীর সম্বন্ধে যে বহু মনের সৃষ্টি কথিত হইয়াছে, সেই সমস্ত মনের সাবয়বত্ব স্বীকার করা যায়। যোগিগণ যোগশক্তি-প্রভাবে বহু শরীরের ন্যায় বহু মনেরও সৃষ্টি করিতে পারেন এবং তাঁহারা যুগপৎ নানা শরীরে নানা মনের দ্বারা বহু সুখ-দুঃখ-ভোগও করেন। কিন্তু "তাৎপর্য্যটীকাকার" বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, কায়ব্যূহকারী যোগী, তাহার সৃষ্ট অন্যান্য শরীরে মুক্ত পুরুষগণের সেই সমস্ত নিত্য মনই আকর্ষণ করিয়া প্রবিষ্ট করেন। বাচস্পতি মিশ্র এবিষয়ে কোন প্রমাণ বলেন নাই।

† অবশ্য বৈষ্ণব দার্শনিকগণ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের উক্ত "বালাগ্রশতভাগস্য" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যানুসারে জীবাত্মাই স্বভাবতঃ অণু, এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন এবং বেদান্ত-দর্শনে বাদরায়ণের সূত্র দ্বারাও সিদ্ধান্তরূপেই উক্ত মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ন্যায়বৈশেষিকাদি সম্প্রদায়ের মতে জীবাত্মার স্বভাবতঃ বিভুত্বই শাস্ত্র-সিদ্ধ ও যুক্তি-সিদ্ধ।

এইরূপ অন্তর্য্যামী পরমাত্মার উপাধি-বিশেষের অণুত্ব গ্রহণ করিয়াই তাঁহাকে যেমন শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে "অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ" বলা হইয়াছে, তদ্রূপ, জীবাত্মার উপাধি তাহার মনের অণুত্ব গ্রহণ করিয়াই তাহাকেও কোন স্থলে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ বলা হইয়াছে। ঐ "অঙ্গুষ্ঠমাত্র" শব্দের অর্থও অতি সূক্ষ্ম। যেমন মহাভারতের বনপর্ব্বে কথিত হইয়াছে—"অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ যমো বলাৎ" (২৯৬ অঃ ১৭)। অর্থাৎ সাবিত্রীর পতি সত্যবানের শরীর হইতে যম অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিলেন। সাংখ্যাদি অনেক সম্প্রদায়ের মতে স্থূলশরীর-মধ্যস্থ লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্মশরীরই উক্তশ্লোকে কথিত অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ। কিন্তু ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতে মৃত্যুকালে জীবের প্রাণ-সংযুক্ত সেই মনই শরীর হইতে উৎক্রান্ত হয়। সেই মনের অতিসূক্ষ্মত্ববশতঃই আত্মাকে "অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ" বলা হইয়াছে এবং সেই প্রাণ-সংযুক্ত মনের আকর্ষণই উক্ত শ্লোকে সেই পুরুষের আকর্ষণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। মহাভারতে উক্ত শ্লোকের পরে "ততঃ সমুদ্ধৃতপ্রাণং গতশ্বাসং হতপ্রভং" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারাও ঐ তাৎপর্য্য বুঝা যায়। মূল কথা, ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতে জীবের নিত্যসিদ্ধ মন পরমাণুর ন্যায় অতি সূক্ষ্ম। ঐ

তাঁহাদিগের মতে "মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি" (কঠ) ইত্যাদি অনেক শ্রুতি ও অন্য শাস্ত্রবাক্যানুসারে পরমাত্মার ন্যায় জীবাত্মাও বিভু। পরন্তু উক্ত শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেই "বুদ্ধেগুর্ণেনাত্ম-গুণেন চৈব"—ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যের দ্বারা কথিত হইয়াছে যে, জীবাত্মা তাহার স্বকীয় গুণ পরমহত্ত্ব প্রযুক্ত "অবর" অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা মহান্ হইলেও তাহার "বুদ্ধি" অর্থাৎ মনের গুণ অণুত্ব-প্রযুক্ত "আরাগ্রমাত্র"। অতি তীক্ষ্ণাগ্র সূচী-বিশেষের নাম "আরা"। তাহার অগ্রপরিমিত অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম। উক্ত শ্রুতি বাক্যানুসারে "বেদান্ত-পরিভাষা" গ্রন্থে অদ্বৈতবাদী ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্রও বলিয়াছেন—"এতেন জীবস্যাণুত্বং প্রত্যুক্তং, "বুদ্ধে গুর্ণেনাত্ম-গুণেন চৈব আরাগ্রমাত্রো হ্যবরোঽপি দৃষ্ট" ইত্যাদৌ জীবস্য বুদ্ধি-শব্দবাচ্যান্তঃ-করণ-পরিমাণোপাধিকস্য পরমাণুত্ব-শ্রবণাৎ।"

মনেরই নামান্তর অন্তঃকরণ, চিত্ত, হৃদয় প্রভৃতি। কোষকার অমরসিংহও বলিয়াছেন—"চিত্তন্তু চেতো হৃদয়ং স্বান্তং হৃন্মানসং মনঃ ॥"

মনের পরে সপ্তম প্রমেয় **প্রবৃত্তি**। এই "প্রবৃত্তি" শব্দের অর্থ মানবের শুভাশুভকর্ম। উহা ত্রিবিধ—শারীরিক, বাচিক ও মানসিক। তাই গৌতম বলিয়াছেন—

প্রবৃত্তির্ব্বাগ্‌-বুদ্ধি-শরীরারম্ভঃ ॥ ১।১।১৭ ॥

যাহা আরব্ধ অর্থাৎ অনুষ্ঠিত হয়, এই অর্থে উক্ত সূত্রে "আরম্ভ" শব্দের অর্থ—শুভাশুভ কর্ম্ম। এবং যদ্দ্বারা বুঝা যায় এই অর্থে "বুদ্ধি" শব্দের অর্থ মন। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও বলিয়াছেন—"মনোঽত্র বুদ্ধিরিত্যভিপ্রেতং বুধ্যতেঽনেনেতি বুদ্ধিঃ"। তাহা হইলে উক্ত সূত্রের দ্বারা বুঝা যায় যে, "বাগারম্ভ" অর্থাৎ বাচিক শুভাশুভকর্ম্ম এবং "বুদ্ধ্যারম্ভ" অর্থাৎ মানসিক শুভাশুভ কর্ম্ম এবং "শরীরারম্ভ" অর্থাৎ শারীরিক শুভা-শুভকর্ম্ম—এই ত্রিবিধ প্রবৃত্তি। মহর্ষি গৌতম ন্যায়দর্শনের দ্বিতীয় সূত্রে উক্ত ত্রিবিধ শুভাশুভকর্ম্ম জন্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকেই "প্রবৃত্তি" শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু উহা "প্রবৃত্তি" শব্দের মুখ্য অর্থ নহে। উদ্দ্যোতকর গৌতমের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, প্রবৃত্তি দ্বিবিধ—কারণরূপ ও কার্য্যরূপ। মানবের ধর্ম্মাধর্ম্মের জনক শুভাশুভ কর্ম্মরূপ প্রবৃত্তি—কারণরূপ প্রবৃত্তি এবং তাহার কার্য্য বা ফল যে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, তাহাই কার্য্যরূপ প্রবৃত্তি।

প্রবৃত্তির পরে অষ্টম প্রমেয় **দোষ**। জীবাত্মার রাগ, দ্বেষ ও মোহ, এই তিনটীর নাম "দোষ"। উহা পূর্ব্বসূত্রোক্ত 'প্রবৃত্তির' জনক। তাই গৌতম পূর্ব্বোক্ত "প্রবৃত্তি"র পরেই উহার কারণ "দোষ" নামক প্রমেয়ের উল্লেখ করিয়া উহার লক্ষণ বলিয়াছেন—

প্রবর্ত্তনা-লক্ষণা দোষাঃ ॥ ১।১।১৮ ॥

"প্রবর্ত্তনা" শব্দের অর্থ এখানে প্রবৃত্তি-জনকত্ব। ঐ "প্রবর্ত্তনা" যাহার লক্ষণ, তাহা দোষ। বিষয়ে আসক্তিরূপ রাগ, এবং দ্বেষ ও মোহই জীবাত্মাকে শুভাশুভ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে। অবশ্য কাম, মৎসর, ও অসূয়া প্রভৃতি নামেও বহু দোষ আছে। কিন্তু সেই সমস্তই উক্ত ত্রিবিধ দোষের অন্তর্গত। তাই গৌতম পরে বলিয়াছেন—**তৎ-ত্রৈরাশ্যং, রাগ-দ্বেষ-মোহার্থান্তর-ভাবাৎ** (৪।১।৩)। ফলকথা, রাগ, দ্বেষ ও মোহ নামে দোষ ত্রিবিধ। উক্ত ত্রিবিধ দোষের মধ্যে মোহই সর্ব্বোপেক্ষা নিকৃষ্ট। এ বিষয়ে গৌতমের কথা পূর্ব্বেই (পঞ্চম অধ্যায়ে) বলিয়াছি।

দোষের পরে নবম প্রমেয় **প্রেত্যভাব**। প্র পূর্ব্বক "ইণ্" ধাতুর উত্তর ক্ত্বা প্রত্যয়-সিদ্ধ "প্রেত্য" শব্দের দ্বারা বুঝা যায়—মরণের পরে। "ভাব" শব্দের অর্থ জন্ম। তাই ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"প্রেত্যভাবো মৃত্বা পুনর্জ্জন্ম"। পূর্ব্বসূত্রোক্ত দোষজন্য জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ প্রবৃত্তির ফলেই জীবের পুনর্জ্জন্ম হয়। সুতরাং জীবের পুনর্জ্জন্ম, তাহার দোষ-মূলক। তাই মহর্ষি গৌতম প্রমেয় পদার্থের মধ্যে দোষের পরেই "প্রেত্যভাবে"র উল্লেখ করিয়া পরে উহার লক্ষণ বলিয়াছেন—

পুনরুৎপত্তিঃ প্রেত্যভাবঃ ॥ ১।১।১৯ ॥

জীবাত্মার নিত্যত্ববশতঃ তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। কিন্তু অনাদিকাল হইতে তাহার পুনঃ পুনঃ যে অভিনব স্থূল শরীর-বিশেষের পরিগ্রহ, উহাই উক্ত সূত্রে "পুনরুৎপত্তি" শব্দের দ্বারা বিবক্ষিত। গৌতম পরে উক্ত বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন—"আত্ম-নিত্যত্বে প্রেত্যভাব-সিদ্ধিঃ" (৪।১।১০)। অর্থাৎ জীবাত্মার নিত্যত্ব-প্রযুক্ত তাহার "প্রেত্যভাব" বা পুনর্জ্জন্ম সিদ্ধ হয়। তাৎপর্য্য এই যে, ন্যায়-দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ে জীবাত্মার নিত্যত্ব-সাধক যে সমস্ত যুক্তি

কথিত হইয়াছে, তদ্দ্বারাই তাহার পূর্ব্বজন্মও সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত বিষয়ে গৌতমের যুক্তি ও অন্যান্য বক্তব্য পূর্ব্বেই (৫ম অঃ) বলিয়াছি।

"প্রেত্যভাবে"র পরে দশম প্রমেয় **ফল**। উহা দ্বিবিধ—মুখ্য ও গৌণ। জীবের সুখ ও দুঃখের উপভোগই তাহার মুখ্য ফল এবং তাহার সাধন দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সমস্তই গৌণ ফল। জীবের ফলমাত্রই তাহার পূর্ব্বকৃত-কর্ম্ম-জন্য ধর্ম্ম বা অধর্ম্মের ফল এবং সেই ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম তাহার দোষ-জনিত। তাই গৌতম পরে "ফলের" লক্ষণ বলিয়াছেন—

প্রবৃত্তি-দোষ-জনিতোঽর্থঃ ফলং ॥ ১।১।২০ ॥

অর্থাৎ জীবের ধর্ম্ম বা অধর্ম্মরূপ প্রবৃত্তি এবং রাগ-দ্বেষাদি-দোষ-জনিত পদার্থমাত্রই ফল। বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ প্রবৃত্তির ন্যায় জীবের সুখ-দুঃখাদি ফলের প্রতিও তাহার রাগ-দ্বেষাদি-দোষ কারণ,—ইহা ব্যক্ত করিতেই গৌতম উক্ত সূত্রে "প্রবৃত্তি" শব্দের পরে "দোষ" শব্দেরও প্রয়োগ করিয়াছেন। দোষরূপ জলের দ্বারা সিক্ত আত্মরূপ ভূমিতেই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ বীজ, সুখ-দুঃখাদি ফল উৎপন্ন করে। গৌতম পরে (৪র্থ অঃ) যাগাদি কর্ম্ম-জনিত স্বর্গাদি ফল যে, কালান্তরেই জন্মে অর্থাৎ উহা ঐহিক ফল নহে—এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া তদ্দ্বারা পরলোকও সমর্থন করিয়াছেন এবং শুভাশুভকর্ম্ম-জন্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ গুণ যে, সেই কর্ম্ম-কর্ত্তা নিত্য জীবাত্মাতেই জন্মে এবং তদ্দ্বারাই পূর্ব্বকৃত সেই সমস্ত শুভাশুভ কর্ম্ম, কালান্তরেও স্বর্গনরকাদি ফলের কারণ হয়—এই সিদ্ধান্তও ব্যক্ত করিয়াছেন।

ফলের পরে একাদশ প্রমেয় **দুঃখ**। দুঃখ কি, ইহা না বুঝিলে 'অপবর্গ'-লাভের অধিকারই হয় না। তাই গৌতম দুঃখের হেতু শরীরাদি ফল পর্য্যন্ত প্রমেয় পদার্থের উল্লেখ পূর্ব্বক লক্ষণ বলিয়া অপবর্গের পূর্ব্বে উদ্দিষ্ট "দুঃখ" নামক প্রমেয়ের লক্ষণ বলিয়াছেন—

বাধনা-লক্ষণং দুঃখং ॥ ১।১।২১ ॥

ভাষ্যকার, সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন—"বাধনা পীড়া তাপ ইতি"। অর্থাৎ "বাধনা" "পীড়া" ও "তাপ" শব্দ একার্থ-বাচক পর্য্যায় শব্দ। ফল কথা, সর্ব্বজীবের মনোগ্রাহ্য যে দুঃখ, তাহারই নাম বাধনা এবং উহারই অপর নাম 'পীড়া' ও 'তাপ'। পূর্ব্বাচার্য্যগণ ঐ দুঃখকে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই নামত্রয়ে ত্রিবিধ বলিয়াছেন। তাই উক্ত ত্রিবিধ দুঃখই "ত্রিতাপ" নামে কথিত হইয়াছে। দুঃখ স্বভাবতঃই অপ্রিয় পদার্থ। সুতরাং প্রতিকূলভাবেই উহার অনুভব বা মানস প্রত্যক্ষ হওয়ায় পূর্ব্বাচার্য্যগণ উহার স্বরূপ ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন—"প্রতিকূলবেদনীয়ং দুঃখং"।

ভাষ্যকার সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যাহা "বাধনা-লক্ষণ," অর্থাৎ দুঃখানুষক্ত, তাহাই দুঃখ। যেখানে সুখ আছে, সেখানে অবশ্যই দুঃখ আছে। সুখমাত্রে দুঃখের উক্ত অবিনাভাবরূপ সম্বন্ধই তাহাতে দুঃখানুষঙ্গ এবং ঐ দুঃখানুষঙ্গ-প্রযুক্তই সুখমাত্রই দুঃখানুষক্ত ও দুঃখানুবিদ্ধ বলিয়া কথিত হইয়াছে। সুতরাং উক্ত লক্ষণানুসারে জীবের সুখ ও দুঃখ। এবং দুঃখের কারণ শরীরাদিও দুঃখ। কারণ জীবের শরীর তাহার সমস্ত দুঃখের আয়তন বা অধিষ্ঠান বলিয়া শরীরে সমস্ত দুঃখের নিমিত্ততারূপ দুঃখানুষঙ্গ আছে এবং জীবের দুঃখের সাধন ইন্দ্রিয়বর্গ ও তাহার গ্রাহ্যবিষয়-সমূহ এবং তদ্বিষয়ক বুদ্ধি বা জ্ঞানসমূহে দুঃখের সাধনত্বসম্বন্ধরূপ দুঃখানুষঙ্গ থাকায় ঐ সমস্তও দুঃখ। আর সর্ব্বজীবের মনোগ্রাহ্য দুঃখাত্মক গুণপদার্থে ঐ দুঃখের অভেদ সম্বন্ধরূপ দুঃখানুষঙ্গ থাকায় উহা মুখ্য দুঃখ। ফলকথা, ভাষ্যকার উক্তরূপ ব্যাখ্যার দ্বারা শরীরাদি পদার্থ এবং সুখকেও গৌণ দুঃখ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকরও উক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়া একবিংশতি প্রকার দুঃখ বলিয়াছেন * এবং

* জীবের দুঃখের আয়তন শরীর এবং সেই দুঃখের সাধন ঘ্রাণাদি ষড়িন্দ্রিয় এবং সেই ষড়িন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য ষড় বিষয় এবং সেই ষড় বিষয়ে ষড় বুদ্ধি এবং সুখ, এই বিংশতি প্রকার গৌণ দুঃখ এবং মুখ্য দুঃখ গ্রহণ করিয়া একবিংশতি প্রকার দুঃখ কথিত হইয়াছে।

সেই একবিংশতি প্রকার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকেই মুক্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

বস্তুতঃ পূর্ব্বোক্ত শরীরাদি সুখ পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থ "দুঃখ" শব্দের বাচ্য না হইলেও মুমুক্ষু ঐ সমস্তকেও দুঃখ বলিয়া ভাবনা করিবেন। তাই গৌতম ঐ অভিপ্রায়েই তাঁহার কথিত প্রমেয়বর্গের মধ্যে সুখের উল্লেখ করেন নাই। তিনি পরে বলিয়াছেন—**বাধনা ঽনিবৃত্তের্বেদয়তঃ পর্য্যেষণ-দোষাদপ্রতিষেধঃ॥ দুঃখবিকল্পে সুখাভিমানাচ্চ॥** (৪।১।৫৬।৫৭)। তাৎপর্য্য এই যে, নানাপ্রকার সুখাকাঙ্ক্ষার বহু দোষবশতঃ উহা নানা দুঃখেরই কারণ হওয়ায় সুখ-লিপ্সু জীবের 'বাধনা'র (দুঃখের) নিবৃত্তি হয় না। পরন্তু সুখ-লিপ্সু মানব "দুঃখ-বিকল্পে" অর্থাৎ নানাপ্রকার দুঃখে সুখের অভিমানবশতঃ সুখ এবং তাহার সাধন বিষয়-সমূহে আসক্ত হইয়া রাগ-দ্বেষাদি দোষবশতঃ নানাবিধ কর্ম্ম করিয়া তাহার ফলে পুনঃ পুনঃ, জন্ম, জরা ও নানাব্যাধি প্রভৃতি নিমিত্তক নানাবিধ অসংখ্য দুঃখ ভোগ করে। অতএব যিনি মুমুক্ষু, তিনি শরীরাদির ন্যায় সুখকেও দুঃখ বলিয়াই ভাবনা করিবেন। সর্ব্বপ্রকার সুখকেই দুঃখ বলিয়া দীর্ঘকাল ভাবনা করিলে তাহাতে আসক্তিক্ষয় বা বৈরাগ্য জন্মে। সুতরাং সুখের জন্য নানা কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তিও ক্ষীণ হইয়া যায়। কিন্তু মুমুক্ষুর 'প্রমেয়'বর্গের মধ্যে সুখের উল্লেখ করিলে সুখস্বরূপে তাহারও তত্ত্বজ্ঞানের জন্য মুমুক্ষুর সুখকেও সুখ বলিয়া ধ্যান করিতে হয়। কিন্তু ঐরূপ ধ্যান মুমুক্ষুর বৈরাগ্যের পরিপন্থী। মুমুক্ষু সুখকেও দুঃখ বলিয়াই ধ্যান করিবেন। তাই গৌতম প্রমেয়বর্গের মধ্যে সুখের উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু অন্য অনেক সূত্রে সুখের উল্লেখ করায় তিনি যে সুখ পদার্থই মানিতেন না ইহা কথনই বলা যাইবে না।

দুঃখের পরে দ্বাদশ প্রমেয় **অপবর্গ**। গৌতম উক্ত অপবর্গের লক্ষণ বলিয়াছেন—**তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গঃ॥** (১।১।২২)। অর্থাৎ

পূর্ব্বসূত্রোক্ত দুঃখের যে আত্যন্তিক নিবৃত্তি, তাহাই অপবর্গ। সুষুপ্তি-কালে এবং প্রলয়াদি কালে জীবের যে সাময়িক দুঃখ-নিবৃত্তি, তাহা আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি নহে। যে দুঃখ-নিবৃত্তির পরে আর কখনও পুনর্জ্জন্ম হইবে না—সুতরাং কোন প্রকার দুঃখোৎপত্তির কোন কারণই থাকিবে না, উহাই আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি। উহারই নাম **অপবর্গ**। গৌতম পরে চতুর্থ অধ্যায়ে "অপবর্গের" পরীক্ষা করিতে প্রথমে উহা অসম্ভব, এই পূর্ব্বপক্ষের সমর্থন করিয়া উহার খণ্ডনদ্বারা অপবর্গ যে, অবশ্যই সম্ভব—ইহাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে অন্যান্য বক্তব্য প্রথমেই (২য় অঃ) বলিয়াছি।

এখন এখানে বুঝা আবশ্যক যে, মহর্ষি গৌতম হেয় ও উপাদেয়-ভেদে পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ প্রকার "প্রমেয়" বলিয়াছেন। তন্মধ্যে শরীর হইতে দুঃখ পর্য্যন্ত দশবিধ প্রমেয়,—হেয় অর্থাৎ ত্যাজ্য এবং প্রথম প্রমেয় আত্মা ও চরম প্রমেয় অপবর্গ—উপাদেয় অর্থাৎ গ্রাহ্য। আত্মার উচ্ছেদ কাহারই কাম্য হইতে পারে না এবং চিরস্থায়ী আত্মার অপবর্গই চরমলভ্য। সুতরাং আত্মা ও অপবর্গ হেয় পদার্থ নহে। কিন্তু দুঃখ স্বভাবতঃই অপ্রিয় পদার্থ বলিয়া হেয়। যোগ-দর্শনে পতঞ্জলিও বলিয়াছেন—"হেয়ং দুঃখ-মনাগতং"। কিন্তু সেই দুঃখের যে সমস্ত হেতু, তাহার পরিত্যাগ ব্যতীত কখনই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইতে পারে না। সুতরাং শরীরাদি ফল পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত নববিধ প্রমেয়ও দুঃখের হেতু বলিয়া হেয়। যে সমস্ত পদার্থ হেয়, তদ্বিষয়েও নানা প্রকার মিথ্যা জ্ঞান, সংসার-বন্ধনের হেতু হওয়ায় সেই সমস্ত বিষয়ের তত্ত্ব-জ্ঞানও মুক্তিলাভে আবশ্যক। তাই গৌতম পরে বলিয়াছেন—**দোষ-নিমিত্তানাং তত্ত্ব-জ্ঞানাদহঙ্কার-নিবৃত্তিঃ** (৪।২।১)। ফলকথা, গৌতমের মতে আত্মাদি অপবর্গ পর্য্যন্ত দ্বাদশ প্রকার প্রমেয় পদার্থের তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারই মুক্তির চরম কারণ। গৌতম প্রথমেই "দুঃখ-জন্ম," ইত্যাদি দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা ইহার সূচনা করিয়াছেন। এবিষয়ে অন্যান্য বক্তব্য পূর্ব্বেই (তৃতীয় অধ্যায়ে) বলিয়াছি।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ন্যায়দর্শনে সংশয়াদি চতুর্দ্দশ পদার্থের ব্যাখ্যা

গৌতমোক্ত প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের মধ্যে 'প্রমাণ' ও 'প্রমেয়' পদার্থের পরিচয় লিখিত হইয়াছে। এখন এই অধ্যায়ে যথাক্রমে সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান,—এই চতুর্দ্দশ পদার্থের পরিচয় লিখিত হইবে। উক্ত সংশয়াদি চতুর্দ্দশ পদার্থই "আন্বীক্ষিকী" বিদ্যা বা ন্যায় শাস্ত্রের পৃথক্ প্রস্থান অর্থাৎ অসাধারণ প্রতিপাদ্য। আর কোন বিদ্যা বা শাস্ত্রে উক্ত চতুর্দ্দশ পদার্থের প্রতিপাদন হয় নাই। প্রস্থানের ভেদেই বিদ্যা বা শাস্ত্রের ভেদ হইয়াছে। তাই আন্বীক্ষিকী বিদ্যা, ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি, এই বিদ্যা-ত্রয় হইতে ভিন্ন চতুর্থী বিদ্যা বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।* উক্ত "আন্বীক্ষিকী" বিদ্যায় উহার পৃথক্ প্রস্থান সংশয়াদি চতুর্দ্দশ পদার্থের বিশেষরূপে প্রতিপাদন করা আবশ্যক। নচেৎ প্রস্থান-ভেদ না হওয়ায় বিদ্যা বা শাস্ত্রের ভেদ হয় না। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ইহা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, উক্ত সংশয়াদি চতুর্দ্দশ পদার্থের পৃথক্ উল্লেখপূর্ব্বক বিশেষরূপে প্রতিপাদন না করিলে এই বিদ্যা উপনিষদের ন্যায় অধ্যাত্মবিদ্যামাত্র হয় অর্থাৎ চতুর্থী বিদ্যা হয় না। সুতরাং যদিও সামান্যতঃ প্রমাণ ও প্রমেয় পদার্থ বলিলেই সকল পদার্থ বলা হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা উক্ত সংশয়াদি চতুর্দ্দশ পদার্থের বিশেষজ্ঞান

---

* মনুসংহিতা—৭ম অঃ ৪৩ শ্লোক এবং মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৩১৮ অঃ ৪৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

জন্মে না। তাই ন্যায়শাস্ত্রের বক্তা মহর্ষি গৌতম ন্যায়শাস্ত্রের পৃথক্ প্রস্থান অর্থাৎ অসাধারণ প্রতিপাদ্য পূর্ব্বোক্ত সংশয়াদি চতুর্দ্দশ পদার্থের পৃথক্ উল্লেখ পূর্ব্বক উহার লক্ষণাদি বলিয়াছেন।

সংশয়

পূর্ব্বোক্ত সংশয়াদি চতুর্দ্দশ পদার্থের মধ্যে "সংশয়" নামক পদার্থ গৌতমের প্রথম সূত্রোক্ত ষোড়শপদার্থের অন্তর্গত তৃতীয় পদার্থ। উহা "ন্যায়ে"র পূর্ব্বাঙ্গ। কারণ, অজ্ঞাত পদার্থে ন্যায়-প্রবৃত্তি হয় না, নিশ্চিত পদার্থেও ন্যায়-প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু যে পদার্থে কাহারও সংশয় জন্মিয়াছে, সেই সন্দিগ্ধ পদার্থেই ন্যায়-প্রবৃত্তি হয়। যথাক্রমে উচ্চারিত গৌতমোক্ত প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বরূপ-বাক্যসমষ্টিই ঐ "ন্যায়" শব্দের অর্থ। বাদী ও প্রতিবাদীর নিজ নিজ সিদ্ধান্তে তাঁহাদিগের সংশয় না থাকিলেও মধ্যস্থ ব্যক্তিগণের সংশয়-নিরাসের উদ্দেশ্যে তাঁহারা প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বরূপ বাক্যপ্রয়োগ করিয়া নিজপক্ষ-স্থাপন ও পরপক্ষ-খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগের সেই ন্যায়-প্রয়োগই ন্যায়-প্রবৃত্তি। মধ্যস্থগণের সংশয়ই উহার মূল। তাই মহর্ষি গৌতম প্রথম সূত্রে 'প্রমাণ' ও 'প্রমেয়' পদার্থের পরেই ন্যায়ের পূর্ব্বাঙ্গ **সংশয়** পদার্থের উদ্দেশ করিয়াছেন। পরে ক্রমানুসারে ঐ 'সংশয়' পদার্থের লক্ষণ এবং কারণ-ভেদ-প্রযুক্ত প্রকার-ভেদ সূচনার জন্য বলিয়াছেন—

> **সমানানেকধর্ম্মোপপত্তে রুপলব্ধ্যনুপলব্ধ্যব্যবস্থাতশ্চ**
> **বিশেষাপেক্ষো বিমর্শঃ সংশয়ঃ ॥ ১।১।২৩ ॥**

উক্তসূত্রে "বিমর্শ" শব্দের দ্বারা সংশয়ের সামান্যলক্ষণ সূচিত হইয়াছে। "বি" শব্দের অর্থ—বিরোধ। "মৃশ" ধাতুর অর্থ—জ্ঞান। তাহা হইলে "বিমর্শ" শব্দের দ্বারা বুঝা যায়—বিরুদ্ধ পদার্থের জ্ঞান। ফলিতার্থ এই যে, কোন একই পদার্থে নানাবিরুদ্ধ পদার্থের যে জ্ঞান,

তাহা 'সংশয়'। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রভৃতি প্রাচীনগণ উহাকে "অনবধারণ" জ্ঞান বলিয়াছেন। "অবধারণ" শব্দের অর্থ—নিশ্চয়। কিন্তু নিশ্চয়ের অভাবই সংশয় নহে। কারণ, যে পদার্থ বিষয়ে কোনরূপ জ্ঞানই জন্মে নাই, সে বিষয়েও নিশ্চয়ের অভাব থাকে। যে পদার্থ বিষয়ে কাহারও সংশয় জন্মে, তদ্বিষয়ে পূর্ব্বে তাহার সামান্য জ্ঞান অবশ্যই জন্মে। কিন্তু সেই পদার্থের বিশেষ ধর্ম্মকে অবধারণ করিতে না পারায় তদ্বিষয়ে তাহার সংশয়রূপ যে জ্ঞান জন্মে, তাহাই "অনবধারণ" জ্ঞান বলিয়া কথিত হইয়াছে। বিশেষ ধর্ম্মের নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান উক্ত সংশয়-জ্ঞানের প্রতিবন্ধক। সুতরাং বিশেষ ধর্ম্মের নিশ্চয় হইলে সংশয় জন্মে না। উক্ত সূত্রে **বিশেষাপেক্ষঃ** এই পদের দ্বারা ইহাও সূচিত হইয়াছে। পরন্তু উক্ত পদের দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, বিশেষ ধর্ম্মের স্মরণ, সংশয়মাত্রেই আবশ্যক। সুতরাং পূর্ব্বে অন্যত্র সেই বিশেষ ধর্ম্মের উপলব্ধি আবশ্যক।

উক্ত সূত্রের প্রথমে **সমানানেক ধর্ম্মোপপত্তে র্বিপ্রতিপত্তেঃ** ইত্যাদি পদত্রয়ের দ্বারা পঞ্চবিধ সংশয় সূচিত হইয়াছে (পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় সূত্রে "বিপ্রতিপত্তেঃ" এই পদটি ভ্রমবশতঃ মুদ্রিত হয় নাই।) প্রথম পদের দ্বারা সমানধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীর জ্ঞান-জন্য প্রথম প্রকার সংশয় এবং অসাধারণ ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীর জ্ঞান জন্য দ্বিতীয় প্রকার সংশয় সূচিত হইয়াছে। যেমন সন্ধ্যাকালে পথে একটি দণ্ডায়মান স্থাণুতে (শাখাপল্লব শূন্য বৃক্ষে) কাহারও চক্ষুঃ সংযোগ হইলে তখন তাহাতে স্থাণুত্ব অথবা মনুষ্যত্ব-রূপ একতর বিশেষ ধর্ম্মের নিশ্চয় না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার— ইহা কি স্থাণু? অথবা মনুষ্য? এইরূপ সংশয় জন্মে। 'স্থাণুর্ন বা' অথবা 'পুরুষো ন বা' ইত্যাকার সংশয়ও হইতে পারে। "স্থাণুর্ব্বা পুরুষো বা" ইত্যাকার সংশয়ে স্থাণুত্ব ও তাহার অভাব এবং পুরুষত্ব ও তাহার অভাব এই চতুষ্কোটি বিষয় হয়, এইরূপ মতও আছে। সংশয়ের বিশেষণ

বিষয়ে আরও মতভেদ আছে। যাহা হউক, মূলকথা, পূর্ব্বোক্ত স্থলে সেই দণ্ডায়মান দ্রব্যে, ঐরূপ স্থিরভাবে দণ্ডায়মান পুরুষের সমান ধর্ম্ম দৈর্ঘ্য ও বিস্তৃতি প্রভৃতির দর্শন জন্য 'অয়ং স্থাণুর্ব্বা' 'পুরুষো বা' এই আকারে সংশয় জন্মে। * উক্তরূপ সমস্ত সংশয়ই সমান ধর্ম্মজ্ঞান জন্য প্রথম প্রকার সংশয়। কিন্তু সম্মুখীন সেই দ্রব্যে স্থাণুত্ব অথবা পুরুষত্ব প্রভৃতি কোন বিশেষ ধর্ম্মের নিশ্চয় হইলে তখন আর ঐরূপ সংশয় জন্মে না। সুতরাং বিশেষ ধর্ম্ম-নিশ্চয়ের অভাব, সংশয়মাত্রেই কারণ।

এইরূপ অসাধারণ ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীর জ্ঞান জন্যও সংশয় জন্মে। যেমন শব্দে নিত্যত্ব অথবা অনিত্যত্বের নিশ্চয় না হইলে তখন তাহাতে শব্দমাত্রের অসাধারণধর্ম্ম শব্দত্বের জ্ঞানজন্য অর্থাৎ শব্দে নিত্যানিত্য-ব্যাবৃত্ত শব্দত্বের জ্ঞান জন্য 'শব্দো নিত্যো নবা' অর্থাৎ শব্দ নিত্য কি অনিত্য, এইরূপ সংশয় জন্মে। গৌতমের মতে আরও অনেক স্থলে উক্তরূপ অসাধারণ ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীর জ্ঞানজন্য দ্বিতীয় প্রকার সংশয় জন্মে। কিন্তু শব্দে নিত্যত্ব বা অনিত্যত্বরূপ কোন বিশেষ ধর্ম্মের নিশ্চয় হইলে তখন আর উক্তরূপ সংশয় জন্মিতে পারে না।

গৌতম পরে **বিপ্রতিপত্তেঃ** এই পদের দ্বারা "বিপ্রতিপত্তি"—প্রযুক্ত তৃতীয় প্রকার সংশয় বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানুসারে একই

---

* অনেক নব্য নৈয়ায়িকের মতে "অয়ং স্থাণুর্নবা" অথবা "পুরুষো নবা"—এইরূপ আকারেই সংশয় জন্মে। কিন্তু ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ কেবল ভাবপদার্থ কোটিক এবং বহুভাব পদার্থ কোটিক সংশয়ও প্রদর্শন করিয়াছেন। এবিষয়ে "কেবলান্বয়ি দীধিতি"র টীকায় গদাধর ভট্টাচার্য্য উভয় মতের যুক্তি বিচার করিয়াছেন। বস্তুতঃ ভাবদ্বয় কোটিক ও বহুভাব কোটিক সংশয়ের কারণ উপস্থিত হইলে উহাও অবশ্যই জন্মে। "অভিজ্ঞান-শকুন্তল" নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে কালিদাসের "স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু"—ইত্যাদি শ্লোকে এবং তাঁহার রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ "কিমিন্দুঃ কিং পদ্মং কিমু মুকুরবিম্বং কিমু মুখং"—ইত্যাদি শ্লোকে বহুভাব-কোটিক সংশয়ই বর্ণিত হইয়াছে।

আধারে বিরুদ্ধ পদার্থদ্বয়ের বোধক যে বাক্যদ্বয়, তাহাই উক্ত "বিপ্রতিপত্তি" শব্দের অর্থ। যেমন মীমাংসক বলেন—শব্দ নিত্য। নৈয়ায়িক বলেন—শব্দ অনিত্য। কিন্তু একই শব্দে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বরূপ বিরুদ্ধ পদার্থদ্বয় প্রমাণ-সিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং উক্ত বিরুদ্ধ পদার্থদ্বয়ের বোধক বাক্যদ্বয় শ্রবণ করিলে তখন সেই বাক্যার্থ-জ্ঞান জন্য মধ্যস্থ ব্যক্তিদিগের এইরূপ সংশয় জন্মে যে—শব্দ কি নিত্য? অথবা অনিত্য? বাদী মীমাংসক এবং প্রতিবাদী নৈয়ায়িক সেখানে মধ্যস্থ ব্যক্তিদিগের ঐ সংশয়নিরাসের উদ্দেশ্যে ন্যায়-প্রয়োগের দ্বারা স্ব স্ব পক্ষের সংস্থাপন করেন।

গৌতম পরে উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থাকে যথাক্রমে চতুর্থ ও পঞ্চম প্রকার সংশয়ের হেতু বলিয়াছেন। উপলব্ধির অব্যবস্থা বলিতে উপলব্ধির নিয়মাভাব। যেমন তড়াগাদিতে বিদ্যমান জলেরই উপলব্ধি হয় এবং মরীচিকায় অবিদ্যমান জলেরও ভ্রমাত্মক উপলব্ধি হয়। সর্ব্বত্রই যে, বিদ্যমান পদার্থেরই উপলব্ধি হয়, অথবা অবিদ্যমান পদার্থের উপলব্ধি হয়—এইরূপ কোন নিয়ম নাই। এইরূপ ভূগর্ভে বা অন্যত্র বিদ্যমান জলাদি পদার্থেরও উপলব্ধি হয় না এবং সর্ব্বত্রই অবিদ্যমান পদার্থের উপলব্ধি হয় না। উপলব্ধির ন্যায় অনুপলব্ধিরও উক্তরূপ কোন নিয়ম নাই। সুতরাং কাহারও কোন পদার্থের উপলব্ধি হইলে সেখানে যদি সেই পদার্থের বিদ্যমানত্ব বা অবিদ্যমানত্বের নিশ্চয় না হয়, তাহা হইলে সেখানে তাহার এইরূপ সংশয় জন্মে যে, বিদ্যমান পদার্থেরই কি উপলব্ধি হইতেছে? অথবা অবিদ্যমান পদার্থেরই উপলব্ধি হইতেছে? উহা উপলব্ধির অব্যবস্থাপ্রযুক্ত চতুর্থপ্রকার সংশয়। এইরূপ কোন স্থানে কোন পদার্থের উপলব্ধি না হইলে তাহার বিদ্যমানত্ব বা অবিদ্যমানত্বের নিশ্চয় না হওয়া পর্য্যন্ত—'এখানে কি বিদ্যমান পদার্থের উপলব্ধি হইতেছে না? অথবা অবিদ্যমান পদার্থের

উপলব্ধি হইতেছে না? এইরূপ সংশয় জন্মে। উহা অনুপলব্ধির অব্যবস্থাপ্রযুক্ত পঞ্চম প্রকার সংশয়। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। * ভাসর্ব্বজ্ঞও "ন্যায়সারে" গৌতমের সূত্রানুসারে সংশয়কে পঞ্চবিধই বলিয়াছেন।

প্রয়োজন

সংশয়ের ন্যায় প্রয়োজনও "ন্যায়ে"র পূর্ব্বাঙ্গ। কারণ, প্রয়োজন ব্যতীতও পূর্ব্বোক্ত ন্যায়-প্রবৃত্তি হয় না। প্রয়োজনের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারও পূর্ব্বে বলিয়াছেন—"তদাশ্রয়শ্চ ন্যায়ঃ প্রবর্ত্ততে"। তাই মহর্ষি গৌতম সংশয়ের পরেই "প্রয়োজন" পদার্থের উদ্দেশ করিয়া তাহার লক্ষণসূত্র বলিয়াছেন,—

যমর্থমধিকৃত্য প্রবর্ত্ততে তৎ প্রয়োজনং ॥১।১।২৪ ॥

ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে পদার্থকে প্রাপ্য বা ত্যাজ্য বলিয়া নিশ্চয় করিয়া জীব তাহার প্রাপ্তি বা পরিত্যাগের উপায়ে প্রবৃত্ত হয়, সেই পদার্থকে "প্রয়োজন" বলে। ভাষ্যকারের মতে প্রাপ্য

* কিন্তু "বার্ত্তিক"কার উদ্দ্যোতকর ভাষ্যকারের ঐরূপ ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, উপলব্ধির অব্যবস্থা বলিতে একতর পক্ষের সাধক প্রমাণের অভাব এবং অনুপলব্ধির অব্যবস্থা বলিতে বাধক প্রমাণের অভাব। ঐ উভয় সংশয়মাত্রেই কারণ, কিন্তু কোন সংশয় বিশেষের কারণ নহে। সুতরাং মহর্ষি গৌতমও ঐ উভয়কে সংশয়মাত্রের কারণ বলিয়াছেন—ইহাই বুঝিতে হইবে। অতএব প্রথমোক্ত সাধারণ ধর্ম্মজ্ঞান প্রভৃতি ত্রিবিধ কারণ জন্য সংশয় ত্রিবিধ। পরবর্ত্তী প্রায় সমস্ত নৈয়ায়িক উক্ত বিষয়ে উদ্দ্যোতকরের মতই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু গৌতমের সূত্র দ্বারা ভাষ্যকারের মতই সরলভাবে বুঝা যায়। কোন নব্য-নৈয়ায়িক সম্প্রদায় গৌতমের উক্ত সূত্রে "চ" শব্দের দ্বারা ব্যাপ্যপদার্থের সংশয় জন্য ব্যাপক পদার্থের সংশয়ও গৌতমের অভিমত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "অনুমান চিন্তামণি"র উপাধি-বিভাগের টীকায় রঘুনাথ শিরোমণিও ঐরূপ কথা বলিয়াছেন।

পদার্থের ন্যায় ত্যাজ্য পদার্থও প্রয়োজন। কারণ, ত্যাজ্য পদার্থের পরিত্যাগের জন্যও জীবের প্রবৃত্তি হওয়ায় ত্যাজ্য পদার্থও জীবের প্রবৃত্তির প্রয়োজক হইয়া থাকে। "প্রযুজ্যতে হনেন"—এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে "প্রয়োজন" শব্দের দ্বারা উক্তরূপ অর্থ বুঝা যায়। কিন্তু বৃত্তিকার বিশ্বনাথ সরলভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে পদার্থকে উদ্দেশ্য করিয়া জীব তাহার উপায়ে প্রবৃত্ত হয়, তাহা "প্রয়োজন"। ঐ প্রয়োজন মুখ্য ও গৌণ ভেদে দ্বিবিধ। সুখ ও দুঃখ-নিবৃত্তি বিষয়ে জীবের স্বতঃই ইচ্ছা জন্মে, এজন্য ঐ উভয়কেই বলা হইয়াছে—স্বতঃ প্রয়োজন বা মুখ্য প্রয়োজন। আর ঐ সুখ ও দুঃখ-নিবৃত্তির যে সমস্ত উপায়, তাহাকে বলা হইয়াছে—গৌণ প্রয়োজন।

দৃষ্টান্ত

প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ব-রূপ ন্যায়-বাক্যের মধ্যে দৃষ্টান্ত বোধক যে উদাহরণবাক্য বক্তব্য, তাহা দৃষ্টান্ত পদার্থের জ্ঞান ব্যতীত বলা যায় না। তাই মহর্ষি গৌতম 'প্রয়োজন' পদার্থের পরেই 'দৃষ্টান্ত' পদার্থের উদ্দেশ করিয়া পরে উহার লক্ষণ সূত্র বলিয়াছেন—

লৌকিক-পরীক্ষকাণাং যস্মিন্নর্থে বুদ্ধি-
সাম্যং স দৃষ্টান্তঃ ॥ ১।১।২৫ ॥

ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যাহারা স্বাভাবিক এবং শাস্ত্রানু-শীলনাদি-জন্য বুদ্ধি-প্রকর্ষ লাভ করেন নাই, তাঁহারা "লৌকিক"। আর যাহারা উক্তরূপ বুদ্ধি-প্রকর্ষ লাভ করিয়াছেন অর্থাৎ যাহারা লৌকিক ব্যক্তিকে তত্ত্ব-বুঝাইতে সমর্থ, তাঁহারা "পরীক্ষক"। যে পদার্থে লৌকিক ও পরীক্ষক, এই উভয়ের বুদ্ধির সাম্য হয় অর্থাৎ যাহাতে উভয়ের বুদ্ধির বৈষম্য বা বিরোধ থাকে না—সেই পদার্থকে "দৃষ্টান্ত" বলে।

বস্তুতঃ সর্ব্বত্রই যে, উক্তরূপ লৌকিক ব্যক্তির বুদ্ধি-গম্য বা লোক-সিদ্ধ পদার্থই দৃষ্টান্ত—ইহা গৌতমের বিবক্ষিত নহে। কারণ, তিনি বেদের প্রামাণ্য-পরীক্ষায় শেষ-সূত্রে মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদের প্রামাণ্যকে এবং অন্যত্র আরও কোন কোন পদার্থকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন,—যাহা লোকসিদ্ধ নহে, কিন্তু কেবল পরীক্ষক পণ্ডিতজন-বোধ্য। স্নুতরাং উক্ত সূত্রে "লৌকিক" শব্দের দ্বারা যাহাকে তত্ত্ব বুঝান হয়, সেই বোদ্ধা পুরুষ এবং "পরীক্ষক" শব্দের দ্বারা যিনি তাহাকে প্রমাণাদির দ্বারা কোন তত্ত্ব বুঝান, সেই বোধয়িতা পুরুষই গৌতমের বিবক্ষিত। বিচার-স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী উভয় ব্যক্তিই বোদ্ধা ও বোধয়িতা। স্নুতরাং যে পদার্থ তাহাদিগের উভয়ের মতেই প্রমাণ-সিদ্ধ, অর্থাৎ যাহা উভয়েরই স্বীকৃত, তাহা লোক-সিদ্ধ পদার্থ না হইলেও দৃষ্টান্ত হয়। 'ভামতী' টীকায় (২।১।১৪) বাচস্পতি মিশ্রও গৌতমের উক্ত সূত্রের উক্তরূপ তাৎপর্য্যই সমর্থন করিয়াছেন। যে পদার্থে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের মত-বৈষম্য আছে, তাহা সেখানে দৃষ্টান্ত হয় না—ইহা উক্ত সূত্রে "যস্মিন্নর্থে বুদ্ধি-সাম্যং" এই কথার দ্বারা গৌতমও ব্যক্ত করিয়াছেন। উক্ত দৃষ্টান্ত পদার্থ দ্বিবিধ—সাধর্ম্ম্য দৃষ্টান্ত এবং বৈধর্ম্ম্য দৃষ্টান্ত। পরে তৃতীয় অবয়ব উদাহরণ বাক্যের ব্যাখ্যায় ইহা পরিস্ফুট হইবে।

সিদ্ধান্ত

কোন সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করিয়াই তাহার সংস্থাপনের জন্য দৃষ্টান্ত-মূলক ন্যায়ের প্রয়োগ হয়। স্নুতরাং সিদ্ধান্ত কাহাকে বলে এবং উহা কত প্রকার—ইহা বলা আবশ্যক। তাই মহর্ষি গৌতম প্রথম সূত্রে "দৃষ্টান্ত" পদার্থের পরে "সিদ্ধান্ত" পদার্থের উদ্দেশ করিয়া পরে যথাক্রমে উহার লক্ষণ ও প্রকারভেদ প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন—

তন্ত্রাধিকরণাভ্যুপগম-সংস্থিতিঃ সিদ্ধান্তঃ ॥১।১।২৬॥

স চতুর্ব্বিধঃ, সর্ব্বতন্ত্র-প্রতিতন্ত্রাধিকরণাভ্যুপগম-সংস্থিত্যর্থান্তর-ভাবাৎ ॥ ১।১।২৭ ॥

"তন্ত্র" শব্দের অর্থ—শাস্ত্র। "তন্ত্র" বা শাস্ত্র যাহার অধিকরণ বা আশ্রয় অর্থাৎ যে সমস্ত পদার্থ কোন শাস্ত্র-বোধিত, সেই সমস্ত পদার্থই উক্ত প্রথম সূত্রে "তন্ত্রাধিকরণ" শব্দের দ্বারা বিবক্ষিত। সেই সমস্ত পদার্থের "অভ্যুপগম" অর্থাৎ স্বীকাররূপ যে "সংস্থিতি" বা নিশ্চয়, অর্থাৎ নিশ্চিত যে শাস্ত্রার্থ, তাহাই সিদ্ধান্ত। "অন্ত" শব্দেব নিশ্চয় অর্থ গ্রহণ করিলে "সিদ্ধান্ত" শব্দের দ্বারা শাস্ত্র-সিদ্ধ পদার্থের নিশ্চয়ই সিদ্ধান্ত—ইহা বুঝা যায়। ভাষ্যকার সেই নিশ্চয়-বিষয়ীভূত পদার্থকেই 'সিদ্ধান্ত' বলিয়াছেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সিদ্ধান্তও তাঁহাদিগের সম্মত সিদ্ধান্ত। গৌতম পরে দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা 'সিদ্ধান্ত' পদার্থকে চতুর্ব্বিধ বলিয়াছেন। যথা—(১) সর্ব্বতন্ত্র-সিদ্ধান্ত, (২) প্রতিতন্ত্র-সিদ্ধান্ত, (৩) অধিকরণ-সিদ্ধান্ত ও (৪) অভ্যুগম-সিদ্ধান্ত।

গৌতম পরে প্রথম প্রকার সিদ্ধান্তের লক্ষণ সূত্র বলিয়াছেন—**সর্ব্বতন্ত্রাবিরুদ্ধ স্তন্ত্রেঽধি কৃতোঽর্থঃ সর্ব্বতন্ত্র সিদ্ধান্তঃ ॥ ১।১।২৮ ॥** অর্থাৎ যাহা সর্ব্বশাস্ত্রে অবিরুদ্ধ এবং শাস্ত্রে কথিত, তাহাকে বলে,—**সর্ব্বতন্ত্র-সিদ্ধান্ত**। যেমন ঘ্রাণাদির ইন্দ্রিয়ত্ব, পৃথিব্যাদির ভূতত্ব ও আত্মার নিত্যত্ব প্রভৃতি সমস্ত আস্তিক শাস্ত্রে অবিরুদ্ধ এবং শাস্ত্রে কথিত হওয়ায় "সর্ব্বতন্ত্র-সিদ্ধান্ত"। কিন্তু যাহা কোন শাস্ত্রে কথিত হয় নাই, তাহা সর্ব্বশাস্ত্রে অবিরুদ্ধ হইলেও "সর্ব্বতন্ত্র-সিদ্ধান্ত" নহে। তাই গৌতম উক্ত সূত্রে বলিয়াছেন—"তন্ত্রেঽধিকৃতঃ।"

গৌতম পরে দ্বিতীয় প্রকার সিদ্ধান্তের লক্ষণ সূত্র বলিয়াছেন—**সমানতন্ত্র-সিদ্ধঃ পরতন্ত্রা-সিদ্ধঃ, প্রতিতন্ত্র-সিদ্ধান্তঃ** ॥ "সমান-তন্ত্র" বলিতে এখানে একতন্ত্র অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের নিজ

মত-প্রতিপাদক শাস্ত্র। যে সম্প্রদায়ের পক্ষে যাহা নিজতন্ত্র-সিদ্ধ, কিন্তু অপর তন্ত্রে অসিদ্ধ, তাহাই সেই সম্প্রদায়ের **প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত**। যেমন শব্দের অনিত্যত্ব ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের "প্রতিতন্ত্র-সিদ্ধান্ত" এবং শব্দের নিত্যত্ব মীমাংসক সম্প্রদায়ের "প্রতিতন্ত্র-সিদ্ধান্ত"। এইরূপ আরও বহু বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ইহার উদাহরণ বুঝিতে হইবে।

গৌতম পরে তৃতীয় প্রকার সিদ্ধান্তের লক্ষণ সূত্র বলিয়াছেন—
যৎ-সিদ্ধাবন্য-প্রকরণ-সিদ্ধিঃ সোঽধিকরণ-সিদ্ধান্তঃ॥ অর্থাৎ যে পদার্থের সিদ্ধি হইলেই অন্য প্রকৃত পদার্থের অর্থাৎ সাধ্য পদার্থের সিদ্ধি হয়, তাহা "অধিকরণ সিদ্ধান্ত"। ইহার ব্যাখ্যা ও উদাহরণ বিষয়ে মত-ভেদ আছে। "বার্ত্তিক"কার উদ্দ্যোতকর ও রঘুনাথ শিরোমণির ব্যাখ্যানুসারে বৃত্তিকার বিশ্বনাথ গৌতমের উক্ত সূত্রের তাৎপর্য্যার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে—যে পদার্থের সিদ্ধি ব্যতীত যে পদার্থ কোন প্রমাণ দ্বারাই সিদ্ধ হয় না, সেই প্রথমোক্ত পদার্থই "অধিকরণ সিদ্ধান্ত"।

যেমন "তদ্দ্ব্যণুকং সকর্ত্তৃকং, কার্য্যত্বাদ্, ঘটবৎ"—ইত্যাদি ন্যায়-প্রয়োগ করিয়া অনুমান প্রমাণ দ্বারা সৃষ্টির প্রথমে উৎপন্ন "দ্ব্যণুক" নামক দ্রব্যে কর্ত্তৃ-জন্যত্ব সিদ্ধ করিলে অর্থাৎ সেই দ্ব্যণুকের কোন কর্ত্তা আছেন, ইহা সিদ্ধ করিলে সেই কর্ত্তার সর্ব্বজ্ঞত্বও সিদ্ধ হয়। কারণ, সেই দ্ব্যণুকের উপাদান কারণ অতীন্দ্রিয় পরমাণুর প্রত্যক্ষ ব্যতীত সেই দ্ব্যণুকের সৃষ্টি সম্ভব হয় না। সুতরাং সেই দ্ব্যণুক-কর্ত্তা পুরুষ যে অতীন্দ্রিয়-দর্শী সর্ব্বজ্ঞ—ইহা স্বীকার্য্য। উক্তস্থলে জগৎকর্ত্তা সেই পরমেশ্বরের নিত্য-সর্ব্বজ্ঞত্বই উক্তলক্ষণানুসারে "অধিকরণসিদ্ধান্ত"। কারণ, পূর্ব্বোক্তরূপ অনুমান প্রমাণের দ্বারা সৃষ্টির প্রথমে উৎপন্ন "দ্ব্যণুক" নামক দ্রব্যে সকর্ত্তৃকত্ব বা কর্ত্তৃজন্যত্ব সিদ্ধ হইলে আনুষঙ্গিক-রূপে সেই দ্ব্যণুক-কর্ত্তার নিত্যসর্ব্বজ্ঞত্ব অবশ্যই সিদ্ধ হয়। নচেৎ কোন প্রমাণ দ্বারাই সেই দ্ব্যণুকে কর্ত্তৃ-জন্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং

পরমেশ্বরের নিত্যসর্ব্বজ্ঞত্বরূপ সিদ্ধান্ত উক্ত কর্ত্তৃ-জন্যত্বরূপ সিদ্ধান্তের অধিকরণ বা আশ্রয় বলিয়া উহা "অধিকরণ-সিদ্ধান্ত" নামে কথিত হইয়াছে। এইরূপ আত্মা ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন, ইহা সিদ্ধ করিতে গৌতম প্রথমে যে অনুমান প্রমাণ বলিয়াছেন, তদ্দ্বারা আত্মাতে ইন্দ্রিয়ভিন্নত্ব সিদ্ধ করিতে হইলে আনুষঙ্গিকরূপে ইন্দ্রিয়ের নানাত্বপ্রভৃতিও অবশ্য স্বীকার্য্য হয়। ভাষ্যকার সেই সমস্ত সিদ্ধান্তকেই ইহার উদাহরণরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

গৌতম পরে চতুর্থ প্রকার সিদ্ধান্তের লক্ষণ-সূত্র বলিয়াছেন—

অপরীক্ষিতাভ্যুপগমাৎ তদ্বিশেষ-পরীক্ষণমভ্যুপমসিদ্ধান্তঃ॥

(১।১।৩১।) ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানুসারে যে স্থলে প্রতিবাদী কোন পদার্থে তাঁহার অপরীক্ষিত ধর্ম্ম অর্থাৎ তাঁহার অসম্মত কোন ধর্ম্মের 'অভ্যুপগম' বা স্বীকার করিয়াই সেই পদার্থে তাঁহার অসম্মত অপর বিশেষ ধর্ম্মের পরীক্ষা করেন, সেই স্থলে প্রতিবাদীর স্বীকৃত সেই অপর সিদ্ধান্ত, তাঁহার পক্ষে **অভ্যুপমসিদ্ধান্ত**। যেমন বাদী কোন মীমাংসক বলিলেন, 'শব্দ—দ্রব্য পদার্থ ও নিত্য'। তখন প্রতিবাদী নৈয়ায়িক বাদীর সম্মত শব্দের দ্রব্যত্ব সিদ্ধান্তের পরীক্ষা না করিয়া অর্থাৎ সে বিষয়ে কোন বিচার না করিয়াই বলিলেন—আচ্ছা শব্দ দ্রব্য পদার্থ হউক, কিন্তু উহা নিত্য কি অনিত্য—ইহাই বিচার্য্য। উক্ত স্থলে নৈয়ায়িকের স্বীকৃত বাদীর সিদ্ধান্ত—তাঁহার পক্ষে পক্ষে **অভ্যুপমসিদ্ধান্ত**। প্রতিবাদী নৈয়ায়িকের অভিসন্ধি এই যে—শব্দের দ্রব্যত্ব সিদ্ধান্ত মানিয়া লইয়াও নিত্যত্ব সিদ্ধান্তের খণ্ডন করিলে বাদীর ঐ প্রধান সিদ্ধান্তের ভঙ্গ হওয়ায় তিনি পরে আর শব্দের দ্রব্যত্ব সিদ্ধান্ত স্থাপনে প্রয়াস করিবেন না। ফলকথা, উক্ত রূপ উদ্দেশ্যে প্রতিবাদী বাদীর অভিমত কোন সিদ্ধান্ত বিশেষ মানিয়া লইয়া তাঁহার অন্য সিদ্ধান্তের খণ্ডন করিলে সেই স্থলে সেই স্বীকৃত সিদ্ধান্ত তাঁহার পক্ষে "অভ্যুপগম-সিদ্ধান্ত" হয়। কিন্তু

বাদীর পক্ষে তাহা "প্রতিতন্ত্র সিদ্ধান্ত"। "চরক-সংহিতার" "বিমান-স্থানে"ও "অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত" উক্তরূপেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

কিন্তু "বার্ত্তিক"কার উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যাহা সূত্রের দ্বারা "অপরীক্ষিত" অর্থাৎ সূত্রে স্পষ্ট কথিত হয় নাই, তাহা স্বীকার করিয়া সূত্রকার সেই পদার্থের বিশেষ ধর্ম্মের পরীক্ষা করিলে সেই অপরীক্ষিত পদার্থকে বলে "অভ্যুপগম-সিদ্ধান্ত"। যেমন গৌতম ইন্দ্রিয়-বিভাগ সূত্রে মনের উল্লেখ না করিলেও তিনি পরে মনের যে সমস্ত বিশেষ ধর্ম্মের পরীক্ষা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহার মতে মনও যে ইন্দ্রিয়-বিশেষ—ইহা বুঝা যায়। সুতরাং মনের ইন্দ্রিয়ত্ব—"অভ্যুপগম-সিদ্ধান্ত"। কিন্তু গৌতমের পূর্ব্বোক্ত "অপরীক্ষিতা-ভ্যুপগমাৎ"—ইত্যাদি সূত্রপাঠের দ্বারা ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাই সরলভাবে বুঝা যায়। ভাষ্যকার পূর্ব্বে প্রত্যক্ষলক্ষণ-সূত্রের ভাষ্যে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব সমর্থন করিতে গৌতম কেন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মনের উল্লেখ করেন নাই, তাহার হেতুও বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের মতে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব—"সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত"।

অবয়ব

"ন্যায়"দ্বারা সিদ্ধান্ত-নির্ণয়াদি কার্য্যে "অবয়ব" পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক। তাই মহর্ষি গৌতম "সিদ্ধান্ত" পদার্থের পরেই "অবয়ব" পদার্থের উল্লেখ করিয়া পরে উহার বিভাগ করিতে বলিয়াছেন—

প্রতিজ্ঞা-হেতূদাহরণোপনয়-নিগমনান্যবয়বাঃ ॥ ১।১।৩২ ॥

(১) প্রতিজ্ঞা, (২) হেতু, (৩) উদাহরণ, (৪) উপনয় ও (৫) নিগমন—অবয়ব। অর্থাৎ উক্ত প্রতিজ্ঞাদি নামে ন্যায়বাক্যের পঞ্চ অবয়ব। এখানে বলা আবশ্যক যে, পূর্ব্বোক্ত অনুমান প্রমাণ, 'স্বার্থ' ও 'পরার্থ' ভেদে দ্বিবিধ। নিজের তত্ত্ব-নিশ্চয়ার্থ যে অনুমান

প্রমাণ, তাহাকে বলে—**স্বার্থানুমান**। আর অপরকে নিজমত বুঝাইবার উদ্দেশ্যে যে অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন করা হয়, তাহাকে বলে—**পরার্থানুমান**। বিচার-স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী নিজমত প্রতিপাদন করিতে যে অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন করেন, সেই পরার্থানুমানও **ন্যায়** নামে কথিত হইয়াছে। কিন্তু সেই স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী যে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চ বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহাই **পঞ্চাবয়ব ন্যায়**। ভাষ্যকার উহাকেই বলিয়াছেন—'পরম ন্যায়'।

"তাৎপর্য্যটীকা"কার বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন যে—যেমন সাবয়ব দ্রব্যের সমস্ত অবয়ব মিলিত হইয়া সেই দ্রব্যের উৎপাদন ও ধারণ করে, তদ্রূপ, যথাক্রমে প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পঞ্চবাক্য মিলিত হইয়া **ন্যায়** নামক মহাবাক্যের নিষ্পাদন করিয়া বক্তার বিবক্ষিত বিশিষ্ট অর্থের প্রতিপাদন করে। তাই উক্ত প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চবাক্যে "অবয়ব" শব্দের গৌণ প্রয়োগ হইয়াছে। অর্থাৎ ঐ সমস্ত বাক্য অবয়বের সদৃশ, এজন্য "অবয়ব" নামে কথিত হইয়াছে। ফলকথা, যথাক্রমে উচ্চারিত পূর্ব্বোক্ত পঞ্চাবয়বরূপ বাক্যসমষ্টিই **ন্যায়**। আর সেই ন্যায় বাক্যের অন্তর্গত যে প্রতিজ্ঞাদি নামক খণ্ডবাক্য, তাহাই ন্যায়ের **অবয়ব**। গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রভৃতি নব্য নৈয়ায়িকগণ ক্রমে উক্ত "ন্যায়" এবং "অবয়বে"র লক্ষণ-ব্যাখ্যায় বহু সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছেন।

সর্ব্বপ্রথম "অবয়বে"র নাম **প্রতিজ্ঞা**। মহর্ষি গৌতম পরে উহার লক্ষণ-সূত্র বলিয়াছেন—

সাধ্য-নির্দ্দেশঃ প্রতিজ্ঞা ॥ ১।১।৩৩ ॥

ন্যায়-সূত্রে "সাধ্য" শব্দের দ্বিবিধ অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে। ভাষ্যকারও পরে বলিয়াছেন—"সাধ্যঞ্চ দ্বিবিধং।" কোন ধর্ম্মীতে যে ধর্ম্মের অনুমানের উদ্দেশ্যে ন্যায়-প্রয়োগ হয়, সেই (১) অনুমেয় ধর্ম্মরূপ সাধ্য এবং (২) সেই ধর্ম্ম-বিশিষ্ট ধর্ম্মি-রূপ সাধ্য। যেমন শব্দে অনিত্যত্ব ধর্ম্মের

অনুমান স্থলে শব্দে অনুমেয় অনিত্যত্ব—সাধ্যধর্ম্ম। আর সেই অনিত্যত্ব-রূপে শব্দ—সাধ্য ধর্ম্মী। এই সূত্রে "সাধ্য" শব্দের অর্থ সাধ্যধর্ম্মী। বাদী বা প্রতিবাদী 'ন্যায়'-প্রয়োগ করিতে সর্ব্বাগ্রে যে বাক্যের দ্বারা সাধ্যধর্ম্মীর নির্দ্দেশ করেন অর্থাৎ তাঁহাদিগের সাধনীয় ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীর বোধক যে বাক্য, তাহার নাম **প্রতিজ্ঞা**। যেমন শব্দে অনিত্যত্ব স্থাপন করিতে নৈয়ায়িক প্রথমে প্রতিজ্ঞা বাক্য বলেন,—**শব্দোঽনিত্যঃ**। (ভাষ্যকার "নিত্যঃ শব্দঃ' এইরূপ প্রতিজ্ঞা বাক্য বলিয়াছেন।)

"প্রতিজ্ঞা"র পরে দ্বিতীয় অবয়বের নাম **হেতু**। উক্ত "হেতু" শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে,—অনুমেয় ধর্ম্মের লিঙ্গ বা হেতুর হেতুত্ব-বোধক বাক্য। বাক্যরূপ সেই হেতুও দ্বিবিধ—(১) সাধর্ম্ম্য হেতু ও (২) বৈধর্ম্ম্য হেতু। মহর্ষি গোতম পরে যথাক্রমে উক্ত দ্বিবিধ 'হেতু'র লক্ষণ-সূত্র বলিয়াছেন—

উদাহরণ-সাধর্ম্ম্যাৎ সাধ্য-সাধনং হেতুঃ ॥ ১।১।৩৪ ॥

তথা বৈধর্ম্ম্যাৎ ॥ ১।১।৩৫ ॥

উক্ত সূত্রে "উদাহরণ" শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে, উদাহৃত পদার্থ, অর্থাৎ দৃষ্টান্ত পদার্থ। যে পদার্থে অনুমানের লিঙ্গ বা হেতুতে অনুমেয় ধর্ম্মের ব্যাপ্তি-নিশ্চয় হয়, সেই পদার্থই অনুমান-স্থলে দৃষ্টান্ত পদার্থ। সেই দৃষ্টান্ত পদার্থও দ্বিবিধ—(১) সাধর্ম্ম্য দৃষ্টান্ত এবং (২) বৈধর্ম্ম্য-দৃষ্টান্ত। পরে উহাই যথাক্রমে **অন্বয় দৃষ্টান্ত** এবং **ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত** নামে কথিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত সাধ্য ধর্ম্মী ও দৃষ্টান্ত পদার্থের যাহা সমান ধর্ম্ম, তাহাই প্রথম সূত্রে "উদাহরণ-সাধর্ম্ম্য" শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে। দ্বিতীয় সূত্রে "বৈধর্ম্ম্য" শব্দের দ্বারা 'উদাহরণে'র অর্থাৎ ব্যতিরেক দৃষ্টান্তভূত পদার্থের বৈধর্ম্ম্যই বুঝিতে হইবে। 'অবয়ব-প্রকরণে' উক্ত সূত্রে **হেতু** শব্দের দ্বারা দ্বিতীয় অবয়ব বাক্যরূপ

হেতুই লক্ষ্যরূপে গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং **সাধ্য-সাধনং**—এই পদের দ্বারা সাধ্য-ধর্ম্মের সাধনত্ব-বোধক বাক্যই বিবক্ষিত বুঝা যায়।

তাহা হইলে যথাক্রমে উক্ত দুই সূত্রের দ্বারা বুঝা যায় যে, অন্বয়দৃষ্টান্ত ও সাধ্য-ধর্ম্মীর সমান ধর্ম্মপ্রযুক্ত সেই সমানধর্ম্মরূপ হেতুর সাধ্য-সাধনত্ব-বোধক যে বাক্য, তাহা (১) সাধর্ম্ম্য হেতুবাক্য এবং ব্যতিরেক দৃষ্টান্তের বৈধর্ম্ম্য প্রযুক্ত সেই বৈধর্ম্ম্যরূপ হেতুর সাধ্য-সাধনত্ববোধক যে বাক্য, তাহা (২) বৈধর্ম্ম্য হেতুবাক্য। যেমন পূর্ব্বোক্ত **শব্দোহ-নিত্যঃ**—এই প্রতিজ্ঞাবাক্যের পরে নৈয়ায়িক, হেতু বাক্য বলেন—**উৎপত্তিমত্ত্বাৎ**। নৈয়ায়িকের মতে বিদ্যমান শব্দেরই অভিব্যক্তি হয় না; কিন্তু অবিদ্যমান শব্দেরই উৎপত্তি হয়। সুতরাং উক্তস্থলে নৈয়ায়িক "উৎপত্তিমত্ত্বাৎ" এই বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করেন যে, উৎপত্তিমত্ত্ব অনিত্যত্বরূপ সাধ্যধর্ম্মের সাধন। উক্ত উৎপত্তিমত্ত্ব সাধ্যধর্ম্মী শব্দ এবং ঘটাদি দৃষ্টান্ত পদার্থের সমান ধর্ম্ম হওয়ায় তৎপ্রযুক্ত ঐরূপ বাক্য কথিত হয়। সুতরাং উক্ত বাক্য **সাধর্ম্ম্য হেতুবাক্য**। ভাষ্যকারের মতে পূর্ব্বোক্ত স্থলে নৈয়ায়িক নিত্য আত্মাকে ব্যতিরেক দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ বাক্য বলিলে তখন উক্তরূপ হেতু বাক্যই "বৈধর্ম্ম্যহেতু" হইবে। কিন্তু পরবর্ত্তী উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ উক্ত মত গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে যে স্থলে অন্বয় দৃষ্টান্ত সম্ভব না হওয়ায় কেবল ব্যতিরেক দৃষ্টান্তই গ্রহণ করিতে হয়, সেইরূপ স্থলীয় হেতুই 'বৈধর্ম্ম্যহেতু' বা ব্যতিরেকী হেতু এবং সেই হেতু-বোধক বাক্যই 'বৈধর্ম্ম্যহেতু' বাক্য। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে।

হেতুর পরে তৃতীয় অবয়বের নাম—**উদাহরণ**। 'উদাহ্রিয়তে যেন বাক্যেন' অর্থাৎ যে বাক্যের দ্বারা হেতু পদার্থ ও অনুমেয় ধর্ম্মের ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব সম্বন্ধ বোধিত হয়, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে উক্ত **উদাহরণ** শব্দের অর্থ—উদাহরণ বাক্য। উক্ত উদাহরণ বাক্যও

দ্বিবিধ—(১) 'সাধর্ম্ম্যোদাহরণ' ও (২) 'বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ'। মহর্ষি গোতম পরে যথাক্রমে উক্ত দ্বিবিধ উদাহরণের লক্ষণ-সূত্র বলিয়াছেন—

সাধ্য-সাধর্ম্ম্যাৎ তদ্ধর্ম্মভাবী দৃষ্টান্ত উদাহরণম্॥
তদ্বিপর্য্যয়াদ্ বা বিপরীতম্॥ ১।১।৩৬।৩৭॥

ফলিতার্থ এই যে, সাধ্যধর্ম্মীর সমান ধর্ম্মবত্তা প্রযুক্ত যে পদার্থে সেই সাধ্যধর্ম্ম বিদ্যমান থাকে, সেই পদার্থকে বলে—সাধর্ম্ম্য-দৃষ্টান্ত বা **অন্বয়দৃষ্টান্ত**। তাদৃশ দৃষ্টান্তের বোধক বাক্য-বিশেষই 'সাধর্ম্ম্যোদাহরণ বাক্য'। যেমন পূর্ব্বোক্ত স্থলে নৈয়ায়িক 'উৎপত্তিমত্ত্বাৎ' এই হেতু বাক্যের পরে "যো য উৎপত্তিমান্ সোঽনিত্যঃ, যথা—ঘটঃ" এইরূপ কোন বাক্য বলিলে তাহা হইবে—'**সাধর্ম্ম্যোদাহরণ** বাক্য'। (উহার আকার বিষয়েও মতভেদ আছে)। ভাষ্যকারের মতে পূর্ব্বোক্ত স্থলে আত্মাদি ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া উদাহরণ বাক্য বলিলে, তাহা হইবে—'বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ বাক্য'।

কিন্তু "বার্ত্তিক"কার উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে—যে স্থলে অন্বয়-দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যায় না, সেইরূপ স্থলেই ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া উদাহরণ বাক্য বলিলে উহা হইবে—**বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ** এবং সেই স্থলেই পূর্ব্বকথিত হেতু হইবে—**বৈধর্ম্ম্য হেতু**। যেমন, "জীবচ্ছরীরং ন নিরাত্মকং, প্রাণাদিমত্ত্বাৎ, যন্নৈবং তন্নৈবং যথা ঘটঃ"—এইরূপ ন্যায়-প্রয়োগস্থলে অন্বয়দৃষ্টান্ত-প্রদর্শন সম্ভব না হওয়ায় ব্যতিরেক দৃষ্টান্তই প্রদর্শিত হয়। কারণ, প্রতিবাদী (নৈরাত্ম্যবাদী) প্রাণাদি বিশিষ্ট কোন শরীরেই অতিরিক্ত আত্মা স্বীকার না করায়—যাহাতে প্রাণাদি আছে, তাহাতে অতিরিক্ত আত্মা আছে—ইহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যায় না। সুতরাং যাহা সাত্মক নহে—তাহাতে প্রাণাদি নাই, যথা ঘটাদি,—এইরূপে ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াই বাদী নৈয়ায়িক উক্তস্থলে প্রকাশ করেন যে, প্রাণাদিমত্ত্বের অভাব

সাত্মকত্বাভাবের (নিরাত্মকত্বের) ব্যাপক এবং নিরাত্মকত্ব তাহার ব্যাপ্য। কারণ, যে সমস্ত পদার্থ নিরাত্মক, (আত্মশূন্য), তাহাতে প্রাণাদি নাই। সুতরাং জীবিত ব্যক্তির শরীরমাত্রেই প্রাণাদি থাকায় উক্ত 'প্রাণাদিমত্ত্ব'রূপ হেতুর দ্বারা তাহাতে নিরাত্মকত্বের অভাব (সাত্মকত্ব) অনুমান প্রমাণ-সিদ্ধ হয়। কারণ, যে যে স্থানে ব্যাপক পদার্থের অভাব থাকে, সেখানে তাহার ব্যাপ্য পদার্থের অভাব থাকে। ফলকথা, এইমতে উক্তস্থলে ব্যতিরেক দৃষ্টান্তে ব্যতিরেক ব্যাপ্তি-নিশ্চয় জন্যই উক্তরূপ অনুমিতি জন্মে এবং ঐরূপ স্থলেই হেতু ও উদাহরণ—'ব্যতিরেকী' নামে কথিত হয় এবং উক্তরূপ অনুমানকেই 'ব্যতিরেকী' অনুমান বলে। *

বস্তুতঃ মহর্ষি গৌতম দ্বিবিধ হেতু ও দ্বিবিধ উদাহরণের উল্লেখ করায় **কেবল ব্যতিরেকী** হেতুও যে তাঁহার সম্মত—ইহা বুঝা যায়; অনেকের মতে উক্ত হেতুর লক্ষণ-সূত্র দ্বারা **অন্বয় ব্যতিরেকী** নামে তৃতীয় প্রকার হেতুও সূচিত হইয়াছে। বস্তুতঃ গৌতমের অনুমান সূত্রে

---

* "তত্ত্ব-চিন্তামণি"কার গঙ্গেশ উপাধ্যায় "পৃথিবী ইতরেভ্যো ভিদ্যতে, গন্ধবত্ত্বাৎ" এইরূপ প্রয়োগে 'কেবল ব্যতিরেকী' অনুমানের সমর্থন করিতে বহু সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও পরে উদ্দ্যোতকরোক্ত "জীবচ্ছরীরং" ইত্যাদি প্রয়োগ গ্রহণ করিয়া বিচারপূর্ব্বক উক্ত স্থলে ব্যতিরেকী অনুমানই সমর্থন করিয়াছেন। মীমাংসক সম্প্রদায়ের মতে সর্ব্বত্রই অন্বয় ব্যাপ্তির নিশ্চয়-জন্যই অনুমিতি হওয়ায় অনুমানমাত্রই "অন্বয়ী।" সুতরাং পূর্ব্বোক্ত স্থলে "অর্থাপত্তি" নামক পৃথক্ প্রমাণ জন্যই উক্তরূপ বোধ জন্মে। (পূর্ব্ব ২১৯—২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। "বেদান্তপরিভাষা"কার ধর্ম্মরাজ "কেবল ব্যতিরেকী" অনুমানের খণ্ডন করিতে পরে ইহাও বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তির ধূমে বহ্নির অন্বয় ব্যাপ্তি-জ্ঞান হয় নাই, কিন্তু বহ্নির অভাবে ধূমাভাবের ব্যাপ্তিজ্ঞান (ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি-জ্ঞান) হইয়াছে,—সেই ব্যক্তির কোন স্থানে ধূম দর্শনের পরে যে, বহ্নির নিশ্চয় তাহাও "অর্থাপত্তি" প্রমাণের দ্বারাই জন্মে। কিন্তু উক্তরূপ স্থলেও 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্'—এইরূপ নিশ্চয় যে, অনুমিতি—ইহাই অনুভব সিদ্ধ।

ত্রিবিধং এই পদের দ্বারা প্রাচীন নৈয়ায়িক উদ্দ্যোতকরও প্রথমে 'অন্বয়ী', 'ব্যতিরেকী'ও 'অন্বয় ব্যতিরেকী' এই ত্রিবিধ অনুমানের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু উহার লক্ষণ ও উদাহরণ বিষয়ে ক্রমে নানা মতভেদ হইয়াছে। "তত্ত্ব-চিন্তামণি"কার গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের মতে কেবলান্বয়ী সাধ্যধর্ম্মের সাধক অনুমান প্রমাণই **কেবলান্বয়ী** অনুমান। যে পদার্থের কুত্রাপি ব্যতিরেক (অভাব) নাই, অর্থাৎ যে পদার্থের সামান্যাভাব অলীক, সেই পদার্থকে বলে কেবলান্বয়ী পদার্থ। যেমন পদার্থমাত্রেই তাহার বাচক শব্দের বাচ্যত্ব ধর্ম্ম থাকে। কুত্রাপি বাচ্যত্বের ব্যতিরেক অর্থাৎ সামান্যাভাব না থাকায় উহা কেবলান্বয়ী পদার্থ। উক্তরূপ কেবলান্বয়ী পদার্থের সাধক যে অনুমান প্রমাণ, তাহাই **কেবলান্বয়ী**। কারণ উক্তরূপ সাধ্যধর্ম্মের সম্বন্ধে অন্য পদার্থে কেবল অন্বয়ব্যাপ্তিরই নিশ্চয় হইতে পারে। কেবল অন্বয়দৃষ্টান্তে যে ব্যাপ্তির নিশ্চয় হয়, তাহার নাম **অন্বয়-ব্যাপ্তি**। কিন্তু যে স্থলে অন্বয়দৃষ্টান্ত সম্ভব না হওয়ায় কোন ব্যতিরেক দৃষ্টান্তে কেবলমাত্র **ব্যতিরেক ব্যাপ্তির** নিশ্চয় জন্যই অনুমিতি জন্মে, সেই স্থলে সেই ব্যাপ্তি-জ্ঞানরূপ অনুমান প্রমাণ এবং হেতু **কেবল ব্যতিরেকী**। ইহার উদাহরণ পূর্ব্বে বলিয়াছি।

এইরূপ কোন স্থলে কোন হেতুতে দ্বিবিধ দৃষ্টান্তে দ্বিবিধ ব্যাপ্তিরই নিশ্চয় হইলে তজ্জন্য যে অনুমিতি জন্মে, তাহার করণ যে ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং সেই স্থলীয় যে হেতু, তাহার নাম **অন্বয়ব্যতিরেকী**। বাচস্পতি মিশ্রেরও ইহা সম্মত। কিন্তু উহা গৌতমের সম্মত কিনা, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। বাহুল্যভয়ে পূর্ব্বোক্ত সকল সকল বিষয়ে নানামতের আলোচনা এখানে সম্ভব নহে। মূল কথা স্মরণ করিতে হইবে—মহর্ষি গৌতম **হেতু** ও **উদাহরণ** বাক্যকে দ্বিবিধ বলিয়াছেন।

উদাহরণের পরে চতুর্থ অবয়ব উপনয়। উদাহরণের দ্বিবিধত্ববশতঃ

'উপনয়'ও দ্বিবিধ—(১) সাধর্ম্ম্যোপনয় ও (২) বৈধর্ম্ম্যোপনয়। মহর্ষি গৌতম পরে উহার লক্ষণসূত্র বলিয়াছেন—

উদাহরণাপেক্ষস্তথেত্যুপসংহারো
ন তথেতি বা সাধ্যস্যোপনয়ঃ ॥ ১।১।৩৮ ॥

অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্মীতে পূর্ব্বোক্ত উদাহরণবাক্যানুসারী "তথা" এইরূপ অথবা "ন তথা" এইরূপ যে উপসংহার, (বাক্যবিশেষ) তাহা "উপনয়"। যেমন "শব্দোঽনিত্যঃ, উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাৎ" ইত্যাদি ন্যায়-প্রয়োগ-স্থলে নৈয়ায়িক যদি "যথা ঘটঃ" এইরূপ সাধর্ম্ম্যোদাহরণ বাক্য বলেন, তাহা হইলে উহার পরে উপনয় বাক্য বলিবেন—"তথাচোৎপত্তি-ধর্ম্মকঃ শব্দঃ"। উক্ত বাক্য হইবে—"সাধর্ম্ম্যোপনয়"। উহার দ্বারা বুঝা যায়, শব্দও ঘটের ন্যায় উৎপত্তিবিশিষ্ট। এইরূপ উক্ত স্থলে নৈয়ায়িক যদি "যথা আত্মা" এইরূপ 'বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ'বাক্য বলেন,—তাহা হইলে পরে "বৈধর্ম্ম্যোপনয়" বাক্য বলিবেন,—"নচ তথানুৎপত্তি-ধর্ম্মকঃ শব্দঃ"। উক্ত বাক্যের দ্বারা বুঝা যায় যে, শব্দ, আত্মার ন্যায় অনুৎপত্তিধর্ম্ম-বিশিষ্ট নহে। কোন মতে পূর্ব্বোক্ত স্থলে "তথাচায়ং" এইরূপ বাক্যও উপনয় বাক্য হইতে পারে। উপনয় বাক্যের আকার বিষয়ে আরও অনেক মতভেদ আছে। নব্যমতে উপনয় বাক্যে "তথা" শব্দের প্রয়োগ অবশ্য কর্ত্তব্য নহে। **উপনয়ের** পরে-পঞ্চম অবয়ব **নিগমন**। গৌতম পরে ইহার লক্ষণ বলিয়াছেন—

হেত্বপদেশাৎ প্রতিজ্ঞায়াঃ পুনর্ব্বচনং নিগমনং ॥ ১।১।৩৯ ॥

ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানুসারে প্রতিজ্ঞা বাক্যের পরে যে হেতুবাক্য কথিত হয়, তাহার উল্লেখ পূর্ব্বক সেই প্রতিজ্ঞা বাক্যের যে পুনর্ব্বচন, তাহা **নিগমন**। পূর্ব্বোক্ত স্থলে ভাষ্যকার "অনিত্যঃ শব্দ"—এইরূপ প্রতিজ্ঞা বাক্যের প্রয়োগ করায় তিনি পরে "তস্মাদুৎপত্তিধর্ম্মকত্বাদ-নিত্যঃ শব্দঃ, এইরূপ নিগমন বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনি

গৌতমের উক্ত সূত্রে—"হেত্বপদেশাৎ" এই বাক্যানুসারে "নিগমন" বাক্যে "তস্মাৎ"—এই পদের পরে পূর্ব্বোক্ত "উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাৎ" এই হেতু বাক্যেরও উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্ত্তী নব্য নৈয়ায়িকগণ কেবল "তস্মাৎ" এই পদের দ্বারাই পূর্ব্বোক্ত হেতু পদার্থের উল্লেখ পূর্ব্বক নিগমন বাক্য বলিয়াছেন। হেতু বাক্য, উদাহরণ বাক্য ও উপনয় বাক্য দ্বিবিধ হইলেও শেষোক্ত নিগমনবাক্য সর্ব্বত্রই একরূপ। কারণ, সাধর্ম্ম্যহেতুই হউক, অথবা বৈধর্ম্ম্যহেতুই হউক, তাহার উল্লেখ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার প্রতিজ্ঞা বাক্য বলিলে সেই নিগমন বাক্যের প্রকার ভেদ হইতে পারে না। কিন্তু ভাসবর্ব্বজ্ঞ ("ন্যায়সার" গ্রন্থে) নিগমন বাক্যকেও দ্বিবিধ বলিয়াছেন।

পঞ্চাবয়বের প্রয়োজন

অবয়বের সংখ্যাবিষয়ে নানা মতভেদ আছে। * ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রভৃতি গৌতমোক্ত পঞ্চাবয়বের প্রয়োজন-বর্ণনে যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, সর্ব্বাগ্রে প্রতিজ্ঞা বাক্য না বলিলে ন্যায়-প্রয়োগ হইতেই পারে না। কারণ, প্রথমে বাদীর সাধ্য ধর্ম্ম কি, ইহা ব্যক্ত না করিলে হেতু বাক্যাদির প্রয়োগ সংগত হয় না। বাদী প্রথমে প্রতিজ্ঞা বাক্যের দ্বারা তাঁহার সাধ্য ধর্ম্মের প্রকাশ করিলেই সেই সাধ্য ধর্ম্মের সাধন কি? এইরূপ প্রশ্নানুসারেই হেতু বাক্যের প্রয়োগ হয়। উদাহরণ বাক্য অথবা উপনয় বাক্যের দ্বারা কোন

* মীমাংসক সম্প্রদায়ের মতে প্রতিজ্ঞাদি অবয়বত্রয়, অথবা উদাহরণাদি অবয়বত্রয়ই প্রযোজ্য। পঞ্চাবয়ব-প্রয়োগ অনাবশ্যক। বৌদ্ধ সম্প্রদায় 'উদাহরণ' ও 'উপনয়'—এই অবয়বদ্বয়বাদী, ইহাই প্রসিদ্ধ। কিন্তু পরে বৌদ্ধাচার্য্য রত্নাকরশান্তি "অন্তর্ব্যাপ্তি-সমর্থন" নামক গ্রন্থে জৈন সম্প্রদায়ের ন্যায় "অন্তর্ব্যাপ্তি" সমর্থন করিয়া উদাহরণ বাক্যেরও অনাবশ্যকতা সমর্থন করেন। অবয়বের সংখ্যা বিষয়ে নানা মতভেদের সমালোচনা মৎসম্পাদিত ন্যায় দর্শনের দ্বিতীয় সংস্করণের প্রথম খণ্ডে ২৯০-৯৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পদার্থে সাধ্য ধর্ম্মের সাধনত্বরূপ হেতুত্ব বুঝা যায় না। সুতরাং তাহা বুঝাইবার জন্য 'প্রতিজ্ঞা' বাক্যের পরেই পঞ্চমী বিভক্ত্যন্ত 'হেতু' বাক্যের প্রয়োগ কর্ত্তব্য। পরে সেই হেতু পদার্থ যে, বাদীর পূর্ব্বকথিত সেই সাধ্য ধর্ম্মের ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট, ইহা বুঝাইবার জন্য 'উদাহরণ' বাক্যের প্রয়োগ কর্ত্তব্য। কারণ, সেই ব্যাপ্তি সম্বন্ধের বোধ ব্যতীত সেই হেতুর দ্বারা সেই সাধ্য ধর্ম্মের অনুমিতি হইতে পারে না। অন্য কোন অবয়বের দ্বারা সেই ব্যাপ্তি সম্বন্ধের বোধ হইতে পারে না। অতএব উদাহরণ বাক্য অবশ্য বক্তব্য।

কিন্তু যে ধর্ম্মীতে কোন ধর্ম্মের অনুমিতি হইবে, সেই ধর্ম্মীতে সেই সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট সেই হেতু পদার্থ আছে, এইরূপ যে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান, (যাহা "লিঙ্গ-পরামর্শ" নামে কথিত হইয়াছে) তাহা অনুমিতির অব্যবহিত পূর্ব্বে আবশ্যক। নচেৎ সেই অনুমিতি জন্মিতে পারে না। সুতরাং বাদী তাঁহার প্রতিবাদী অথবা মধ্যস্থ ব্যক্তিদিগের উক্তরূপ অনুমিতির চরমকারণ উক্ত রূপ জ্ঞান (লিঙ্গ-পরামর্শ) জন্মাইবার জন্য পরে পূর্ব্বোক্ত রূপ **উপনয়** বাক্য অবশ্যই বলিবেন। সর্ব্বশেষে বাদী তাহার পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞাদি চারিটী বাক্যের পরস্পর সাকাঙ্ক্ষতা বুঝাইবার জন্য পূর্ব্বোক্তরূপ **নিগমন** বাক্যও অবশ্যই বলিবেন। কারণ, ঐ চারিটী বাক্য যে পরস্পরসম্বন্ধ-বিশিষ্ট বা সাকাঙ্ক্ষ, ইহা না বুঝিলে উহার দ্বারা বাদীর প্রতিপাদ্য অর্থ বুঝা যায় না। ভাষ্যকার "নিগমন" শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রকাশ করিতেও বলিয়াছেন—"নিগম্যন্তেঽনেন প্রতিজ্ঞা-হেতূদাহরণোপনয়া একত্রেতি নিগমনং"। অর্থাৎ যে বাক্যের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ ও উপনয় এই চারিটী বাক্য একই প্রতিপাদ্য অর্থে পরস্পর সম্বন্ধ-বিশিষ্ট, ইহা বোধিত হয়, তাহা নিগমন। ভাষ্যকার পরে "নিগমন" বাক্যের অন্য বিশেষ প্রয়োজনও বলিয়াছেন।

রামানুজ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণববৈদান্তিক শ্রীনিবাস দাস "যতীন্দ্রমত-দীপিকা" গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, আমাদিগের মতে "অবয়বে"র প্রয়োগ বিষয়ে কোন নিয়ম নাই। কোন স্থলে পঞ্চাবয়ব, কোন স্থলে অবয়ব-ত্রয় এবং কোন স্থলে অবয়ব-দ্বয়ই প্রযোজ্য। "তীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্যক্তিগণ "উদাহরণ" ও "উপনয়" এই দুইটি মাত্র অবয়ব-প্রয়োগ করিলেই বাদীর বক্তব্য বুঝিতে পারেন। সুতরাং তাঁহাদিগের নিকটে উক্ত অবয়ব-দ্বয়ই প্রযোজ্য। মধ্যমবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের নিকটে পরে নিগমন বাক্যও প্রযোজ্য। কিন্তু কোমল বুদ্ধি ব্যক্তিদিগের নিকটে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বই প্রযোজ্য। জৈন দার্শনিক সম্প্রদায়ও পরে এইরূপ কথা বলিলেও তাঁহাদিগের মতে সর্ব্বত্র "প্রতিজ্ঞা" ও "হেতু" এই অবয়বদ্বয়ই প্রযোজ্য।

কিন্তু এই মতে বক্তব্য এই যে, জিগীষা-মূলক "জল্প" ও "বিতণ্ডা" নামক 'কথা'য় বাদী কখনই পূর্ব্বে প্রতিবাদী ও মধ্যস্থগণের বুদ্ধির তারতম্য নিশ্চয় করিয়া তদনুসারে বাক্য-প্রয়োগ করিতে পারেন না। সুতরাং জিগীষা মূলক বিচারস্থলে বাদী ও প্রতিবাদীর বাক্য-সংক্ষেপ কখনই উচিত নহে। কারণ, তাহাতে তাঁহাদিগের অনেক "নিগ্রহ-স্থান" সম্ভব হওয়ায় পরাজয়ের আশঙ্কা আছে। পরন্তু "উদাহরণ" বাক্য ও "উপনয়" বাক্যে বাদী বা প্রতিবাদীর অভিমত সেই ধর্ম্মীতে তাহাদিগের সাধ্যধর্ম্মের বোধক কোন শব্দ-প্রয়োগ না হওয়ায় কেবল ঐ দুইটি বাক্যের দ্বারা তাঁহাদিগের সাধ্য ধর্ম্ম বুঝাও যায় না। তাই মীমাংসক সম্প্রদায়ও পক্ষান্তরে উদাহরণ ও উপনয় বাক্যের পরে নিগমন বাক্যকে তৃতীয় অবয়ব রূপে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের মতেও দ্বিতীয় পক্ষে হেতু বাক্যের প্রয়োগ না করিয়া সর্ব্বাগ্রে উদাহরণ বাক্য-প্রয়োগে কোন সংগতি নাই। কারণ, প্রথমে হেতুবাক্য দ্বারা হেতু পদার্থ কথিত হইলে পরে মধ্যস্থের প্রশ্নানুসারেই সেই হেতু পদার্থে

সাধ্য ধর্ম্মের ব্যাপ্তি-প্রদর্শনের জন্যই উদাহরণ বাক্য বক্তব্য। আর সর্ব্বাগ্রে প্রতিজ্ঞা না করিলে হেতু-বাক্যের প্রয়োগও সংগতই হয় না।

পরন্তু যাহারা স্থলবিশেষে পঞ্চাবয়বের প্রয়োগ কর্ত্তব্য বলিয়াছেন, তাঁহারাও "পঞ্চাবয়বাদ" স্বীকারই করিয়াছেন। "ন্যায়-সারে" ভাসর্ব্বজ্ঞ এবং প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদও পঞ্চাবয়বেরই উল্লেখ করিয়াছেন। "চরক-সংহিতার" বিমান স্থানেও (অষ্টম অঃ) গৌতমোক্ত পঞ্চাবয়বই উদাহরণের সহিত কথিত হইয়াছে। "বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরে"ও উক্ত পঞ্চাবয়বই কথিত হইয়াছে। * মহাভারতের সভাপর্ব্বেও নারদের গুণ-বর্ণনায় কথিত হইয়াছে—"পঞ্চাবয়ব-যুক্তস্য বাক্যস্য গুণদোষবিৎ।" (৫।৫)। সুতরাং উক্ত পঞ্চাবয়বাদই যে, বহু সম্মত সুপ্রাচীন মত, এ বিষয়ে সংশয় নাই।

তর্ক

প্রাচীনকাল হইতেই "তর্ক" শব্দের নানা অর্থে প্রয়োগ হইতেছে। কিন্তু গৌতমোক্ত যে, তর্ক পদার্থ, তাহা প্রমাণের সহকারী জ্ঞানবিশেষ। প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বরূপ ন্যায়-প্রয়োগের দ্বারা তত্ত্ব-নির্ণয়াদি করিতে ঐ তর্ক আবশ্যক হওয়ায় মহর্ষি গৌতম "অবয়ব" পদার্থের পরেই ঐ 'তর্ক' পদার্থের উল্লেখ করিয়া পরে উহার লক্ষণ-সূত্র বলিয়াছেন—

অবিজ্ঞাততত্ত্বে হর্থে কারণোপপত্তিত
স্তত্ত্ব-জ্ঞানার্থ মূহস্তর্কঃ ।। ১।১।৪০ ।।

ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে পদার্থের তত্ত্ব-নিশ্চয় জন্মে নাই, তাহার তত্ত্ব-নিশ্চয়ার্থ সেই তত্ত্ব-নিশ্চয়ের কারণ যে প্রমাণ, তাহার উপপত্তি-প্রযুক্ত সেই পদার্থে যে উহ, তাহা "তর্ক"। অর্থাৎ সন্দিহ্যমান

* "প্রতিজ্ঞা-হেতু-দৃষ্টান্তা বুপসংহার এবচ। তথা নিগমনঞ্চৈব পঞ্চাবয়ব মিষ্যতে"। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে। ৩।৫।৫।

ধর্ম্ম-দ্বয়ের মধ্যে এই বিষয়েই প্রমাণ সম্ভব হয়, এইরূপ যে ঊহ অর্থাৎ মানস-জ্ঞান-বিশেষ, তাহার নাম **তর্ক**। ঊহা কোন প্রমাণ নহে, এবং প্রমাণের ফল তত্ত্ব-নিশ্চয়ও নহে, কিন্তু প্রমাণের সহকারী জ্ঞানবিশেষ।

ভাষ্যকার ইহাঁর উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, কোন বিশেষ কারণে আত্মার নিত্যত্ববিষয়ে সংশয় জন্মিলে তখন আত্মার নিত্যত্ব-সাধক যে প্রমাণ, তাহা তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। কিন্তু পরে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা বশতঃ মনের দ্বারা এইরূপ তর্ক জন্মে যে, যদি জীবের দেহোৎপত্তিকালে অভিনব আত্মারই উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে আত্মার সংসার এবং মোক্ষ হইতে পারে না। কারণ, আত্মার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল-ব্যতীত তাহার বিচিত্র জন্ম বা সংসার সম্ভব হইতে পারে না এবং আত্মার উৎপত্তি স্বীকার করিলে কোন কালে তাহার বিনাশও স্বীকার্য্য হওয়ায় তাহার মুক্তি বলা যায় না। অতএব আত্মার উৎপত্তি-বিনাশ-শূন্যত্বরূপ নিত্যত্ব-বিষয়েই প্রমাণ প্রবৃত্ত হইতে পারে। উক্তরূপ তর্কের ফলে তখন আত্মার নিত্যত্ববিষয়ে সংশয় নিবৃত্ত হওয়ায় আত্মার নিত্যত্ব-সাধক সেই প্রমাণই নিজ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া আত্মার নিত্যত্ব-রূপ তত্ত্ব-নিশ্চয় জন্মায়। পূর্ব্বোক্তরূপ তর্ক ঐ প্রমাণকে অনুগ্রহ করায় তত্ত্ব-নিশ্চয়কার্য্যে উহার সহকারী হইয়া থাকে। তর্ক প্রমাণকে অনুগ্রহ করে—ইহার অর্থ এই যে, তর্ক, প্রমাণের বিষয়ে সংশয় নিবৃত্ত করিয়া প্রমাণকে সেই বিষয়ে প্রবৃত্ত করে। ভাষ্যকারের অন্য কথার দ্বারাও তাঁহার মত বুঝা যায় যে, এই বিষয়েই এইরূপে প্রমাণ প্রবৃত্ত হইতে পারে, এইরূপ সম্ভাবনাত্মক জ্ঞানই **তর্ক**।*

---

* "ভগবদ্গীতা"র "মত্তঃ স্মৃতিজ্ঞানমপোহনঞ্চ" (১৫।১৫) এই বাক্যে "অপোহন" শব্দের দ্বারা ভাষ্যকার রামানুজ গৌতমোক্ত তর্কই গ্রহণ করিয়াছেন এবং "উহন" ও "উহ" যে, উহারই নামান্তর, ইহা বলিয়া তিনি বাৎস্যায়নের মতানুসারেই উহার স্বরূপ ব্যাখ্যা

প্রাচীনকাল হইতেই উক্ত "তর্ক" পদার্থের স্বরূপবিষয়ে নানা মতভেদ হইয়াছে, ইহা উদ্দ্যোতকরের বিচারের দ্বারাও বুঝিতে পারা যায়। কোন মতে উহা সংশয়াত্মক জ্ঞান-বিশেষ এবং কোন মতে উহা নির্ণয়-বিশেষ। কোন মতে উহা পৃথক্ প্রমাণ। কিন্তু কোন মতে উহা অনুমান-প্রমাণেরই অন্তর্গত। প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ 'তর্ক' বা 'উহ' নামে কোন পৃথক্ জ্ঞানের উল্লেখ না করায় "ন্যায়কন্দলী"-কার শ্রীধর ভট্ট বিচার পূর্ব্বক পরে ঐরূপ কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু "ন্যায়বার্ত্তিকে" উদ্দ্যোতকর বিভিন্ন মতের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, 'এই পদার্থ, এইরূপই হইতে পারে'—এইরূপ সম্ভাবনাত্মক জ্ঞান বিশেষই **তর্ক**। উহা সংশয়ও নহে, নির্ণয়ও নহে। তাই মহর্ষি গৌতম ষোড়শ পদার্থের মধ্যে তর্কের পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু পরে উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ সংশয়ভিন্ন "সম্ভাবনা" নামে কোন জ্ঞান স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে 'সম্ভাবনা' নামক জ্ঞানও সংশয় বিশেষ। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত তর্করূপ জ্ঞানের পরে মনের দ্বারা উহার সংশয়ত্বরূপে বোধ হয় না। সুতরাং 'তর্ক' সংশয়াত্মক জ্ঞান নহে।

তবে উহা কিরূপ জ্ঞান? তর্কের স্বরূপ কি? "তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি" গ্রন্থে উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন—"তস্য চ স্বরূপ মনিষ্টপ্রসঙ্গ ইতি।" অর্থাৎ অনিষ্ট পদার্থের যে প্রসঙ্গ বা আপত্তি, তাহাকে বলে **তর্ক**। উক্ত মতানুসারেই "তার্কিকরক্ষা"কার বরদরাজ বলিয়াছেন—

"তর্কোঽনিষ্ট-প্রসঙ্গঃ স্যা দনিষ্টং দ্বিবিধং স্মৃতং।
প্রামাণিক-পরিত্যাগ স্তথেতর-পরিগ্রহঃ॥"

করিয়াছেন—"উহানাম ইদং প্রমাণমিত্থং প্রবর্ত্তিতুমর্হতীতি প্রমাণ-প্রবৃত্ত্যর্হতাপ্রযোজক সামগ্র্যাদিনিরূপণজন্যং প্রমাণানুগ্রাহকং জ্ঞানং।" "ন্যায়-পরিশুদ্ধি" গ্রন্থে বেঙ্কট নাথও গৌতমোক্ত "তর্ক" পদার্থের ব্যাখ্যায় রামানুজের ঐ ব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন।

অর্থাৎ অনিষ্টের আপত্তিকে "তর্ক" বলে। সেই অনিষ্ট দ্বিবিধ। প্রমাণ-সিদ্ধ পদার্থের পরিত্যাগ এবং অপ্রামাণিক পদার্থের স্বীকার। যেমন কেহ বলিলেন—জলপান পিপাসার নিবর্ত্তক নহে। উক্তস্থলে জলপানের পিপাসার নিবর্ত্তকত্ব যাহা সর্ব্বসম্মত প্রমাণ-সিদ্ধ পদার্থ, তাহার পরিত্যাগ বা অপলাপ প্রথম প্রকার অনিষ্ট, উক্ত অনিষ্টের যে আপত্তি, তাহা তর্ক। এবং কেহ বলিলেন—জল-পান অন্তর্দ্দাহ জন্মায়। উক্তস্থলে জল-পানের অন্তর্দ্দাহ-জনকত্ব অপ্রামাণিক পদার্থ হওয়ায় উহা দ্বিতীয় প্রকার অনিষ্ট। ঐরূপ অনিষ্ট পদার্থের আপত্তিও তর্ক। এইরূপ সর্ব্বত্রই পূর্ব্বোক্ত যে কোন অনিষ্ট পদার্থের আপত্তিরূপ মানস জ্ঞানই তর্ক পদার্থ।

পরবর্ত্তী নব্যনৈয়ায়িকগণ উক্ত সিদ্ধান্তানুসারে আরও সূক্ষ্মবিচার করিয়া বিশদভাবে তর্কের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তদনুসারে বৃত্তিকার বিশ্বনাথ গৌতমের উক্তসূত্রে "কারণ" শব্দের দ্বারা ব্যাপ্য-পদার্থ এবং "উপপত্তি" শব্দের দ্বারা আরোপ অর্থ গ্রহণ করিয়া গৌতমোক্ত তর্কের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যেখানে ব্যাপক পদার্থ নাই, ইহা নির্ণীত বা সর্ব্ব-সম্মত, সেখানে ব্যাপ্য পদার্থের আরোপপ্রযুক্ত সেই ব্যাপক পদার্থের আরোপ রূপ যে উহ বা আপত্তি, তাহাকে বলে, তর্ক। যেমন ধূম বহ্নির ব্যাপ্য পদার্থ, বহ্নি তাহার ব্যাপক পদার্থ। ব্যাপ্য পদার্থ যেখানে থাকে, সেখানে তাহার ব্যাপক পদার্থ অবশ্যই থাকিবে, নচেৎ তাহাকে ব্যাপক পদার্থ বলা যায় না। সুতরাং কোন স্থানে ব্যাপ্য পদার্থটি আছে বলিলে তাহার আরোপ-প্রযুক্ত তাহার ব্যাপক পদার্থটির আরোপরূপ আপত্তি হয়। কিন্তু যেখানে সেই ব্যাপক পদার্থটি বিদ্যমানই আছে, সেখানে তাহার আপত্তি, তর্ক নহে। উহাকে বলে "ইষ্টাপত্তি"। যেমন পাকশালায় যখন ধূম ও বহ্নি উভয়ই থাকে, তখন সেখানে বহ্নির আপত্তি ইষ্টাপত্তি,

উহা "তর্ক" নহে। কিন্তু যেখানে ধূমও নাই, বহ্নিও নাই, সেখানে কেহ ধূম আছে বলিলে বহ্নির আপত্তি, "তর্ক" হইবে।

পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত আপত্তিরূপ তর্ক মনের দ্বারাই জন্মে, উহা মানস প্রত্যক্ষ রূপ জ্ঞান। আমরা কত সময়ে নীরবে কত বিষয়ে মনের দ্বারাই ঐরূপ তর্ক করি, এবং প্রয়োজন হইলে বাক্যের দ্বারা তাহা প্রকাশ করি। কিন্তু সেই বাক্য তর্ক নহে, পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত মানস প্রত্যক্ষ রূপ আপত্তিই তর্ক।* উহা ভ্রম জ্ঞান হইলেও উহার সাহায্যে পরে প্রমাণের দ্বারা তত্ত্ব-নিশ্চয় জন্মে ও জন্মিতে পারে। কিরূপে তাহা জন্মে, তাহাও এখানে সংক্ষেপে বলিতেছি। কিন্তু তাহা বুঝিতে হইলে প্রথমে বুঝা আবশ্যক যে, সর্ব্বত্রই তর্ক-স্থলে যে ব্যাপ্য পদার্থটির আরোপ করিয়া তাহার ব্যাপক পদার্থের আপত্তি করা হয়, সেই ব্যাপ্য পদার্থটি হয়, আপাদক এবং তাহার ব্যাপক সেই পদার্থটি হয়, আপাদ্য। কারণ যে, পদার্থের আপত্তি করা হয়, তাহাকে বলে, **আপাদ্য** এবং যে পদার্থের আরোপ-প্রযুক্ত সেই আপত্তি হয়, তাহাকে বলে, **আপাদক**। যেমন যদি ধূম থাকে, তবে বহ্নি থাকুক? এইরূপে কোনস্থানে ধূমের আরোপ-প্রযুক্ত বহ্নির আপত্তি করিলে সেখানে বহ্নি হইবে—আপাদ্য এবং ধূম হইবে—আপাদক। আপাদক পদার্থটি হইবে—আপাদ্য পদার্থের

---

* যাহা আরোপাত্মক জ্ঞান, তাহা ভ্রমজ্ঞানই হয়। ভ্রমেরই অপর নাম আরোপ। ঐ ভ্রমজ্ঞান আহার্য্য ও অনাহার্য্য নামে দ্বিবিধ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। "আহার্য্য" শব্দের অর্থ কৃত্রিম। ভ্রমের বাধক নিশ্চয় সত্ত্বেও ইচ্ছা পূর্ব্বক যে আরোপ করা হয়, তাহাকে বলে, "আহার্য্য" ভ্রম। যেমন জলে ধূম ও বহ্নি উভয়ই নাই, ইহা নিশ্চয় থাকিলেও যদি জলে ধূম থাকে, তবে বহ্নি থাকুক? এইরূপে জলে ধূম ও বহ্নির যে স্বেচ্ছাকৃত আরোপ, তাহা আহার্য্য ভ্রম। সুতরাং উক্ত রূপ তর্ক ভ্রমাত্মক নিশ্চয়রূপ জ্ঞান এবং উহা মানস প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞান। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও লিখিয়াছেন—"উহত্বঞ্চ মানসত্ব-ব্যাপ্যো জাতিবিশেষঃ।"

ব্যাপ্য পদার্থ, সুতরাং আপাদ্য পদার্থটি হইবে—তাহার ব্যাপক পদার্থ। যেখানে ব্যাপ্য পদার্থ থাকে, সেখানে তাহার ব্যাপক পদার্থ অবশ্যই থাকে। সুতরাং সেই ব্যাপক পদার্থ না থাকিলে সেখানে তাহার ব্যাপ্য পদার্থও থাকে না।

ফলকথা, যে যে স্থানে ব্যাপক পদার্থের অভাব থাকে, সেখানে, তাহার ব্যাপ্য পদার্থেরও অভাব থাকায় ব্যাপক পদার্থের অভাবে ব্যাপ্য পদার্থের অভাবের ব্যাপ্তি আছে। পূর্ব্বোক্তস্থলে উক্তরূপ তর্ক সেই ব্যাপ্তির স্মরণ জন্মাইয়া সেখানে (জলং, ধূমাভাববদ্, বহ্ন্যভাবাৎ এইরূপে) জলে ধূমাভাবের সাধক অনুমান প্রমাণ উপস্থিত করে। সুতরাং পূর্ব্বোক্তরূপ তর্ক সেখানে জলে ধূমাভাবরূপ তত্ত্ব-নির্ণয়ে সহায় হইয়া থাকে। উক্তস্থলে আপাদক ধূম পদার্থে আপাদ্য বহ্নি পদার্থের যে ব্যাপ্তি আছে, তাহাই ঐ তর্কের মূল ব্যাপ্তি। উহা না থাকিলে উক্তরূপ আপত্তি কখনই তর্ক হইতে পারে না। তাই আপাদক পদার্থে আপাদ্য পদার্থের যে ব্যাপ্তি, তাহাই তর্কের প্রথম অঙ্গ। তর্কের আরও চারিটি অঙ্গ আছে। সেই পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন তর্কই প্রকৃত তর্ক। সুতরাং উহাই প্রমাণ দ্বারা তত্ত্ব-নিশ্চয়ে প্রমাণের সহায় হইয়া থাকে। তাই বরদরাজ বলিয়াছেন—"অঙ্গপঞ্চকসম্পন্ন স্তত্ত্ব-জ্ঞানায় কল্পতে"। পঞ্চাঙ্গের মধ্যে যে কোনও অঙ্গহীন হইলেও তাহা তর্ক হইবে না— তাহাকে বলে, **তর্কাভাস**। * সুতরাং কোন তর্ক উপস্থিত হইলে

---

* "তার্কিকরক্ষা" গ্রন্থে বরদরাজ বলিয়াছেন—"ব্যাপ্তিস্তর্কাঽপ্রতিহতি রবসানং বিপর্য্যয়ে। অনিষ্টানমুকূলত্বে ইতি তর্কাঙ্গ-পঞ্চকং"। অঙ্গান্যতম-বৈকল্যে তর্কস্যাভাসতা ভবেৎ॥" অর্থাৎ (১) আপাদক পদার্থে আপাদ্য পদার্থের ব্যাপ্তি, (২) সেই তর্কের ব্যাঘাতক অপর প্রতিকূল তর্কের দ্বারা অপ্রতিঘাত, (৩) বিপর্য্যয়ে অর্থাৎ আপাদ্য পদার্থের অভাবে পর্য্যবসান, (৪) আপাদ্য পদার্থের অনিষ্টত্ব এবং (৫) সেই আপত্তির অননুকূলত্ব অর্থাৎ প্রতিপক্ষের অসাধকত্ব, এই পাঁচটি তর্কের অঙ্গ। উহার কোন একটি অঙ্গ-শূন্য হইলেও তাহা তর্ক হইবে না, কিন্তু তাহা হইবে—"তর্কাভাস।"

উহা তর্ক বা তর্কাভাস, তাহাও বিচার করিয়া বুঝিতে হইবে। তর্কের যে সমস্ত দোষ কথিত হইয়াছে, তাহাও বুঝিতে হইবে। সুতরাং কাহারও কোনও তর্ককে কুতর্ক বলিতে হইলেও কেন তাহা কুতর্ক, তাহাতে তর্কের কোন্ অঙ্গ নাই, এবং কি দোষ আছে, তাহা বিচার করিয়া বলিতে হইবে।

তর্কের প্রকারভেদ

নানাস্থলে নানারূপে পূর্ব্বোক্ত আপত্তিরূপ তর্ক উপস্থিত হয়। মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য "আত্ম-তত্ত্ববিবেক" গ্রন্থে উক্ত তর্কপদার্থকে (১) "আত্মাশ্রয়" (২) "ইতরেতরাশ্রয়" (৩) "চক্রক" (৪) "অনবস্থা" ও (৫) "অনিষ্ট-প্রসঙ্গ" নামে পঞ্চবিধ বলিয়াছেন। তদনুসারে "তার্কিকরক্ষা" গ্রন্থে বরদরাজও বলিয়াছেন—"আত্মাশ্রয়াদি-ভেদেন তর্কঃ পঞ্চবিধঃ স্মৃতঃ।" শেষোক্ত পঞ্চম প্রকার তর্ক "বাধিতার্থ-প্রসঙ্গ" নামেও কথিত হইয়াছে। "প্রসঙ্গ" শব্দের অর্থ আপত্তি। যে পদার্থ প্রমাণ-বাধিত হওয়ায় অনিষ্ট অর্থাৎ অস্বীকৃত, এমন পদার্থের আপত্তিই "বাধিতার্থ-প্রসঙ্গ"। যদিও পূর্ব্বোক্ত আত্মাশ্রয়াদি চতুর্ব্বিধ তর্কও 'বাধিতার্থ-প্রসঙ্গ', তথাপি ঐ সমস্ত তর্কে যে বিশেষ আছে, তাহা গ্রহণ করিয়াই পৃথক্ সংজ্ঞার দ্বারা উহার পৃথক্ উল্লেখ হইয়াছে। ঐ চতুর্ব্বিধ তর্ক ভিন্ন আর যে সমস্ত বাধিতার্থ-প্রসঙ্গ বা অনিষ্টাপত্তি, তাহাই শেষোক্ত পঞ্চম প্রকার তর্ক। তাই বৃত্তিকার বিশ্বনাথ উহাকে "তদন্য বাধিতার্থ-প্রসঙ্গ" নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

---

* "সর্ব্ব দর্শন সংগ্রহে" (অক্ষপাদদর্শনে) মাধবাচার্য্য পূর্ব্বোক্ত আত্মাশ্রয়াদি চতুর্ব্বিধ তর্ক এবং "ব্যাঘাত" প্রভৃতি নামে আরও সপ্ত প্রকার তর্কের উল্লেখ করিয়া গৌতমোক্ত তর্ককেই একাদশ প্রকার বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি উহার কোন ব্যাখ্যা করেন নাই। কোন অপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে উহার ব্যাখ্যা পাইলেও তাহার মূল পাওয়া যায় না

কোন পদার্থ নিজের উৎপত্তি অথবা স্থিতি অথবা জ্ঞানে নিজেকেই অব্যবধানে অপেক্ষা করিলে তৎপ্রযুক্ত যে অনিষ্টাপত্তি হয়,—তাহার নাম (১) **আত্মাশ্রয়**। এইরূপ অপর একটি পদার্থকে অপেক্ষা করিয়া অর্থাৎ এক পদার্থ-ব্যবধানে আবার নিজেকেই অপেক্ষা করিলে তৎপ্রযুক্ত যে অনিষ্টাপত্তি হয়,—তাহার নাম (২) **ইতরেতরাশ্রয়** ও **অন্যোন্যাশ্রয়**। এইরূপ অপর দুইটি পদার্থ বা ততোঽধিক পদার্থকে অপেক্ষা করিয়া শেষে আবার নিজেকেই অপেক্ষা করিলে তৎপ্রযুক্ত যে অনিষ্টাপত্তি হয়,—তাহার নাম (৩) **চক্রকাশ্রয়** ও **চক্রক**। যেরূপ আপত্তির কুত্রাপি বিশ্রাম বা শেষ নাই, এমন যে সমস্ত ধারাবাহিক অনন্ত আপত্তি, তাহার নাম—(৪) **অনবস্থা**। কিন্তু যে স্থলে ঐরূপ আপত্তি প্রমাণ-সিদ্ধ, সেখানে উহা অনবস্থা হইবে না। কারণ, সেখানে তাহা সকল মতেই ইষ্টাপত্তি। পূর্ব্বোক্ত রূপ অনন্ত আপত্তিমূলক যে অনিষ্টাপত্তি, তাহাকেও অনেকে "অনবস্থা"ই বলিয়াছেন। যেমন পরমাণুর অবয়ব-স্বীকার করিলে তাহার অবয়ব ও তাহার অবয়ব প্রভৃতি অনন্ত অবয়বের ধারাবাহিক অনন্ত আপত্তি হয়, এবং সেই অনন্ত অবয়ব স্বীকার করিলে পর্ব্বত ও সর্ষপের তুল্য-

---

"ন্যায়-পরিশুদ্ধি" গ্রন্থে বেঙ্কটনাথ তর্কের প্রকার ভেদ-বিষয়ে "প্রজ্ঞা-পরিত্রাণ" নামক গ্রন্থের মত প্রকাশ করিতে আত্মাশ্রয়াদি চতুর্ব্বিধ তর্ক এবং "বিরোধ" ও "অসম্ভব" নামে ষট্ প্রকার তর্ক বলিয়াছেন। "মানমেয়োদয়" গ্রন্থে অনুমান-পরীক্ষায় নারায়ণ ভট্ট উক্ত আত্মাশ্রয়াদি চতুর্ব্বিধ তর্ক এবং গৌরব ও লাঘব নামে ষট্ প্রকার তর্ক বলিয়াছেন। মতান্তরে "প্রথমোপস্থিতত্ব" ও "বিনিগমনাবিরহ"ও তর্ক বলিয়া কথিত হইত,—ইহা বৃত্তিকার বিশ্বনাথের কথায় বুঝা যায়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত আত্মাশ্রয়াদি পঞ্চবিধ তর্কই যে, নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের সম্মত, ইহা সমর্থন করিতে বৃত্তিকার শেষে বলিয়াছেন যে, "প্রথমোপস্থিতত্ব" ও "লাঘব" "গৌরব" প্রভৃতি আপত্তি-স্বরূপ না হওয়ায় উহা বস্তুতঃ তর্ক পদার্থ নহে। কিন্তু ঐ সমস্তও তর্কের ন্যায় প্রমাণের সহকারী হওয়ায় প্রমাণ-সহকারিত্ব রূপ সাধর্ম্ম্য বশতঃ তর্কবৎ ব্যবহৃত হয়।

পরিমাণাপত্তিরূপ অনিষ্টাপত্তি হয়। পূর্ব্বোক্ত "আত্মাশ্রয়" প্রভৃতি ত্রিবিধ তর্কের প্রকার-ভেদে বহু উদাহরণ আছে। কিন্তু সংক্ষেপে তাহার কোন কথাই ব্যক্ত করা যায় না। বহু লিখিলেও তাহা সম্যক্ বুঝা যায় না। গুরু-মুখে শ্রবণ করিয়াই তাহা বুঝিতে হইবে।

পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ তর্ক ভিন্ন সমস্ত তর্কই পঞ্চম প্রকার তর্ক। উহাও ব্যাপ্তি-গ্রাহক ও বিষয়-পরিশোধক এবং অনুকূল তর্ক ও প্রতিকূল তর্ক প্রভৃতি নামে নানাপ্রকার কথিত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে তর্কের উদাহরণ বলিয়াছি, তাহা বিষয়-পরিশোধক অনুকূল তর্ক। আর অনুমান-স্থলে যে তর্ক, হেতু পদার্থে সাধ্যধর্ম্মের ব্যভিচার-সংশয় নিবৃত্ত করে, তাহাকে বলে, ব্যাপ্তি-গ্রাহক অনুকূল তর্ক। যেমন ধূমের দ্বারা বহ্নির অনুমান-স্থলে ধূম বহ্নির ব্যভিচারী কি না? অর্থাৎ বহ্নি শূন্যস্থানেও থাকে কি না? এইরূপ সংশয় হইলে তখন 'ধূম যদি বহ্নির ব্যভিচারী পদার্থ হয়, তাহা হইলে বহ্নি-জন্য না হউক? অর্থাৎ বহ্নি-ব্যতীতও ধূম উৎপন্ন হউক? এই প্রকার আপত্তি-রূপ তর্ক। উক্তরূপ তর্কের ফলে ("ধূমো ন বহ্নি-ব্যভিচারী, বহ্নি-জন্যত্বাৎ" এইরূপে) উক্ত স্থলে ধূমে আপাদ্য পদার্থের অভাবরূপ—(বহ্নি-জন্যত্ব)—হেতুর দ্বারা আপাদক পদার্থের অভাব (বহ্নি-ব্যাভিচারিত্বাভাব) সিদ্ধ হওয়ায় ধূমে বহ্নির ব্যভিচার-সংশয় নিবৃত্ত হয়। সুতরাং উক্তস্থলে পূর্ব্বোক্তরূপ তর্ক, ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের সহায় হওয়ায় উহা **ব্যাপ্তি গ্রাহক** তর্ক।

কিন্তু অন্যান্য প্রমাণ দ্বারা তত্ত্ব-নির্ণয়েও **বিষয়-পরিশোধক** তর্ক আবশ্যক হয়। তাই উক্ত তর্ক পদার্থের স্বরূপবিষয়ে মতভেদ থাকিলেও উহা যে, সর্ব্ব প্রমাণেরই অনুগ্রাহক, ইহা অন্য সম্প্রদায়ও বলিয়াছেন। "মানমেয়োদয়" গ্রন্থে নব্য-মীমাংসক নারায়ণ ভট্টও ইহা সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন—"তস্মাৎ সর্ব্বপ্রমাণানাং তর্কোহনুগ্রাহকঃ স্থিতঃ।" বস্তুতঃ বেদাদি শাস্ত্রের তাৎপর্য্যবিষয়ে সংশয় হইলে তাহার

নিবৃত্তির জন্যও বিচার বা মীমাংসারূপ তর্ক আবশ্যক হয়। তাই মীমাংসক সম্প্রদায় তর্ককে 'বিচার' ও 'মীমাংসা' নামেও উল্লেখ করিয়াছেন, এবং উহাকে প্রমাণের "ইতিকর্ত্তব্যতা" (সহকারী বিশেষ) বলিয়াছেন। কারণ, প্রকৃত তর্কের সাহায্য ব্যতীত বেদাদি শাস্ত্রার্থ-নির্ণয়ও সম্ভব হয় না। তাই ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন—

"আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥" ১২।১০৬॥

নির্ণয়

তর্কের পরে "নির্ণয়"। তত্ত্বের অবধারণই নির্ণয়। কিন্তু গৌতমোক্ত ষোড়শ পদার্থের অন্তর্গত যে নির্ণয় পদার্থ, তাহা অবয়ব ও তর্ক-সাধ্য নির্ণয়-বিশেষ। তাই গৌতম অবয়ব ও তর্ক পদার্থের পরেই "নির্ণয়" পদার্থের উল্লেখ করিয়া পরে উহার লক্ষণ বলিয়াছেন—

বিমৃশ্য পক্ষ-প্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণয়ঃ ॥১।১।৪১॥

অর্থাৎ সংশয়ের পরে বাদী ও প্রতিবাদীর নিজপক্ষ-স্থাপন ও প্রতিপক্ষ-খণ্ডনের দ্বারা মধ্যস্থগণের যে তত্ত্বাবধারণ, তাহা **নির্ণয়**। তাৎপর্য্য এই যে, বাদী ও প্রতিবাদীর স্ব স্ব পক্ষে তাঁহাদিগের নিশ্চয় থাকিলেও মধ্যস্থগণের তদ্‌বিষয়ে সংশয় হইলে তাঁহাদিগের সেই সংশয়-নিবৃত্তির জন্য বাদী ও প্রতিবাদী নিজপক্ষ-স্থাপন ও পরপক্ষ-খণ্ডনে প্রবৃত্ত হন। কারণ, মধ্যস্থগণের একতর পক্ষের নির্ণয় না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা সেই পক্ষের অনুমোদন করিতে পারেন না। উক্তরূপ স্থলে মধ্যস্থগণের সেই সংশয়ের পরে বাদী ও প্রতিবাদীর স্বপক্ষ-স্থাপন ও প্রতিপক্ষ-খণ্ডন দ্বারা মধ্যস্থগণের একতর পক্ষের যে অবধারণ, তাহাই পূর্ব্বোক্ত "নির্ণয়" পদার্থ। ফলকথা, জিগীষু বাদী ও প্রতিবাদীর "জল্প" বা বিতণ্ডা'র দ্বারা মধ্যস্থগণের যে নির্ণয় জন্মে, তাহাকেই গৌতম "নির্ণয়,'

বলিয়াছেন। তাই উক্ত নির্ণয় লক্ষণ-সূত্রে প্রথমে 'বিমৃশ্য" এই পদের প্রয়োগ করিয়াছেন। "বিমৃশ্য"—এই পদের অর্থ বিমর্শ করিয়া অর্থাৎ মধ্যস্থগণ কর্ত্তৃক সংশয়ের অনন্তর।

কিন্তু জিগীষা-শূন্য গুরু-শিষ্য প্রভৃতি বাদী ও প্রতিবাদী হইয়া কোন বিষয়ের তত্ত্ব-নির্ণয়োদ্দেশ্যে যে "বাদ" কথায় প্রবৃত্ত হন, তাহাতে মধ্যস্থ আবশ্যক না হওয়ায় সেই "বাদ" কথার দ্বারা যে তত্ত্ব-নির্ণয় হয়, তাহা মধ্যস্থ-কর্ত্তৃক সংশয়-পূর্ব্বক নহে। সুতরাং উক্ত সূত্রের প্রথমোক্ত "বিমৃশ্য"—এই পদ পরিত্যাগ করিয়া শেষোক্ত অংশের দ্বারাই "বাদ" কথা-স্থলীয় নির্ণয়ের লক্ষণও বুঝিতে হইবে এবং কেবল "অর্থাবধারণং নির্ণয়ঃ"—এই অংশের দ্বারা নির্ণয়-মাত্রেরই সামান্য লক্ষণ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ যে কোন প্রমাণ দ্বারা যে অর্থাবধারণ বা তত্ত্ব-নিশ্চয়, তাহাই সামান্যতঃ যথার্থ নির্ণয় পদার্থ। আর 'প্রমাণাভাসে'র দ্বারা যেখানে কোন পদার্থের নিশ্চয় জন্মে, তাহা ভ্রমাত্মক নির্ণয় পদার্থ।

বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা

মহর্ষি গৌতম প্রথম সূত্রে যে "বাদ", "জল্প" ও "বিতণ্ডা" নামক পদার্থ-ত্রয় বলিয়াছেন, উহার নাম **কথা**। ভাষ্যকার উহার ব্যাখ্যা করিতে প্রথমেই বলিয়াছেন—"তিস্রঃ কথা ভবন্তি, বাদো জল্পো বিতণ্ডা-চেতি।" গৌতম নিজেও পরে (৫।২।১৯।২৩) উক্ত পারিভাষিক "কথা" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। বাল্মীকিরামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডেও (২।৪২) ঐ পারিভাষিক "কথা" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। এখন ঐ "কথা"র সামান্য লক্ষণ কি, তাহা বুঝা আবশ্যক। "তার্কিকরক্ষা" গ্রন্থে বরদরাজ বলিয়াছেন—"বিচার-বিষয়ো নানাবক্তৃকো বাক্য-বিস্তরঃ।" অর্থাৎ বিচার্য্য বিষয়ে নানাবক্তৃক যে বাক্য সমূহ, তাহা "কথা"। একজন বক্তা অথবা গ্রন্থকর্ত্তার পূর্ব্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ, এবং দূষণ ও সমাধানের

প্রতিপাদক বাক্য-সমূহ "কথা" নহে। কিন্তু বিচার্য্য বিষয়ে বাদী ও প্রতিবাদীর যথোক্ত নিয়মানুসারে উক্তি-প্রত্যুক্তিরূপ যে বচন-সমূহ, তাহাই "কথা"। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ইহা বিশদ করিয়া বলিয়াছেন যে, তত্ত্ব-নির্ণয় অথবা জয়-লাভ, ইহার একতরের সম্পাদন-যোগ্য যে ন্যায়ানুগত বাক্য-সন্দর্ভ, তাহা "কথা"। লৌকিক বিবাদ-স্থলে বাদী ও প্রতিবাদীর যে সমস্ত উক্তি-প্রত্যুক্তি, তাহা ন্যায়ানুগত না হওয়ায় অর্থাৎ সেই স্থলে যথাশাস্ত্র ন্যায়-প্রয়োগাদি না হওয়ায় তাহা "কথা" নহে।

বস্তুতঃ বাদী ও প্রতিবাদীর স্বপক্ষ-সংস্থাপন ও পরপক্ষ-খণ্ডনার্থ উক্তি-প্রত্যুক্তিরূপ বিচার, তত্ত্ব-নির্ণয় অথবা জয়-লাভ, এই দুই উদ্দেশ্যে হইতে পারে ও হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কেবল তত্ত্ব-নির্ণয়োদ্দেশ্যে গুরু-শিষ্য প্রভৃতির যে বিচার হয়, তাহার নাম "বাদ"। উহাতে কাহারও জিগীষা থাকে না। কারণ, তত্ত্ব-নির্ণয়ই উহার একমাত্র উদ্দেশ্য। সুতরাং যে পর্য্যন্ত তত্ত্ব-নির্ণয় না হয়, সেই পর্য্যন্তই ঐ "বাদ" কর্ত্তব্য। কিন্তু যেখানে বাদী ও প্রতিবাদী জিগীষু হইয়া বিচার করেন, সেখানে তাঁহাদিগের যে ন্যায়ানুগত উক্তি-প্রত্যুক্তি-রূপ বাক্য সমূহ, তাহাই "জল্প" ও "বিতণ্ডা" নামে দ্বিবিধ কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে যেখানে প্রতিবাদীও বাদীর ন্যায় নিজপক্ষ-স্থাপন করেন, সেখানে তাঁহাদিগের সেই কথার নাম **জল্প** এবং যেখানে প্রতিবাদী নিজপক্ষ-স্থাপন না করিয়া কেবল পরপক্ষ-খণ্ডনই করেন, সেখানে সেই "কথা"র নাম **বিতণ্ডা**। সেই "বিতণ্ডা"কারী প্রতিবাদীর নাম **বৈতণ্ডিক**। মহর্ষি গৌতম ন্যায়দর্শনের প্রথম অধ্যায়ে দ্বিতীয় আহ্নিকের প্রারম্ভে যথাক্রমে পূর্ব্বোক্ত "বাদ", "জল্প" ও "বিতণ্ডা"র লক্ষণ সূত্র বলিয়াছেন—

প্রমাণতর্ক সাধনোপালম্ভঃ সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ
পঞ্চাবয়বোপপন্নঃ পক্ষপ্রতিপক্ষ-পরিগ্রহোবাদঃ ॥

যথোক্তোপপন্নছল-জাতি-নিগ্রহস্থান-
সাধনোপালম্ভো জল্পঃ ॥
স প্রতিপক্ষস্থাপনা-হীনো বিতণ্ডা ॥

প্রথম সূত্রের দ্বারা গৌতম "বাদে"র লক্ষণ বলিয়াছেন যে, যাহাতে প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা সাধন (স্বপক্ষ-স্থাপন) এবং উপালম্ভ (পর-পক্ষ-খণ্ডন) হয় এবং যাহা সিদ্ধান্তের অবিরুদ্ধ, অর্থাৎ যাহাতে কোন অপসিদ্ধান্ত বলা হয় না এবং যাহা পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বযুক্ত, এমন যে "পক্ষপ্রতিপক্ষ-পরিগ্রহ", অর্থাৎ যাহাতে বাদী ও প্রতিবাদী নিয়মতঃ দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম্মরূপ পক্ষ ও প্রতিপক্ষকে গ্রহণ করিয়া সংস্থাপন করেন—এমন যে, বাদী ও প্রতিবাদীর বাক্য-সমূহ, তাহা "বাদ"।

যেমন তত্ত্ব-নির্ণয়ার্থী শিষ্য প্রথমে গুরুর নিকটে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বরূপ "ন্যায়"-বাক্য প্রয়োগ করিয়া আত্মার অনিত্যত্বরূপ পক্ষের স্থাপন করিলে পরে গুরু যথানিয়মে ন্যায়-প্রয়োগ করিয়া আত্মার নিত্যত্ব-রূপ প্রতিপক্ষের সংস্থাপন ও অনিত্যত্ব পক্ষের খণ্ডন করিয়া শিষ্যের তত্ত্ব-নির্ণয় সম্পাদন করিলেন। উক্ত স্থলে তাঁহাদিগের উভয়ের সেই সমস্ত উক্তি-প্রত্যুক্তিরূপ বাক্য-সমূহ "বাদ"। অবশ্য আত্মার অনিত্যত্ব-পক্ষে শিষ্যের কথিত সেই প্রমাণ ও তর্ক, প্রকৃত প্রমাণ ও প্রকৃত তর্ক নহে। উহাকে বলে—**প্রমাণাভাস** ও **তর্কাভাস**। কিন্তু শিষ্য তাঁহাকে প্রকৃত প্রমাণ ও প্রকৃত তর্ক বলিয়া বুঝিয়াই উহা প্রদর্শন করায় ঐ তাৎপর্য্যে গৌতম তাঁহার পক্ষেও সেই সমস্ত বাক্যকে "প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালম্ভ" বলিয়াছেন।

পরন্তু "জল্প" ও "বিতণ্ডায়" প্রতিবাদীর জয়-লাভ উদ্দেশ্য থাকায় তিনি কোন স্থলে 'প্রমাণাভাস' ও তর্কাভাস' বলিয়া বুঝিয়াও তাহাকে প্রমাণ ও তর্ক বলিয়া তদ্দ্বারা স্বপক্ষ-স্থাপন ও পরপক্ষ-খণ্ডন করিতে পারেন। কিন্তু "বাদ" কথায় প্রতিবাদী তাহা করিতে পারেন না। কারণ,

প্রতারক ব্যক্তি "বাদ" কথায় অধিকারীই নহে। সুতরাং "প্রমাণাভাস" ও "তর্কাভাস" বলিয়া বুঝিলে তদ্দ্বারা যাহাতে স্বপক্ষ-স্থাপনাদি করা যায় না, তাহা "বাদ"—ইহাই উক্ত সূত্রে গোতমের প্রথমোক্ত ঐ পদের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে—উক্ত সূত্রে পরে **পঞ্চাবয়বোপপন্নঃ** এই পদের প্রয়োগ হইলেও প্রথমে **প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালম্ভঃ** এই পদের দ্বারা ইহাও সূচিত হইয়াছে যে,—কোন স্থলে পঞ্চাবয়বের প্রয়োগব্যতীতও "বাদ" কথা হইতে পারে। কিন্তু সেখানেও প্রমাণ ও তর্কদ্বারা স্বপক্ষ-স্থাপন ও পরপক্ষ-খণ্ডন করিতে হইবে। নচেৎ তাহা "বাদ" হয় না।

কিন্তু "জল্প" ও "বিতণ্ডা"-স্থলে সর্ব্বত্রই মধ্যস্থের প্রশ্নানুসারে বাদীর যথানিয়মে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের প্রয়োগ কর্ত্তব্য এবং তাহাতে জয়-পরাজয়ের ব্যবস্থা থাকায় "প্রতিজ্ঞা-হানি" প্রভৃতি সমস্ত নিগ্রহ-স্থানেরই উদ্ভাবন কর্ত্তব্য। কিন্তু "বাদ" কথাতেও "অপসিদ্ধান্ত"ও "হেত্বাভাস"রূপ নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন অবশ্য কর্ত্তব্য। অর্থাৎ গুরুও যদি কদাচিৎ ভ্রমবশতঃ কোন অপসিদ্ধান্ত বলেন, অথবা দুষ্ট হেতুর দ্বারা নিজপক্ষ স্থাপন করেন, তাহা হইলে শিষ্যও তাহার উল্লেখপূর্ব্বক প্রতিবাদ করিবেন। নচেৎ সেখানে তত্ত্ব-নির্ণয়রূপ উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত "বাদ"-লক্ষণ-সূত্রে গোতম **সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ**—এই পদের দ্বারা "বাদ" কথায় যে, "অপসিদ্ধান্ত" ও "হেত্বাভাস" নামক নিগ্রহস্থানের উল্লেখ কর্ত্তব্য—ইহাও সূচনা করিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রভৃতি অনেক প্রাচীন আচার্য্যের মতে "বাদ" কথায় পঞ্চাবয়ব-প্রয়োগ-স্থলে "ন্যূন" ও "অধিক" নামক নিগ্রহস্থানেরও উদ্ভাবন কর্ত্তব্য। পরে "নিগ্রহস্থানে"র পরিচয় বুঝিলে ইহা বুঝা যাইবে।

গোতম পরে দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত "জল্পে"র লক্ষণ বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত "বাদ"-লক্ষণ-সূত্রে বাদের যে সমস্ত ধর্ম্ম কথিত

হইয়াছে, সেই সমস্ত ধর্ম্মবিশিষ্ট হইয়া যাহাতে "ছল", "জাতি" ও সর্ব্ব প্রকার "নিগ্রহস্থানে"র দ্বারা সাধন ও উপালম্ভ (স্বপক্ষ-স্থাপন ও পরপক্ষ-খণ্ডন) হয় অর্থাৎ হইতে পারে, এমন বাক্য-সমূহই "জল্প"। উক্ত সূত্রে গৌতমের শেষোক্ত ঐ অতিরিক্ত বিশেষণ পদের দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে যে—"বাদ" কথায় বাদী ও প্রতিবাদীর জিগীষা থাকে না। কিন্তু "জল্প" কথায় তাঁহাদিগের জিগীষা থাকে। কারণ, জয়-লাভের উদ্দেশ্যেই জিগীষু প্রতিবাদী "ছল" প্রভৃতির প্রয়োগ করেন। "জল্প" ও "বিতণ্ডা" নামক কথায় জয়লাভার্থ অসদুত্তর বিশেষই "ছল" ও "জাতি" নামে কথিত হইয়াছে। সে কিরূপ, তাহা পরে বুঝা যাইবে। ফলকথা, কেবল তত্ত্ব-নির্ণয়ার্থ যে বিচার, যাহাতে কাহারও জিগীষা নাই, তাহা "বাদ" এবং বিজিগীষু বাদী ও প্রতিবাদীর স্ব স্ব পক্ষ-স্থাপন পূর্ব্বক যে বিচার, তাহা "জল্প"—ইহাই গৌতমের উক্ত দুই সূত্রের তাৎপর্য্যার্থ। তদনুসারেই পূর্ব্বাচার্য্যগণ বলিয়াছেন—"তত্ত্ব-বুভুৎসু-কথা বাদঃ। উভয়পক্ষ-স্থাপনাবতী বিজিগীষু-কথা জল্পঃ"।

গৌতম পরে বিতণ্ডার লক্ষণ সূত্র বলিয়াছেন—**স প্রতিপক্ষ-স্থাপনা-হীনো বিতণ্ডা॥** 'স জল্পঃ প্রতিপক্ষ-স্থাপনা-হীনঃ সন্ বিতণ্ডা ভবতি।' অর্থাৎ পূর্ব্ব সূত্রোক্ত 'জল্প'ই প্রতিপক্ষ-স্থাপনা-হীন হইলে 'বিতণ্ডা' হয়। তাৎপর্য্য এই যে—বাদী প্রথমে নিজপক্ষ-স্থাপন করিলে বিতণ্ডাকারী প্রতিবাদী কেবল তাহার খণ্ডনই করেন। কিন্তু বাদীর যাহা প্রতিপক্ষ অর্থাৎ বৈতণ্ডিকের নিজপক্ষ, তাহা তিনি স্থাপন করেন না। কোন মতে বৈতণ্ডিকের নিজের কোন পক্ষ বা সিদ্ধান্তই নাই। কিন্তু ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বিচার দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, বৈতণ্ডিকেরও নিজপক্ষ আছে। নচেৎ তাহার "বিতণ্ডা"ই সম্ভব হয় না।

বস্তুতঃ মহর্ষি গৌতমও উক্ত সূত্রে "প্রতিপক্ষ" শব্দের পরে "স্থাপনা" শব্দের প্রয়োগ করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন যে—বৈতণ্ডিকেরও

নিজপক্ষ আছে। কিন্তু বাদীর পক্ষ খণ্ডন করিতে পারিলে তাহার সেই নিজ পক্ষ আপনিই সিদ্ধ হইবে, এই আশায় বৈতণ্ডিক প্রতিবাদী নিজপক্ষ-স্থাপনা না করিয়া কেবল বাদীর পক্ষের খণ্ডনই করেন। উদ্দ্যোতকরও বলিয়াছেন—"অভ্যুপেত্য পক্ষং যো ন স্থাপয়তি, স বৈতণ্ডিক উচ্যতে।" মূলকথা, পূর্ব্বোক্ত 'জল্প' কথায় বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই যথানিয়মে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ব প্রয়োগ-করেন। কিন্তু 'বিতণ্ডা'য় প্রতিবাদী নিজপক্ষ-স্থাপন করেন না—ইহাই "জল্প" হইতে বিতণ্ডার বিশেষ। "চরক সংহিতা"র বিমান স্থানেও (অষ্টম অঃ) কথিত হইয়াছে—"জল্প-বিপর্য্যয়ো বিতণ্ডা,—বিতণ্ডা নাম পরপক্ষ-দোষ-বচনমাত্রমেব।"

পূর্ব্বোক্ত "বিতণ্ডা" পদার্থের স্বরূপ না জানিয়া অনেকেই "বিতণ্ডা" বলিতে বাক্-কলহ অথবা সত্যের অপলাপ করিয়া কুতর্ক করা প্রভৃতি বুঝেন এবং অনেকেই ঐরূপ কোন অর্থে "বাগ্‌বিতণ্ডা" ও "বাদবিতণ্ডা" প্রভৃতি শব্দ-প্রয়োগও করেন। বঙ্গভাষায় এখন প্রায়ই "বিতণ্ডা" শব্দের প্রকৃতার্থে প্রয়োগ হয় না। বস্তুতঃ "বিতণ্ড্যতে ব্যাহন্যতে পর-পক্ষোঽনয়া"—এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে যে "কথা"র দ্বারা প্রতিবাদী কেবল পরপক্ষ-খণ্ডনই করেন, তাহাই "বিতণ্ডা" শব্দের যৌগিক অর্থ।

পরন্তু বিচারস্থলে যাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া কলহ করেন, অথবা সর্ব্বজন-সিদ্ধ অনুভবের অপলাপ করিয়া অনুচিত কুতর্ক করেন, তাঁহারা "বিতণ্ডা" কথারও অধিকারী নহেন। তর্কশাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা ও প্রচারক পূর্ব্বাচার্য্যগণ বিচার-স্থলে জয়-লাভের জন্যও কাহাকেও ঐরূপ অনুচিত কর্ত্তব্যের উপদেশ করেন নাই। পরন্তু তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ কথার অধিকারীর নিরূপণ করিতে স্পষ্টভাষায় বলিয়া গিয়াছেন যে, যাঁহারা তত্ত্ব-নির্ণয় অথবা জয়-লাভের অভিলাষী এবং সর্ব্বজন-সিদ্ধ অনুভবের অপলাপ করেন না এবং যাঁহারা বাক্য-শ্রবণাদি-পটু অর্থাৎ বধির ও

প্রমত্ত নহেন এবং কথার সম্পাদক সমস্ত ব্যাপারে সমর্থ এবং যাঁহারা কলহ করেন না, তাঁহারাই **কথার অধিকারী**। আর তন্মধ্যে যাঁহারা কেবল তত্ত্ব-নির্ণয়েচ্ছু এবং নিজের পরিজ্ঞাত সত্যের গোপন করেন না এবং প্রকৃত বিষয়েই সমস্ত বাক্য প্রয়োগ করেন এবং যথা-কালেই যাঁহাদিগের উত্তরের স্ফূর্ত্তি হয় এবং যাঁহারা যুক্তিসিদ্ধ-তত্ত্ব-বোদ্ধা, তাঁহারাই **বাদ কথার অধিকারী**।

পরন্তু (১) বাদি-নিয়ম (২) প্রতিবাদি-নিয়ম (৩) সভাপতি-নিয়ম ও (৪) মধ্যস্থ ও সদস্য-নিয়ম, এই চারিটি পূর্ব্বোক্ত "জল্প" ও "বিতণ্ডার" অঙ্গ বলিয়া পূর্ব্বাচার্য্যগণ ঐকমত্যে বলিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে বাদি-নিয়ম ও প্রতিবাদি-নিয়ম অর্থাৎ কে বাদী হইবেন এবং কে প্রতিবাদী হইবেন, ইহা নির্দ্ধারণ করিতেও প্রথমে তাঁহাদিগের অধিকার-নির্ণয় আবশ্যক। সভাপতি, তাঁহা নির্ণয় করিয়া বাদী ও প্রতিবাদীর নিয়োগ করিবেন। সেই সভায় কোন রাজা বা তত্তুল্য প্রভাবশালী কোন ব্যক্তি সভাপতি হইবেন। অথবা তিনি অন্য উপযুক্ত সভাপতি নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং উপস্থিত থাকিবেন। সভাপতিই তখন উপযুক্ত মধ্যস্থ-নিয়োগ করিয়া বাদী ও প্রতিবাদীর বিচারের প্রবর্ত্তন করিবেন। তখন সেই বাদী ও প্রতিবাদী, মধ্যস্থ পণ্ডিতগণের নিকটে যথানিয়মে ক্রমশঃ তাঁহাদিগের সমস্ত বক্তব্য বলিবেন। এখন এখানে "জল্প" কথার ক্রম-পদ্ধতিও সংক্ষেপে বলিতেছি।

প্রথমে বাদী মধ্যস্থের প্রশ্নানুসারে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ব, রূপ ন্যায়-প্রয়োগ দ্বারা নিজপক্ষ-স্থাপন করিয়া পরে তাঁহার কথিত হেতু যে, নির্দ্দোষ, ইহা প্রতিপন্ন করিবেন। অর্থাৎ তাঁহার হেতুতে সম্ভাব্যমান সমস্ত দোষের নিরাকরণের জন্য প্রথমে সামান্যতঃ উহা হেত্বাভাস নহে, কারণ, উহাতে হেত্বাভাসের সামান্য লক্ষণ নাই এবং পরে বিশেষতঃ উহা বিরুদ্ধ নহে, ব্যভিচারী নহে—ইত্যাদি প্রকারে উহা যে, কোন প্রকার

হেত্বাভাসই হইতে পারে না, সুতরাং উহা তাঁহার সাধ্যধর্ম্মের সাধক প্রকৃত হেতু, ইহা বুঝাইবেন। উক্তরূপে বাদীর সমস্ত বক্তব্য সমাপ্ত হইলে তখন প্রতিবাদী মধ্যস্থগণের নিকটে বাদীর পূর্ব্বোক্ত প্রধান কথার অনুবাদ করিবেন। কারণ, তিনি যে, বাদীর কথা বুঝিয়াছেন, ইহা প্রথমে মধ্যস্থ-গণের বুঝা আবশ্যক। নচেৎ তাঁহার প্রতিবাদ ব্যর্থ হইবে এবং বাদীর কথা না বুঝিয়া প্রতিবাদ করিলে পরে তাঁহার অনেক "নিগ্রহস্থান"ও উপস্থিত হইবে। প্রতিবাদী পরে বাদীর পূর্ব্বপক্ষ-স্থাপনার খণ্ডন করিতে প্রথমে বাদীর পক্ষে "হেত্বাভাস" ভিন্ন নিগ্রহস্থান বিশেষের উদ্ভাবন করিবেন। তাহা সম্ভব না হইলে পরে যথাসম্ভব "হেত্বাভাস"রূপ নিগ্রস্থানের উদ্‌ভাবন দ্বারা বাদীর কথিত হেতুর দুষ্টত্ব প্রতিপাদন করিয়া শেষে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বরূপ ন্যায়-প্রয়োগ দ্বারা নিজ পক্ষ-স্থাপন করিবেন।

উক্তরূপে প্রতিবাদীর সমস্ত বক্তব্য সমাপ্ত হইলেই তখন আবার বাদী তৃতীয়পক্ষস্থ হইয়া প্রতিবাদীর কথিত প্রতিবাদের অনুবাদ করিয়া, তিনি যে, প্রতিবাদীর সমস্ত কথাই ঠিক বুঝিয়াছেন, ইহা মধ্যস্থগণকে বুঝাইবেন। পরে তাহার নিজ পক্ষের সাধক হেতুতে প্রতিবাদীর প্রদর্শিত সমস্ত দোষের উদ্ধার করিয়া প্রতিবাদীর নিজপক্ষ-স্থাপনার খণ্ডনের জন্য উহাতে প্রথমে "হেত্বাভাস" ভিন্ন "নিগ্রহস্থান" বিশেষের উদ্ভাবন করিবেন। তাহা সম্ভব না হইলে তখন যথাসম্ভব হেত্বাভাসের উদ্‌ভাবন (উল্লেখ) করিবেন। পরে প্রতিবাদী তখন চতুর্থপক্ষস্থ হইয়া পূর্ব্ববৎ ঐ সমস্ত করিবেন। উক্তরূপ প্রণালীতে সেই জিগীষু বাদী ও প্রতিবাদীর বিচার চলিবে। পরিশেষে যিনি নিজমতে দোষের উদ্ধার ও পরমতে দোষ প্রদর্শন করিতে অসমর্থ হইবেন, তিনিই পরাজিত হইবেন। মধ্যস্থগণ সেই জয়-পরাজয়-নির্ণয় করিবেন এবং তাঁহাদিগের নির্ণয় অবগত হইয়া নিগ্রহানুগ্রহ-সমর্থ সভাপতি সেই

জয়-পরাজয়ের ঘোষণা করিবেন। উক্তরূপ বিচার-কালে বাদী বা প্রতিবাদী তথাকথিত কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিলে তিনি যথার্থরূপে নিজপক্ষ-স্থাপন করিলেও সেই নিয়ম-লঙ্ঘন জন্য তৎকালে নিগ্রহস্থান প্রাপ্ত হইয়া নিগৃহীত বা পরাজিত বলিয়া কথিত হইবেন।

ফলকথা, গৌতমোক্ত "জল্প" ও "বিতণ্ডা"য় যেরূপ নিয়ম-বন্ধন অবশ্য স্বীকার্য্য, তদনুসারেই 'জল্প' ও 'বিতণ্ডা' কর্ত্তব্য। সুতরাং উহাতে বাদী বা প্রতিবাদীর ক্রোধ বা কলহের কোন অবকাশই নাই। কিন্তু এখন নিগ্রহানুগ্রহ-সমর্থ সর্ব্বমান্য কোন সভাপতি এবং সর্ব্বমান্য পক্ষপাত-শূন্য প্রকৃত বোদ্ধা মধ্যস্থও অতি দুর্লভ। আর কাল-প্রভাবে এখন অনেকেই কোন নিয়মের অধীন হইতে চাহে না। তাই বাদী ও প্রতিবাদীর যথানিয়মে বিচার-পদ্ধতি এখন বিলুপ্তপ্রায়। এ বিষয়ে অধিক বলা অনাবশ্যক।

কিন্তু এখানে ইহা বলা আবশ্যক যে, পূর্ব্বোক্ত "বাদ" কথায় সভা বা মধ্যস্থ প্রভৃতির অপেক্ষা নাই। পর্ণকুটীরে বা বৃক্ষমূলে বসিয়াও গুরু-শিষ্য প্রভৃতি তত্ত্বনির্ণয়ার্থ "বাদ" করিয়াছেন। মুমুক্ষু ব্যক্তিও তত্ত্ব-নির্ণয় ও তাহার দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য প্রথমে "আন্বীক্ষিকী" বিদ্যার অধ্যয়ন, ধারণা ও সতত চিন্তনাদিরূপ অভ্যাস এবং সেই বিদ্যাভিজ্ঞ অসূয়া-শূন্য শিষ্য, গুরু, সতীর্থ্য ও শাস্ত্র-তত্ত্বজ্ঞ অন্যান্য শ্রেয়োর্থীদিগের সমীপস্থ হইয়া পূর্ব্বোক্ত "বাদ" বিচার করিবেন। ইহারই প্রাচীন নাম **তদ্বিদ্য-সংবাদ** ও **তদ্বিদ্য-সম্ভাষা**। মহর্ষি গৌতমও পরে দুই সূত্রের দ্বারা ইহা বলিয়াছেন। * পূর্ব্বোক্তরূপ "বাদ" বিচারে কাহারও কিছুমাত্র জিগীষা না থাকায় উহা "বীতরাগ-কথা" নামেও কথিত হইয়াছে। কিন্তু উহাতেও যথা নিয়মে পর-পক্ষ-খণ্ডনও কর্ত্তব্য।

---

* "জ্ঞানগ্রহণাভ্যাসস্তদ্বিদ্যৈঃ সহ সংবাদঃ"। "তং শিষ্য-গুরু-সব্রহ্মচারি বিশিষ্ট শ্রেয়োর্থিভিরনসূয়িভিরভ্যুপেয়াৎ"। "ন্যায়দর্শন" ৪।২।৪৭।৪৮।

নচেৎ সেই "বাদ" কথার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। শারীরক-ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্করও ইহা সমর্থন করিয়াছেন। * পূর্ব্বোক্ত "বাদ", "জল্প" ও "বিতণ্ডা"র মধ্যে বাদই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কারণ, উহা তত্ত্বনির্ণয়ের পরম পবিত্র সহায়। তাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"বাদঃ প্রবদতামহং" (গীতা—১০।৩২)। অর্থাৎ বাদ, জল্প ও বিতণ্ডার মধ্যে আমি বাদ।

কিন্তু স্থলবিশেষে মুমুক্ষুরও "জল্প" ও "বিতণ্ডা" কর্ত্তব্য হওয়ায় উহার তত্ত্ব-জ্ঞানও তাঁহার আবশ্যক। তাই মহর্ষি গৌতম তাঁহার কথিত ষোড়শ পদার্থের মধ্যে "বাদে"র পরে "জল্প" এবং "বিতণ্ডা" নামক পদার্থেরও উল্লেখ করিয়াছেন। কি কারণে মুমুক্ষু ব্যক্তিরও জিগীষু হইয়া জল্প ও বিতণ্ডা কর্ত্তব্য ? গৌতম পরে বলিয়াছেন—

তত্ত্বাধ্যবসায়-সংরক্ষণার্থং জল্পবিতণ্ডে বীজ-প্ররোহ-
সংরক্ষণার্থং কণ্টক-শাখাবরণবৎ ॥ ৪।২।৫০ ॥‡

তাৎপর্য্য এই যে, কেহ কোন ক্ষেত্রে কোন বীজ রোপণ করিলে যখন উহা হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, তখন গো মহিষাদি পশুগণ উহা বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইলে সেই ব্যক্তি সেই অঙ্কুরের রক্ষার জন্য যেমন কণ্টক-শাখার দ্বারা উহার আবরণ করে, তদ্রূপ, মুমুক্ষু ব্যক্তিও তাঁহার

---

* নন্বু মুমুক্ষূণাং মোক্ষ-সাধনত্বেন সম্যগ্ দর্শন-নিরূপণায় স্বপক্ষ-স্থাপনমেব কেবলং কর্ত্তুং যুক্তং, কিং পরপক্ষ-নিরাকরণেন পরদ্বেষ-করেণ, বাঢ়মেবং, তথাপি মহাজন-পরিগৃহীতানি মহান্তি সাংখ্যাদি তন্ত্রাণি" ইত্যাদি শারীরক-ভাষ্য (২।২।১)। "তত্ত্ব-নির্ণয়াবসানা বীতরাগ-কথা, নচ পরপক্ষ-দূষণ মন্তরেণ তত্ত্ব-নির্ণয়ঃ শক্যঃ কর্ত্তুমিতি তত্ত্ব-নির্ণয়ায় বীতরাগেণাপি পরপক্ষো দূষ্যতে, নতু পরপক্ষতয়েতি ন বীতরাগ-কথাত্ব-ব্যাহতি রিত্যর্থঃ" ।—"ভামতী"।

‡ মনে হয়, গৌতমের উক্ত সূত্রানুসারেই কোন সময়ে কোন বৈদান্তিক "ইদন্ত কণ্টকাবরণং" "তত্ত্বন্ত বাদরায়ণাৎ" এইরূপ বাক্য রচনা করিয়াছিলেন। উক্ত সূত্রের দ্বারা গৌতম কিন্তু ন্যায় শাস্ত্রকে কণ্টকাবরণ বলেন নাই। তিনি "তত্ত্বন্ত বাদরায়ণাৎ" এইরূপ কোন সূত্রও বলেন নাই।

প্রথমোৎপন্ন তত্ত্ব-নিশ্চয় রক্ষার জন্য আবশ্যক হইলে 'জল্প' ও 'বিতণ্ডা' করিবেন। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন গৌতমের তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, শাস্ত্র হইতে প্রথমে তত্ত্ব-শ্রবণ করিলেও যাঁহাদিগের সেই তত্ত্ব-নিশ্চয় দৃঢ় বা পরিপক্ক হয় নাই এবং সেই তত্ত্ব-নিশ্চয়ের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য যাঁহারা গুরূপদেশানুসারে মননে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকটে নাস্তিকগণ বিপরীত পক্ষ সমর্থন করিলে তাঁহাদিগের সেই তত্ত্ব-নিশ্চয়ের হানি হইয়া থাকে। সুতরাং তখন তাঁহারা নিজের সেই তত্ত্ব-নিশ্চয়-রক্ষার জন্যই অগত্যা "জল্প" বা "বিতণ্ডা"কে আশ্রয় করিয়া সেই সমস্ত নাস্তিককে নিরস্ত করিবেন। কিন্তু ধন-লাভ বা লোক-সমাজে পূজা ও খ্যাতি-লাভের জন্য কখনই তাঁহারা উহা করিবেন না। তাই ভাষ্যকার স্পষ্ট বলিয়াছেন—**তদেতদ্বিদ্যা-পরিপালনার্থং, ন লাভ-পূজা-খ্যাত্যর্থমিতি**।

"তাৎপর্য্যটীকা"কার বাচস্পতি মিশ্র ইহাও বলিয়াছেন যে, দাম্ভিক নাস্তিকগণ সদ্বিদ্যায় বিরক্তিবশতঃ অথবা লাভ, পূজা বা খ্যাতির কামনায় আস্তিকদিগকে আক্রমণ করিয়া বেদ ও ব্রাহ্মণাদির খণ্ডন করিলে তদ্দ্বারা সমাজ ও ধর্ম্ম-রক্ষক রাজারও মতি-বিভ্রম হওয়ায় প্রজাবর্গের মধ্যে ধর্ম্ম-বিপ্লব উপস্থিত হইয়া থাকে। সুতরাং উহার নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে আস্তিক পণ্ডিতগণ তৎকালে "জল্প" বা "বিতণ্ডা"র দ্বারাও সেই সমস্ত নাস্তিককে নিরস্ত করিয়া দিবেন। কিন্তু তাঁহারাও বেদবিদ্যা ও বৈদিকধর্ম্মের রক্ষার জন্যই—উহা করিবেন। ধন-লাভ বা লোকসমাজে পূজা বা খ্যাতি-লাভের জন্য উহা করিবেন না।

গৌতমের উক্ত সূত্রানুসারে "তার্কিকরক্ষা" গ্রন্থে মহানৈয়ায়িক বরদারাজ বলিয়াছেন যে, * ধর্ম্ম-শাস্ত্রে "ন বিগৃহ্য কথাং কুর্য্যাৎ" অর্থাৎ

* ন চ "ন বিগৃহ্যকথাং কুর্য্যাদি"ত্যাদিভি র্জল্প-বিতণ্ডয়োর্নিষেধঃ শঙ্কনীয়ঃ, নাস্তিক নিরাকরণার্থ মবশ্যকর্ত্তব্যত্বেন তদিতরবিষয়ত্বান্নিষেধস্য। "তদুক্তং-"তত্ত্বাধ্যবসায়-সংরক্ষণার্থং" ইত্যাদি।

জল্প ও বিতণ্ডা করিবে না—এই নিষেধ বাক্য আছে বটে, কিন্তু অনুচিত উদ্দেশ্যে জিগীষু হইয়া শিষ্ট আস্তিকগণের সহিত উহা করিবে না, ইহাই ঐ নিষেধবাক্যের তাৎপর্য্য। কারণ, সময় বিশেষে অশিষ্ট বা দুর্ব্বিনীত নাস্তিকগণকে নিরস্ত করা প্রয়োজন হওয়ায় তাহাদিগের সহিত "জল্প" এবং "বিতণ্ডা"ও কর্ত্তব্য। মহর্ষি গৌতমেরও ইহাই অভিপ্রেত। রামানুজ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব দার্শনিক বহু-বিজ্ঞ বেঙ্কটনাথও তাঁহার "ন্যায়পরিশুদ্ধি" গ্রন্থে ঐরূপ সিদ্ধান্তই বলিয়াছেন এবং ঐ ব্যবস্থা যে শাস্ত্রসিদ্ধ, ইহা সমর্থন করিতে পরে—"ভগবদগীতা"র "বাদঃ প্রবদতামহং"—এই বাক্যের রামানুজের ব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যবস্থা রামানুজেরও সম্মত, ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন। *

বস্তুতঃ যে উদ্দেশ্যেই হউক, যে অবস্থাভেই হউই, সময়-বিশেষে অনেক শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিও জিগীষামূলক শাস্ত্রবিচারও করিয়াছেন। সুপ্রাচীনকালে রাজর্ষি জনকের যজ্ঞ-সভায় ব্রহ্মবিৎ যাজ্ঞবল্ক্যও জিগীষু হইয়া উষস্ত, কহোল ও আর্ত্তভাগ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণকে নিরস্ত করিয়াছিলেন এবং তখন সেই সমস্ত ব্রাহ্মণও যাজ্ঞবল্ক্যের পরাভবেচ্ছু হইয়াই, তাঁহাকে ক্রমে বহু দুরুত্তর প্রশ্ন করিয়াছিলেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভ হইতে সেই বিবরণ প্রকাশিত আছে। যদিও আমরা সেখানে সেই সমস্ত প্রশ্ন ও যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর বাক্যকে গৌতমোক্ত "জল্প" বা "বিতণ্ডার" লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া বুঝি না, কিন্তু "জীবন্মুক্তিবিবেক" গ্রন্থে অদ্বৈতবাদী বিদ্যারণ্য মুনিও সেখানে যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতিকে "বিজিগীষু-কথায়" প্রবৃত্ত বলিয়া তাঁহাদিগেরও বিদ্যা-গর্ব্বের সমর্থন করিয়াছেন। ‡ যাহা হউক, এবিষয়ে আর অধিক বলা অনাবশ্যক। অতঃপর "হেত্বাভাসে"র পরিচয় বলিতে হইবে।

* "আগম-সিদ্ধা চেয়ং ব্যবস্থা", "বাদজল্প-বিতণ্ডাভি" রিত্যাদি বচনাৎ। ভগবদ্ গীতা-ভাষ্যেঽপি ইত্যাদি—"ন্যায়-পরিশুদ্ধি" (চৌখাম্বা সিরিজ) দ্বিতীয় আহ্নিক দ্রষ্টব্য।

‡ "অস্তি হি যাজ্ঞবল্ক্যস্য তৎপ্রতিবাদিনামুষস্ত-কহোলাদীনাঞ্চ ভূয়ান্ বিদ্যামদঃ,

হেত্বাভাস

অনুমান-স্থলে যাহা প্রকৃত হেতু নহে, কিন্তু হেতুর ন্যায় প্রতীত হয়, তাহার নাম 'হেত্বাভাস'। উক্ত 'হেত্বাভাসে'র বিশেষ-জ্ঞান ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ "কথা"য় অধিকারই হয় না। তাই মহর্ষি গৌতম পরে 'হেত্বাভাস' পদার্থের উল্লেখ পূর্ব্বক যথাক্রমে উহার বিভাগার্থ পরে বলিয়াছেন—

সব্যভিচার-বিরুদ্ধ-প্রকরণসম-সাধ্যসম-
কালাতীতা হেত্বাভাসাঃ ॥ ১।২।৪ ॥

অর্থাৎ (১) সব্যভিচার, (২) বিরুদ্ধ, (৩) প্রকরণসম (৪) সাধ্যসম ও (৫) কালাতীত নামে হেত্বাভাস পাঁচপ্রকার। উক্ত বিভাগ-সূত্রে "হেত্বাভাস" শব্দের দ্বারা হেত্বাভাসের সামান্যলক্ষণও সূচিত হইয়াছে। কারণ, "হেতুবদাভাসন্তে" অর্থাৎ যে সমস্ত পদার্থ হেতুর লক্ষণাক্রান্ত নহে, কিন্তু হেতুর ন্যায় প্রতীয়মান হয়,—এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে "হেত্বাভাস" শব্দেব দ্বারা উহার লক্ষণ বুঝা যায়। তাই ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও প্রথমে বলিয়াছেন—"হেতু-লক্ষণাভাবা-দহেতবো হেতুসামান্যাদ্ধেতুবদাভাসমানাঃ"। অর্থাৎ হেতু পদার্থের সমস্ত লক্ষণ না থাকায় যে সমস্ত পদার্থ যে স্থলে অহেতু (প্রকৃত হেতু নহে), কিন্তু হেতুর সাদৃশ্যবশতঃ হেতুর ন্যায় প্রতীয়মান হয়, সেই সমস্ত পদার্থই সেই স্থলে **হেত্বাভাস**। তাহা হইলে এখন অনুমানস্থলে হেতুর লক্ষণ কি, ইহাই প্রথমে বুঝা আবশ্যক। মহর্ষি গৌতম পূর্ব্বে হেতু বাক্যের লক্ষণ-সূত্রে "সাধ্য-সাধনং" এই পদের দ্বারা এবং পরে পঞ্চবিধ হেত্বাভাসের লক্ষণ দ্বারা হেতু পদার্থের সামান্য লক্ষণও সূচনা

তৈঃ সর্ব্বৈরপি বিজিগীষু-কথায়াং প্রবৃত্তত্বাৎ"—ইত্যাদি "জীবন্মুক্তি বিবেক" দ্বিতীয় প্রকরণ (বোম্বাই সংস্করণ ২৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

করিয়াছেন। তদনুসারেই পরবর্ত্তী নৈয়ায়িকগণ বলিয়াছেন যে, (১) পক্ষে সত্তা, (২) সপক্ষে সত্তা, (৩) বিপক্ষে অসত্তা, (৪) অসৎ প্রতিপক্ষত্ব ও (৫) অবাধিতত্ব এই পঞ্চধর্ম্ম, (স্থলবিশেষে ধর্ম্মচতুষ্টয়) হেতু পদার্থের সামান্য লক্ষণ। *

যে ধর্ম্মীতে কোন ধর্ম্মের অনুমান করা হয়, তাহার নাম **পক্ষ** এবং যে পদার্থ সেই অনুমেয় ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া নিশ্চিত, তাহার নাম **সপক্ষ** এবং যে পদার্থ সেই অনুমেয় ধর্ম্ম-শূন্য বলিয়া নিশ্চিত, তাহার নাম **বিপক্ষ**। যেমন ধূম হেতুর দ্বারা পর্ব্বতে বহ্নির অনুমান-স্থলে পর্ব্বত "পক্ষ", রন্ধন-শালা "সপক্ষ" এবং জলাদি "বিপক্ষ"। পক্ষ পদার্থে বিদ্যমান থাকাই (১) **পক্ষে-সত্তা** এবং সপক্ষ পদার্থে বিদ্যমান থাকাই (২) **সপক্ষে সত্তা** এবং বিপক্ষ পদার্থে বিদ্যমান না থাকাই (৩) **বিপক্ষে-অসত্তা**। পূর্ব্বোক্ত স্থলে পর্ব্বতরূপ পক্ষ এবং রন্ধন-শালারূপ সপক্ষে ধূম বিদ্যমান থাকায় এবং বিপক্ষ জলাদি পদার্থে ধূম বিদ্যমান না থাকায় ধূমে পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মত্রয় আছে এবং পূর্ব্বোক্ত-স্থলে ধূম হেতুর প্রতিপক্ষ অর্থাৎ তুল্যবল বিরোধী অপর কোন হেতুর জ্ঞান না হওয়ায় উহাতে "অসৎপ্রতিপক্ষত্ব" ধর্ম্ম আছে এবং পর্ব্বতে যে বহ্নি নাই, ইহা বলবং প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত না হওয়ায় উহাতে "অবাধিতত্ব" ধর্ম্মও আছে। সুতরাং ধূমপদার্থে পূর্ব্বোক্ত পক্ষে-সত্তা প্রভৃতি পঞ্চধর্ম্মই থাকায় উক্তস্থলে উহা হেতুর লক্ষণাক্রান্ত হইয়াছে।

মহর্ষি গৌতম উক্ত পঞ্চধর্ম্মের এক একটি ধর্ম্মের অভাব গ্রহণ করিয়া পঞ্চবিধ হেত্বাভাস বলিয়াছেন। কারণ, বিপক্ষে অসত্তা না

---

* যে স্থলে "সপক্ষ" কোন পদার্থ নাই, সেই স্থলে "সপক্ষসত্ত্ব"কে ত্যাগ করিয়া এবং যে স্থলে "বিপক্ষ" কোন পদার্থ নাই; সেই স্থলে "বিপক্ষাসত্ত্ব"কে ত্যাগ করিয়া অন্য চারিটি ধর্ম্মই হেতু পদার্থের লক্ষণ বুঝিতে হইবে। "তর্কামৃত" গ্রন্থে জগদীশ তর্কালঙ্কারও ইহা বলিয়াছেন।

থাকিলে (১) "সব্যভিচার" নামক হেত্বাভাস হয়। সপক্ষে সত্তা না থাকিলে (২) "বিরুদ্ধ" নামক হেত্বাভাস হয়। "অসৎপ্রতিপক্ষত্ব" না থাকিলে (৩) "প্রকরণ-সম" নামক হেত্বাভাস হয়। পক্ষে সত্ত্বা না থাকিলে (৪) "সাধ্যসম" নামক হেত্বাভাস হয়। "অবাধিতত্ব" না থাকিলে (৫) "কালাতীত" নামক হেত্বাভাস হয়। কিন্তু ঐ সমস্ত পদার্থে—হেতুর কোন কোন ধর্ম্ম থাকায় উহা হেতুর সদৃশ, তাই উহা হেতুর ন্যায় প্রতীয়মান হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত অর্থে "হেত্বাভাস" নামে কথিত হইয়াছে। "তার্কিক রক্ষা" গ্রন্থে বরদরাজও বলিয়াছেন—

"হেতোঃ কেনাপি রূপেণ রহিতাঃ কৈশ্চিদন্বিতাঃ।
হেত্বাভাসাঃ পঞ্চধা তে গৌতমেন প্রপঞ্চিতাঃ॥"

পূর্ব্বসূত্রোক্ত প্রথম প্রকার হেত্বাভাসের নাম **সব্যভিচার**। মহর্ষি গৌতম ক্রমানুসারে পরে উহার লক্ষণ সূত্র বলিয়াছেন—

অনৈকান্তিকঃ সব্যভিচারঃ ॥ ২।২।৫ ॥

অর্থাৎ যাহা "অনৈকান্তিক", তাহা "সব্যভিচার" নামক হেত্বাভাস। ইহা "অনৈকান্তিক" ও "অনৈকান্ত" নামেও কথিত হইয়াছে। প্রাচীন কালে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম অর্থেও "অন্ত" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। অনুমান-স্থলে সাধ্য ধর্ম্ম ও তাহার অভাব পরস্পর বিরুদ্ধ অন্ত-দ্বয়। 'একস্মিন্ অন্তে বিদ্যতে' এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে "ঐকান্তিক" শব্দের দ্বারা বুঝা যায়, কোন এক অন্তে নিয়ত। তাহার বিপরীত অর্থাৎ যেহেতু কোন এক পক্ষে নিয়ত নহে, তাহা "অনৈকান্তিক।" ভাষ্য-কারের উক্তরূপ ব্যাখ্যানুসারে ফলিতার্থ এই যে, অনুমান-স্থলে যে হেতু, সাধ্যধর্ম্মযুক্ত স্থানে (সপক্ষে) থাকে এবং সাধ্যধর্ম্মশূন্য স্থানেও (বিপক্ষেও) থাকে, তাহা 'সব্যভিচার' নামক হেত্বাভাস। উক্তরূপ হেতুতে বিপক্ষে অসত্ত্বা-রূপ লক্ষণ না থাকায় হেতুর সমস্ত লক্ষণ থাকে না এবং উহা সাধ্য ধর্ম্মের ব্যভিচারী হওয়ায় ব্যাপ্তি শূন্য।

যেমন কোন বাদী বলিলেন—'শব্দো নিত্যঃ,' স্পর্শশূন্যত্বাৎ, আত্মবৎ।' উক্ত স্থলে আত্মাদি অনেক নিত্য পদার্থের ন্যায় রূপাদি অনেক অনিত্য পদার্থেও স্পর্শশূন্যত্ব থাকায় উক্ত হেতু নিত্যত্বের ব্যভিচারী। সুতরাং উহা **সব্যভিচার**। উক্তরূপ হেতুতে যে বিপক্ষে সত্তা অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্মশূন্য পদার্থে বিদ্যমানতা, উহাই ব্যভিচার। কিন্তু ব্যভিচার-নিশ্চয় হইলে ব্যাপ্তি-নিশ্চয় সম্ভব না হওয়ায় উক্তরূপ হেতুর দ্বারা অনুমিতি হইতে পারে না। পরে মহর্ষি গোতমও "ব্যভিচারা দহেতুঃ" (৪।১।৫) এই সূত্রের দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সাধ্যধর্ম্মের ব্যভিচার বিশিষ্ট হইলে তাহা ব্যাপ্তি বিশিষ্ট না হওয়ায় প্রকৃত হেতু হয় না। সুতরাং উক্ত সূত্রের দ্বারা সাধ্যধর্ম্মের ব্যভিচারের অভাবই যে, ফলতঃ অনুমানের অঙ্গ ব্যাপ্তি, ইহাও সূচিত হইয়াছে। ব্যাপ্তির অন্যরূপ লক্ষণও আছে।

"তার্কিক-রক্ষা"কার বরদ রাজ এবং আরও অনেক নৈয়ায়িক উক্ত "সব্যভিচার" নামক হেত্বাভাসকে **সাধারণ** ও **অসাধারণ** নামে দ্বিবিধ বলিয়াছেন।* যে হেতু 'পক্ষ', 'সপক্ষ' ও 'বিপক্ষে' থাকে, তাহা

---

* পরে, "তত্ত্ব-চিন্তামণি"কার গঙ্গেশ উপাধ্যায় "অনুপসংহারী" এই নামে তৃতীয় প্রকার "সব্যভিচারও বলিয়াছেন।" ক্রমে উক্ত ত্রিবিধ সব্যভিচারের নানারূপ ব্যাখ্যাও হইয়াছে। গঙ্গেশ প্রভৃতির মতে "সর্ব্বং প্রমেয়ং" এইরূপে সমস্ত পদার্থেই প্রমেয়ত্ব ধর্ম্মের অনুমান করিতে যে কোন হেতু গৃহীত হইবে, তাহাই "অনুপসংহারী" সব্যভিচার। কারণ, উক্তস্থলে সমস্ত পদার্থই পক্ষরূপে গৃহীত হওয়ায় সপক্ষ বা বিপক্ষরূপ দৃষ্টান্তের অভাবে সেই হেতুতে প্রমেয়ত্বরূপ সাধ্য ধর্ম্মের ব্যাপ্তি-নিশ্চয় হইতে পারে না। ফলকথা, যেরূপেই হউক, সমস্ত পদার্থই কোন অনুমানে পক্ষরূপে গৃহীত হইলে উক্ত মতে সেখানে যে কোন হেতুই "অনুপসংহারী" হইবে। অনেক নব্য নৈয়ায়িকের মতে সমস্ত পদার্থে বর্ত্তমান বাচ্যত্ব ও প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি কেবলান্বয়ী ধর্ম্ম সাধ্যধর্ম্মরূপে অথবা হেতুরূপে গৃহীত হইলে সেই স্থলীয় হেতু "অনুপসংহারী"।

সাধারণ সব্যভিচার। "শব্দো নিত্যঃ অস্পর্শত্বাৎ", "পর্ব্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ" ইত্যাদি স্থলেই ইহার উদাহরণ বুঝিতে হইবে। আর যে হেতু সপক্ষেও থাকে না, বিপক্ষেও থাকে না, কিন্তু কেবল পক্ষমাত্রেই থাকে, তাহা **অসাধারণ** নামে দ্বিতীয় প্রকার "সব্যভিচার।" যেমন "শব্দো-নিত্যঃ, শব্দত্বাৎ" এইরূপ প্রয়োগে অর্থাৎ শব্দে নিত্যত্ব সিদ্ধ করিতে শব্দ-মাত্রের অসাধারণ ধর্ম্ম শব্দত্বকেই হেতুরূপে গ্রহণ করিলে উহা "অসাধারণ" সব্যভিচার। কারণ, শব্দে নিত্যত্ব বা অনিত্যত্বের নিশ্চয় না হওয়া পর্য্যন্ত উক্ত স্থলে শব্দ 'সপক্ষ'ও নহে, 'বিপক্ষ'ও নহে। সুতরাং সপক্ষ বা বিপক্ষরূপ কোন দৃষ্টান্ত সম্ভব না হওয়ায় উক্ত স্থলে, শব্দত্বরূপ হেতুতে নিত্যত্বের ব্যাপ্তি-নিশ্চয় হইতে পারে না। পরন্তু শব্দে উক্ত শব্দত্বরূপ অসাধারণ ধর্ম্মের জ্ঞানজন্য 'শব্দো নিত্যো নবা' এইরূপ সংশয় জন্মে। সুতরাং উক্ত হেতুও প্রকৃত হেতু নহে। উহা **অসাধারণ** নামে দ্বিতীয় প্রকার "সব্যভিচার।" উক্তমতে পূর্ব্বোক্ত সূত্রে **অনৈকান্তিক** শব্দের দ্বারা উহাও বুঝা যায়। কিন্তু ভাষ্যকার ঐরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই।

দ্বিতীয় হেত্বাভাসের নাম **বিরুদ্ধ**। গোতম পরে উহার লক্ষণ সূত্র বলিয়াছেন—

সিদ্ধান্তমভ্যুপেত্য তদ্বিরোধী বিরুদ্ধঃ ॥১।২।৬॥

অর্থাৎ কোন সিদ্ধান্তকে স্বীকার করিয়া তাহার বিরোধী পদার্থকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে তাহা "বিরুদ্ধ" নামক হেত্বাভাস। তাৎপর্য্য এই যে, যেহেতু সাধ্যধর্ম্মের ব্যাঘাতক অর্থাৎ তাহার অভাবের সাধক, সেই হেতু "বিরুদ্ধ" হেত্বাভাস। যেমন কোন বাদী প্রথমে 'শব্দো নিত্যঃ' এইরূপ প্রতিজ্ঞা বাক্য বলিয়া অর্থাৎ শব্দে নিত্যত্ব সিদ্ধান্তই স্বীকার করিয়া পরে যে কোন কারণে ভ্রমবশতঃ 'উৎপত্তিমত্বাৎ' এইরূপ হেতু বাক্য বলিলে উক্ত 'উৎপত্তিমত্ত্ব' হেতু **বিরুদ্ধ** হেত্বাভাস হইবে।

কারণ, যে সমস্ত পদার্থে উৎপত্তিমত্ত্ব আছে, তাহা অনিত্য। সুতরাং উৎপত্তিমত্ত্বরূপ ধর্ম্ম অনিত্যত্বেরই ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট। অতএব উহা অনিত্যত্বেরই সাধক হওয়ায় নিত্যত্বের বিরোধী। অর্থাৎ উক্ত উৎপত্তিমত্ত্ব হেতু নিত্যত্বরূপ সাধ্যধর্ম্মের অভাবেরই (অনিত্যত্বের) সাধক হওয়ায় নিত্যত্বের সাধক হইতে পারে না। উক্ত স্থলে নিত্যত্ব-রূপে নিশ্চিত আত্মাদি পদার্থে অর্থাৎ 'সপক্ষে' উৎপত্তিমত্ত্ব ধর্ম্ম না থাকায় উক্ত হেতুতে **সপক্ষে সত্তা**-রূপ হেতু লক্ষণ নাই। সুতরাং উহা 'হেত্বাভাস'। "তার্কিকরক্ষা"কার বরদরাজ বলিয়াছেন—"বিরুদ্ধঃ স্যাদ্ বর্ত্তমানো হেতুঃ পক্ষ-বিপক্ষয়োঃ।" অর্থাৎ কেবল 'পক্ষ' ও 'বিপক্ষে' বর্ত্তমান হেতুই "বিরুদ্ধ"। এইমতে হেতুর "পক্ষ-সত্ত্ব" না থাকিলে "বিরুদ্ধ" হেত্বাভাস হয় না।

তৃতীয় হেত্বাভাসের নাম **প্রকরণ-সম**। গৌতম পরে উহার লক্ষণসূত্র বলিয়াছেন—

> যস্মাৎ প্রকরণ-চিন্তা, স নির্ণয়ার্থমপদিষ্টঃ
> প্রকরণ-সমঃ ॥ ১।২।৭॥

অর্থাৎ যৎ-প্রযুক্ত 'প্রকরণ'-বিষয়ে চিন্তা জন্মে, অর্থাৎ কোন পক্ষেরই নির্ণয় না হওয়ায় সংশয়-বিষয়ীভূত পক্ষ ও প্রতিপক্ষ বিষয়ে জিজ্ঞাসা জন্মে; তাহা নির্ণয়ের নিমিত্ত 'অপদিষ্ট' অর্থাৎ হেতুরূপে কথিত হইলে **প্রকরণসম** নামক হেত্বাভাস হয়। উক্ত "প্রকরণ" শব্দের অর্থ—বাদী ও প্রতিবাদীর পক্ষ ও প্রতিপক্ষরূপ সাধ্য-ধর্ম্ম-দ্বয়। তদ্‌বিষয়ে মধ্যস্থগণের জিজ্ঞাসাই "প্রকরণ চিন্তা"।

যেমন বাদী নৈয়ায়িক বলিলেন—"শব্দোঽনিত্যঃ, নিত্যধর্ম্মানুপ-লব্ধেঃ"। অর্থাৎ শব্দ অনিত্য, যেহেতু শব্দে নিত্য পদার্থের কোন ধর্ম্মের উপলব্ধি হয় না। পরে প্রতিবাদী মীমাংসক বলিলেন—"শব্দো নিত্যঃ, অনিত্যধর্ম্মানুপলব্ধেঃ"। অর্থাৎ শব্দ নিত্য, যেহেতু শব্দে

অনিত্যপদার্থের কোন ধর্ম্মের উপলব্ধি হয় না। উক্ত স্থলে শব্দে অনিত্যত্ব ও নিত্যত্বই-পক্ষ ও প্রতিপক্ষরূপ প্রকরণ-দ্বয়। কিন্তু বাদী বা প্রতিবাদী উক্ত স্থলে অপরের হেতুর কোন দোষ বা দুর্ব্বলত্ব সমর্থন করিতে না পারিলে- মধ্যস্থগণ উক্ত হেতুদ্বয়ের বলাবল নিশ্চয় করিতে না পারায় উক্ত উভয় হেতুই তুল্যবল হয়। অনিশ্চিত-বলাবলত্বই উক্তরূপ স্থলে হেতুদ্বয়ের তুল্যবলত্ব। সুতরাং উক্ত স্থলে কোন হেতুর দ্বারাই মধ্যস্থগণের কোন পক্ষের অনুমিতিরূপ নির্ণয় না হওয়ায় শব্দে অনিত্যত্ব ও নিত্যত্ব-বিষয়ে সংশয়-নিবৃত্তি হয় না। সুতরাং পরে তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা জন্মে। উক্তরূপ হেতুদ্বয়ই সেই জিজ্ঞাসার প্রয়োজক হওয়ায় উহা "প্রকরণসম" নামক হেত্বাভাস। এই "প্রকরণসম" হেত্বাভাসই পরে **সৎপ্রতিপক্ষ** নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। "দীধিতি"কার রঘুনাথ শিরোমণি ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"সন্ প্রতিপক্ষো বিরোধি-পরামর্শো যস্য স তথা।" জয়ন্ত ভট্টের মতে উক্তরূপ হেতুদ্বয়ই "বিরুদ্ধা ব্যভিচারী"-এই নামে কথিত হইতে পারে। *

চতুর্থ হেত্বাভাসের নাম—**সাধ্য-সম**। গৌতম পরে উহার লক্ষণ-সূত্র বলিয়াছেন—

---

* জয়ন্ত ভট্টের মতে উক্তরূপ "প্রকরণ-সম" হেতুদ্বয়ের প্রয়োগ-স্থলে মধ্যস্থগণের প্রকরণদ্বয়-বিষয়ে মানস সংশয়রূপ চিন্তা জন্মে। পরে "রত্নকোষ"কার পৃথ্বীধর আচার্য্য উক্তরূপ স্থলে সংশয়াকার অনুমিতিই সমর্থন করেন। (প্রথম সংস্করণে জয়ন্ত ভট্টের মতানুসারেই ব্যাখ্যা লিখিত হয়)। কিন্তু ভাষ্যকার প্রথমোক্ত "সব্যভিচার" হইতে "প্রকরণসমে"র ভেদ প্রকাশের জন্য সূত্রোক্ত "প্রকরণ-চিন্তা"র ব্যাখ্যা করিয়াছেন—প্রকরণ-বিষয়ে জিজ্ঞাসা। উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণও সমর্থন করিয়াছেন যে, সৎপ্রতিপক্ষ হেতুদ্বয়ের প্রয়োগ-স্থলে পরে সাধ্য ধর্ম্ম ও তাহার অভাব বিষয়ে মধ্যস্থগণের সংশয় জন্মে না। কিন্তু কোন পক্ষেরই নির্ণয় না হওয়ায় তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা জন্মে। এ বিষয়ে ক্রমে বহু সূক্ষ্ম বিচার ও মতভেদ হইয়াছে। মতভেদের ব্যাখ্যা ও আলোচনা মৎ সম্পাদিত ন্যায়-দর্শনের (দ্বিতীয় সং) প্রথম খণ্ডে ৩৫০—৫৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

"সাধ্যাবিশিষ্টঃ সাধ্যত্বাৎ সাধ্যসমঃ॥ ১।২।৮ ॥

অর্থাৎ সাধ্যত্ব-প্রযুক্ত যে পদার্থ সাধ্য ধর্ম্মের তুল্য, তাহা **সাধ্য-সম** হেত্বাভাস। তাৎপর্য্য এই যে, সিদ্ধ পদার্থই অনুমানের হেতু হইতে পারে। কিন্তু বাদী ও প্রতিবাদীর সাধ্য-ধর্ম্ম যেমন অনুমানের পূর্ব্বে অসিদ্ধ হওয়ায় সাধ্য; তদ্রূপ, তাঁহাদিগের কথিত হেতু পদার্থও পূর্ব্বে অসিদ্ধ হইলে উহা সাধ্য-তুল্য। উক্তরূপ পদার্থে 'পক্ষ-সত্ত্বা' না থাকায় উহাতে প্রকৃত হেতুর লক্ষণ নাই। সুতরাং উহা "সাধ্য-সম" নামক হেত্বাভাস। গৌতমোক্ত এই "সাধ্যসম"ই পরে **অসিদ্ধ** এই নামে কথিত হইয়াছে এবং নানাগ্রন্থে উহার নানারূপ ব্যাখ্যা ও নানাপ্রকার ভেদ-বর্ণন হইয়াছে।

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন **দ্রব্যং ছায়া, গতিমত্ত্বাৎ**—এইরূপ প্রয়োগে গতিমত্ত্ব হেতুকে "সাধ্য-সমে"র উদাহরণ বলিয়াছেন। কারণ, ছায়াতে যে, গতিক্রিয়া থাকে, অর্থাৎ মনুষ্যাদির ন্যায় ছায়াও যে গমন করে, ইহা প্রতিবাদী নৈয়ায়িক স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে মনুষ্যাদি-কর্ত্তৃক আচ্ছাদিত আলোক-সমূহের অভাবই ছায়া। সুতরাং তাহাতে গতিক্রিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু অনেক স্থলে গতিক্রিয়ার ভ্রম হয়। অতএব প্রতিবাদীর মতে ছায়াতে গতিমত্ত্ব অসিদ্ধ হওয়ায় উক্ত স্থলে ঐ হেতু "সাধ্য-সম" হেত্বাভাস।

"ন্যায়-বার্ত্তিক"কার উদ্দ্যোতকর পূর্ব্বোক্ত "সাধ্যসম" বা "অসিদ্ধ" নামক হেত্বাভাসকে "স্বরূপাসিদ্ধ," "আশ্রয়াসিদ্ধ" ও অন্যথাসিদ্ধ" নামে ত্রিবিধ বলিয়া পূর্ব্বোক্ত স্থলেই উদাহরণ প্রকাশ করিয়াছেন যে, ছায়াতে গতিমত্ত্ব বা গতিক্রিয়া স্বরূপতঃই অসিদ্ধ হইলে উহা (১) **স্বরূপাসিদ্ধ**। আর যদি বাদী মীমাংসক বলেন যে, ছায়া যখন এক স্থানে দৃষ্ট হইয়া অন্যত্রও দৃষ্ট হয়, তখন তাহাতে গতিক্রিয়া অবশ্য স্বীকার্য্য। কারণ, এক স্থানে দৃষ্ট পদার্থের যে অন্যত্র দর্শন, উহা সেই পদার্থের গতি-

ক্রিয়া ব্যতীত সম্ভব হয় না। কিন্তু ইহা বলিলেও ঐ হেতু (২) **আশ্রয়াসিদ্ধ**। কারণ, ছায়াতে দ্রব্যত্ব সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত অন্য দ্রব্যের ন্যায় তাহাতে স্থানান্তরে দর্শনরূপ হেতুও সিদ্ধ হয় না। সুতরাং দ্রব্য-রূপ ছায়া সিদ্ধ না হওয়ায় তাহাকে আশ্রয় করিয়া কথিত যে স্থানান্তরে দর্শনরূপ হেতু, তাহা "আশ্রয়াসিদ্ধ"। পরন্তু আলোকবিশেষের অভাবকে ছায়া বলিলেও—তাহার স্থানান্তরে দর্শন হইতে পারে। কারণ প্রতিবাদীর মতে অভাবপদার্থ-বিশেষেরও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং অন্যমতে ছায়া দ্রব্য পদার্থ না হইলেও তাহার স্থানান্তরে দর্শন সিদ্ধ হওয়ায় ঐ হেতু (৩) **অন্যথাসিদ্ধ**।

বস্তুতঃ মহর্ষি গৌতমও "অসিদ্ধ" শব্দের প্রয়োগ না করিয়া উক্ত সূত্রে "সাধ্যাবিশিষ্ট" শব্দের দ্বারা সূচনা করিয়াছেন যে, যে হেতু কেবল প্রতিবাদীর মতে অসিদ্ধ, তাহাও "সাধ্যসম" নামক হেত্বাভাস। প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ উক্তরূপ অসিদ্ধকে **অন্যতরাসিদ্ধ** নামে এবং যে হেতু, বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের মতেই অসিদ্ধ, তাহাকে **উভয়াসিদ্ধ** নামে উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন 'শব্দোঽনিত্যঃ, চাক্ষুষত্বাৎ' এইরূপ প্রয়োগে চাক্ষুষত্ব হেতু **উভয়াসিদ্ধ**। কারণ, বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের মতেই শব্দে চাক্ষুষত্ব অসিদ্ধ। এইরূপ যে হেতু অনুমানের ধর্ম্মিরূপ পক্ষের একাংশে অসিদ্ধ হয়, তাহা "একদেশাসিদ্ধ" ও **ভাগাসিদ্ধ** নামে কথিত হইয়াছে এবং যে হেতু অনুমানের ধর্ম্মিরূপ পক্ষে সন্দিগ্ধ, তাহা **সন্দিগ্ধাসিদ্ধ** নামে কথিত হইয়াছে। এইরূপ কোন বিশিষ্ট হেতুর বিশেষ্য বা বিশেষণ অসিদ্ধ হইলে উহা যথাক্রমে **বিশেষ্যাসিদ্ধ** ও **বিশেষণাসিদ্ধ** নামে কথিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ সমস্ত 'অসিদ্ধ'ই "স্বরূপাসিদ্ধে"র অন্তর্গত।

"তত্ত্ব-চিন্তামণি"কার গঙ্গেশ উপাধ্যায় (১) 'আশ্রয়াসিদ্ধি' (২) 'স্বরূপাসিদ্ধি' ও (৩) 'ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি' নামে হেতুর 'অসিদ্ধি' দোষ

ত্রিবিধ বলিয়াছেন। হেতুর ব্যর্থবিশেষণবত্তাহ ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি দোষ, ইহা প্রসিদ্ধ মত। কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণি উহাকে 'হেতুর' দোষ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে সাধ্য-ধর্ম্ম অথবা হেতুর বিশেষণ অসিদ্ধ হইলে সেই স্থলে ব্যাপ্তি-নিশ্চয় সম্ভব না হওয়ায় হেতুর "ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি" দোষ হয়। "তর্কভাষা" গ্রন্থে কেশব মিশ্র বলিয়াছেন যে, হেতুতে ব্যাপ্তি-নিশ্চয়ের অভাব-প্রযুক্ত এবং উপাধির সত্তা-প্রযুক্ত 'ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি' দোষ দ্বিবিধ। "তর্ক-সংগ্রহে" অন্নংভট্ট উপাধিবিশিষ্ট হেতুকেই "ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ" বলিয়াছেন।

কোন নৈয়ায়িক সম্প্রদায় **সিদ্ধসাধন** নামে এবং **অপ্রযোজক** নামে পৃথক্ হেত্বাভাসও স্বীকার করিয়াছিলেন। ভাসর্ব্বজ্ঞ "ন্যায়সার" গ্রন্থে **অনধ্যবসিত** নামে ষষ্ঠ হেত্বাভাসও বলিয়াছেন। কিন্তু মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থে (৩৷৭) বলিয়াছেন যে, পঞ্চবিধ হেত্বাভাস ভিন্ন আর কোন হেত্বাভাস গৌতমের সম্মত হইলে তাঁহার হেত্বাভাসের বিভাগ-সূত্র ব্যর্থ হয়। উক্ত বিভাগ-সূত্রের দ্বারা সূচিত হইয়াছে যে, সর্ব্বপ্রকার সমস্ত হেত্বাভাসই উক্ত পঞ্চবিধ হেত্বাভাসের অন্তর্গত। তাই উদয়নাচার্য্য পূর্ব্বে গৌতমোক্ত "সাধ্য-সম" অর্থাৎ "অসিদ্ধ" হেত্বাভাসের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, "অসিদ্ধি" প্রযুক্ত হেত্বাভাসই **অসিদ্ধ** নামে কথিত হয়। 'সিদ্ধি'র অভাবই 'অসিদ্ধি'। উক্ত "সিদ্ধি' শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে—'সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্ম্মতার নিশ্চয়' অর্থাৎ অনুমিতির চরম কারণ পূর্ব্বোক্ত **লিঙ্গ-পরামর্শ**। সেই সিদ্ধির অভাব-রূপ অসিদ্ধি (১) "অন্যথাসিদ্ধি" (২) "আশ্রয়াসিদ্ধি" ও (৩) "স্বরূপাসিদ্ধি" নামে ত্রিবিধ। তন্মধ্যে "আশ্রয়াসিদ্ধি" দ্বিবিধ। অনুমানের আশ্রয় অর্থাৎ ধর্ম্মিরূপ পক্ষ পদার্থের স্বরূপতঃ যে অসিদ্ধি, তাহা প্রথম প্রকার "আশ্রয়াসিদ্ধি'। যেমন 'আকাশকুসুমং গন্ধবৎ পুষ্পত্বাৎ, এইরূপ প্রয়োগে

পক্ষভূত আকাশকুসুমই অসিদ্ধ বা অলীক। সুতরাং উক্ত হেতু "আশ্রয়াসিদ্ধ।" আর কেহ যদি কোন পদার্থে সর্ব্ব-সম্মত সিদ্ধ পদার্থের অনুমানের জন্য কোন হেতুর প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে সেই হেতুও 'আশ্রয়াসিদ্ধ।' কারণ, সেই স্থলে ধর্ম্মিরূপ পক্ষে 'পক্ষতা' রূপ বিশেষণ না থাকায় উহা পক্ষই হয় না। প্রাচীন-মতে সাধ্য ধর্ম্মের সংশয়-যোগ্যতাই "পক্ষতা।" কিন্তু সিদ্ধ বা নিশ্চিত পদার্থে সংশয় সম্ভব হয় না। স্বার্থানুমান-স্থলে স্বেচ্ছা-প্রযুক্ত সংশয় (আহার্য্য সংশয়) সম্ভব হইলেও পরার্থানুমান-স্থলে উক্তরূপ সংশয় বলা যায় না। অতএব "সিদ্ধ-সাধন" স্থলেও হেতু "আশ্রয়া-সিদ্ধই" হইবে। "সিদ্ধ-সাধন" নামে পৃথক্ হেত্বাভাস স্বীকার অনাবশ্যক।

পূর্ব্বোক্ত মতে সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্ম্মরূপ যে হেতু, তাহা সাধ্যধর্ম্মের তুল্য অর্থাৎ অসিদ্ধ হইলে সেই স্থলীয় হেতুই "সাধ্যসম" নামক হেত্বাভাস, ইহাই গৌতমের উক্ত সূত্রের তাৎপর্য্যার্থ। সুতরাং হেতু পদার্থে সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তি অসিদ্ধ হইলে অথবা অনুমানের আশ্রয়রূপ পক্ষ অসিদ্ধ হইলে অথবা সেই পক্ষে সেই হেতুই স্বরূপতঃ অসিদ্ধ হইলে "ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট পক্ষধর্ম্ম" অসিদ্ধ হওয়ায় ঐ সমস্ত স্থলেই "সাধ্যসম" নামক হেত্বাভাস হইবে। তন্মধ্যে যেখানে গৃহীত হেতুপদার্থে সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তি অসিদ্ধ, সেই স্থলীয় হেতুই উদয়নাচার্য্যের মতে "অন্যথাসিদ্ধ"। "প্রকাশ" টীকাকার বর্দ্ধমান উপাধ্যায় উদয়নোক্ত "অন্যথাসিদ্ধি"র ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"অন্যথাসিদ্ধিঃ সোপাধিত্বং"। অর্থাৎ যে হেতু সোপাধি, তাহাকে বলে—"অন্যথাসিদ্ধ"।

এখন উপাধি কাহাকে বলে, তাহা বুঝা অত্যাবশ্যক। অনুমান-স্থলে যে পদার্থ সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপক ও ব্যাপ্য এবং হেতু পদার্থের অব্যাপক, তাহাই উদয়নের মতে মুখ্য **উপাধি**। আর যে পদার্থ সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্য না হইলেও ব্যাপক এবং হেতু পদার্থের অব্যাপক,

তাহাও তুল্য যুক্তিতে উপাধি হয়। যেমন পর্ব্বতে ধূমের অনুমান করিতে বহ্নিকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে (পর্ব্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ) সেই স্থলে আর্দ্র ইন্ধন উপাধি। কারণ আর্দ্র ইন্ধনের সহিত বহ্নির সংযোগ ব্যতীত ধূম জন্মে না। সুতরাং যে যে স্থানে ধূম থাকে, সেই সমস্ত স্থানেই আর্দ্র ইন্ধন থাকায় উহা উক্ত স্থলে সাধ্যধর্ম্ম ধূমের ব্যাপক পদার্থ এবং তপ্তলৌহপিণ্ডে বহ্নি থাকিলেও সেখানে আর্দ্র ইন্ধন না থাকায় উহা বহ্নিরূপ হেতুর অব্যাপক পদার্থ। সুতরাং শেষোক্ত লক্ষণানুসারে উক্ত স্থলে আর্দ্র ইন্ধন উপাধি হওয়ায় বহ্নিরূপ হেতু 'সোপাধি' হইয়াছে।

উক্ত 'উপাধি' পদার্থ সন্দিগ্ধ ও নিশ্চিত ভেদে দ্বিবিধ। যে পদার্থে সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপকত্ব অথবা হেতু পদার্থের অব্যাপকত্ব অথবা ঐ উভয়ই সন্দিগ্ধ, তাহাকে বলে—**সন্দিগ্ধ উপাধি**। সন্দিগ্ধ উপাধি স্থলেও হেতু পদার্থে সাধ্যধর্ম্মের ব্যভিচার-সংশয় হওয়ায় সেই হেতুর দ্বারা অনুমিতি হয় না। আর নিশ্চিত উপাধি-স্থলে সেই উপাধি পদার্থের ব্যভিচারিত্ব হেতুর দ্বারা হেতু পদার্থে সেই সাধ্যধর্ম্মের ব্যভিচারের অনুমিতি হওয়ায় ব্যভিচার-নিশ্চয়রূপ প্রতিবন্ধকবশতঃ তাহাতে ব্যাপ্তি-নিশ্চয় সম্ভব না হওয়ায় অনুমিতি হয় না।

যেমন পূর্ব্বোক্ত স্থলে আর্দ্র ইন্ধন-শূন্য তপ্তলৌহপিণ্ডে বহ্নি থাকায় বহ্নি আর্দ্র ইন্ধনের ব্যভিচারী পদার্থ, সুতরাং উহা সাধ্যধর্ম্ম ধূমেরও ব্যভিচারী পদার্থ। কারণ, যাহা ব্যাপক পদার্থের ব্যভিচারী, তাহা তাহার ব্যাপ্য পদার্থেরও ব্যভিচারী হইয়া থাকে। সুতরাং উক্তস্থলে ("বহ্নির্ধূম-ব্যভিচারী, আর্দ্রেন্ধন-ব্যভিচারিত্বাৎ—এইরূপে) অনুমান প্রমাণ দ্বারা বহ্নি হেতুতে ধূমের ব্যভিচার-নিশ্চয় জন্মে। এইরূপ অনেকস্থলে উপাধি পদার্থের অভাবরূপ হেতুর দ্বারা অনুমানের আশ্রয়-রূপ পক্ষে সাধ্যধর্ম্মের অভাব-নিশ্চয় হইলে উহা সেই অনুমিতিরই

প্রতিবন্ধক হয়। সুতরাং অনুমান-স্থলে উক্তরূপ উপাধি পদার্থ নানা-রূপেই হেতুর দূষক হইয়া থাকে। কিন্তু উহা কোন 'হেত্বাভাস' নহে। কারণ, উহা হেতুরূপে প্রযুক্ত হয় না, উহাতে হেত্বাভাসের লক্ষণই নাই। ন্যায়-শাস্ত্রের অনুমান-কাণ্ডে উক্ত উপাধি পদার্থের লক্ষণাদি ও তৎসম্বন্ধে বিবিধ বিচার অতিবিস্তৃত ও দুরূহ। সংক্ষেপে তাহার কিছুই ব্যক্ত করা যায় না। *

মূলকথা, উদয়নাচার্য্যের মতে—সোপাধি হেতুর নামই "অন্যথাসিদ্ধ" ও **অপ্রয়োজক**। উহা গৌতমোক্ত "সাধ্যসম" বা "অসিদ্ধ" নামক হেত্বাভাসেরই প্রকার বিশেষ। উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন যে—যে স্থলে হেতুপদার্থে সাধ্যধর্ম্মের ব্যভিচার-সংশয়ের নিবর্ত্তক অনুকূল তর্ক নাই, সেই স্থলীয় হেতুকে বলে—**অপ্রযোজক** এবং উহা "শঙ্কিতোপাধি" ও "নিশ্চিতোপাধি" নামে দ্বিবিধ। সুতরাং উহা পূর্ব্বোক্ত "অসিদ্ধে"রই অন্তর্গত হওয়ায় পৃথক্ হেত্বাভাস নহে। এইরূপ যে হেতু, অনুমানের আশ্রয়ে স্বরূপতঃই অসিদ্ধ, তাহাকে বলে—"স্বরূপাসিদ্ধ"। পূর্ব্বে ইহার উদাহরণ ও প্রকারভেদ বলিয়াছি।

পঞ্চম হেত্বাভাসের নাম **কালাতীত**। মহর্ষি গৌতম পরে উহার লক্ষণ-সূত্র বলিয়াছেন—

কালাত্যয়াপদিষ্টঃ কালাতীতঃ ॥১।২।৯॥

অর্থাৎ যে হেতু অনুমানের কালাত্যয়ে অপদিষ্ট (প্রযুক্ত) হয়, তাহা **কালাতীত** নামক হেত্বাভাস। তাৎপর্য্য এই যে, যে কাল পর্য্যন্ত অনুমানের ধর্ম্মিরূপ "পক্ষ" পদার্থে সাধ্যধর্ম্মের অভাব নিশ্চয় না হয়, সেই কাল পর্য্যন্তই তাহাতে সেই ধর্ম্মের অনুমিতি হইতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বে কোন বলবৎ প্রমাণ দ্বারা সেই সাধ্যধর্ম্মের অভাব-নিশ্চয়

---

* উপাধি পদার্থের লক্ষণ ও উদাহরণাদির ব্যাখ্যা মৎসম্পাদিত ন্যায়-দর্শনের দ্বিতীয় খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

হইলে তখন তাহাতে সেই ধর্ম্মের অনুস্থিতির কাল থাকে না। সুতরাং অনুমানের কালাত্যয়ে প্রযুক্ত সমস্ত হেতুই **কালাতীত** নামক হেত্বাভাস। ফলকথা, বলবৎ প্রমাণের দ্বারা বাধিত হেতুই "কালাতীত।" উক্তরূপ হেতুই পরে "বাধিতসাধ্যক" এবং "বাধিত" নামেও কথিত হইয়াছে। "তার্কিকরক্ষা"কার বরদরাজও বলিয়াছেন—"কালাতীতো বলবতা প্রমাণেন প্রবাধিতঃ।"

যেমন 'বহ্নিঃ অনুষ্ণঃ'—এইরূপে বহ্নিতে অনুষ্ণত্বের অনুমানের জন্য প্রযুক্ত যে কোন হেতুই "কালাতীত" বা 'বাধিত' হেত্বাভাস। কারণ বহ্নিতে অনুষ্ণত্বরূপ সাধ্যধর্ম্মের অভাব (উষ্ণত্ব) পূর্ব্বেই প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-সিদ্ধ। এইরূপ যাগ যে স্বর্গের সাধন, ইহা পূর্ব্বেই বলবত্তর বেদপ্রমাণ-সিদ্ধ। সুতরাং—যাগো ন স্বর্গ-'সাধনং,' এইরূপে যাগে স্বর্গ-সাধনত্বাভাবের অনুমানের জন্য যে কোন হেতুর প্রয়োগ করিলে তাহা "কালাতীত" নামক হেত্বাভাস হয়। পূর্ব্বোক্ত স্থলে হেতুতে ব্যভিচারাদি অন্য কোন দোষ থাকিলেও "বাধ" দোষও স্বীকার্য্য। কেবল 'বাধ' দোষ-বিশিষ্ট **বাধিত** হেত্বাভাসের উদাহরণও আছে। সুতরাং পঞ্চম হেত্বাভাস অবশ্য স্বীকার্য্য। বৈশেষিকাদি সম্প্রদায় উহা অস্বীকার করিয়া উক্তরূপ স্থলে "প্রতিজ্ঞাভাস"ই বলিয়াছেন। তাঁহাগিদের মতে 'বহ্নিরনুষ্ণঃ' এইরূপ প্রয়োগ-স্থলে উহা প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ "প্রতিজ্ঞাভাস"। বৌদ্ধাচার্য্য দিঙ্‌নাগও অনেকপ্রকার "প্রতিজ্ঞাভাস" বলিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষি গৌতমের মতে উক্তরূপ স্থলেও হেত্বাভাস স্বীকার্য্য। তাই তিনি "প্রতিজ্ঞাভাসা"দি বলেন নাই। জয়ন্ত ভট্টও বিচার পূর্ব্বক এই কথাই বলিয়াছেন।

হেত্বাভাসের প্রকার-ভেদে মতভেদ

বৈশেষিক সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ মতে 'হেত্বাভাস' ত্রিবিধ। কারণ, অনুমানের 'লিঙ্গ' পঞ্চলক্ষণ নহে, কিন্তু ত্রিলক্ষণ। (১) পক্ষে সত্তা-

(২) সপক্ষে সত্তা ও (৩) বিপক্ষে অসত্তাই লিঙ্গের (হেতুর) লক্ষণ। উক্ত ধর্ম্মত্রয়ের মধ্যে যে কোন এক ধর্ম্ম বা দুই ধর্ম্ম না থাকিলে তাহা "অলিঙ্গ" অর্থাৎ হেত্বাভাস হয়। তাই কথিত হইয়াছে—"বিপরীত-মতো যৎ স্যাদেকেন দ্বিতয়েন বা। **বিরুদ্ধাঽসিদ্ধসন্দিগ্ধমলিঙ্গং কাশ্যপোঽব্রবীৎ॥"*** কশ্যপমুনির অপত্য কণাদমুনির অপর নাম **কাশ্যপ**। তাঁহার অভিপ্রায় বুঝা যায় যে, "সৎপ্রতিপক্ষ" অর্থাৎ তুল্যবল বিরোধী হেতু-দ্বয়ের প্রয়োগ-স্থলে মধ্যস্থ-গণের কোন পক্ষের অনুমিতি-রূপ নির্ণয় না হইলেও তাঁহারা সেই হেতুদ্বয়কে অহেতু বলিতে পারেন না। কারণ, তাঁহারা তখন সেই হেতুদ্বয়েব কোন দোষ বুঝেন না। এইরূপ অনেক স্থলে বলবৎ প্রমাণ দ্বারা সাধ্যধর্ম্মের অভাব-নিশ্চয়-রূপ প্রতিবন্ধকবশতঃ অনুমিতি না হইলেও সেইস্থলীয় হেতুতে 'বাধ' নামক কোন দোষান্তর নাই এবং তাহা স্বীকার করাও অনাবশ্যক। সুতরাং "অসৎপ্রতিপক্ষত্ব" ও "অবাধিতত্ব"

---

* মহর্ষি কণাদ বৈশেষিক দর্শনে অনুমানের হেতুকে "অপদেশ" নামে উল্লেখ করিয়া পরে বলিয়াছেন—"অপ্রসিদ্ধোঽনপদেশোঽসন্ সন্দিগ্ধশ্চানপদেশঃ (৩।১।১৫) অর্থাৎ "অনপদেশ" (অহেতু বা হেত্বাভাস) ত্রিবিধ। যথা—"অপ্রসিদ্ধ" (বিরুদ্ধ), "অসন্" (অসিদ্ধ), "সন্দিগ্ধ" (সব্যভিচার)। কিন্তু ব্যোমশিবাচার্য্য কণাদের উক্ত সূত্রে "চ" শব্দের দ্বারা কণাদের অনুক্ত "প্রকরণসম" ও "কালাতীত" নামক হেত্বাভাস-দ্বয়ও তাঁহার সম্মত বলিয়াছেন। "উপস্কার" টীকায় শঙ্কর মিশ্র বৃত্তিকারের মত বলিয়া ব্যোমশিবাচার্য্যের উক্ত মতেরই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও উক্ত মত গ্রহণ করেন নাই। বস্তুতঃ প্রশস্তপাদের উক্ত দ্বিতীয় শ্লোকের পরার্দ্ধে স্পষ্ট কথিত হইয়াছে—"বিরুদ্ধাসিদ্ধ-সন্দিগ্ধমলিঙ্গং কাশ্যপোঽব্রবীৎ"। অর্থাৎ কাশ্যপ (কণাদ) "বিরুদ্ধ", "অসিদ্ধ" ও "সন্দিগ্ধ" (সব্যভিচার) এই ত্রিবিধ "অলিঙ্গ" (অহেতু বা হেত্বাভাস) বলিয়াছেন। ব্যোমশিবাচার্য্য নিজমত-রক্ষার জন্য অধ্যাহার ও কষ্টকল্পনা করিয়া ঐ সমস্ত স্থলে যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। "ব্যোমবতী বৃত্তি" কাশীচৌখাম্বা সংস্কৃত সিরীজ" ৫৬৫-৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হেতুর লক্ষণ নহে। কিন্তু পক্ষসত্ত্বাদি ধর্মত্রয়ই হেতুর লক্ষণ। সুতরাং অনুমানের হেতু ত্রিলক্ষণ।

বৌদ্ধ নৈয়ায়িক **দিঙ্‌নাগও** বলিয়াছেন—"ত্রিরূপাল্লিঙ্গাদ্ যদনুমেয়ে জ্ঞানং তদনুমানং"। "ন্যায়-বিন্দু" গ্রন্থে বৌদ্ধাচার্য্য **ধর্ম্মকীর্ত্তি** স্পষ্ট বলিয়াছেন—"অসিদ্ধবিরুদ্ধানৈকান্তিকাস্ত্রয়ো হেত্বাভাসাঃ"। প্রাচীন আলঙ্কারিক **ভামহও** "কাব্যালঙ্কার" গ্রন্থে বলিয়াছেন—"হেতুস্ত্রিলক্ষণো জ্ঞেয়ো হেত্বাভাসো বিপর্য্যয়াৎ"। সুতরাং তাঁহার মতেও পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম-ত্রয়ই হেতুর লক্ষণ এবং তাহার এক একটি ধর্ম্মের অভাব-প্রযুক্ত হেত্বাভাস ত্রিবিধ। শ্বেতাম্বর জৈন সম্প্রদায়ও "অসিদ্ধ", "বিরুদ্ধ" ও "অনৈকান্তিক"—এই ত্রিবিধ হেত্বাভাস বলিয়াছেন। দিগম্বর জৈন সম্প্রদায় "অকিঞ্চিৎ-কর" নামে আরও এক প্রকার হেত্বাভাস স্বীকার করিয়া হেত্বাভাস চতুর্ব্বিধ বলিয়াছেন।

মীমাংসাচার্য্য গুরু প্রভাকরও গৌতমোক্ত "প্রকরণসম" ও "কালাতীত" নামক হেত্বাভাস স্বীকার করেন নাই। পরন্তু তাঁহার মতে কোনস্থলে তুল্যবল-বিরোধী হেতু-দ্বয় সম্ভবই হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে সেখানে সাধ্যধর্ম্ম বিষয়ে কোন দিনই সংশয়ের নিবৃত্তি হইতে পারে না। সুতরাং "সৎপ্রতিপক্ষ" নামে কোন হেত্বাভাসের উদাহরণ সম্ভব না হওয়ায় উহা স্বীকার করা যায় না। কিন্তু ভট্ট কুমারিলের মতের ব্যাখ্যাতা পার্থসারথি মিশ্র "শাস্ত্র-দীপিকা"র তর্কপাদে প্রভাকরের যুক্তি খণ্ডন করিয়া **সৎপ্রতিপক্ষ** হেত্বাভাসও সমর্থন করিয়াছেন। তবে উক্ত মতে উহা **অনৈকান্তিকেরই** দ্বিতীয় প্রকার। তিনি বলিয়াছেন যে, কোন স্থলে 'সৎপ্রতিপক্ষ'

---

* "অসিদ্ধ বিরুদ্ধানৈকান্তিকা স্ত্রয়োহেত্বাভাসাঃ।" জৈন বাদিদেবসূরিকৃত "প্রমাণনয়-তত্ত্বালোকালঙ্কার"—ষষ্ঠপঃ ৩৭। "হেত্বাভাসা অসিদ্ধ-বিরুদ্ধানৈকান্তিকাহকিঞ্চিৎকরাঃ।" পরীক্ষা-মুখসূত্র।

হেতু-দ্বয় অসম্ভব নহে। কারণ, উভয় হেতুর মধ্যে কোন হেতুর দুর্ব্বলত্ব-নিশ্চয় না হওয়া পর্য্যন্ত সেই হেতুদ্বয়কে তুল্যবল বলা যায়। অর্থাৎ অনিশ্চিত-বলাবলত্বই হেতুদ্বয়ের তুল্যবলত্ব। পরে কোন হেতুর দুর্ব্বলত্ব-নিশ্চয় হইলে তখন আর সেই হেতু-দ্বয়ের 'সৎপ্রতিপক্ষত্ব' দোষ থাকে না। তখন নির্দ্দোষ প্রবল হেতুর দ্বারাই অনুমিতি জন্মে। প্রাচীন নৈয়ায়িকগণও উক্তরূপ হেতুদ্বয়ের "সৎপ্রতিপক্ষত্ব" দোষকে ঐরূপ অনিত্য দোষ অর্থাৎ সাময়িক দোষই বলিয়াছেন।

কিন্তু গৌতমের মতে "প্রকরণসম" বা 'সৎপ্রতিপক্ষ' হেত্বাভাস, "অনৈকান্তিক" হইতে ভিন্ন। কারণ, 'সৎপ্রতিপক্ষ' হেতুদ্বয়ের প্রয়োগ-স্থলে পরে মধ্যস্থগণের বাদী ও প্রতিবাদীর সাধ্যধর্ম্ম-বিষয়ে সংশয় জন্মে না। কিন্তু সংশয়ের নিবৃত্তি না হওয়ায় তদ্‌বিষয়ে জিজ্ঞাসা, জন্মে। ভাষ্যকার ইহাই বলিয়া "সব্যভিচার" হইতে "প্রকরণসমে"র ভেদ ব্যক্ত করিয়াছেন। মতান্তরে 'সৎপ্রতিপক্ষ' হেতুদ্বয়ের প্রয়োগ-স্থলে পরে মধ্যস্থ-গণের সংশয় জন্মিলেও 'সব্যভিচার' বা "অনৈকান্তিক" হইতে "সৎপ্রতিপক্ষ" হেত্বাভাস ভিন্ন। কারণ, "সব্যভিচাব"-স্থলে একই হেতুর প্রয়োগ হয় এবং সেই একই হেতু দুষ্ট। কিন্তু তুল্যবল বিরোধী অপর হেতুর প্রয়োগ না হইলে "সৎপ্রতিপক্ষ" হেত্বাভাস হয় না এবং সেই স্থলে উভয় হেতুই দুষ্ট। সুতরাং উহা 'সব্যভিচার' হইতে পৃথক হেত্বাভাস বলিয়াই স্বীকার্য্য।

"প্রকরণসম" ও "কালাতীত" নামে পৃথক্ হেত্বাভাস-স্বীকারে গৌতমের যুক্তি বুঝা যায় যে, অন্য প্রতিবন্ধক না থাকিলে যথার্থ অনুমিতির প্রয়োজক হেতুই প্রকৃত হেতু। "হেত্বাভাস" শব্দের অন্তর্গত "হেতু" শব্দেরও উহাই অর্থ। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত-লক্ষণাক্রান্ত "প্রকরণসম" হেতু-দ্বয়ের এবং "কালাতীত" হেতুর প্রয়োগ হইলে মধ্যস্থগণের কখনই সেই হেতুর দ্বারা সেই সাধ্যধর্ম্মের অনুমিতি

জন্মে না। অর্থাৎ উক্তরূপ "প্রকরণসম" হেতুদ্বয় এবং "কালাতীত" (বাধিত) হেতু সেই স্থলে সাধ্যধর্ম্মের অনুমিতির উৎপাদনে যোগ্যই নহে। সুতরাং উক্তরূপ হেতুকে প্রকৃত হেতু বলা যায় না। কিন্তু হেতুর সর্ব্ব-লক্ষণ-সম্পন্ন হইলে তাহাকে অহেতুও বলা যায় না। অতএব "অসৎপ্রতিপক্ষত্ব" এবং "অবাধিতত্ব" এই ধর্ম্মদ্বয়ও হেতুর লক্ষণ বলিয়া স্বীকার্য্য। "প্রকরণসম" (সৎপ্রতিপক্ষ) হেতুদ্বয়ে 'অসৎপ্রতিপক্ষত্ব'-রূপ লক্ষণ না থাকায় উহা অহেতু এবং "কালাতীত" ('বাধিত') হেতুতে 'অবাধিতত্ব'-রূপ লক্ষণ না থাকায় উহাও অহেতু। সুতরাং "প্রকরণসম" এবং "কালাতীত" নামে হেত্বাভাসও স্বীকার্য্য হওয়ায় গৌতমের মতে অনুমানের হেতু পঞ্চলক্ষণ এবং হেত্বাভাস পঞ্চবিধ। নানা গ্রন্থে নানা মতে—হেত্বাভাসের বহু প্রকার ভেদের বর্ণন ও ব্যাখ্যা হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্ব প্রকার সমস্ত হেত্বাভাসই "সব্যভিচারা"দি পঞ্চবিধ হেত্বাভাসেরই অন্তর্গত। মহর্ষি গৌতম ইহাই ব্যক্ত করিতে প্রথমে হেত্বাভাসের বিভাগ-সূত্র বলিয়াছেন—**সব্যভিচার-বিরুদ্ধ-প্রকরণসম-সাধ্যসম-কালাতীতা হেত্বাভাসাঃ ॥**

ছল ও জাতি

পূর্ব্বোক্ত "জল্প" ও "বিতণ্ডা"য় প্রতিবাদী কোন সময়ে সদুত্তর করিতে অসমর্থ হইলে পরাজয়-ভয়ে নীরব না থাকিয়া বহু প্রকার অসদুত্তর করিতে পারেন এবং চিরকালই অনেকে তাহা করিতেছেন। তন্মধ্যে অসদুত্তর-বিশেষের নাম—ছল। মহর্ষি গৌতম পরে যথাক্রমে উহার লক্ষণ-সূত্র ও বিভাগ-সূত্র বলিয়াছেন—

বচন-বিঘাতোঽর্থ-বিকল্পোপপত্ত্যা ছলং ॥

তৎ ত্রিবিধং, বাক্‌ছলং সামান্য-চ্ছল-

মুপচার-চ্ছলঞ্চ ॥ ১।২।১০।১১ ॥

অর্থাৎ বাদীর অভিমত শব্দার্থ বা বাক্যার্থ হইতে ভিন্ন অর্থের কল্পনার দ্বারা বাদীর বচন-বিঘাতক যে অসদুত্তর, তাহার নাম—**ছল**। সেই 'ছল' ত্রিবিধ। গৌতম পরে যথাক্রমে ত্রিবিধ ছলের লক্ষণ-সূত্র বলিয়াছেন—

অবিশেষাঽভিহিতেঽর্থে বক্তু রভিপ্রায়া-
দর্থান্তর-কল্পনা বাক্-ছলং ॥ ১।২।১২ ॥
সম্ভবতোঽর্থস্যাতি-সামান্যযোগাদ-
সম্ভূতার্থ-কল্পনা সামান্য-চ্ছলং। ১।২।১৩ ॥
ধর্ম্ম-বিকল্প-নির্দ্দেশেঽর্থ-সদ্ভাব-
প্রতিষেধ উপচারচ্ছলং ॥ ১।২।১৪ ॥

অবিশেষে উক্ত হইলে অর্থাৎ অনেক অর্থের বোধক কোন সামান্য শব্দ প্রযুক্ত হইলে তাহার অর্থ-বিষয়ে বক্তার অনভিপ্রেত অর্থের কল্পনার দ্বারা যে প্রতিষেধ,—তাহা (১) **বাক্ ছল**। যেমন নূতন কম্বলবিশিষ্ট কোন ব্যক্তিকে দেখিয়া কেহ বলিলেন—"নেপালা-দাগতোঽয়ং নবকম্বলবত্বাৎ।" অর্থাৎ এই ব্যক্তি নেপাল হইতে আগত, যেহেতু ইহাতে নবকম্বলবত্ত্ব আছে। পরে প্রতিবাদী বলিলেন—"একোঽস্য কম্বলঃ কুতো নব কম্বলাঃ?—অর্থাৎ ইহঁার একখানামাত্র কম্বল আছে, নয়খানা কম্বল কোথায়?—বস্তুতঃ উক্ত স্থলে বাদী নূতনার্থ "নব" শব্দের প্রয়োগ করিয়াই 'নবকম্বলবত্বাৎ'—এই হেতু বাক্য বলিয়াছেন। কিন্তু প্রতিবাদী তাহা বুঝিয়াই হউক, অথবা না বুঝিয়াই হউক, উক্ত হেতুবাক্যে ' 'নবন্" শব্দ গ্রহণ করিয়া "নবকম্বল" এই সমাসরূপ শব্দের অর্থান্তর-কল্পনা অর্থাৎ বক্তার অনভিপ্রেত নবসংখ্যক কম্বলরূপ অর্থের কল্পনার দ্বারা বাদীর হেতুতে অসিদ্ধি দোষ প্রদর্শন করায় উহা—**বাক্ ছল**। কিন্তু উক্তস্থলে বাদীর কথিত নূতনকম্বলবত্ত্ব-

রূপ হেতু অসিদ্ধ না হওয়ায় উক্তরূপ "ছল" অসদুত্তর। "বাক্‌ছলে"র আরও অনেক প্রকার উদাহরণ আছে।

সম্ভাব্যমান পদার্থের সম্বন্ধে 'অতিসামান্যযোগ' অর্থাৎ অতিব্যাপক কোন সামান্য ধর্ম্মের সত্তা-প্রযুক্ত বক্তার অনভিপ্রেত কোন অসম্ভব অর্থের কল্পনার দ্বারা যে প্রতিষেধ, তাহা (২) **সামান্যচ্ছল**। যেমন কেহ কোন ব্রাহ্মণকে বিদ্যার আচরণ-সম্পন্ন বলিলে অপর ব্যক্তি ব্রাহ্মণত্ব জাতির প্রশংসার উদ্দেশ্যেই বলিলেন—"সম্ভবতি ব্রাহ্মণে বিদ্যা-চরণ-সম্পৎ।" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-সন্তানে বিদ্যার অভ্যাস-সম্পৎ সম্ভব। পরে কোন প্রতিবাদী বলিলেন যে, ব্রাহ্মণত্ব জাতি থাকিলেই যদি বিদ্যাচরণ-সম্পন্ন হয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-সন্তান হইলেই যদি বিদ্বান্ হয়, তাহা হইলে শিশু এবং ব্রাত্যব্রাহ্মণও বিদ্যাচরণ-সম্পন্ন হউক্। উক্ত স্থলে ব্রাহ্মণত্ব ধর্ম্ম বিদ্যাচরণের পক্ষে অতিব্যাপক সামান্য ধর্ম্ম। কারণ, অবিদ্বান্ ব্রাহ্মণেও ব্রাহ্মণত্ব জাতি আছে। কিন্তু কেবল সেই ব্রাহ্মণত্ব জাতিই বিদ্যার হেতু নহে এবং বাদীর তাহা বিবক্ষিতও নহে। সুতরাং উক্ত স্থলে প্রতিবাদী ব্রাহ্মণত্ব জাতিতে বিদ্যার সাধক হেতুত্বরূপ অসম্ভব অর্থের কল্পনার দ্বারা ব্যভিচার দোষের প্রকাশ করায় উহা অসদুত্তর। উক্তস্থলে উহা ব্রাহ্মণত্বরূপ সামান্যধর্ম্ম-নিমিত্তক "ছল"। তাই উহার নাম—**সামান্যচ্ছল**।

বাদী কোন প্রসিদ্ধ লাক্ষণিক শব্দের প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি তাহার মুখ্য অর্থের কল্পনার দ্বারা প্রতিষেধরূপ অসদুত্তর করেন, তাহা হইলে উহার নাম (৩) **উপচার-চ্ছল**। যেমন কোন বাদী বলিলেন—"মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি।" "মঞ্চ" শব্দের মুখ্য অর্থ—উচ্চস্থ আসন-বিশেষ। উহা সেই মঞ্চস্থ পুরুষগণের আশ্রয় স্থান; এইজন্য মঞ্চস্থ পুরুষ অর্থে "মঞ্চ" শব্দের লাক্ষণিক প্রয়োগ হইয়াছে। উহাকে বলে—স্থান-নিমিত্তক "উপচার"। কিন্তু প্রতিবাদী উহা বুঝিয়াই হউক, অথবা

না-বুঝিয়াই হউক, উক্ত বাক্যে "মঞ্চ" শব্দের মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিয়াই প্রতিষেধ করিলেন যে, মঞ্চ ক্রোশন (আহ্বান) করিতেছে না। অর্থাৎ আসন-বিশেষ মঞ্চে আহ্বান-কর্তৃত্ব নাই। "মঞ্চ" শব্দের 'উপচার'-নিমিত্তক উক্তরূপ প্রতিষেধের নাম "উপচার-চ্ছল।" প্রাচীন মতে প্রসিদ্ধ লাক্ষণিক শব্দের প্রয়োগ-স্থলেই উহার মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিয়া প্রতিষেধ করিলে তাহাকে বলে—"উপচার-চ্ছল।" কিন্তু বাদীর অভিপ্রেত অর্থে উক্তরূপ প্রতিষেধ না হওয়ায় উহাও অসদুত্তর।

গৌতম পরে 'বাক্ চ্ছল' হইতে 'উপচারচ্ছল' ভিন্নপ্রকার নহে, এই পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, "উপচারচ্ছলে" বিশেষ আছে। আর সেই বিশেষ গ্রহণ না করিলে "বাক্ ছল" এবং "সামান্য চ্ছলে"রও অবিশেষবশতঃ "ছল"কে একবিধই কেন বলা হয় না? সুতরাং বিশেষ গ্রহণ করিয়া "ছল" ত্রিবিধ, ইহাই বক্তব্য। "চরক সংহিতা"র বিমান স্থানে (অষ্টম অঃ) দ্বিবিধ ছলই কথিত হইয়াছে। উহা প্রাচীন চরক-মত। "ছলে"র ন্যায় "জাতি"ও অসদুত্তর। তাই গৌতম পরেই "জাতি" পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

"জাতি" শব্দের অনেক অর্থ আছে। কিন্তু গৌতমের প্রথম সূত্রোক্ত পঞ্চদশ পদার্থ যে **জাতি**, তাহা অসদুত্তর-বিশেষ। পূর্ব্বোক্ত "জল্প" ও "বিতণ্ডা"য় প্রতিবাদীর যে উত্তর স্বব্যাঘাতক, অর্থাৎ তুল্যভাবে নিজের উত্তরের ব্যাঘাতক হয়, সেই উত্তরের নাম "জাতি" বা জাত্যুত্তর। উক্তরূপ অর্থেই ঐ "জাতি" শব্দটি পারিভাষিক। মহর্ষি গৌতম সামান্যতঃ ঐ "জাতি"র লক্ষণ বলিয়াছেন,—

সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং জাতিঃ ॥ ১।২।১৮ ॥

অর্থাৎ ব্যাপ্তিকে অপেক্ষা না করিয়া কেবল কোন সাধর্ম্ম্য অথবা বৈধর্ম্ম্য দ্বারা যে, "প্রত্যবস্থান" অর্থাৎ দোষোদ্ভাবন,—তাহাকে বলে—**জাতি**। গৌতম পরে পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে উক্ত "জাতি"কে

চতুর্ব্বিংশতি প্রকারে বিভক্ত করিয়া ক্রমে উহার লক্ষণ বলিয়াছেন এবং ঐ সমস্ত "জাতি" অসদুত্তর কেন, তাহাও বলিয়াছেন। গৌতমোক্ত চতুর্ব্বিংশতি প্রকার "জাতি"র নাম যথা—

(১) সাধর্ম্ম্য-সমা,	(১৩) অনুৎপত্তি-সমা,
(২) বৈধর্ম্ম্য-সমা,	(১৪) সংশয়-সমা,
(৩) উৎকর্ষ-সমা,	(১৫) প্রকরণ-সমা,
(৪) অপকর্ষ-সমা,	(১৬) অহেতু-সমা,
(৫) বর্ণ্য-সমা,	(১৭) অর্থাপত্তি-সমা,
(৬) অবর্ণ্য-সমা,	(১৮) অবিশেষ-সমা,
(৭) বিকল্প-সমা,	(১৯) উপপত্তি-সমা,
(৮) সাধ্য-সমা,	(২০) উপলব্ধি-সমা,
(৯) প্রাপ্তি-সমা,	(২১) অনুপলব্ধি-সমা,
(১০) অপ্রাপ্তিসমা,	(২২) অনিত্য-সমা,
(১১) প্রসঙ্গ-সমা,	(২৩) নিত্য-সমা,
(১২) প্রতিদৃষ্টান্ত-সমা,	(২৪) কার্য্য-সমা।

বাদী কোন "ন্যায়"-প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি কোন একটি সাধর্ম্ম্যমাত্র অথবা বৈধর্ম্ম্যমাত্রকে গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা বাদীর গৃহীত সেই ধর্ম্মী বা পক্ষে তাহার সাধ্যধর্ম্মের অভাবের আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে প্রতিবাদীর সেই উত্তরের নাম যথাক্রমে—

সাধর্ম্ম্য-সমা ও বৈধর্ম্ম্য-সমা জাতি।

যেমন কোন বাদী প্রথমে "শব্দোঽনিত্যঃ, কার্য্যত্বাদ্ ঘটবৎ"— ইত্যাদি বাক্যরূপ ন্যায়-প্রয়োগ করিয়া জন্যত্বরূপ হেতুর দ্বারা শব্দে অনিত্যত্বের সংস্থাপন করিলে তখন প্রতিবাদী সদুত্তর দ্বারা উহার

খণ্ডন করিতে অশক্ত হইয়া যদি বলেন যে, শব্দে যেমন ঘটের সাধর্ম্ম্য জন্যত্ব আছে ; তদ্রূপ, আকাশের সাধর্ম্ম্য অমূর্ত্তত্বও আছে। কারণ, শব্দও আকাশের ন্যায় অমূর্ত্ত পদার্থ। তাহা হইলে নিত্য আকাশের সাধর্ম্ম্য অমূর্ত্তত্ব-প্রযুক্ত শব্দও আকাশের ন্যায় নিত্য হউক? ঘটের সাধর্ম্ম্য জন্যত্ব-প্রযুক্ত শব্দ ঘটের ন্যায় অনিত্য হইবে, কিন্তু আকাশের সাধর্ম্ম্য অমূর্ত্তত্ব-প্রযুক্ত আকাশের ন্যায় নিত্য হইবে না,—এবিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। উক্ত-স্থলে প্রতিবাদীর উক্তরূপ উত্তরের নাম **সাধর্ম্ম্য-সমা** জাতি।

এইরূপ উক্তস্থলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, শব্দে যেমন অনিত্য ঘটের সাধর্ম্ম্য জন্যত্ব আছে ; তদ্রূপ, অনিত্য ঘটের বৈধর্ম্ম্য অমূর্ত্তত্বও আছে। সুতরাং শব্দে অনিত্য ঘটের বৈধর্ম্ম্য-প্রযুক্ত শব্দ নিত্য কেন হইবে না,—এবিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। প্রতিবাদীর উক্তরূপ উত্তরের নাম **বৈধর্ম্ম্যসমা** জাতি।

পূর্ব্বোক্ত স্থলে উক্ত দ্বিবিধ উত্তরই সদুত্তর নহে। কারণ, শব্দে আকাশের সাধর্ম্ম্য ও ঘটের বৈধর্ম্ম্য যে অমূর্ত্তত্ব, তাহাতে নিত্যত্ব ধর্ম্মের ব্যাপ্তি নাই অর্থাৎ অমূর্ত্ত পদার্থ হইলেই যে, উহা নিত্য হইবে, এমন নিয়ম নাই। কারণ, রূপাদি বহু অমূর্ত্ত পদার্থ অনিত্য, সুতরাং অমূর্ত্তত্ব ধর্ম্ম, নিত্যত্ব ধর্ম্মের ব্যভিচারী। কিন্তু প্রতিবাদী ব্যাপ্তির অপেক্ষা না করিয়া অর্থাৎ নিত্যত্বের ব্যাপ্তিশূন্য কেবলমাত্র ঐ সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যরূপ অমূর্ত্তত্বকে গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা শব্দে নিত্যত্বের আপত্তি প্রকাশ করায় তাহার ঐ উত্তর সদুত্তর হইতে পারে না। পরন্তু উহা স্ব-ব্যাঘাতকত্ব-বশতঃ অত্যন্ত অসদুত্তর। কারণ, প্রতিবাদী ব্যাপ্তিশূন্য কোন সাধর্ম্ম্য বা বৈধর্ম্ম্যমাত্রকে গ্রহণ করিয়া উক্তরূপ আপত্তি করিলে তুল্যভাবে সেখানে বাদীও বলিতে পারেন যে, প্রতিবাদীর ঐ উত্তর আমার মতের দূষক নহে। কারণ, অদূষক বচনমাত্রের সাধর্ম্ম্য যে বচনত্ব বা প্রমেয়ত্ব,

তাহা প্রতিবাদীর উক্ত বচনেও থাকায় তৎ-প্রযুক্ত অন্যান্য অদূষক বচনের ন্যায় প্রতিবাদীর ঐ বচনও অদূষক কেন হইবে না? তাহা হইলে প্রতিবাদীর ঐ উত্তর, উক্তরূপে নিজেরই ব্যাঘাতক হওয়ায় উহা কখনই সদুত্তর হইতে পারে না। এইরূপ অন্যান্য সমস্ত "জাতি"ও তুল্যভাবে স্ব-ব্যাঘাতক উত্তর হওয়ায় অসদুত্তর। তাই উদয়নাচার্য্য স্ব-ব্যাঘাতক উত্তরত্বই "জাতি"মাত্রের সামান্য লক্ষণ বলিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত "ছল" নামক অসদুত্তর ঐরূপ স্ব-ব্যাঘাতক নহে।

গৌতমোক্ত "জাতি" পদার্থের লক্ষণাদি অতিদুর্ব্বোধ। সংক্ষেপে তাহার কিছুই ব্যক্ত করা যায় না। উদাহরণ-প্রদর্শন ব্যতীতও কোন "জাতি"র স্বরূপ-ব্যাখ্যা সম্ভব হয় না। কিন্তু সংক্ষেপের অনুরোধে এই গ্রন্থে সমস্ত "জাতি"র ব্যাখ্যা সম্ভব হইল না। মৎ-সম্পাদিত ন্যায় দর্শনের পঞ্চম খণ্ডে সমস্ত "জাতি"র ব্যাখ্যা ও তদ্বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

নিগ্রহ-স্থান

"নিগ্রহস্থান"ই গৌতমোক্ত ষোড়শ পদার্থের অন্তর্গত চরম পদার্থ। গৌতম বলিয়াছেন—**বিপ্রতি-পত্তিরপ্রতিপত্তিশ্চ নিগ্রহ-স্থানম্**॥ (১।২।১৯)। বৃত্তিকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"নিগ্রহস্য খলীকারস্য স্থানং।" প্রাচীন নৈয়ায়িক উদ্দ্যোতকরও উক্ত **খলীকার** শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "বিবক্ষিতার্থাহপ্রতিপাদকত্বমেব খলীকারঃ।" তাৎপর্য্য এই যে "জল্প"ও "বিতণ্ডা"য় বাদী ও প্রতিবাদীর পরাজয়-রূপ নিগ্রহ হইলেও "বাদ কথায়" পরাজয়-রূপ নিগ্রহ বলা যায় না। কিন্তু তাহাতে জিগীষা-শূন্য গুরু-শিষ্য প্রভৃতির বিবক্ষিত বিষয়ের অপ্রতিপাদকত্ব অর্থাৎ নিজপক্ষ প্রতিপাদন করিতে না পারাই নিগ্রহ। উহার প্রাচীন নাম **খলীকার**। "খলীকার" নামে কোন নিগ্রহস্থান নাই।

ফলকথা, পরাজয়রূপ নিগ্রহ এবং "বাদ" স্থলে "খলীকার"রূপ নিগ্রহের যাহা স্থান অর্থাৎ কারণ, তাহাকে বলে **নিগ্রহ-স্থান**। বাদী অথবা প্রতিবাদীর "বিপ্রতিপত্তি" অর্থাৎ কোন বিষয়ে বিপরীত জ্ঞানরূপ ভ্রম এবং অনেক স্থলে "অপ্রতিপত্তি" অর্থাৎ অজ্ঞতাই তাঁহাদিগের নিগ্রহস্থানের মূল। তাই ঐ তাৎপর্য্যেই মহর্ষি গৌতম উক্ত সূত্রে বলিয়াছেন,—"বিপ্রতিপত্তিরপ্রতিপত্তিশ্চ"। বৃত্তিকার বলিয়াছেন যে, যদ্দ্বারা বাদী বা প্রতিবাদীর বিপ্রতিপত্তি বা অপ্রতিপত্তি অনুমিত হয়, তাহাকে বলে,—"নিগ্রহস্থান",—ইহাই গৌতমের উক্ত সূত্রের তাৎপর্য্যার্থ। তন্মধ্যে বিপ্রতিপত্তিমূলক নিগ্রহস্থানগুলি "বিপ্রতিপত্তি" শব্দের দ্বারা এবং অপ্রতিপত্তি-মূলক নিগ্রহস্থানগুলি "অপ্রতিপত্তি" শব্দের দ্বারা লক্ষিত হইয়াছে।

মহর্ষি গৌতম পরে ন্যায় দর্শনের পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে পূর্ব্বোক্ত নিগ্রহ স্থানকে দ্বাবিংশতি প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা—

(১) প্রতিজ্ঞা-হানি,
(২) প্রতিজ্ঞান্তর,
(৩) প্রতিজ্ঞা-বিরোধ,
(৪) প্রতিজ্ঞা-সন্ন্যাস,
(৫) হেত্বন্তর,
(৬) অর্থান্তর,
(৭) নিরর্থক,
(৮) অবিজ্ঞাতার্থ,
(৯) অপার্থক,
(১০) অপ্রাপ্তকাল,
(১১) ন্যূন,
(১২) অধিক,
(১৩) পুনরুক্ত,
(১৪) অননুভাষণ,
(১৫) অজ্ঞান,
(১৬) অপ্রতিভা,
(১৭) বিক্ষেপ,
(১৮) মতানুজ্ঞা,
(১৯) পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণ,
(২০) নিরনুযোজ্যানুযোগ,
(২১) অপসিদ্ধান্ত,
(২২) হেত্বাভাস।

বাদী বা প্রতিবাদী প্রথমে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ব-প্রয়োগপূর্ব্বক নিজ পক্ষ স্থাপন করিয়া পরে তাঁহার প্রতিবাদীর প্রদর্শিত কোন দোষের উদ্ধারে অসমর্থ হইয়া যদি তাঁহার পূর্ব্বোক্ত "পক্ষ" প্রভৃতি যে কোন পদার্থ পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার (১) **প্রতিজ্ঞাহানি** নামক নিগ্রহ স্থান হয়।

যেমন কোন বাদী প্রথমে "শব্দোঽনিত্যঃ"—এই প্রতিজ্ঞা বাক্যের প্রয়োগ করিয়া "হেতু" বাক্যাদির প্রয়োগ দ্বারা শব্দে অনিত্যত্বের সংস্থাপন করিলে পরে প্রতিবাদী মীমাংসক, শব্দের নিত্যত্ব-পক্ষে প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া বাদীর পূর্ব্বোক্ত অনুমানে "বাধ" দোষ সমর্থন করিলেন। তখন বাদী নৈয়ায়িক সেই দোষ খণ্ডন করিতে অশক্ত হইয়া পরে যদি বলেন—"পর্ব্বতোঽনিত্যঃ", অর্থাৎ যদি শব্দকে পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বতকে পক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া তাহারই অনিত্যত্ব স্থাপন করেন,—তাহা হইলে উক্ত স্থলে সেই বাদীর "প্রতিজ্ঞাহানি" নামক নিগ্রহস্থান হইবে। এইরূপ বাদী তাহার পূর্ব্বকথিত হেতু, দৃষ্টান্ত, সাধ্যধর্ম্ম ও তাহার বিশেষণ প্রভৃতি যে কোন পদার্থের পরিত্যাগ করিলেও সেখানে তাহার "প্রতিজ্ঞাহানি" নামক নিগ্রহ স্থান হইবে।

বাদী যদি প্রতিবাদীর প্রদর্শিত দোষের উদ্ধারের উদ্দেশ্যে তাঁহার পূর্ব্বকথিত হেতু ভিন্ন যে কোন পদার্থে কোন বিশেষণ প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে সেখানে তাঁহার (২) **প্রতিজ্ঞান্তর** নামক নিগ্রহ স্থান হইবে।

যেমন বাদী মীমাংসক "শব্দো নিত্যঃ"—এই প্রতিজ্ঞা বাক্য প্রয়োগ করিয়া শব্দে নিত্যত্ব পক্ষের সংস্থাপন করিলে, তখন প্রতিবাদী নৈয়ায়িক বলিলেন যে—ধ্বন্যাত্মক শব্দ যে অনিত্য, ইহা ত সর্ব্বসিদ্ধ; সুতরাং শব্দমাত্রে নিত্যত্ব সাধন করা যায় না। নৈয়ায়িক ঐ কথা বলিয়া উক্তানুমানে অংশতঃ "বাধ" দোষের উদ্ভাবন করিলে, তখন মীমাংসক যদি

বলেন—"অস্তু বর্ণাত্মকঃ শব্দঃ পক্ষঃ", অর্থাৎ আমি বর্ণাত্মক শব্দ মাত্রকেই পক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া তাহাতেই নিত্যত্ব-সাধন করিব। উক্ত স্থলে বাদী মীমাংসক তাহার পূর্ব্বগৃহীত শব্দরূপ পক্ষে বর্ণাত্মকত্ব-রূপ বিশেষণ প্রবিষ্ট করায় তাহার "প্রতিজ্ঞান্তর" নামক নিগ্রহ স্থান হইবে। এইরূপ উদাহরণ বা উপনয় বাক্যেও পরে কোন পদার্থে কোন বিশেষণ প্রবিষ্ট করিলে সেখানেও উক্ত "প্রতিজ্ঞান্তর" নামক নিগ্রহস্থানই হইবে।

পূর্ব্বোক্ত "প্রতিজ্ঞাহানি"-স্থলে বাদী তাঁহার পূর্ব্বোক্ত কোন পদার্থকে পরিত্যাগ করায় ফলে তাঁহার গৃহীত পক্ষেরই হানি হয়। কিন্তু "প্রতিজ্ঞান্তর"-স্থলে বাদী তাঁহার পূর্ব্বোক্ত কোন পদার্থের পরিত্যাগ করেন না, কিন্তু তাঁহার কথিত হেতু ভিন্ন কোন পদার্থে অতিরিক্ত বিশেষণমাত্র প্রবিষ্ট করেন। সুতরাং "প্রতিজ্ঞাহানি" হইতে "প্রতিজ্ঞান্তরে"র উক্তরূপ ভেদ বা বিশেষ আছে। এখন শেষোক্ত নিগ্রহস্থানগুলির স্বরূপমাত্রই সংক্ষেপে বলিব। তাহাদিগের উদাহরণ প্রদর্শন করা সম্ভব নহে।

বাদী বা প্রতিবাদীর প্রতিজ্ঞা ও হেতু যদি পরস্পর বিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে (৩) **প্রতিজ্ঞা-বিরোধ** নামক নিগ্রহস্থান হয়।

প্রতিবাদী বাদীর পক্ষের খণ্ডন করিলে বাদী তাহার খণ্ডন করিতে অশক্ত হইয়া যদি নিজের প্রতিজ্ঞার্থ অস্বীকার করেন, অর্থাৎ পরে যদি বলেন যে—'আমি ইহা বলি নাই', তাহা হইলে সেখানে তাহার **প্রতিজ্ঞা-সন্ন্যাস** নামক নিগ্রহ স্থান হয়।

প্রতিবাদী বাদীর কথিত হেতুতে ব্যভিচার দোষ প্রদর্শন করিলে সেই দোষের উদ্ধারের জন্য বাদী পরে যদি তাঁহার সেই হেতুতেই কোন বিশেষণ-প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার (৫) **হেত্বন্তর**

নামক নিগ্রহ স্থান হয়। পূর্ব্বোক্ত "প্রতিজ্ঞান্তর"—স্থলে হেতু ভিন্ন পদার্থেই বিশেষণ প্রবিষ্ট হওয়ায় উহা "হেত্বন্তর" হইতে ভিন্ন।

বাদী বা প্রতিবাদী প্রতিজ্ঞাদি বাক্য দ্বারা নিজ পক্ষ স্থাপন করিতে মধ্যে যদি কোন অসম্বদ্ধার্থ বাক্য অর্থাৎ প্রকৃত বিষয়ের অনুপযোগী বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে সেখানে তাঁহাদিগের (৬) **অর্থান্তর** নামক নিগ্রহ স্থান হয়।

বাদী বা প্রতিবাদী নিজপক্ষ স্থাপন করিতে যদি অর্থ-শূন্য অর্থাৎ যাহা কোন অর্থের বাচক নহে—এমন শব্দের প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে সেখানে তাঁহাদিগের (৭) **নিরর্থক** নামক নিগ্রহ স্থান হয়।

বাদী যদি এমন কোন বাক্য প্রয়োগ করেন যে, যাহা তিন বার বলিলেও অতি দুর্ব্বোধার্থ বলিয়া মধ্যস্থ সভ্যগণ ও প্রতিবাদী কেহই তাহার অর্থ বুঝিতে পারেন না, তাহা হইলে সেখানে বাদীর সেই বাক্য অবিজ্ঞাতার্থ বলিয়া তাঁহার (৮) **অবিজ্ঞাতার্থ** নামক নিগ্রহ স্থান হয়।

যে পদ-সমূহ বা বাক্য-সমূহের মধ্যে প্রত্যেক পদ ও প্রত্যেক বাক্যের প্রতিপাদ্য অর্থ থাকিলেও সমুদায়ের প্রতিপাদ্য অর্থ নাই, অর্থাৎ যে পদ-সমূহ বা বাক্য-সমূহ মিলিত হইয়া কোন বিশিষ্টার্থ-বোধ জন্মায় না, বাদী বা প্রতিবাদী তাহার প্রয়োগ করিলে তাঁহাদিগের (৯) **অপার্থক** নামক নিগ্রহ স্থান হয়।

বাদী বা প্রতিবাদী যদি প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ব বাক্য অথবা অন্যান্য বক্তব্যের ক্রম লঙ্ঘন করিয়া যে কালে যাহা বক্তব্য, তৎপূর্ব্বেই তাহা বলেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের (১০) **অপ্রাপ্তকাল** নামক নিগ্রহ স্থান হয়।

বাদী বা প্রতিবাদীর নিজ পক্ষ স্থাপন করিতে নিজসম্প্রদায়-সম্মত অবয়বের মধ্যে যে কোন একটি অবয়বও ন্যূন হইলে অর্থাৎ তাহার

প্রয়োগ না করিলে তাঁহাদিগের (১১) **ন্যূন** নামক নিগ্রহ স্থান হয়।

বাদী বা প্রতিবাদী নিজ পক্ষ স্থাপন করিতে নিষ্প্রয়োজনে "হেতু" বাক্য বা "উদাহরণ" বাক্য একের অধিক বলিলে তাঁহাদিগের (১২) **অধিক** নামক নিগ্রহ স্থান হয়।

বাদী বা প্রতিবাদী নিষ্প্রয়োজনে কোন শব্দ বা অর্থের পুনরুক্তি করিলে (১৩) **পুনরুক্ত** নামক নিগ্রহ স্থান হয়।

বাদী প্রথমে নিজ পক্ষ-স্থাপনাদি করিলে প্রতিবাদী পরে মধ্যস্থগণের নিকটে বাদীর সেই সমস্ত বাক্যার্থ অথবা তন্মধ্যে তাহার খণ্ডনীয় পদার্থের অনুভাষণ করিয়া অর্থাৎ বাদী ইহা বলিয়াছেন, ইহা প্রকাশ করিয়াই তাহার খণ্ডন করিবেন, ইহাই 'জল্প' ও 'বিতণ্ডা'-স্থলে নিয়ম। কিন্তু বাদী প্রথমে তিনবার তাঁহার সমস্ত বাক্য বলিলেও এবং মধ্যস্থ সভ্যগণ সেই বাক্যার্থ বুঝিলেও প্রতিবাদী যদি তাহার অনুভাষণ না করেন, তাহা হইলে সেখানে তাঁহার (১৪) **অননুভাষণ** নামক নিগ্রহ স্থান হয়।

বাদী তাঁহার বক্তব্য তিনবার বলিলেও এবং মধ্যস্থ সভ্যগণ বাদীর সেই বাক্যার্থ বুঝিলেও প্রতিবাদী যদি তাহা বুঝিতে না পারেন, তাহা হইলে সেখানে তাঁহার (১৫) **অজ্ঞান** নামক নিগ্রহ স্থান হয়।

প্রতিবাদী বাদীর বাক্যার্থ বুঝিয়া মধ্যস্থগণের নিকটে তাহার অনুভাষণ পর্য্যন্ত করিলেও পরে উত্তর-কালে যদি তাহার উত্তরের স্ফূর্ত্তি না জ্ঞান না হয়, তাহা হইলে সেখানে তাঁহার (১৬) **অপ্রতিভা** নামক নিগ্রহ স্থান হয়।

বাদী নিজপক্ষ-স্থাপনাদি করিলে প্রতিবাদী যদি তখনই অথবা নিজ বক্তব্য কিছু বলিয়াই ভাবী পরাজয়ের সম্ভাবনায় কোন কার্য্য-ব্যাসঙ্গ প্রকাশ করিয়া অর্থাৎ আমার বাড়ীতে অবশ্য কর্ত্তব্য এমন কার্য্য আছে, যে জন্য এখনই আমার বাড়ী যাওয়া অত্যাবশ্যক, পরে যথা বক্তব্য

বলিব,—এইরূপ কোন মিথ্যা বলিয়া আরব্ধ "কথা"র ভঙ্গ করিয়া চলিয়া যান্, তাহা হইলে সেখানে তাঁহার (১৭) **বিক্ষেপ** নামক নিগ্রহস্থান হয়।

প্রতিবাদী যদি নিজ পক্ষে বাদীর প্রদর্শিত দোষের উদ্ধার না করিয়া অর্থাৎ নিজ পক্ষে সেই দোষ মানিয়া লইয়াই বাদীর পক্ষেও তত্তুল্য দোষের আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সেখানে তাহার (১৮) **মতানুজ্ঞা** নামক নিগ্রহ স্থান হয়।

বাদী বা প্রতিবাদী কোন নিগ্রহস্থান-প্রাপ্ত হইলেও তাঁহার প্রতিবাদী যদি সেই নিগ্রহস্থানের উল্লেখ না করেন অর্থাৎ যে কোন কারণে তাহার উপেক্ষা করেন, তাহা হইলে উহা সেখানে তাঁহার (১৯) **পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণ** নামক নিগ্রহ স্থান হয়। এই নিগ্রহস্থান পরে মধ্যস্থই উদ্ভাবন করিবেন।

যাহা যেখানে বস্তুতঃ নিগ্রহস্থান নহে, তাহাকে নিগ্রহস্থান বলিয়া বাদী বা প্রতিবাদী, যদি অপরকে বলেন যে, আপনি এই নিগ্রহস্থান দ্বারা নিগৃহীত হইয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহার (২০) **নিরনুযোজ্যানুযোগ** নামক নিগ্রহস্থান হয়।

বাদী বা প্রতিবাদী কোন শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া নিজমত-সমর্থন করিতে পরে যদি বাধ্য হইয়া সেই স্বীকৃত সিদ্ধান্তের বিপরীত সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন, তাহা হইলে সেখানে তাঁহার (২১) **অপসিদ্ধান্ত** নামক নিগ্রহস্থান হয়।

পূর্ব্বে "সব্যভিচার" প্রভৃতি নামে যে পঞ্চবিধ হেত্বাভাস লক্ষিত হইয়াছে, সেই লক্ষণাক্রান্ত সেই সমস্ত (২২) **হেত্বাভাসও** নিগ্রহস্থান। তাই মহর্ষি গৌতম ন্যায়দর্শনে সর্ব্বশেষ সূত্র বলিয়াছেন—

হেত্বাভাসাশ্চ যথোক্তাঃ।

বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি অনেক পূর্ব্বাচার্য্য গৌতমের উক্ত চরম সূত্রে "চ" শব্দের দ্বারা আরও কোন কোন নিগ্রহস্থানের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "তত্ত্বচিন্তামণি"র "অসিদ্ধি"গ্রন্থের "দীধিতি"টীকার শেষে রঘুনাথ শিরোমণিও বলিয়াছেন—"চকারেণ সমুচ্চিতং পৃথগেব নিগ্রহস্থানম্"।*

পূর্ব্বোক্ত দ্বাবিংশতি প্রকার নিগ্রহস্থানের মধ্যে "অপসিদ্ধান্ত" ও "হেত্বাভাস"রূপ নিগ্রহস্থান, তত্ত্বনির্ণয়ার্থ "বাদ" কথাতেও উদ্ভাব্য। মতান্তরে আরও কোন কোন নিগ্রহস্থানও উদ্ভাব্য। কিন্তু "জল্প" ও "বিতণ্ডা" নামক কথায় সর্ব্বপ্রকার নিগ্রহস্থানই উদ্ভাব্য এবং তাহাতে প্রতিবাদীর জয়লাভের উদ্দেশ্যে পূর্ব্বোক্ত "ছল" ও "জাতি" নামক নানাপ্রকার অসদুত্তরেরও প্রয়োগ হইতে পারে। তাই মহর্ষি গৌতম পূর্ব্বে "জল্পে"র লক্ষণ-সূত্রে বলিয়াছেন—"ছল-জাতি-নিগ্রহস্থান-সাধনোপালম্ভো জল্পঃ"। পূর্ব্বে যথাস্থানে ইহা বলিয়াছি এবং স্থল-বিশেষে যে, নিজের অপক্ক তত্ত্বনিশ্চয়-রক্ষার্থ মুমুক্ষু ব্যক্তিরও "জল্প" ও "বিতণ্ডা" কর্ত্তব্য হয়, এবিষয়েও গৌতমের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। "নিগ্রহস্থানে"র বিশেষ জ্ঞান ব্যতীত কোন বিচারই হইতে পারে না। তাই অন্যান্য নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ও উহার বিচার করিয়াছেন। কিন্তু পরে বৌদ্ধ সম্প্রদায় গৌতমোক্ত সর্ব্বপ্রকার নিগ্রহস্থান স্বীকার করেন নাই। বৌদ্ধাচার্য্য ধর্ম্মকীর্ত্তির "বাদন্যায়" গ্রন্থ ও তাহার শান্ত রক্ষিত-কৃত টীকা

* উক্তস্থলে রঘুনাথ শিরোমণি বলিয়াছেন যে, হেতুতে ব্যর্থ বিশেষণ প্রযুক্ত সেই হেতুকে "ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ" নামে কোন হেত্বাভাস বলা যায় না। কিন্তু সেই ব্যর্থ-বিশেষণ-প্রয়োগ, বাদী পুরুষেরই দোষ। সুতরাং উহা 'নিগ্রহস্থান' বলিয়াই স্বীকার্য্য। অতএব গৌতমের চরমসূত্রে অনুক্ত সমুচ্চয়ার্থ "চ" শব্দের দ্বারা সেই অতিরিক্ত নিগ্রহস্থানও বুঝিতে হইবে। শিরোমণির উক্ত মতের ব্যাখ্যায় "বিশেষব্যাপ্তি-দীধিতি"র টীকার শেষে ঐ তাৎপর্য্যেই জগদীশ বলিয়াছেন—"অধিকেনৈব নিগ্রহস্থানেন পুরুষো নিগৃহ্যতে। নীলধূমাদি ব্যর্থ বিশেষণবিশিষ্ট হেতুর প্রয়োগস্থলে ইহার উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে।

পাঠ করিলে গৌতমমত-খণ্ডনে তাঁহাদিগের সমস্ত কথা জানা যাইবে। পরে বাচস্পতিমিশ্র ও জয়ন্তভট্ট প্রভৃতি পূর্ব্বাচার্য্যগণ অনেক কথারও বিস্তারপূর্ব্বক খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের প্রতিবাদও অবশ্য পাঠ্য ও বোধ্য। সংক্ষেপে সে সমস্ত কথার কিছুই ব্যক্ত করা যায় না। মৎসম্পাদিত ন্যায়দর্শনের (দ্বিতীয় সং) প্রথম খণ্ডের শেষে এবং পঞ্চম খণ্ডের শেষে উক্ত বিষয়ে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

যুগ্মাষ্ট-দ্ব্যেকবঙ্গাব্দে (১২৮২) মাঘস্যৈকাদশে দিনে।
সোমবারে চতুর্দ্দশ্যাং লগ্নে চ মিথুনে শুভে॥
যশোহর-প্রদেশে যো বিদ্বদ্বিপ্র-কুলান্বিতে।
গ্রামে 'তালখড়ী' নাম্নি ভট্টাচার্য্য-কুলেঽভবৎ॥
পিতা সৃষ্টিধরো নাম যস্য বিদ্বান্ মহাতপাঃ।
মাতা চ মোক্ষদা দেবী দেবীব ভুবি যা স্থিতা॥
সরোজবাসিনী পত্নী নিজমুক্ত্যর্থমেব হি।
যং কাশীমনয়দ্ বদ্ধা পূর্ব্বং পূর্ব্বতপোগুণৈঃ॥
সোঽধুনা কলিকাতাস্থো বদ্ধঃ কর্ম্মবশাদহম্।
বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃদ্ধঃ পাঠয়ামীশ্বরেচ্ছয়া॥
অশক্তেনাপি তেনাত্র নিযুক্তেন যথামতি।
ন্যায়দর্শন-সিদ্ধান্ত-ব্যাখ্যা সংক্ষেপতঃ কৃতা॥

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা।	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৩৪	ব্রহ্মেব	ব্রহ্মৈব
১৩৫	গ্রণ	গ্রহণ
১৩৯	হস্তত্ব	হস্ত্ত্ব
১৪২	বহনাং	বহূনাং
২২০	গৃহে অসত্তা	বহিঃ সত্তা
২৪৪	(১।১।১৯ ।	(১।১৯) ।
২৭২	ধর্ম্মোপপত্তেরূপ	ধর্ম্মোপপত্তের্ব্বিপ্রতিপত্তে
২৮০	সোহ	সোঽহ
৩১৩	বরদারজ	বরদরাজ
৩৩০-৩১	অনেকান্তিক	অনৈকান্তিক
৩৩৪	ঊচ্চস্থ	উচ্চস্থ